হাদীস শরীফ
২য় খণ্ড
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

হাদীস শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৯২১-০৯২৪৬৭

হাদীস শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

রচনাকাল ঃ
প্রকাশকাল ঃ ১৯৬৪
১৩ প্রকাশ ঃ মার্চ ঃ ২০০৮
চৈত্র ঃ ১৪১৪
রবিউল আউয়ালঃ ১৪২৯

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
খায়রুন প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা নাসিরুল হক
খায়রুন প্রকাশনী ॥

প্রচ্ছদ ঃ
মোস্তাফা বশীরুল হাসান ॥

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স, ১০-ই/এ-১, মধুবাগ,
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ২২০.০০

HADIS SHARIF *(2nd volume): Compilation of selected traditions of the Holy Prophet (sm) with Bangla translation and explanatory notes by Moulana Muhammad Abdur Rahim & Published by Mustafa Nasirul Haque of Khairun Prokashani, Dhaka , Bangladesh.*
march 2008

Price : Tk 220.00
U.S. $ 5

ISBN 984-8455-04-3 (set)

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অবয়ব নির্মাণে হাদীস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। কুরআনী নির্দেশাবলীর মর্মার্থ অনুধাবন এবং বাস্তব জীবনে উহার যথার্থ অনুশীলনে হাদীসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। এ কারণেই যুগে-যুগে দেশে-দেশে হাদীসের সংকলন, অনুবাদ ও বিশ্লেষণের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সময়ের চাহিদা মোতাবেক হাদীসের বিন্যাস ও ভাষ্য রচনার দুরূহ কাজও অনেক মনীষী সম্পাদন করিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় হাদীসের কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ হইলেও উহার যুগোপযোগী বিন্যাস ও ভাষ্য রচনার কাজটি প্রায় উপেক্ষিতই ছিল দীর্ঘকাল যাবত। ফলে এতদাঞ্চলের সাধারণ দ্বীনদার লোকেরা এসব অনুবাদ পড়িয়া খুব বেশী উপকৃত হইতে পারিতেন না; উহা হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লাভও অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হইতনা। সৌভাগ্যক্রমে, একালের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) সুদীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বৎসরব্যাপী অশেষ সাধনাবলে 'হাদীস শরীফ' নামক গ্রন্থমালা প্রণয়ন করিয়া বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের দীর্ঘকালের এক বিরাট অভাব পূরণ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে তিনি হাদীসের বিশাল ভান্ডার হইতে অতি প্রয়োজনীয় হাদীসসমূহ চয়ন করিয়া একটি নির্দিষ্ট ধারাক্রম অনুসারে সাজাইয়া দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আগাগোড়াই তিনি ইসলামের মৌল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আধুনিক মন-মানসের চাহিদার প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ইহাতে সন্নিবিষ্ট হাদীসসমূহের তিনি শুধু প্রাঞ্জল অনুবাদ ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং ইহার আলোকে প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধানগুলিও অতি চমৎকারভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই দিক দিয়া তিনি একই সঙ্গে মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ উভয়ের দায়িত্বই অতি নিপুনভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন।

'হাদীস শরীফ' নামক এই গ্রন্থমালার প্রণয়নের কাজ তিনি শুরু করিয়াছিলেন ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। ইহার প্রথম খন্ডের প্রথম ভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে-আইয়ুব শাহীর কারাগারে তাঁহার অবস্থানকালে-আর দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। অতঃপর বিগত দুই যুগে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা হইতে ইহার পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একইভাবে ইহার দ্বিতীয় খন্ডও প্রথমতঃ দুই ভাগে এবং পরে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা হইতে। অবশ্য ইহার তৃতীয় খন্ড এখনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে 'খায়রুন প্রকাশনী' গ্রন্থটির সকল খন্ডের প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং সে অনুসারে প্রথম খন্ড ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

বর্তমানে কাগজ-কালির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির দরুণ মুদ্রণ ব্যয় বহুলাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশক গ্রন্থটির মূল্য যথাসম্ভব যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য গ্রন্থের কলেবর সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়া ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে। অন্যদিকে, ইহার মুদ্রণ পারিপাট্য পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থের এই সংস্করণটি পাঠকদের নিকট অধিকতর সমাদৃত হইবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গ্রন্থকারের এই দ্বীনী খিদমত কবুল করুন এবং তাঁহাকে জান্নাতুল ফিরদৌসে স্থান দিন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
সেক্রেটারী
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন

নভেম্বর ১৯৯১ ইং

ভূমিকা

'হাদীস শরীফ' নামে সহীহ্ হাদীসের সংকলন, তরজমা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যায়ে আজ হইতে প্রায় পনর বৎসর পূর্বে যে গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলাম, ইতিপূর্বে বিগত ষাট দশকের প্রথমার্ধে উহার প্রথম খণ্ডের দুইটি ভাগ প্রকাশিত হইয়া সুধী পাঠকদের হাতে পৌছিয়াছে। বর্তমানে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডটি দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া ঢাকাস্থ 'মাহবুব প্রকাশনী' কর্তৃক প্রকাশিত হইল। হাদীস শরীফের এই খণ্ডও আমি সুধী মণ্ডলীর সম্মুখে পেশ করিতে পারিয়াছি, এইজন্য আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শোকরিয়া আদায় করিতেছি এবং যাঁহার বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই গ্রন্থ, সেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি জানাইতেছি অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

'হাদীস শরীফের' প্রথম দুই ভাগের ভূমিকায় নিবেদন করিয়াছি যে, হাদীস কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দ্বীন ইসলামের প্রথম উৎস কুরআন, দ্বিতীয় উৎস হাদীস। অতএব কুরআন বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে হাদীস সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করা মুসলমানের পক্ষে একান্তই কর্তব্য। বস্তুত কুরআন বুঝিবার জন্যও হাদীস জানা অপরিহার্য, হাদীস না জানিলে কুরআন জানা ও বুঝা সম্ভব নয়। দ্বীন ইসলাম জানার জন্য কুরআন হইতে পাওয়া জ্ঞানও সম্পূর্ণ নয় হাদীসের জ্ঞান ব্যতীত। ব্যক্তিগতভাবে আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের শোকরিয়া এইজন্যও আদায় করিতেছি যে, দেশবাসীর সমীপে পূর্ণাঙ্গ দীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করিতে গিয়া দুইটি বড় খিদমত সুসম্পন্ন করার তওফীক আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল, কুরআন মজীদের যথোপযোগী ও আধুনিকতম জ্ঞানে সুসমৃদ্ধ তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' আর দ্বিতীয়টি হইল, হাদীসের এই বিরাট সংকলন।

ইসলাম সম্পর্কিত অন্যান্য বহু মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদের প্রসঙ্গ না হয় এখানে অনুল্লিখিতই থাকিল।

হাদীস শরীফের এই দ্বিতীয় খণ্ড দুইটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'তাহারাত ও নামায' সংক্রান্ত হাদীস এবং দ্বিতীয় ভাগে 'রোযা, যাকাত, হজ্জ ও কুরবানী' সংক্রান্ত হাদীসমসমূহ সংকলিত হইয়াছে ও সবিস্তারে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এই উভয় ভাগের হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং আলোচনা ও পর্যালোচনা পর্যায়ে আমি জরুরী সব কথাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এই ব্যাপারে প্রধানত সিয়াহ সিত্তা ছাড়াও অন্যান্য বহু কয়খানি মৌলিক হাদীস গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া সহীহমত হাদীসসমূহ সংকলিত করিয়াছি এবং উহার ব্যাখ্যা পর্যায়ে প্রখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ মন্থন করিয়া ইসলামী শরীয়তের মনি-মুক্তা আহরণ করিতে ও তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এই কারণে গ্রন্থাবলীর নাম প্রত্যেক্ষ হাদীস ও উহার ব্যাখ্যার শেষে উল্লেখ করিয়াছি এবং স্বতন্ত্রভাবে সমস্ত গ্রন্থের তালিকা গ্রন্থপঞ্জী শিরোনামায় একসঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিয়াছি।

দ্বিতীয় খণ্ড হাদীস গ্রন্থের এই দুইটি ভাগে যেসব হাদীস সংকলিত হইয়াছে, একটি শব্দে উহার শিরোনামা হইতেছে 'ইবাদত'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সর্বাত্মকভাবে তাঁহার প্রকৃত বান্দা বানাইবার জন্য এবং সমগ্র জীবন আল্লাহ্র ইবাদত পালনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যেসব বুনিয়াদী ইবাদতের অনুষ্ঠান চিরস্থায়ীভাবে ফরয করিয়া দিয়াছেন, এই দুইটি ভাগে সেই সংক্রান্ত হাদীসমূহই সংকলিত হইয়াছে। এই সব বিষয়ে রাসূলে করীম (স) নিজ ভাষায় যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন ও কথা বুঝাইয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই আলোচনাকে এক কথায় বলা যাইতে পারে 'ফিকাহ্'। কেননা কুরআন ও হাদীস হইতে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের জন্য যেসব আইন-বিধান পাওয়া যায় ও উহার ভিত্তিতে যেসব খুঁটিনাটি মস্‌লা জানা যায়, তাহারই অপর নাম 'ফিকাহ'। ফিকাহর এই সব মস্‌লা সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলমানেরই জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু শুধু মসলামাসায়েল শিক্ষা দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। মুসলমানের ব্যবহারিক জীবনের নিয়ম-নীতি ও আইন বিধান যে ফিকাহ রচয়িতাদের মনগড়া ও স্বকপোলকল্পিত নয়, বরং তাহার সবই মূলত কুরআন ও হাদীস হইতেই নিঃসৃত ও উৎসারিত, মূল দলীলের ভিত্তিতে তাহা জনাইয়া দেওয়া এই গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্য। কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে হাদীস জানা ও শেখা যে মুসলমানের পক্ষে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তাহা এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্টরূপে বুঝিতে

পারা যাইবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা এক একটি হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই সংক্রান্ত অন্যান্য হাদীসেরও উদ্ধৃতি দিয়াছি এবং সেই হাদীসের সঙ্গে কুরআন মজীদের যে যে আয়াতের কোন না কোন সম্পর্ক আছে, প্রসঙ্গত সেই আয়াতটিরও উল্লেখ করিয়াছি। শুধু তাহাই নয়, আলোচ্য হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে মুহাদ্দিস ও ফিকাহ্‌বিদগণের অভিমত তাঁহাদের প্রত্যেকের দলীল-প্রমাণসহ উল্লেখ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি; কোন কোন ক্ষেত্রে দলীলের ভিত্তিতে যে মতটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, তাহাও চিহ্নিত করিয়াছি।

আমি আমার অতীব নগণ্য সামন্য জ্ঞান ও বুঝিবার যোগ্যতা অনুযায়ী হাদীস সমূহের তরজমা ও ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং উহার ভিত্তিতে সর্বজনমান্য মুহাদ্দিস, ফিকাহ্‌বিদ ও ইমামগণের মতামতের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর তথ্যানুযায়ী উল্লেখ করিয়াছি। কোথাও ভুল হইয়া থাকিলে সেইজন্য এখনই আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করিতেছি এবং কোন বিজ্ঞ পাঠক আমার ভুল ধরাইয়া দিলে তাহা সংশোধনের জন্য প্রস্তুত থাকার কথা সবিনয়ে জানাইয়া দিতেছি।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট গৃহীত হয়, রাসূলে করীম (স)-ও যদি ইহাকে দ্বীনের যথার্থ খিদমত রূপে পছন্দ করেন, মুসলমান ভাইগণ ইহার সাহায্যে দ্বীন ইসলামের অন্যতম মৌল উৎসের ও উহার আসল ভাষার সহিত পরিচিতি হওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং ইসলামী ইবাদতের সৌন্দর্য মাহাত্ম্য অনুধাবন করিয়া উহা পালন করার প্রেরণা পান, তাহা হইলে আমার এই শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

ইহার কারণেও যদি আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে আমাকে নাজাত দেন তাহা হইলে উহা আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহের প্রকাশ হইবে, এই ভরসা অন্তরে গভীরভাবে পোষণ করিতেছি।

এই সঙ্গে পাঠক সমাজকে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, হাদীস শরীফের তৃতীয় খণ্ড (সামাজিক জীবন সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সংকলন) বর্তমানে তৈরীর পথে। ইনশা' আল্লাহ্ উহাও যথাসময় প্রকাশিত হইবে।

১৯৭৫ ইং মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

সূচীপত্র

রোযাঃ ১৭২–২৩৪

যাকাতঃ ২৩৫—২৮১

হজ্জঃ ২৮২—৩৪৪

গ্রন্থপঞ্জীঃ ৩৪৩

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا أَوْ وَعَاهَا وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلُ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. (ابو داؤد)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সেই লোকের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত করিবেন, চির সবুজ চির তাজা করিয়া রাখিবেন, যে আমার কথা শুনিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিবে কিংবা স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখিবে এবং অপর লোকের নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিবে। জ্ঞানের বহু ধারকই প্রকৃত জ্ঞানী নহে, তবে জ্ঞানের বহু ধারক উহা এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাইয়া দেয় যে তাহার অপেক্ষা অধিক সমঝদার।

—আবূদাউদ

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ. (ترمذى)

আল্লাহ্ তা'আলা ধন্য করিবেন সেই ব্যক্তিকে, যে আমার নিকট হইতে কোন কিছু শুনিল এবং উহা যেভাবে শুনিল সেই ভাবেই অন্য লোকের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। কেননা প্রথম শ্রোতার অপেক্ষা উহা পরে যাহার নিকট পৌঁছায় সে-ই উহার সংরক্ষণকারী হইয়া থাকে। —তিরমিযি

হাদীস শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

কুরআন ও হাদীস পাঠ করে দীন-ইসলাম সম্পর্কে
সরাসরি জ্ঞান অন্বেষণকারীদের হাতে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

তাহারাত

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

عَنْ اَبِیْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِیِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَئَانِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَّكَ اَوْ عَلَيْكَ وَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهٗ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا - (مسلم)

হযরত আবূ মালিক আল–আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। আর 'আলহামদুলিল্লাহ্' আমলের পাল্লা পূর্ণ মাত্রায় ভরিয়া দেয়, 'সুবহান আল্লাহ্' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' পূর্ণ করিয়া দেয় আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে। পরন্তু নামায জ্যোতি, সাদ্‌কা অনস্বীকার্য দলীল, ধৈর্য আলো এবং কুরআন হয় তোমার পক্ষের প্রমাণ, না হয় তোমার বিরুদ্ধের দলীল। প্রত্যেক মানুষেরই সকাল হয়, পরে সে নিজের সত্তারই বেচা–কেনা করে। অতঃপর সে হয় উহাকে (নিজকে) মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে, নতুবা উহাকে (নিজকে) সে ধ্বংস করিয়া দেয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটি মূলত নবী করীম (স)–এর একটি ভাষণ। ইহাতে ইসলামের কয়েকটি মূলনীতি সন্নিবেশিত রহিয়াছে বিধায় ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। এই ভাষণে তিনি দ্বীন–ইসলাম সংক্রান্ত অনেক তত্ত্বকথাই বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষণটির শুধু প্রথম বাক্যই পবিত্রতা সংক্রান্ত। আর এই কারণেই সম্পূর্ণ হাদীসটি হাদীসের কিতাবসমূহে 'তাহারাত' পর্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। طُهُوْرٌ অর্থ পবিত্রতা অর্জন।

হাদীসের শব্দ شَطْرٌ অর্থ অর্ধেক। ইমাম তিরমিযী অপর একজন সাহাবী হইতে অন্য ভাষায় এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সেই ভাষা হইলঃ

اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ - পবিত্রতা–পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।

মূলত شَطْرٌ ও نِصْفٌ শব্দদ্বয়ের অর্থ একই। আর উভয় ধরনের বর্ণনার হাদীসের অর্থ হইল, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঈমানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

কিন্তু হাদীসে পবিত্রতাকে ' ঈমানের অর্ধেক' বলা হইল কেন? ইহার জবাবে বলা হইয়াছেঃ পবিত্রতার যাহা সওয়াব তাহা ঈমানের সওয়াবের অর্ধেক পরিমাণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বলা হইয়াছে, ঈমান যেমন পূর্ববর্তী সব ভুলত্রুটি ও গুনাহ্ খাতা দূর করিয়া দেয়, অযূও অনুরূপ কাজ করে। তবে ইহা ঈমান ব্যতিরেকে সহীহ হয় না। উহা যেহেতু ঈমানের উপর নির্ভরশীল, এই কারণে ইহা 'ঈমানের অর্ধেক' হওয়ার সমার্থবোধক হইল। আরো বলা হইয়াছে, এখানে 'ঈমান' বলিয়া 'নামায' বুঝানো হইয়াছে। আর 'তাহারাত'—পবিত্রতা নামায শুদ্ধ হওয়ার অপরিহার্য শর্ত। ফলে ইহা ঈমানের অর্ধেকের সমান। আর شطر শব্দ বলিলে যে শাব্দিক অর্থে পুরাপুরি 'অর্ধেক'ই হইতে হইবে, এমন

বাধ্যবাধকতা কিছুই নাই। ইমাম নববীর মতে এই জওয়াবটি অধিক গ্রহণযোগ্য। ইমাম তুরপুশ্তী বলিয়াছেন, 'ঈমান' হইল শির্ক হইতে পবিত্রতা, যেমন 'তহুর' হইল অযূহীন অবস্থা হইতে পবিত্রতা। ফলে এই দুইটি—ঈমান ও তাহারাত—উভয়ই পবিত্রতার ব্যাপার। উহাদের একটি মানুষের আভ্যন্তরীণ দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট, আর দ্বিতীয়টি বহিরাঙ্গের সহিত।

ইমাম গাজ্জালীর বিশ্লেষণে দেখানো হইয়াছে, 'তাহারাত' বা পবিত্রতার চারিটি পর্যায় রহিয়াছেঃ (ক) বাহ্যিক দিক অপবিত্রতা ও ময়লা-আবর্জনা হইতে পবিত্রকরণ। (খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে পাপ-গুনাহ্ ও অপরাধ হইতে পবিত্র করণ। (গ) খারাপ ও ঘৃণ্য চরিত্র হইতে অন্তরকে পবিত্রকরণ এবং (ঘ) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছু হইতে মন, অন্তর ও হৃদয়কে পবিত্রকরণ। আর নবী-রাসূল ও সিদ্দিকগণের পবিত্রতার ইহাই হইল মূল কথা। ইহার প্রত্যেকটি পর্যায়ে 'তাহারাত' হইল অর্ধেক কাজ। প্রত্যেকটি পর্যায়ে যেমন বর্জন ও ত্যাগ আছে, তেমনি আছে গ্রহণ ও অলংকরণ। এই হিসাবে বর্জন হইল অর্ধেক আমল। কেননা অপর অংশ উহারই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্র নির্ভুল পরিচিতি ও তাঁহার মহানত্ব হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছু হৃদয় মন হইতে বিদায় গ্রহণ না করিবে। কেননা কাহারো হৃদয়ে এই দুইটি কখনো একত্রিত হইতে পারে না। অনুরূপভাবে হৃদয়-মন হইতে খারাপ চরিত্র ও পংকিল মানসিকতার বিলীন হওয়া এবং অতঃপর উহার উত্তম ও মহান চরিত্রগুণে অভিষিক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির প্রথমে পাপ হইতে মুক্তি লাভ এবং পরে আল্লাহ্নুগত্যের গুণে অলংকৃত হওয়া আবশ্যক। আর ইহাদের প্রত্যেকটি পর্যায়ের জন্য জরুরী শর্ত হইল পরবর্তী জরুরী কাজ খুঁজিয়া লওয়া। অতএব বহিরাঙ্গের পবিত্রতার পর আত্মার (روح) পবিত্রতা, উহার পর হৃদয়ের (قلب) পবিত্রতা এবং সর্বশেষে অন্তরলোকের গভীর গহনের পবিত্রতা। এই কারণে 'তাহারাত' বলিতে কেবলমাত্র বহিরাঙ্গের পবিত্রতাকে যথেষ্ট মনে করা মূলতই ভুল। কেননা তাহাতে এই পবিত্রতার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলার সমূহ আশংকা রহিয়াছে। (التعليق الصبيح)

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার এই গুরুত্ব বলার পর রাসূলে করীম (স) আল্লাহ্র তস্বীহ করা ও হাম্দ করার সওয়াব উহার উন্নত মর্যাদার কথা বলিয়াছেন। তসবীহ অর্থাৎ 'সুব্হান আল্লাহ্' বলার তাৎপর্য হইল এই বিশ্বাস ও মনোভাব প্রকাশ করা ও উহার সত্যতার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্র মহান সত্তা তাহার—আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদার পক্ষে—হানিকর সব রকমের কথা ও ধারণা-বিশ্বাসের কলুষতা হইতে পবিত্র। হামদ অর্থাৎ আল্হামদুলিল্লাহ্ বলার তাৎপর্য হইল এই দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা প্রকাশ করা যে, যে সব সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার কারণে একজনের প্রশংসা করা চলে, তাহা কেবলমাত্র মহান 'আল্লাহ্ তা'আলার সত্তায় নিহিত। অতএব সমস্ত প্রশংসা ও তারীফ একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য। আল্লাহ্র আলোকমন্ডিত ও নিষ্পাপ সৃষ্টি—ফেরেশতাগণের দিন-রাত্রির একমাত্র কাজ হইল এই তসবীহ করা। কুরআন মজীদেও তাঁহাদের এই কাজের কথা তাঁহাদের নিজেদের জবানীতেই বলা হইয়াছেঃ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (البقرة ٣٠)

হে আল্লাহ্! আমরা তো কেবল তোমারই তসবীহ ও প্রশংসাকার্যে প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি।

কাজেই আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি এই মানুষেরও দিনরাত্র এই কাজেই অতিবাহিত হওয়া উচিত। এই কাজই হওয়া উচিত তাহাদের দিনরাত্রির একমাত্র ব্যস্ততা। তাহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল আল্লাহ্রই পবিত্রতা বর্ণনা করিবে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে কেবল তাঁহারই প্রশংসা করিবে। এই কাজে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (স) আলোচ্য হাদীসে এই তসবীহ ও হামদ করার ফযীলত বয়ান করিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'সুব্হান-আল্লাহ্' কালেমা আমলের তুলাদন্ডকে ভরিয়া দেয়। আর এই কালেমার সাথে 'আলহামদুলিল্লাহ'-ও যদি মিলিত হয় তাহা হইলে এই দুইটি কালেমা'র 'নূর' আসমান যমীনের সমগ্র পরিমন্ডলকেই পরিপূর্ণ করিয়া দিবে, সমুজ্জল ও ভাস্বর করিয়া তুলিবে।

'সুব্‌হান আল্লাহ্‌' কালেমা দ্বারা আমলের তুলাদন্ড ভরিয়া যাওয়া এবং 'সুব্‌হান আল্লাহ্‌' ও 'আলহামদুলিল্লাহ্‌' বাক্যদ্বয় দ্বারা আসমান ও যমীন পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য যে কি, তাহা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান, চিন্তাশক্তি কিংবা অনুভূতি এই দুনিয়ায় মানুষকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যেহেতু এই কথা রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন এবং তাহার কথা নির্ভুল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাই একথা আমাদিগকে অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে এবং এই কাজ করিয়া ইহার কল্যাণ লাভের জন্য আমাদিগকে সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ইহার পর নবী করীম (স) নামায সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ উহা নূর-নির্মল আলোকমালা। বস্তুত নামাযীর মধ্যে নামাযের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হৃদয়লোকে একটা জ্যোতির উদ্রেক হয় এবং যে সব নামাযী সত্যিকারভাবে নামায পড়ে, তাহারা ইহা নিঃসন্দেহে অনুভব করিতে পারে। নামায়ের একটি মোক্ষম কল্যাণ এই যে, উহার সাহায্যে মানুষ সব অন্যায় ও লজ্জাকর কাজকর্ম হইতে বাঁচিতে পারে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۔ (العنكبوت ۴۵)

নামায নামাযীকে সব লজ্জাকর ও ঘৃণ্য নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত রাখে।

আর পরকালে নামাযের এই 'নূর' সেখানকার অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ ۔ (الحديد ۱۲)

আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের অগ্রভাগে এবং তাহাদের ডানদিকে তাহাদের আমলের 'নূর' দৌড়াইতে থাকিবে।

অতঃপর 'সাদ্‌কা' সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ 'উহা অকাট্য ও অনস্বীকার্য দলীল।' দুনিয়ায় ইহার তাৎপর্য ইহাই হইতে পারে যে, সাদ্‌কা দানকারী বান্দা প্রকৃতই মুমিন ও মুসলমানরূপে প্রতীত। সাদ্‌কা বা দান-খয়রাতই হইল একজন লোকের ঈমানদার হওয়ার প্রমাণ। বস্তুত দিলের মর্মমূলে ঈমান না থাকিলে কোন লোকই স্বীয় শ্রমার্জিত অর্থ-সম্পদ সহজে অন্যকে দিতে পারে না। মানুষ অর্থব্যয়ে সাধারণত কার্পণ্যই দেখাইয়া থাকে। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। পক্ষান্তরে পরকালে এই কথার তাৎপর্য এই দেখা যাইবে যে, সাদ্‌কা দানকারী নিষ্ঠাবান বান্দার সাদ্‌কাকেই তাহার নিঃসন্দেহে আল্লাহপরস্তির অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শনরূপে মানিয়া লইয়া তাহাকে নানাবিধ নিয়ামত দিয়া ধন্য করা হইবে। কিয়ামতের দিন তাহাকে তাহার ধন-সম্পদের ব্যয়-ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তখন জবাবে তাহার দানশীলতাকে সে বাস্তব প্রমাণ হিসাবে পেশ করিবে। এই দানশীলতাই তখন তাহার এমন এক নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইবে, যাহার দরুন সে সব রকমের জিজ্ঞাসাবাদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যাইবে। এই দান-সাদ্‌কাই তাহার কল্যাণ লাভের কারণ হইবে।

ইহার পর 'সবর' বা ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে,উহা আলো এবং উজ্জ্বলতা। 'সবর' শব্দের অর্থঃ

حَبْسُ النَّفْسِ عَمَّا تَمَنّٰى مِنَ الشَّهَوَاتِ وَعَلٰى مَا يَشُقُّ عَلَيْهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَ فِيْمَا يَصْعَبُ عَلَيْهَا مِنَ النَّائِبَاتِ ۔

মনের কামনা লালসা হইতে নিজেকে বিরত রাখা এবং যে সব ইবাদত করা কষ্টকর এবং যে সব ঘটনা-দুর্ঘটায় বান্দাকে নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহাতে বিশ্বাস স্থির রাখা।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, এই 'সবর' অর্থ রোযা। কিন্তু 'সবর' শব্দের আসল অর্থ তো "রোযা নয়, বরং উহার আসল অর্থ হইল, আল্লাহ্‌র বিধানের অধীন নফ্‌সের সব লালসা-কামনাকে দমন

রাখা ও তাঁহার পথে সব রকমের দুঃখ–কষ্ট শান্ত মনে ও অক্ষুব্ধ চিত্তে বরদাশত করিতে থাকা।" আর এখানে এই অর্থই প্রযোজ্য। এই অর্থের দিক দিয়া ইহা ধর্মভিত্তিক গোটা জীবনকেই পরিব্যাপ্ত করে। নামায, রোযা, সাদ্‌কা, হজ্জ ও জিহাদ এবং সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীন ও আইন–বিধান পুরাপুরি পালন ব্যাপদেশে যাবতীয় দুঃখ–কষ্ট ভোগ করা সবই উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই 'সবর' সম্পর্কেই রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন যে, উহা আলো ও উজ্জ্বলতা। কুরআন মজীদে সূর্যের আলোকে ضِيَاء (আলো) এবং চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যকে نور 'নূর' বলা হইয়াছে–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا۔ (يونس ٥)

সেই মহান আল্লাহ্‌ই সূর্যকে আলো এবং চন্দ্রকে উজ্জ্বল বানাইয়াছেন।

এই হিসাবে 'সবর' ও 'নামায'–এর বিচ্ছুরিত আলোর মধ্যে ততখানি তারতম্য হইবে, যতখানি তারতম্য সূর্য ও চন্দ্রের আলোর মধ্যে। পরে 'কুরআন' সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ 'উহা তোমার পক্ষের প্রমাণ অথবা তোমার বিপক্ষের'। অর্থাৎ কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কালাম, তাঁহারই দেওয়া হিদায়তের বিধান। কাজেই তোমরা যদি উহার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা কর এবং উহা মানিয়া চল, তবে উহা তোমার পক্ষের— তোমার ঈমান ও আনুগত্যের সাক্ষী ও প্রমাণ হইবে। আর যদি তোমার আচরণ ও আমল উহার বিপরীত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কুরআন মজীদ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে এবং উহাই তোমার বেঈমানী প্রমাণ করিয়া দিবে।

এইসব কথা বলার পর হাদীসের শেষভাগে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ প্রত্যেক মানুষই যে–অবস্থায় ও যে ব্যস্ততায়ই থাকুক ও দিনাতিপাত করুক না কেন, প্রতিদিনই সে নিজের সত্তার ও নিজের মনের বেচা–কেনা অবশ্যই করে। এই বেচা–কেনার মাধ্যমে হয় সে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করে কিংবা উহাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, মানুষের গোটা জীবনই এক ধারাবাহিক ব্যবসায় ও কেনা–বেচার জীবন। সে নিজেকে কাহারও না–কাহারও নিকট কিছুর বিনিময়ে অবশ্যই বিক্রয় করে এবং অন্য কাহারও না–কাহারও নিকট হইতে কিছু না–কিছু ক্রয় করে। সে যদি আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও তাঁহার সন্তোষ–সন্ধানমূলক জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলে সে নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট বিক্রয় করিল এবং উহার বিনিময়ে সে নিজের জন্য মহৎ কিছু উপার্জন করিল। আর সেই সঙ্গে সে নিজের পরকালীন মুক্তিরও ব্যবস্থা করিতে পারিল। কিন্তু যদি সে ইহার বিপরীত আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া লালসার দাসত্বমূলক জীবন যাপন করে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সে নিজের ধ্বংসের আয়োজন করিল এবং জাহান্নামকে নিজের চূড়ান্ত পরিণতিরূপে বাছাই করিয়া লইল।

হাদীসটির প্রথম ও মূল প্রসঙ্গ ছিল পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রকৃত মর্যাদা বর্ণনা। পরবর্তী কথাগুলি মূলত উহার সহিত অপ্রাসঙ্গিক নহে। সামগ্রিকভাবে রাসূলে করীমের এই ভাষণটি দ্বীনী–যিন্দেগীর প্রেক্ষিতে অত্যন্ত মূল্যবান, সন্দেহ নাই।

প্রস্রাব–পায়খানা হইতে পবিত্রতা অর্জন

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهٖ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ وَّيَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ (رواه ابوداؤد - ابن ماجه - دارمى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ আমি তোমাদের জন্য পিতার সমতুল্য। আমি তোমাদিগকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষা

দিতেছি। অতএব তোমাদের কেহ যখন পায়খানায় যাইবে তখন যেন কিবলামুখী হইয়া এবং কিবলাকে পিছনে ফেলিয়া না বসে। কেহ তাহার ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা লাভের কাজ না করে। এইজন্য তিনি তিন খন্ড পাথর ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন এবং গোবর ও হাড় ব্যবহার করিতে নিষেধকরিতেন। —আবূ দাউদ, ইবেন মাজাহ্, দারেমী

ব্যাখ্যা প্রস্রাব-পায়খানা মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনের ব্যাপার। ইহাতে শরীর নাপাক হয়, নামায পড়ার উপযুক্ত থাকে না। কাজেই একদিকে যেমন পায়খানা প্রস্রাবের জন্য বসিবার শরীয়তসম্মত নিয়ম জানিতে হইবে তেমনি জানিতে হইবে তজ্জনিত অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ম। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। হাদীসটির শুরুতেই এই শিক্ষাদানের ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মতের মুকাবিলায় রাসূলে করীম (স)-এর সঠিক মর্যাদার কথা বলা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ 'আমি তোমাদের পিতার মত।' এই কথাটি দ্বারা রাসূলের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে, যেন মুসলমানরা তাঁহার নিকট তাহাদের দ্বীনী ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা না পায়। ঠিক যেমন পুত্র পিতার নিকট নিজের কোন অসুবিধার কথা বলা হইতে নিছক লজ্জার কারণে বিরত থাকে না, এখানেও ঠিক তেমনি। এখানে পিতা-পুত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া নবী করীম (স) প্রসঙ্গত একথাটিও স্পষ্ট করিয়া তুলিলেন যে, পিতার কর্তব্য হইল সন্তানদিগকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এবং সন্তানের কর্তব্য তাহা গ্রহণ ও পালন করা। সন্তানের কর্তব্য যেমন পিতার আদেশ-নিষেধ-উপদেশ পালন করিয়া চলা, তেমনি সর্বসাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য রাসূলের কথা মানিয়া চলা। আর তাঁহার কর্তব্য সঠিক শিক্ষাদান।

এই হাদীসে পায়খানা-প্রস্রাবের উদ্দেশ্যে বসা ও উহার অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। হাদীসের মূল শব্দ غَائِط অর্থ নিচু স্থান। পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য বসার উদ্দেশ্যে সাধারণত নিচুস্থান নির্ধারণ করা হয় বলিয়া এই শব্দটি পায়খানা-প্রস্রাব করার স্থান এবং পায়খানা প্রস্রাব করা —এই উভয় অর্থ প্রকাশ করে। হাদীসে বলা হইয়াছে, তোমাদের কেহ যখন প্রস্রাব-পায়খানায় বসিবে তখন যেন কিবলামুখী হইয়া কিংবা কিবলাকে পিছনে ফেলিয়া না বসে। কেননা, 'কিবলা' বিশেষভাবে নামাযের জন্য একটি পবিত্র দিক। সেই দিকেই আল্লাহ্র ঘর—কাবা শরীফ। প্রস্রাব-পায়খানার দুর্গন্ধময় ও নাপাক আবর্জনাপূর্ণ স্থানে কিবলার মুখামুখি হইয়া বসা বা উহাকে পিছনে ফেলিয়া বসা অত্যন্ত বেয়াদবীমূলক কাজ। সেই কারণে রাসূলে করীম (স)-এর এই নিষেধ। উন্মুক্ত স্থান হউক কিংবা প্রাচীর বেষ্টিত স্থান প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় সংক্রান্ত এই নিষেধ সর্বত্রই পালনীয়।

'ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা লাভের কাজ করিবে না' অর্থাৎ পায়খানা বা প্রস্রাব করার পর উহার ময়লা পরিষ্কারের কাজে ডান হাত ব্যবহার করা নিষেধ। কেননা ডান হাতখানা বিশেষভাবে পানাহার ও অন্যদের সাথে মুসাফিদা ইত্যাদি কাজের জন্য নির্দিষ্ট। আর বাম হাত দেহের নিম্নাংশের কাজে ও ময়লা আবর্জনা ও অপবিত্রতা বিদূরণের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট। (معالم السنن)

পায়খানা করিবার পর ময়লা সাফ করিবার জন্য নবী করীম (স) সাধারণত তিনখানি পাথর খন্ড ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন। মনে রাখিতে হইবে যে, নবী করীম (স) আরব দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং আরব দেশ হইল উষর-ধূষর মরুভূমি। সেখানে সর্বত্র পানি পাওয়া যায় না। তাই জনসাধারণের পক্ষে এসব ক্ষেত্রে প্রস্তরখন্ড ব্যবহার না করিয়া কোন উপায় ছিল না। কিন্তু প্রস্রাব-পায়খানার ময়লা হইতে পবিত্র হওয়ার ইহাই একমাত্র ও সর্বত্র ব্যবহার্য উপায় নয় এবং নবী করীম (স)-ও সব সময় প্রস্তরখন্ড দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করিতেন এমন কথাও নয়। এইজন্য তিনি নিজে পানিও ব্যবহার করিতেন। এই পর্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি অকাট্য প্রমাণ। তিনি বলিয়াছেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ اَوْ رِكْوَةٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّاَ - (رواه ابوداؤد وروى الدارمى والنسائى معناه)

নবী করীম (স) যখন পায়খানায় যাইতেন, তখন আমি তাহার জন্য একটি পাত্রে পানি লইয়া আগাইয়া যাইতাম। তিনি উহার দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করিয়া পবিত্রতা লাভ করিতেন। পরে তিনি তাঁহার হাত মাটির উপর ঘষিতেন। ইহার পর আমি তাঁহার জন্য অপর এক পাত্রে করিয়া পানি লইয়া আসিলে তিনি উহার দ্বারা অযূ করিতেন।

প্রস্তর কিংবা শুষ্ক মাটি দ্বারাই যে ময়লা সাফ করিতে হইবে, এমন কোন শর্ত ইসলামী শরীয়তে নাই। নবী করীম (স) নিজে অন্য কোন জিনিস ছাড়াও শুধু পানি দ্বারাই এই ময়লা পরিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার হাতে ময়লা লাগিয়া দুর্গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। এই দুর্গন্ধ দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি হাত মাটিতে ঘষিয়াছেন। মাটিতে ঘষিয়া কিংবা সাবান দ্বারাও হাত ধৌত করা যাইতে পারে। ইবনে মালিক ও ইবনে হাজার আল-আসকালানী প্রমুখ মুহাদ্দিস 'ইস্তিনজা' বা 'পায়খানা-প্রস্রাবের ময়লা ও দুর্গন্ধ দূর করিয়া পবিত্রতা অর্জনের' এই পদ্ধতিকেই 'সুন্নাত' বলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, প্রস্রাব-পায়খানা করিবার পর উহার ময়লা হইতে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র পানি ব্যবহার করা এবং পানির পূর্বে কোন পাথরখন্ড কিংবা শুষ্ক মাটির ঢেলা ব্যবহার করা আল্লাহ্‌র নিকটও অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। কুবা'বাসীরা তাহাই করিতেন বলিয়া কুরআন মজীদে তাঁহাদের প্রশংসা করা হইয়াছে। কেননা পূর্ণ মাত্রায় ময়লা পরিষ্কার করা ও পবিত্রতা অর্জন কেবলমাত্র পানি দ্বারাই সম্ভব। এই কারণে এই কাজে শুষ্ক গোবর কিংবা হাড় ব্যবহার করিতে স্পষ্ট নিষেধ করা হইয়াছে কেননা উহার সাহায্যে প্রকৃতভাবে ময়লা পরিষ্কার করা যায় না।

অপবিত্রতা কবর আযাবের কারণ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اَمَّا اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ - (وَفِىْ رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ لَا يَسْتَنْزِهُ) مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا - فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا - (بخارى مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) দুইটি কবরের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি বলিলেনঃ এই কবরদ্বয়ে সমাহিত লোক দুইটির উপর আযাব হইতেছে। আর তেমন কোন বড় গুনাহের কারণে এই আযাব হইতেছে না; (বরং খুবই ছোট-খাটো গুনাহের দরুন আযাব হইতেছে, অথচ ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা কঠিন ছিল না)। ইহাদের একজনের উপর আযাব হইতেছে শুধু এই কারণে যে, সে প্রস্রাবের মলিনতা ও অপবিত্রতা হইতে বাঁচিয়া থাকার অথবা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকার জন্য কোন চিন্তা বা চেষ্টাই করিত না। আর দ্বিতীয় জনের উপর আযাব হওয়ার কারণ এই যে, সে চোগলখুরী করিত। পরে রাসূলে করীম (স) (খেজুর গাছের) একটি তরতাজা শাখা গ্রহণ করিলেন এবং উহাকে মাঝখান হইতে চিরিয়া দুই ভাগ করিলেন। পরে এক এক ভাগ এক একটি কবরের উপর পুতিয়া দিলেন। সাহাবা জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে রাসূল! আপনি এই কাজ করিলেন কি উদ্দেশ্যে? তিনি বলিলেনঃ আশা করা যায়, এই শাখাখন্ড দুইটি শুকাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত এই দুই ব্যক্তির উপর আযাব অনেকটা লাঘব করিয়া দেওয়া হইবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে প্রথমত জানা গেল যে, কবর আযাব হইতে পারে, হয় এবং ইহা সত্য। দুনিয়ার সাধারণ মানুষ বাহিরে থাকিয়া কবর আযাব দেখিতে বা অনুভব করিতে না পারিলেও নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র দেওয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বলে তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতে ও বুঝিতে পারিতেন। অতএব ব্যক্তির গুনাহের কারণে কবরে যে আযাব হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হাদীসে উল্লেখিত কবর দুইটিতে আযাব হওয়ার কথা বলিয়া উহার প্রত্যেকটির কারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একটি কবরে আযাব হওয়ার কারণ সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, লোকটি প্রস্রাবের কদর্যতা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে ও পবিত্র পবিচ্ছন্ন থাকিতে চেষ্টা করিত না।

لا يستتر ، لا يستنزه এবং বুখারী শরীফে উল্লেখিত لا يستبرئ এই তিনটি শব্দের একই অর্থ, একই মর্ম ও তাৎপর্য এবং তাহা হইল 'পবিত্র হইত না'।

ইহা হইতে স্পষ্ট হয় যে, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদির কদর্যতা ও অপবিত্রতা হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং নিজের দেহ ও পোশাককে এই সব ময়লা হইতে সুরক্ষিত রাখা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ। এই নির্দেশ পালন করিতে প্রস্তুত না হওয়া কিংবা এই ব্যাপারে অসতর্কতা অবলম্বন করা বড় অপরাধ এবং সেই জন্য কবরে আযাব ভোগ করিতে হইবে। দ্বিতীয় কবরটিতে আযাব হওয়ার কারণ সম্পর্কে নবী করীম (স) বলিয়াছেন, সে চোগলখুরী করিত অর্থাৎ একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের নিকট কথা লাগাইত। আর ইহা যে অতি বড় নৈতিক গুনাহ তাহাতে সন্দেহ নাই। কুরআন শরীফের একটি আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ - (القلم - ١١ - ١٠)

সেই ব্যক্তির কথা মানিও না, যে নির্ভীকভাবে মিথ্যা কথা বলে ও অসংকোচে কসম খাইয়া কথা বলে এবং দোষ সন্ধান ও চোগলখুরী করার কাজে ব্যস্ত থাকে।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন কায়াব আহ্‌বার বলিয়াছেন, তওরাতে চোগলখুরীকে সবচাইতে বড় গুনাহ বলা হইয়াছেন।

যে দুইটি গুনাহের কারণে এই দুই ব্যক্তি কবর আযাব ভোগ করিতেছিল, সেই দুইটি সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ লোক দুইটি কোন বড় ব্যাপারে আযাব ভোগ করিতেছে না।

ইহার অর্থ এই নয় যে, এই গুনাহ্ দুইটি বড় নয়—খুবই সামান্য ও নগণ্য। না, তাহা নয়। বরং ইহার অর্থ এই যে, এই গুনাহ্ দুইটি এমন কাজ নয়, যাহা না করিলেই নয়, যাহা ত্যাগ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বরং সত্য কথা এই যে, এই কাজ দুইটি না করিয়া খুব সহজেই চলা যাইতে পারে। যদি কেহ ইহা পরিত্যাগ করিবার সংকল্প গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে সেইজন্য কোন বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। কোনরূপ অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। কোন ক্ষতিও হইবে না কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লোক দুইটি এই গুনাহ্ দুইটি করিয়াছে এবং তাহার ফলেই আজ কবরে তাহাদিগকে নিজ নিজ গুনাহের শাস্তিস্বরূপ আযাব ভোগ করিতে হইতেছে।

ইহা হইতে স্পষ্ট জানা গেল যে, কবর আযাব কিংবা জাহান্নামের আযাব—যাহাই যাহাকে ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইবে তাহার নিজের ইচ্ছামূলক গুনাহের কারণে। ইচ্ছামূলকভাবে গুনাহ না করিলে কাহাকেও আযাব ভোগ করিতে হইবে না।

কবর দুইটির উপর তরতাজা খেজুর শাখার খন্ড পুতিয়া দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে নবী করীম (স) বলিলেনঃ 'এই শাখা-খন্ড সম্পূর্ণ শুকাইয়া না-যাওয়া পর্যন্ত সম্ভবত কবর দুইটির আযাব লাঘব করা হইবে।' এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য কি? হাদীসের এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার মনে করেন, কবরের উপর শাখা দুইটি পুতিয়া দেওয়ার কারণেই আযাব বন্ধ হইয়া যায়। কেননা উহা আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ করিতে থাকে। আর এই তসবীহ্ পাঠের প্রভাবে কবরস্থ ব্যক্তিদ্বয়ের উপর আযাব কমিয়া যায়। আর শাখাদ্বয় তসবীহ করে, তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতাংশের উল্লেখ করেনঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ - (بنی اسرائیل ٤٤)

প্রত্যেকটা জিনিসই আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে তসবীহ পাঠ করে।

প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠ করে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবলমাত্র সেই তসবীহ্ পাঠের কারণেই কবর আযাব মাফ হইয়া যাইবে, ইহা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে বলা যাইতে পারে? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তো নবী (স) এমন একখন্ড খেজুর শাখা যাহা দুইদিন পরই শুকাইয়া যাইবে—না পুতিয়া বড় কিংবা একটা পুরা গাছই পুতিয়া দিতে পারিতেন, যাহা কখনো শুকাইয়া যাইবে না এবং ইহার দরুন কখনো আযাবও হইতে পারিবে না। বস্তুত এইরূপ ধারণা ভিত্তিহীন এবং রাসূলে করীম (স)–এর এই কাজের এরূপ ব্যাখ্যাও নির্ভুল মানিয়া লওয়া যায় না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই হাদীসের এবং রাসূলে করীম (স)–এর এই কাজের এই ব্যাখ্যাই সাধারণভাবে প্রচলিত। আর এই ব্যাখ্যার বলেই কবরের উপর খেজুর শাখা পুতিয়া দেওয়ার রেওয়াজ মুসলিম সমাজের সর্বত্র দেখা যায় শুধু তাহাই নয়, বর্তমানের বিদ'আত পন্থীরা এই ব্যাখ্যার বলেই সম্ভবত কবরে ফুলের তোড়া বা পুষ্পমাল্য দিবার প্রথা চালু করিয়াছে। অথচ ইহা সুস্পষ্ট বিদ'আত।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে, ইহার সঠিক তাৎপর্য সম্ভবত তাহাই যাহা হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত মুসলিম শরীফের শেষ ভাগে উদ্ধৃত একটি দীর্ঘ হাদীসে বলা হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) অপর দুইটি কবরে আযাব হইতেছে জানিয়া আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাতের শাফা'আত করিতে চাহিলেন, যেন আযাবের মাত্রা কম হইয়া যায় এবং এই উদ্দেশ্যে কবর দুইটির উপর দুইখানি তাজা ডাল বসাইয়া দিতে চাহিলেন যে, যতক্ষণ উহা সম্পূর্ণ শুকাইয়া না যায়, ততক্ষণ তাহাদের আযাব যেন কম হইয়া থাকে।

এই হাদীসের কথাগুলি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, খেজুর শাখার তসবীহ পাঠের দরুনই কবর আযাব মাফ বা কম হওয়ার কথা নয়,বরং আল্লাহ্‌র নিকট কবর আযাবের মায়াফী চাহিয়া রাসূলে করীম (স) যে শাফা'আত করিয়াছিলেন, তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা ডাল দুইখানি পুতিয়া দিতে ও উহা শুকাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত–সময়ের জন্য আযাব লাঘব হওয়ার অনুমতি জানাইয়াছিলেন। এই কারণেই সেই বিশেষ কবর দুইটির উপর খেজুর শাখা বসানো হইয়াছিল। তাই বলিয়া যে কোন লোকের কবরের উপর তাজা খেজুর শাখা পুতিয়া দিলেই যে তাহার কবর আযাব লাঘব হইবে এমন কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। রাসূলে করীম (স)–এর এই কাজের নির্ভুল ও সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভবত ইহাই। এই ব্যাখ্যা যেমন অপরাপর হাদীসের সহিত সামঞ্জস্যশীল, তেমন ইসলামের মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণার সহিতও ইহা সঙ্গতিপূর্ণ। ইমাম খাত্তাবী আবূ দাউদ–এর শরহে এই ব্যাখ্যাই পেশ করিয়াছেন।

প্রস্রাব হইতে পবিত্রতা লাভের গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ ۔ (مسند احمد)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেনঃ প্রস্রাবই হইয়া থাকে বেশীরভাগ কবর আযাবের কারণ।—মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা 'প্রস্রাবই বেশীর ভাগ কবর আযাবের কারণ হইয়া থাকে' ইহার তাৎপর্য হইল, মানুষ সাধারণভাবে প্রস্রাবের ব্যাপারে খুব কম সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকে। উহার অপবিত্রতা ও মলিনতাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রস্রাব করার পর উহা হইতে ভালোভাবে পবিত্র হওয়ার এবং পানি দিয়া ধুইয়া ফেলিবার প্রয়োজন অনেকেই মনে করে না। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রস্রাবও নাপাক এবং উহার নাপাকী হইতে পবিত্র থাকার বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। প্রস্রাব করিলে অযূ বিনষ্ট হয়। সেই অবস্থায় নামায পড়া হইলে তাহা কিছুতেই কবুল হইতে পারে না। এই কারণে নবী করীম (স) প্রস্রাবের অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিশেষ তাকীদ করিয়াছেন, 'দারেকুতনী উদ্ধৃত একটি হাদীসে নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ۔

তোমরা সকলে প্রস্রাবের মলিনতা ও অপবিত্রতা হইতে অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করিবে। কেননা সাধারণ ও বেশীর ভাগ কবর আযাব এই কারণেই হইয়া থাকে।

এই হাদীসদ্বয় এবং এই পর্যায়ের অন্যান্য হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মানুষের প্রস্রাব—নাপাক ও অপবিত্র। এই ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে সম্পূর্ণ মতৈক্য ও ইজ্‌মা রহিয়াছে, আল্লামা নববী এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে বয়স্ক ও শিশুর প্রস্রাবের ব্যাপারে শুধু এতটুকু পার্থক্য করা যায় যে, বয়স্কদের প্রস্রাব হইতে পবিত্রতা লাভের জন্য খুব ভালোভাবে ধুইতে হয় এবং শিশুর প্রস্রাব কোন কিছুতে লাগিলে উহার উপর শুধু পানির ছিটা দিলেই বা সাধারণভাবে ধৌত করিলে চলে।

পায়খানা—প্রস্রাসের পূর্বের ও পরের দোয়া

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ۔ (ابوداؤد۔ ابن ماجه)

হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ প্রস্রাব-পায়খানার এ সব স্থান নিকৃষ্ট ধরনের জীব—শয়তান ইত্যাদির—থাকার জায়গা। অতএব তোমরা যখন পায়খানা-প্রস্রাবখানায় প্রবেশ করিবে, তখন প্রথমেই এই দোয়া পড়িবেঃ 'আমি সব খবীস ও খবীসানী হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাহি।

—আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ফেরেশতাদের যেমন বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র, ইবাদত ও ইবাদতের স্থান সমূহের সঙ্গে; অনুরূপভাবে শয়তানের মত সব খবীস সৃষ্টিগুলির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে অপবিত্রতা, ময়লা, আবর্জনা ও দুর্গন্ধময় স্থানগুলির সহিত। এই কারণে নবী করীম (স) তাঁহার উম্মতের লোকদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, প্রকৃতির তাগীদে একজন যখন এই সব স্থানে যাইতে বাধ্য হইবে, তখন প্রথমেই যেন সে এই সব জায়গায় বসবাসকারী খবীস-খবীসানীর দুষ্কৃতি ও অনিষ্টকারিতা হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চায় এবং তাহার পরই যেন সেইখানে প্রবেশ করে। নতুবা ইহার যে-কোন স্থানে মানুষ শয়তানের সংস্পর্শে আসিয়া উহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িতে পারে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ ۔ (ترمذی، ابن ماجه)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন পায়খানা-প্রস্রাবখানা হইতে কাজ সারিয়া বাহিরে আসিতেন, তখন বলিতেনঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার পরিপূর্ণ ক্ষমা ও মার্জনা প্রার্থনা করি। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা পায়খানা-প্রস্রাবখানা হইতে কার্য সমাধা করিয়া বাহির হইয়া আসিবার পর নবী করীম (স) যে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, ইহার কয়েকটি ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, মানুষের উদরে যে ময়লা-আবর্জনা সঞ্চিত হয়, উহা তাহার দেহে কর্মবিমুখতা ও ভারাক্রান্ততার সৃষ্টি করে। সময়মত উহা নির্গত না হইলে নানা প্রকারের রোগ সৃষ্টি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে স্বাভাবিক নিয়মে যদি উহা সম্পূর্ণ নির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে গোটা দেহ ও শরীর হালকা ও ভারমুক্ত এবং কর্মতৎপর হইয়া উঠে। তখন এক

প্রকার মানসিক স্ফূর্তি অনুভূত হয়। প্রত্যেকটি মানুষই ইহার বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন মহান ব্যক্তিগণ নিজেদের গুনাহ্ খাতার ব্যাপারেও অনুরূপ অনুভূতি লাভ করিয়া থাকেন। ইহারা স্বাভাবিক নিষ্কর্মতা ও দুনিয়ার সব আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ভারাক্রান্ততার তুলনায় গুনাহের বোঝা ভারাক্রান্ততা ও ক্লেশ অধিক অনুভব করিয়া থাকেন। আর গুনাহের বোঝা হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহারা—সাধারণ মানুষ নিজের উদরস্থ আবর্জনা-বোঝার নিষ্ক্রমণের জন্য যতটা চিন্তান্বিত হইয়া থাকে, তাহার অপেক্ষা—অনেক বেশী চিন্তা-ভারাক্রান্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য নবী করীম (স) যখন প্রকৃতির তাকীদ হইতে দায়িত্বমুক্ত হইতেন এবং মানবীয় প্রকৃতির অনুরূপ তাঁহার দেহ হালকা ও ভারমুক্ত মনে করিতেন তখন পূর্বোল্লেখিত আধ্যাত্মিক অনুভূতির তাকীদে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিতেন এই বলিয়া যে, হে আল্লাহ্! তুমি যেরূপ দৈহিক ময়লা-আবর্জনার বোঝা হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছ এবং তদ্দরুন আমাকে শান্তি সুখ ও স্ফূর্তি দান করিয়াছ, অনুরূপভাবে আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দিয়া আমার আত্মাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও গুনাহের বোঝা হইতে আমার স্কন্ধকে হালকা করিয়া দাও।

প্রশ্ন হইতে পারে, নবী করীম (স)-এর সমস্ত গুনাহ্ই তো মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুরআন মজীদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ـ (الفتح-٢)

আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পূর্বকৃত ও পরে কৃত গুনাহ্-খাতা মাফ করিয়া দিবেন এই উদ্দেশ্যে'

তাহা হইলে প্রতি পদে পদে এইভাবে তাঁহার গুনাহ্ মায়াফীর জন্য আল্লাহ্র নিকট তাঁহার এত প্রার্থনা করার কি প্রয়োজন ছিল? -- প্রশ্নটির বিস্তারিত জওয়াব এখানে না দেওয়া গেলেও সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, মায়াফী চাওয়ার তাঁহার নিজের তেমন প্রয়োজন না থাকিলেও সাধারণ মুসলমানের সেই প্রয়োজন রহিয়াছে এবং তিনি এইসব করিয়া তাহাদিগকেই এই গুনাহ্-মাফ চাওয়ার পদ্ধতি শিখাইয়াছেন ও সেইজন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। কেননা তিনিই তো মুসলমানদের শিক্ষাগুরু। তিনি এই পদ্ধতি না শিক্ষা দিলে আর কে শিক্ষা দিবে?

ইবাদতে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ـ (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি (নবী করীম) বলিয়াছেন, পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামাযই কবুল করা হয় না।

—তিরমিযী

ব্যাখ্যা পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কোন নামাযই কবুল করা হয় না, প্রত্যেক নামাযের পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য। পূর্বে পবিত্রতা অর্জন না করিয়া কোন প্রকারের নামায পড়িলে তাহা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হইবে না। হাদীসটির মোটামুটি বক্তব্য ইহাই।

মূল হাদীসের শব্দ হইল طُهُور (তুহুরুন)। ইহা হইতে অযূ করা এবং গোসল করা উভয় কাজই বুঝায়। আরবী অভিধানিকদের মতে 'তুহুর' শব্দের অর্থ 'অযূ' করা। আর 'তাহাওর' طَهُور শব্দের অর্থ সেই পানি, যাহা দিয়া অযূ করা হয়। আর 'কবুল' শব্দের তাৎপর্য হইল নির্ভুল নিয়মে উহার পালন ও বিশুদ্ধ হওয়া এবং উহার বিনিময়ে প্রতিফল দান। অন্য কথায় আল্লাহ্র হুকুম পালনের দ্বারা স্বীয় দায়িত্ব আদায় করা ও উহার জন্য নির্দিষ্ট ফল লাভ। এইভাবে যে নেক কাজটি করা হয়, তাহা কবুল হয়, আর যাহা এই ভাবে করা হয় না, তাহা কখনও কবুল হয় না। বস্তুত নামায আল্লাহ্র সম্মুখে হাযির হওয়ার একটি অতীব পবিত্র ভাবধারাপূর্ণ ইবাদত। এই ইবাদত প্রকৃত পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কখনো কবুল হইতে পারে না; ইহার কারণ হইল আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ঘোষণা করিয়াছেনঃ

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ

আল্লাহ্ তা'আল কেবলমাত্র সেই লোকদের ইবাদত কবুল করেন যাহারা মনে আল্লাহ্র প্রতি অসীম ভয় রাখিয়া একান্তভাবে তাহারই ইবাদত করে।

আলোচ্য হাদীসটি এই কথারই প্রতিধ্বনি এবং ইহারই বাস্তব রূপ। ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, নামাযের জন্য পূর্বেই 'তাহারাত' বা পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। সমগ্র মুসলিম উম্মত এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য 'তাহারাত' বা পবিত্রতা পূর্বশর্ত। 'তাহারাত' ব্যতীত নামায পড়া সম্পূর্ণ হারাম—তাহা পানি ব্যবহার করিয়া কিংবা মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করিয়া অর্জন করা হউক।

'তাহারাত' ব্যতীত কোন নামাযই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। ইহা এক নিরংকুশ, সার্বিক ও চূড়ান্ত ঘোষণা। ফরয নামায কিংবা নফল নামায—পবিত্রতা ব্যতীত কবুল না হওয়ার ব্যাপারে সবই সমান। জানাযার নামাযও যেহেতু এক প্রকারের নামায, তাই উহাও 'তাহারাত' ব্যতীত কবুল হইবে না। অতএব জানাযার নামায পড়ার পূর্বেও যথারীতি পবিত্রতা অর্জন করিয়া লইতে হইবে। ইমাম বুখারী বলিয়াছেনঃ জানাযার নামাযকে নামায বলা হইয়াছে, যদিও উহাতে রুকূ সিজদা নাই, উহাতে পাঠ করা হয় না। উহাতে শুধু দোয়া, তকবীর ও সালামই রহিয়াছে মাত্র। হযরত ইবনে উমর (রা) এই হাদীসের ভিত্তিতেই বলিয়াছেনঃ

لَا يُصَلِّىْ عَلَيْهَا اِلَّا طَاهِرٌ ـ (فتح البارى ـ تحفة الاحوذى)

পাক ও পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেহ জানাযার নামায পড়িবে না।

তবে যদি কেহ মনে করে যে, এখন অযূ করিতে শুরু করিলে জানাযার নামায পাওয়া যাইবে না, তবে তখন তায়াম্মুম করিয়াও উহা পড়া যাইবে।

ইমাম তাবারানী তাঁহার 'আল-আসওয়াত' গ্রন্থে এই হাদীসটির বর্ণনা দিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا طُهُوْرَ لَهُ ـ যাহার পবিত্রতা নাই, তাহার জন্য নামাযও (জায়েয) নাই।

ইবনে মাজাহ্ হযরত আবূ হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃতি করিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ ـ (بخارى، مسلم)

অযূ না থাকিলে অযূ না করা পর্যন্ত কাহারো নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন না।

পবিত্রতা ও ইবাদত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ ـ وَلَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا طُهُوْرَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلٰوةَ لَهُ وَاِنَّمَا مَوْضَعُ الصَّلٰوةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضَعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ـ

(المعجم الصغير للطبرانى)

হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যাহার মধ্যে আমানত নাই তাহার ঈমানও নাই; যাহার পবিত্রতা নাই তাহার নামায গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না; আর যাহার নামায নাই তাহার দ্বীনও নাই। দ্বীন-ইসলামে নামাযের স্থান বা গুরুত্ব তাহাই যাহা মানব-দেহেমস্তকের। —আল-মু'জিমুসসগীর

ব্যাখ্যা হাদীসে ঈমান, দ্বীন-ইসলাম, পবিত্রতা, নামায ও আমানত বা বিশ্বাসপরায়ণতার গুরুত্ব এবং এই সবের পারস্পরিক ওতপ্রোত জড়িত হওয়ার কথা সংক্ষেপে অত্যন্ত সুন্দর করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথমত বলা হইয়াছেঃ যাহার ঈমান নাই, সে কখনো আমানতদারী রক্ষা করিতে পারে

না। অন্য কথায়, প্রত্যেক বেঈমান ব্যক্তিই খিয়ানতকারী—বিশ্বাসঘাতক। ঠিক ইহার বিপরীত—প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিই আমানতদার। ঈমান থাকিলেই একজন লোক আমানতদারী রক্ষা করিতে পারে। ইহা হইতে একথাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে অবশ্যই আমানতদার হইতে হইবে, কাহারও মধ্যে আমানতদারী না থাকিলে, খিয়ানত কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দিলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার হাজার ধার্মিকতার ছদ্মবেশের অন্তরালে সত্যিকার ঈমান বলিতে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নাই। ঈমান যে কোন নিঃসম্পর্ক একক জিনিস নহে; বরং বাস্তাব কর্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়।

দ্বিতীয়ত বলা হইয়াছেঃ যাহার পবিত্রতা নাই, তাহার নামাযও নাই—অপবিত্র ব্যক্তির পক্ষে নামায পড়া জায়েয নহে। নামাযের পূর্বে অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করিতে হইবে। গোসল ওয়াজিব হইলে তাহা করিতে হইবে, অন্যথায় শুধু অযূ করিয়াই নামায পড়িতে দাঁড়াইবে। বস্তুত বিনা অযূতে নামায হয় না শুধু তাহাই নয়, বরং বিনা অযূতে নামায পড়া মস্তবড় অপরাধ।

তৃতীয়ত বলা হইয়াছেঃ যাহার নামায নাই, তাহার দ্বীনও নাই। বস্তুত নামায হইতেছে দ্বীন-ইসলামের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তাই নামায না পড়িলে দ্বীন-এর প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইতে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে আর কিছুই বাকী থাকে না।

নামাযের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য নবী করীম (স) হাদীসের শেষাংশে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ একটি দেহে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে মস্তক। হাত, পা, কান ইত্যাদি কোন কিছুই না থাকিলে মানুষের মৃত্যু ঘটে না; কিন্তু কাহারও মস্তক ছিন্ন হইলে এক মুহূর্তেই প্রাণবায়ূ নির্গত হইয়া যায়। বস্তুত মস্তকবিহীন মানুষ বা প্রাণী যেমন ধারণা করা যায় না, নামাযহীন দ্বীনও অনুরূপভাবে ধারণার অতীত।

যে হাদীসে বলা হইয়াছে যে, ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে, উহার বাস্তব রূপ এই হাদীসে সুন্দরভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ঈমান হইতেছে মানুষের মনের বিশ্বাসের ব্যাপার, কিন্তু এই বিশ্বাস বাস্তব কর্মের সহিত মোটেই নিঃসম্পর্ক নহে; বরং বাস্তব কর্মের সহিত ইহার এত দৃঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে যে, কর্মের ভিতর দিয়া ঈমানের রূপায়ণ হইতে না থাকিলে ঈমানের অস্তিত্ব আছে বলিয়াও বিশ্বাস করা যায় না। অনুরূপভাবে ঈমান না থাকিলে কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। তাই বলিতে হইবে যে, ঈমান ও আমল বিশ্বাস ও কাজ একটি অভিন্ন জিনিস না হইলেও উহা ঠিক বীজ ও বৃক্ষের মতই অবিচ্ছেদ্য।

পুরামাত্রায় পবিত্রতা অর্জনের মর্যাদা

عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَاَنَسٍ رض اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَثْنٰى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّاُ لِلصَّلٰوةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذٰلِكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ .

(ابن ماجه - ابوداؤد - ترمذى)

হযরত আবূ-আইয়ূব আনসারী, হযরত জাবির ও হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন কুরআনের আয়াত "এই মসজিদে এমন সব লোক রহিয়াছে, যাহারা পুরামাত্রায় পবিত্রতা অর্জন করিতে ভালোবাসে, আর আল্লাহ্ তা'আলাও পুরামাত্রায় পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে ভালোবাসেন" নাযিল হইল, তখন নবী করীম (স) আনসার সমাজের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ 'হে আনসার সমাজের লোকেরা! আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধতা অর্জনের

ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করিয়াছেন।' আমি জানিতে চাহি, তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি কি? তখন জবাবে তাঁহারা বলিলেনঃ (পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে আমাদের পদ্ধতি হইল) আমরা নামাযের জন্য অযূ করি, শরীর না-পাক হইলে গোসল করি এবং পানি দ্বারা প্রস্রাব-পায়খানায় শৌচ করি। ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেন, হ্যা, ইহাই হইল কুরআনে তোমাদের প্রশংসা নাযিল হওয়ার কারণ। অতএব নিয়মিতভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলাই তোমাদের কর্তব্য।

ব্যাখ্যা উপরোদ্ধৃত হাদীসে কুরআন মজীদের যে আয়াতাংশের উল্লেখ হইয়াছে উহা সূরা তওবার ১০৮ নং আয়াতের শেষ অংশ। এই আয়াতাংশ 'কূবা'বাসী আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে, তাহা রাসূলে করীম (স)-এর কথা হইতেই জানা গেল। ইহাতে তাহাদের পবিত্রতা অর্জন প্রবণতার যারপর নাই প্রশংসা করা হইয়াছে। আর এই প্রশংসা করিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। এই প্রশংসা দেখিয়া নবী করীম (স)-এর মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে তাহারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তাহা আল্লাহ্র বিশেষ পছন্দ হইয়াছে। তাই তিনি তাহা সরাসরি তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া লইবার উদ্দেশ্যে 'কূবা'র মসজিদে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আলোচ্য হাদীসে শুধু এতটুকুই উদ্ধৃত হইয়াছেঃ আমরা নামাযের জন্য অযূ করি—অযূ করিয়া নামায পড়ি। আর অযূ তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই নিয়মেই করিতেন যাহা নবী করীম (স) তাঁহাদিগকে শিখাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত বলিলেনঃ শরীর নাপাক হইলে আমরা গোসল করি ও গোসল করিয়া শরীরকে পবিত্র করিয়া লই। তৃতীয়ত, বলিলেনঃ আমরা প্রস্রাব ও পায়খানার পর পানি দ্বারা শৌচ করি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (স) নিজে বলিয়াছেনঃ

نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ اَهْلِ قُبَاء كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ ـ

এই আয়াতাংশ 'কূবা'বাসীদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে—তাহারা পানি দ্বারা শৌচ করে।

(رواه البغوى والترمذى)

ইবনে খুযায়মা উয়াইমার ইবনে সায়েদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; নবী করীম (স) 'কূবা'র মসজিদে আসিলেন এবং লোকদিগকে বলিলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِى الطُّهُوْرِ فِىْ قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ هٰذَا فَمَا الطُّهُوْرُ الَّذِىْ تَطَهَّرُوْنَ بِهٖ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করিয়াছেন—তোমাদের এই মসজিদ সংক্রান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে। আমি জানিতে চাহি, তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন কর?

ইহার উত্তরে তাঁহারা বলিলেনঃ আমরা তো আর কিছুই জানি না। শুধু এতটুকু যে, পানি ব্যবহার করি ও পানি দ্বারা ধৌত করি।

অপর একটি বর্ণনার মতে তাঁহারা বলিলেনঃ 'আমরা পায়খানার পর প্রথমে পাথরখন্ড ব্যবহার করি, অতঃপর পানি দ্বারা ধৌত করি। (تفسير مظهرى)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ এই আয়াতটি যখন নাযিল হইল, তখন নবী করীম (স) উয়াইম ইবনে সায়েদা (রা)-এর নিকট লোক মারফত জিজ্ঞাসা করিলেন, এই প্রশংসার কারণ কি? তিনি বলিলেনঃ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاخَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَاَةٌ مِنَ الْغَائِطِ اِلَّا غَسَلَ فَرْجَهٗ ـ

হে রাসূল! আমাদের পুরুষ ও মেয়েলোক নিজের লজ্জাস্থান ভালোভাবে ধৌত না করিয়া পায়খানা হতে বাহির হয় না। (طبرانى)

মিস্ওয়াক করার রীতি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ ـ (بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টদায়ক মনে না করিতাম, তাহা হইলে তাহাদিগকে ইশার নামায বিলম্ব করিয়া পড়ার এবং প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্ওয়াক করার জন্য আদেশ করিতাম। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসের শব্দ السواك অর্থ, দাঁত মর্দন ও দাঁত পরিষ্কারকরণ। যে জিনিস দ্বারা উহা করা হয়, তাহাকে বলা হয় মিস্ওয়াক।

হাদীসে মূলত দুইটি কথা বলা হইয়াছে। একটি হইল ইশার নামায বিলম্বে পড়া এবং দ্বিতীয়টি হইল প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্ওয়াক করা—দাঁত মাজিয়া নির্মল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত করা।

ইশার নামায একটু বেশী রাত্র হওয়ার পর—এক-তৃতীয়াংশ রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পর—পড়া খুবই পছন্দনীয় কাজ। ইহাতে অনেক সওয়াব।

প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্ওয়াক করা সম্পর্কে এই হাদীসে বিশেষ তাকীদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক নামাযের সময় অর্থ, প্রত্যেক নামাযের জন্য যে অযূ করা হয় সেই সময়। অর্থাৎ নামাযের অযূ করার পূর্বেই এই মিস্ওয়াক করা বাঞ্ছনীয়। হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত অপর এক হাদীসে এই কথাই বলা হইয়াছে। হাদীসটি এইঃ

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ۔

আমার উম্মতদের জন্য কষ্টদায়ক হইবে মনে না করিলে আমি প্রত্যেক অযূর সময়ই মিস্ওয়াক করা ওয়াজিব করিয়া দিতাম। —বুখারী, হাকেম, ইবনে খুযায়মা

এই পর্যায়ে অপর একটি হাদীস হইলঃ

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ طُهُوْرٍ۔

আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টদায়ক হইবে মনে না করিলে আমি তাহাদের জন্য প্রত্যেক নামাযের উদ্দেশ্যে পবিত্রতা অর্জনের সময় মিস্ওয়াক করা ওয়াজিব করিয়া দিতাম।

শেষোক্ত হাদীসদ্বয় হইতে 'প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্ওয়াক করার' তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং বুঝা গিয়াছে যে, 'প্রত্যেক নামাযের সময়' অর্থ প্রত্যেক নামাযের জন্য অযূ করার সময়।

বস্তুত ইসলামে মিস্ওয়াক করা শুধু অযূ বা নামাযের সময়ই নয়, সাধারণভাবেই প্রয়োজন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কেননা মুখের ময়লা ও দুর্গন্ধ পরিষ্কার করার জন্য ইহাই হইল একমাত্র উত্তম পন্থা। রাসূলে করীম (স) ইহাকে নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জনের সময়ের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন—উহার সহিত বাঁধিয়া দিয়াছেন এই কারণে যে, নামাযে আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়ান হয়, দোয়া ও সূরাসমূহ পড়া হয়, আল্লাহ্র সঙ্গে সরাসরি কথা বলা হয়। ইহা অতীব পবিত্র কাজ এবং এ সময় মুখ নির্মল, দুর্গন্ধহীন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা একান্ত আবশ্যক। এই উপায়ে মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবে মুখ পরিষ্কার করিতে প্রস্তুত করা হইল। কিন্তু প্রত্যেক নমাযের অযূর সময় মিস্ওয়াক করা যে অনেক কষ্টদায়ক কাজ। এই কারণে নবী করীম (স) উহা করার জন্য অকাট্য নির্দেশ দেন নাই। যদি ইহা কষ্টদায়ক হইবে মনে না করিতেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই প্রত্যেক নামাযের অযূর সময় ইহা করার আদেশ দিতেন। আর তিনি আদেশ দিলে প্রত্যেক নামাযের সময় মিস্ওয়াক করা ওয়াজিব হইয়া যাইত এবং সেই ওয়াজিব তরক করিলে গুনাহ হইত।

ইহা হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে,নবী করীম (স) তাঁহার উম্মতকে কোন কষ্টদায়ক কাজের নির্দেশ দেন নাই। কেননা তিনি তাঁহার উম্মতকে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় ইসলামের মানবিক বিধান উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তবুও ইহা যে অতীব

সওয়াবের এবং আল্লাহ্‌র নিকট খুবই পছন্দনীয় কাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে নামাযের অযূতে এই মিস্‌ওয়াক করা হয়, সে নামাযের সওয়াব অনেক বেশী হইয়া থাকে। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীসে তাই বলা হইয়াছেঃ

صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ ـ

মিস্‌ওয়াক সহ অযূ করিয়া যে নামায পড়া হায় তাহা মিস্‌ওয়াক না করা অযূসহ নামায অপেক্ষা সত্তরগুণ উত্তম ও অধিক সওয়াবের অধিকারী।

عَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ ـ

(بخارى ، مسلم)

হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠিতেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম মিস্‌ওয়াক করিয়া দাঁত পরিষ্কার করিতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسِّوَاكُ مُطْهِرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ ـ

(الشافعى، احمد، دارمى، نسائى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ মিস্‌ওয়াক করিলে যেমন মুখ পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়, তেমনি ইহাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিও লাভ হয়। —শাফেয়ী, আহমদ, দারেমী, নাসায়ী

মোটকথা মিস্‌ওয়াক করা ও মুখ-দাঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধহীন করিয়া রাখা প্রত্যেক মুসলমানেরই সাধারণ কর্তব্য। বিশেষভাবে নামাযের পূর্বে ইহা করা একান্ত আবশ্যক। বৈষয়িক বা স্বাস্থ্যগত কল্যাণ এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ এই একটি কাজের মধ্যেই যুক্তভাবে শামিল হইয়া আছে। বৈষয়িকতা ও ধর্মীয় কাজ ওতপ্রোত, একই কাজের এ-পিঠ ও-পিঠ, একই যাত্রার দ্বৈতফল। বস্তুত ইসলামী বিধানের ইহাই বৈশিষ্ট—যদিও বৈষয়িকতা উহার আসল মূল্যায়ন নয়।

অযূ

অযূর কল্যাণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَّجْهِهٖ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ اَوْنَحْوِ هٰذَا وَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ ـ (ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ মুসলমান বা (মুমিন) বান্দা যখন অযূ করে এবং তাহাতে সে তাহার মুখমন্ডল ধৌত করে, তখন তাহার মুখমন্ডল হইতে সর্বপ্রকারের গুনাহ-খাতা বাহির হইয়া যায়। ইহা সে তাহার দুই চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায়। উহা বাহির হইয়া যায় অযূর পানির সঙ্গে অথবা (বলিয়াছেন) পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে কিংবা এইরকম কিছু বলিয়াছেন। আর যখন তাহার হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার হস্তদ্বয় হইতে এমন সকল প্রকার গুনাহ-খাতা যাহা তাহার দুইখানি হাত কর্তৃক অনুষ্ঠিতহইয়াছে—পানির সঙ্গে অথবা (বলিয়াছেন) পানির সর্বশেষ বিন্দুর সঙ্গে ঝরিয়া পড়ে। শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সমস্ত গুনাহ হইতে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হইয়া যায়। —তিরমিযি

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসটিতে অযূর কল্যাণ সুন্দর ও সম্যকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'অযূ' অর্থ পবিত্র পানি দ্বারা যথা নিয়মে নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা—নিজেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার উপযুক্ত করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে পবিত্র করার নিয়্যতে। আল্লাহ্‌র ইবাদত করার উদ্দেশ্যে অযূ করিয়া নিজেকে পবিত্র করা অত্যন্ত মহান ও বিপুল সওয়াবের কাজ। ইহার ফলে অনেক গুনাহ-খাতা স্বতঃই মাফ হইয়া যায়। এই মাফ হইয়া যাওয়ার ব্যাপারটি বুঝাইবার জন্য নবী করীম (স) রূপক ভাষা ব্যবহার করিয়া গুনাহের 'বাহির হইয়া যাওয়ার' কথা বলিয়াছেন। গুনাহ তো কোন দেহ-সত্তা-সম্পন্ন জিনিস নয়, কাজেই উহা 'বাহির হওয়ার' কথাটি রূপক অর্থে মনে করিতে হইবে। আল্লামা ইবনুল আরাবী বলিয়াছেনঃ 'গুনাহ বাহির হইয়া যায়, অর্থঃ উহা মাফ হইয়া যায়। সঠিকভাবে অযূ করিলে পূর্ব কৃত গুনাহ দূর ইহয়া যায়। উহা অবশিষ্ট থাকে না। ইমাম সয়ূতী বলিয়াছেন, গুনাহ বাহির হইয়া যাওয়ার এই কথাটি যথার্থ বলা হইয়াছে। কেননা গুনাহ নিজে কোন দেহ-সম্পন্ন সত্তা না হইলেও বান্দা যখন গুনাহ করে তখন তাহার অন্তরে কালো চিহ্ন মুদ্রিত হইয়া পড়ে। অতঃপর অযূ করিলে যে পবিত্রতা অর্জিত হয়, তাহা এই কালো চিহ্ন সম্পূর্ণ মুছিয়া ও নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে।

বান্দা গুনাহ করিলে অন্তরের উপর যে কালো চিহ্ন মুদ্রিত হয়, তাহা স্বয়ং নবী করীম (স)-এরই একটি হাদীস হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন।

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَذْنَبَ ذَنْبًا نَكَتَتْ فِىْ قَلْبِهٖ نُكْتَةٌ فَاِنْ قَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِّلَ قَلْبُهُ وَاِنْ عَادَ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَذٰلِكَ الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَهُ اللّٰهُ فِى الْقُرْاٰنِ ـ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

বান্দা যখন গুনাহ করে, তখন তাহার অন্তরের উপর একটি চিহ্ন মুদ্রিত হয়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, গুনাহের কাজ হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত চাহে, তাহা হইলে তাহার দিল বা অন্তর পরিচ্ছন্ন ও নির্মল হইয়া যায়। কিন্তু সে পুনরায় যদি গুনাহ করে, তাহা হইলে সেই চিহ্নটি প্রবল হয় এবং দিলের উপর চড়িয়া বসে। আর ইহা সেই ময়লা চিহ্ন যাহার কথা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই কুরআন মজীদের আয়াতে বলিয়াছেনঃ 'নয়' কখ্‌খনও নয়, বরং তাহাদের দিলের উপর তাহাদের নিজেদের (পাপ) কাজের দরুন ময়লা চিহ্ন লাগিয়া গিয়াছে।

—সূরা আত্-তাত্‌ফীফ-এর ১৪ আয়াত

নবী করীম (স)-এর অপর একটি বাণী হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। বলিয়াছেনঃ

اَلْحَجَرُ الْاَسْوَدُ يَاقُوْتَةٌ بَيْضَاءُ مِنَ الْجَنَّةِ وَكَانَ اَشَدَّ بَيَاضًا مِّنَ الثَّلْجِ وَاِنَّمَا سَوَّدَتْهُ خَطَايَا الْمُشْرِكِيْنَ - (احمد-ابن ماجه)

(আল্লাহ্‌র ঘরের প্রাচীরে গাথা) কালো-পাথর মূলত জান্নাতের শ্বেত শুভ্র মহামূল্য প্রস্তরখন্ড। উহা বরফের অপেক্ষাও অনেক বেশী শ্বেত-শুভ্র ছিল, মুশরিকদের গুনাহ্-খাতাই উহাকে কালোবর্ণ বানাইয়াদিয়েছে।

ইমাম সয়ূতী বলিয়াছেন, পাথরও যখন গুনাহ্‌গারের গুনাহ্ দ্বারা কালোবর্ণ হইয়া যাইতে পারে, তখন স্বয়ং গুনাহগারের দেহ বা হৃদয়পটে সে কালো চিহ্ন পড়া তো খুবই সম্ভব ব্যাপার। তাহা হইলে মূল হাদীসে যে 'গুনাহ বাহির হইয়া যায়' বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ হইবেঃ

গুনাহের চিহ্ন ও প্রভাব তাহার শরীর ও মন হইতে মুছিয়া যাইবে।

হাদীসের শেষাংশে বলা হইয়াছেঃ অযূকারী অযূ করা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গুনাহ হইতেও পবিত্র হইয়া যায়। সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যেসব গুনাহের কাজ করিয়াছে তাহা সব সগীরা গুনাহ—মাফ হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত অযূকারী গুনাহ খাতা হইতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন হইয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত—নামাযের—জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। (تحفة الاحوذى شرح الترمذى)

বিনা অযূতে কুরআন পাঠ

عَنْ اَبِى السَّلَامِ رض قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ رَاَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَلَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّ الْمَاءَ - (مسند احمد)

আবূস্ সালাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স)-কে দেখিয়াছেন এমন একজন লোক অর্থাৎ জনৈক সাহাবী—আমাকে বলিয়াছেন যে, নবী করীম (স) প্রস্রাব করিলেন, অতঃপর তিনি 'অযূ' করার পূর্বে কুরআন মজীদের কিছু অংশ পাঠ করিলেন। —মুসনাদে আহ্‌মদ

ব্যাখ্যা বিনা 'অযূ'তে কুরআন মজীদ মুখস্থ পড়া যায় কিনা এবং বিনা 'অযূ'তে কুরআন মজীদ স্পর্শ করা জায়েয কিনা মুসলমান জনগণের পক্ষে এই দুইটি বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের বিধান জানিয়া লওয়া একান্তই জরুরী। মুসলমানদের জীবনের আদর্শ বিধান হইল কুরআন মজীদ। দিন-রাত উহা পাঠ করা, স্মরণ করা, উহা হইতে ইসলামের বিধান জানিয়া লওয়া এবং সে জন্য উহা ধরা—স্পর্শ করা একান্তই অপরিহার্য। তাই উপরিউক্ত প্রশ্নদ্বয় এবং তাহার জওয়াব মুসলিম জীবনে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের আয়াত

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ـ (سورة واقعة ـ ٧٩)

কুরআন মজীদ সর্বোত্তম পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেহ স্পর্শ করে না।

কথাটি যদি একটি সংবাদ হয়, তাহা হইলে প্রথমত মনে করিতে হইবে যে, ইহা লওহে মাহ্‌ফুযে সুরক্ষিত কুরআন মজীদ সম্পর্কেই বলা হইয়াছে এবং কেবল ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য কেহই স্পর্শ করে না বা করিতে পারে না বলিয়া এই আয়াত দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়ত দুনিয়ায় বর্তমান কুরআন মজীদ স্পর্শ করা সম্পর্কে যদি ইহা একটি সংবাদ হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, পূর্ণ মাত্রায় পবিত্রতা অর্জন করার পরই কুরআন মজীদ স্পর্শ করা বাঞ্ছনীয়। এই পর্যায়ে আবদুর রহমান ইবনে জায়দ বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ্য। তিনি বলিয়াছেনঃ একদা আমরা হযরত সালমান ফারসী সাহাবীর সঙ্গে ছিলাম। তিনি মলমুত্র ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে আমরা বলিলাম, আপনি অযূ করিয়া লইলে আমরা আপনাকে কুরআন মজীদের একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতাম। তখন তিনি বলিলেনঃ

سَلُوْنِىْ فَاِنِّىْ لَسْتُ اَمَسُّهُ اِنَّمَا يَمَسُّهُ الْمُطَهَّرُوْنَ ثُمَّ تَلَا لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ـ

তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি কুরআন স্পর্শ করিব না। কেননা উহা কেবলমাত্র পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা সম্পন্ন লোক ছাড়া অন্য কেহ স্পর্শ করে না। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতাংশ পাঠ করিলেনঃ উহা সর্বোত্তম পবিত্র লোক ছাড়া অন্য কেহ স্পর্শ করে না।

—মুসান্নাফ ইবনে আবূ শায়বা, হাকেম

ইমাম শাফেয়ীও উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে বিনা অযূতে কুরআন স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (الاحكام للسيوطى) এই পর্যায়ে আর একটি দলীল হইল হযরত আমর ইবনে হাজমর প্রতি নবী করীম (স)-এর লিখিত পত্র। তাহাতে অন্যান্য নির্দেশাবলীর সঙ্গে এই কথাটিও লিখিত ছিলঃ

وَلَا تَمُسُّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا عَلٰى طُهُوْرٍ ـ (موطا مالك)

উত্তম পবিত্রতা অর্জন করা ছাড়া তোমরা কুরআন স্পর্শ করিও না।

হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ ـ

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, পবিত্রতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ কুরআন স্পর্শ করে না।

কুরআনের আয়াত ও হাদীসের এই সব বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, অপবিত্রাবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ। ইহা হইতে কুরআনের তা'যীম ও উহার বিরাট মহান উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়। অপবিত্রাবস্থায় কুরআন স্পর্শ করিলে কুরআনের মর্যাদা ও তা'যীমের ব্যাঘাত ঘটে। এই কারণেই এই নিষেধ।

এ পর্যন্তকার আলোচনা অপবিত্রাবস্থায় কুরআন হাত দ্বারা স্পর্শ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু না-পাক শরীরে ও বিনা অযূতে মুখস্থ কুরআন পড়া জায়েয কিনা, সেই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি বিবরণে বলা হইয়াছে يجوز للجنب قراءة القران 'নাপাক শরীরে কুরআন পাঠ করা, মুখে মুখে পড়া জায়েয'। ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতেও এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে। (تفسير روح المعانى)

عَنْ عَلِىٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ لَا يَحْجِزُهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ـ (رواه الخمسة)

হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেন। অতঃপর তিনি কুরআন পাঠ করিতেন এবং আমাদের সঙ্গে বসিয়া গোশত খাইতেন। ইহাতে তিনি সংকোচ বোধ করিতেন না। তিনি (হযরত আলী) প্রায়ই বলিতেনঃ নাপাক শরীর ছাড়া অন্য কোন কারণে তিনি কুরআন পড়া হইতে বিরত থাকিতেননা। —বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ -

(ابوداؤد - ترمذى - ابن ماجه)

হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ নাপাক শরীরে ও হায়েয অবস্থায় কুরআনের কোন জিনিস (আয়াত বা সূরা) পড়িবে না। —আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌

ব্যাখ্যা এই দুইটি হাদীস হইতেও প্রমাণিত হয় যে, নাপাক শরীরে কুরআন মজীদ স্পর্শ করা তো দূরের কথা, মুখস্থও কিছু পড়া যাইবে না। শেষোক্ত হাদীস হইতে আরো জানা গেল যে, হায়েয অবস্থা সম্পর্কেও ইসলামের এই নির্দেশ। ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেনঃ

وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجُنُبِ وَيَدُلُّ اَيْضًا عَلَى تَحْرِيْمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْحَائِضِ -

উপরের হাদীস দুইটি হইতে প্রমাণিত হয় যে, নাপাক শরীরে ও হায়েয অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া হারাম। (نيل الاوطار)

তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا -

নবী করীম (স) যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী-সংগমের দরুন অপবিত্র না হইতেন, তিনি সর্বাবস্থায় আমাদিগকে কুরআন পড়াইতেন।

'কুরআন পড়াইতেন' অর্থ 'কুআন শিক্ষা দিতেন'। 'সর্বাবস্থায়' অর্থঃ

مُتَوَضِّئًا كَانَ اَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ - তিনি বা-অযূ হইতেন, কি বিনা অযূ।

মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হইলঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ -

নবী করীম (স) সকল সময়ই আল্লাহ্‌র যিক্‌র করিতেন।

'সকল সময়' বলিতে 'জানাবত—স্ত্রী সহবাসজনিত অপবিত্র অবস্থাও বুঝায়। আর 'আল্লাহ্‌র যিক্‌র' বলিতে বুঝায় কুরআন পাঠও। ফলে হযরত আলী বর্ণিত হাদীস ও হযরত আয়েশা বর্ণিত এই হাদীসের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। তবে বলা যায়, হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস ব্যাপক, হযরত আলী বর্ণিত হাদীস দ্বারা উহা সংকুচিত হইয়াছে। বদরুদ্দীন আইনীর মতে হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেননা হযরত আয়েশার কথার অর্থ কুরআন ছাড়া অন্যান্য যিক্‌র, অর্থাৎ কুরআন পড়া কেবল জানাবতের অবস্থায় জায়েয নয়, অন্য সময়— অর্থাৎ অযূ ছাড়াও জায়েযঃ ইমাম তিরমিযী পূর্বোদ্ধৃত হাদীস উল্লেখ করার পর লিখিয়াছেনঃ

يَقْرَأُ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ وَلَا يَقْرَأُ فِى الْمُصْحَفِ اِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ -

বিনা অযূতে কুরআন (মুখস্থ) পড়িতে পারে। কুরআন ধরিয়া উহা হইতে দেখিয়া দেখিয়া 'তাহেরুন'—বা অযূ হওয়া ছাড়া পড়িবে না।

সুফিয়ান সওরী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বাল, ইস্‌হাক রাহ্‌আই, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অযূ জান্নাতের কুঞ্জিকা

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُهَا مِنْ اَيِّهَا شَاءَ - (مسلم)

হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের যে কেহ অযূ করিবে সে যদি (পূর্ণ নিয়ম নীতি অনুযায়ী খুব ভালো করিয়া) পূর্ণ অযূ করে এবং অযূর পর সে যদি (শাহাদাতের কালেমা আরবীতে) পাঠ করেঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেহই ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁহার বান্দা ও রাসূল, তাহা হইলে তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দুয়ার অবশ্যই খুলিয়া যাইবে, অতঃপর সে যে দুয়ার দিয়াই ইচ্ছা হইবে, উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসের সারকথা হইল, যদি কোন লোক পুরামাত্রায় ও পুরাপুরিভাবে অযূ করে এবং সেই অযূর পর হাদীসে উল্লেখিত দোয়া পাঠ করে, তাহা হইলে আটটি জান্নাতের সব কয়টির দুয়ারের চাবি তাহার করায়ত্ত হইবে। সে ইহার যে কোন একটি দুয়ার দিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

অযূ করিবার পর উপরিউক্ত দোয়া পাট করা এই হাদীস অনুযায়ী মুস্তাহাব। হাদীসে অযূর পরে পাঠ করিবার জন্য কয়েক প্রকারের দোয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে কয়েকটি দোয়ার উল্লেখ করা যাইতেছেঃ

(১) اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ ইলাহ্ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। —মুসলিম

(২) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের একজন বানাইয়া দাও। —তিরমিযী

(৩) سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

(نسائى)

হে আল্লাহ্! তুমি সর্বদিক দিয়া পবিত্র। তোমার হামদ্ ও প্রশংসা সহকারে সাক্ষ্য দিতেছি যে, একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেহ ইলাহ্ নাই। তোমার কেহ শরীক নাই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি এবং তোমারই নিকট আমি তওবা করিতেছি! —নাসায়ী

ইমাম নববী লিখিয়াছেন, এই তিনটি দোয়া পরপর মিলাইয়া পাঠ করা আবশ্যক এবং ওয়াজিব গোসলকারীর পক্ষেও এই দোয়া পাট করা উচিত।

বস্তুত অযূর দ্বারা বাহ্যত সংশ্লিষ্ট অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করা ও পবিত্রতা অর্জনই মূল লক্ষ্য। এই কারণে মুমিন বান্দা অযূ করার পর অনুভব করে যে, আমি সংশ্লিষ্ট অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ধৌত করার কাজ করিয়া অযূ সংক্রান্ত শরীয়তের হুকুম তো পালন করিয়াছি, ইহার দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়াছি। কিন্তু আসল মলিনতা ও অপবিত্রতা হইল ঈমানের দুর্বলতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব এবং আমলের খারাবী। এই অনুভূতি সহকারে যদি সে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করিয়া ঈমানকে নূতন ও তাজা করিয়া লয়, আল্লাহ্‌র খালিস বন্দেগী ও রাসূলে করীমের পুরাপুরি আনুগত্যের নূতন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে তহার ক্ষমার ফয়সালাও হইয়া যায় এবং বাহ্যিক অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে মনের অযূও একসাথে সম্পাদিত হয়। কাজেই অযূ করার পর এই দোয়া পাঠ করা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

অযূর পাকালীন ফল

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ـ (بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে যখন ডাকা হইবে, তখন অযূর প্রভাবে তাহাদের মুখমন্ডল এবং হাত ও পা উজ্জ্বল ও আলোকোদ্ভাসিত হইবে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক সেই আলো ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করিতে পারে ও উহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া লইতে পারে, তাহার তাহা অবশ্যই করিয়া লওয়া উচিত। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা অযূর বাহ্যিক ও বৈষয়িক ফল এই যে, উহার সাহায্যে মুখমন্ডল ও হাত–পা ধৌত করার কাজ রীতিমত সম্পন্ন হয়। আর উহার আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ফল এই যে, উহার দরুন অন্তরে পবিত্রতা নিঃশংক অনুভূতি এবং এক প্রকারের পরম পুলক ও আনন্দ স্ফূর্তির নির্মল ভাবধারার উদ্রেক হয়। ইহা সবই এই দুনিয়ায় অর্জনীয়। কিন্তু অযূর এই বাহ্যিক ফলও কেবল দুনিয়ায়ই সীমাবদ্ধ নয়। পরকালেও ইহার পরম ও মহামূল্য ফল পাওয়া যাইবে। আর তাহা এই যে, দুনিয়ায় যাহারা অযূ করা কালে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ–প্রত্যেঙ্গ ঠিক ঠিক ভাবে ও পুরাপুরি মাত্রায় ধৌত করিবে, কিয়ামতের দিন তাহাদের মুখমন্ডল এবং হাত ও পা এবং অযূতে ধুইবার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল ও আলোকমন্ডিত হইবে। আর হাশরের ময়দানে ইহাই হইবে তাহাদের অন্যান্যদের হইতে পার্থক্যসূচক বিশিষ্টতার চিহ্ন। অতএব যাহাদের অযূ যতখানি পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ পরিণত হইবে, তাহাদের ঔজ্জ্বল্য ততই ব্যাপক ও উদ্ভাসিত হইবে। এই কারণে হাদীসের শেষভাগে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, যাহার পক্ষেই তাহার এই ঔজ্জ্বল্যকে বৃদ্ধি ও ব্যাপক করিয়া লওয়া সম্ভব, সে যেন অবশ্যই তাহা করে, তাহা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাইয়া যায়। আর তাহার উপায় হইল, অযূ করার সময় মনোযোগ ও চিন্তা যত্ন সহকারে প্রত্যেকটা কাজ করিবে, নিয়ম–নীতির প্রতি পুরাপুরি লক্ষ্য রাখিবে এবং কোথাও কোন অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া না যাইতে পারে, সেদিকে সচেতন সতর্কতা রাখিয়া অযূ করিবে।

অযূ গুনাহ্ মায়াফী ও মর্যাদা বৃদ্ধির উৎস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ ـ (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ আমি কি তোমাদিগকে সেই সব আমলের কথা বলিব না, যে সবের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহ্সমূহকে মাফ করিয়া দেন ও মর্যাদা বাড়াইয়া দেন? উপস্থিত সাহাবা বলিলেন, 'ইয়া রাসূল! আমাদিগকে অবশ্যই সেইসব আমলের কথা বলিবেন। তখন নবী করীম (স) ইরশাদ করিলেনঃ কষ্ট ও অসহ্যতা সত্ত্বেও পূর্ণমাত্রায় ও ভালোভাবে অযূ করা, মসজিদসমূহের দিকে খুব বেশী পা বাড়ানো এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। বস্তুত ইহাই আসল 'রিবাত', ইহাই প্রকৃত 'রিবাত'। —মুসলিম

ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং শ্রোতাদের মনে সেইদিকে অধিকতর আকৃষ্ট, আগ্রহান্বিত ও ঔৎসুক্যপূর্ণ করিয়া তুলবার জন্য নবী করীম (স) প্রায়ই 'আমি কি তোমাদিগকে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা বলিব না' বলিয়া কথার সূচনা করিতেন। বস্তুত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিশেষ বিশেষ কথা বলিবার ইহা একটি বিশেষ স্টাইল। ইহাতে শ্রোতৃবৃন্দের মন স্বভাবতই বক্তা ও তাহার বক্তব্যের দিকে আকৃষ্ট ও উদগ্রীব হইয়া উঠে। অতঃপর যাহা কিছু বলা হয় তাহা শ্রোতাদের মনে দৃঢ়মূল হইয়া বসে। আলোচ্য হাদীসের শুরুতে নবী করী (স) সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন।

উপরিউক্ত হাদীসটিতে নবী করীম (স) অযূর ফযীলত ও কল্যাণ বর্ণনা প্রসঙ্গে পরপর তিনটি আমলের ফলে কি হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন এবং তাহা যথাযথভাবে করিবার জন্য উৎসাহ দান করিয়া বলিয়াছেন, এইসব আমলের ফলে গুনাহ্ মাফ হইয়া যায়। মানুষের পরকালীন মর্যাদা অধিক বৃদ্ধি পায়। আমল তিনটির মধ্যে প্রথম হইল, কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পুরামাত্রায় অযূ করা এবং সেই ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করিয়া কাজ সমাধা না করা। কেননা তাহা সুন্নাতের পরিপন্থী। বিশেষ করিয়া কঠিন শীতের সময় অযূ করা বড়ই কষ্টকর হইয়া থাকে। এই সময় প্রত্যেকটি অঙ্গ (তিন তিনবার করিয়া) ধৌত করা সহজ কাজ নয়। অথবা নিকটে অল্প পরিমাণ পানি রহিয়াছে। যাহার দ্বারা পুরামাত্রায় ও সুন্নাত মুতাবিত অযূ করা যায় না। ভালোভাবে অযূ করিতে হইলে কিছুদূর যাইয়া পানি লইতে হয়। এই দুইটি অবস্থার ক্ষেত্রেই বর্তমান কথাটি প্রযোজ্য এবং এইরূপ অবস্থাও যদি কেহ ভালোভাবে ও পূর্ণমাত্রায় অযূ করে, তবে উহা এমন একটি উন্নত মানের কাজ, যাহার ফলে বান্দার গুনাহ্ খাতা মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরকালীন মর্যাদা খুবই উন্নত করিয়া দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় আমল হইল, মসজিদসমূহের দিকে খুব বেশী পা বাড়ানো। অন্য কথায় মসজিদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন। নামায পড়ার জন্য বারবার মসজিদে যাওয়া, মসজিদ দূরে অবস্থিত হইলেও তথায় গিয়া নামায পড়া অথবা প্রত্যেক নামাযে মসজিদের জামা'আতে শামিল হওয়ার জন্য যাতায়াত করা। যাহার বসবাস মসজিদ হইতে যত বেশী দূরে, সে এই মসজিদের নামায পড়ার জন্য বারবার যাওয়ার ফলে তাহার বেশী বেশী পদক্ষেপ মসজিদের দিকে হইবে।

আর তৃতীয় আমল—রাসূলে করীম (স)-এর ইরশাদ অনুযায়ী—এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকা এবং দিলকে সেই দিকেই নিয়োজিত রাখা। বস্তুত যে লোকের মনোভাব এইরূপ হইবে, নামায দ্বারা যে লোক মনের শান্তি, সুখ ও চরিতার্থতা লাভ করে, সে নবী করীম (স)-এর বাণী قرة عيني الصلوة আমার চোখের শান্তি ও শীতলতা হইল নামায-এর ভাবধারার কিছু কিছু অংশ লাভ করিবে।

হাদীসের শেষ ভাগে 'ইহাই আসল রিবাত' 'ইহাই প্রকৃত রিবাত' বলা হইয়াছে। 'বিরাত' (رباط) শব্দের প্রচলিত অর্থ 'ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে অবস্থান করা ও পাহারা দেওয়া'। শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে সব মুজাহিদকে সীমান্তে নিযুক্ত করা হয়, তথায় তাহাদের অবস্থান করাকেই 'রিবাত' বলা হয়। বলা বাহুল্য, ইহা অত্যন্ত বড় গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক কষ্টসাধ্য কাজ। এখানে প্রতি মুহূর্তেই জীবনের শংকা-বিপদ ঘনীভূত। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) উপরিউক্ত তিনটি কাজকে 'রিবাত' বলিয়াছেন সম্ভবত এই অর্থে যে, এ তিনটি কাজই সুষ্ঠুরূপে

সম্পন্ন করা হইলে শয়তানের আক্রমণ হইতে বান্দার পক্ষে সুরক্ষিত থাকা অনেকটা নিশ্চিত হয়। আর শয়তানের আক্রমণ হইতে স্বীয় ঈমানকে রক্ষা করা আদর্শবাদের দৃষ্টিতে রাজ্য-সীমান্ত রক্ষা অপেক্ষাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সন্দেহ নাই। আর সত্যকথা এই যে, যাহারা এইসব আমলের সাহায্যে ঈমানী সীমান্তকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের সঠিক ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ তাহাদের দ্বারাই সম্ভবপর।

নামাযের জন্য অযূ অপরিহার্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ - (بخاری، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে লোকের অযূ নাই সে অযূ করিয়া না লইলে (ও বিনা অযূতে নামায পড়িলে) তাহার নামায কবুল হইবে না। —বুখারী, মুসলিম

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَّلَا صَدَقَةٌ مِّنْ غُلُوْلٍ -
(مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হইতে পারে না এবং এমন কোন সাদকা বা দানও কবুল হইবে না, যাহা অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ দিয়া করা হইবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা পবিত্রতা সম্পর্কে নবী করীম (স) তাঁহার উম্মতকে যে সব হিদায়ত দিয়াছেন তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ আইন ও বিধান পর্যায়ের। যেমন ইস্তিন্‌জার হুকুম, দেহ ও কাপড় পবিত্র রাখার হুকুম, পানি পাক বা নাপাক হওয়া পর্যায়ের বিস্তারিত বিধান। আর কতকগুলি হইল নামাযের শর্ত পর্যায়ের। অর্থাৎ ইহা না করিলে নামায হইবে না। নামায পড়িতে হইলে উহার পূর্বে তাহা অবশ্যই করিয়া লইতে হইবে—ইত্যাদি ধরনের কথা। অযূ এই পর্যায়ের বিধান। নামাযের জন্য অযূ সম্পর্কে কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ - (المائدة : ٦)

তোমরা যখন নামায পড়িবার জন্য দাঁড়াইবে, তখন উহার পূর্বে তাহা তোমাদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর। তোমাদের মাথা মসেহ কর। আর তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত ধুইয়া ফেল।

এই আয়াতে বলা হইয়াছে, নামায হইল আল্লাহ্‌র পবিত্র দরবারে হাযির হওয়া এবং তাঁহার সহিত কথা বলা, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি। এই কারণে এই নামায অযূ সহকারেই পড়া যাইতে পারে অযূ ছাড়া নয়। এই অযূ নামায শুরু করার পূর্বে জায়নামাযে দাঁড়াইবারও আগে করিয়া লইতে হইবে। আল্লাহ্‌র পবিত্র দরবারে হাযির হওয়ার জন্য ইহা এক অপরিহার্য নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোনক্রমেই হইতে পারে না।

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ -
(ابوداؤد - ترمذی - دارمی - ابن ماجه)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ নামাযে কুঞ্জিকা হইল পবিত্রতা—অযূ, উহার তাহরীম হইল তাকবীর এবং উহার তাহ্লীল হইল সালাম। —আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, ইবনে মাজাহ

হাদীসটি হযরত আলী (রা) ছাড়াও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা 'তাহরীম' অর্থ 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া হাত বাঁধিয়া নামায শুরু করা। এই ভাবেই নামাযে প্রবেশ করিতে হয়। অতঃপর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত কথাবার্তা, চলাফেরা, নড়া-চড়া কিংবা এমন আচরণ করা যাহার কারণে তাহাকে নামাযে নিযুক্ত মনে করা যায় না—সম্পূর্ণ হারাম হইয়া যায়। এইজন্যই ইহাকে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা হয়।

আর 'নামাযের তাহ্লীল হইল সালাম'—ইহার অর্থ ডান ও বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলিয়া নামায শেষ করিতে হয়। ইহা করা হইলে সব কাজই করা হালাল এবং জায়েয হইয়া যায়, যাহা এতক্ষণ শুধু নামাযের কারণেই হারাম হইয়াছিল। এইজন্য ইহাকে নামাযের তাহলীল বলা হইয়াছে।

পবিত্রতাকে নামাযের চাবি বলার তাৎপর্য কি? কোন তালাবদ্ধ ঘরে যেমন চাবি দিয়া তালা না খোলা পর্যন্ত কাহারো পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না ঠিক এমনিভাবে অযূ ব্যতিরেকে নামাযে শামিল হওয়া কাহারো পক্ষে জায়েয ও বৈধ হয় না।

এই কয়টি হাদীসের বাহ্যিক শব্দে ও বর্ণনাভঙ্গীতে কিছুটা পার্থক্য থাকিলেও মূল প্রতিপাদ্য একই। আর তাহা হইল অযূ ছাড়া নামায কখনই জায়েয ও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। অযূ হইল নামাযের জন্য অপরিহার্য শর্ত। অতএব নামাযে দাঁড়াইবার আগে অযূ করিয়া লইতে হইবে।

নামায যেহেতু আল্লাহ্র পবিত্র দরবারে হাযিরা দেওয়ার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ এক পন্থা ও পদ্ধতি, তাই প্রত্যেক ওয়াক্তে নামাযের জন্য সমস্ত শরীর ধৌত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোশাক পরিধান করার নির্দেশ হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভবত দয়া-পরবশ হইয়াই সেরূপ আদেশ করেন নাই। শুধু এতটুকু আদেশ দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন যে, নামাযের জন্য পোষাক পাক ও পবিত্র হইতে হইবে এবং সাধারণত সমস্ত দেহ নয়, বিশেষ কয়টি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করিলেই চলিবে। লক্ষ্য করা যাইতে পারে, অযূতে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুইতে হয়,তাহাতে মোটামুটি বাহ্যিক অঙ্গ প্রায় সবই ধোয়া হইয়া যায়। আর এই কয়টি অঙ্গ দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণও বটে। এই কারণেই এই কয়টি প্রত্যঙ্গ সমগ্র দেহের স্থলাভিষিক্ত রূপে গণ্য হইল। এতদ্ব্যতীত মুখমন্ডল, হাত পা ও মাথা—পোশাক পরিধানের পর এই অঙ্গগুলিই বাহিরে উন্মুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে অযূতে কেবল এইগুলিই ধুইবার ও মসেহ্ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সমস্ত শরীরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার একটা স্পষ্ট অনুভূতি গড়িয়া উঠে। আর এই অনুভূতিই পবিত্রতার প্রাণ।

অযূ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ وَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّاَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ لَمْ يُطَهِّرْ اِلَّا مَوْضَعَ الْوُضُوْءِ ـ (دارقطنى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক অযূ করিল ও শুরুতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিল—বিসমিল্লাহ বলিল, সে এই অযূ দ্বারা তাহার সমস্ত শরীরকে পাক করিয়া লইল। আর যে লোক অযূ করিল কিন্তু শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিল না, সে তাহার অযূর জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই পবিত্র করিতে পারিল না। —দারেকুত্নী

ব্যাখ্যা অযূতে ফরয মাত্র চারটি, এই চারিটির কথা কুরআন মজীদের পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে বলা হইয়াছে। তাহা হইলঃ পূর্ণ মুখমন্ডল ধৌত করা, কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা, মাথা মাসেহ্ করা এবং দুই পা গিরা পর্যন্ত ধোয়া। এই চারিটি কাজের বাহিরে নবী করীম (স) নিজ হইতে অযূর মধ্যে আরো কিছু কাজের ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং তাহা করিবার জন্য উৎসাহ দান করিয়াছেন। এই কাজগুলি হইল অযূর সুন্নাত ও অন্যান্য আদব-কায়দা। এই সবের সমন্বয়েই অযূ পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। এই পর্যায়ে উল্লেখ্য হইল, যেমন মুখমন্ডল ও হাত পা একবারের বদলে তিনবার করিয়া ধোয়া, ধুইবার সময় মাজা-ঘষা করা, দাঁড়ি ও হাত পায়ের অংগুলির মধ্যে খিলাল করা, সর্বত্র পানি পৌঁছাইবার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা, কুল্লি করা ও নাকে পানি দিয়া উহার ময়লা দূর করা, কর্ণদ্বয়ের ভিতর ও বাহির উভয় দিক মসেহ্ করা, অযূ করিত শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা, অযূ শেষে নির্দিষ্ট দোয়া পড়া—এই সব কিছুই হইল অযূর সুন্নাত অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশের বাহিরে উহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এবং উহার পূর্ণত্ব বিধানের উদ্দেশ্যে নবী করীমের দেওয়া ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য হাদীস। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ বলা সম্পর্কে রাসূলের ইরশাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই হাদীস হইতে জানা গেল যে, মূলত কেবলমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার নামই অযূ নয়। অযূর আসল উদ্দেশ্যও তাহা নয়। আসলে অযূ হইল এক ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া। আর তাহার নিয়ম হইল বিসমিল্লাহ বলিয়া অযূ করা। 'বিসমিল্লাহ' বলা শুধু একটা শব্দ বা বাক্যের উচ্চারণই নয়, ইহাতে অন্তরের গভীর ভাবধারার প্রকাশ ঘটে। ইহা বলিয়া সে প্রকাশ করে যে, কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করাই তাহার লক্ষ্য নয়। তাহার লক্ষ্য সমগ্র সত্তার পবিত্রতা বিধান। সে বিসমিল্লাহ বলিয়া প্রকারান্তরে ঘোষণা করে যে, সে আল্লাহ্র প্রতি অবিচল বিশ্বাস রাখে। সে যাহা কিছু করিতে যাইতেছে, তাহাতে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভই তাহার চরম লক্ষ্য এবং সে আল্লাহ্র শিখানো পদ্ধতিতেই কাজ করিতেছে। সেই সঙ্গে সে একথারও প্রকাশ করে যে, মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্র নাম লইয়াই করা উচিত এবং আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার দেওয়া নিয়মেই করা বাঞ্ছনীয়।

বস্তুত এইভাবে করা অযূই পূর্ণাঙ্গ অযূ। ইসলামে এই অযূই কাম্য। এইরূপ অযূ করিলেই একজন মুসলমান মন ও দেহের দিক দিয়া পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও শুচিতা লাভ পূর্বক আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

তবে বিসমিল্লাহ না বলিলে অযূ একেবারে হইবেই না এমন নয়। অযূ হইবে, তবে পূর্ণাঙ্গ নয়, অসম্পূর্ণ।

এই পর্যায়ে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত হইতেছেঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ -

(مسند احمد - ابو داؤد - ابن ماجه باسناد ضعيف)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ অযূ করিবার শুরুতে যে লোক বিসমিল্লাহ বলে নাই তাহা অযূই শুদ্ধ হয় নাই।

—মুসনাদে আহ্মদ, আবূ-দাউদ, ইবনে মাজাহ্

ইহা একটি হাদীসের অংশ। ইহার পূর্ণ ভাষণ এইঃ

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا وَضُوْءَ لَهٗ وَلَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ -

যে লোক অযূ করে নাই, তাহার নামায হইবে না, আর যে লোক অযূ করিবার সময় বিসমিল্লাহ্ বলে নাই, তাহার অযূই হয় নাই।[১]

১. এই হাদীসটি ইয়াকূব ইবনে মালামাত হইতে—তাঁহার পিতা হইতে—হযরত আবূ হুরায়রা ইহতে বর্ণিত। ইমাম বুখারী বলিয়াছেন, ইয়াকূব ইবনে মালামাত তাঁহার পিতার নিকট হইতে ইহা শুনিয়াছেন কিংবা তাঁহার পিতা হযরত

অযূর পর রুমাল ব্যবহার

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ (ترمذى)

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেঃ আমি রাসূলের করীম (স)-কে দেখিয়াছি, তিনি যখন অযূ করিতেন, তখন তাঁহার কাপড়ের এক অংশ দ্বারা তাঁহার মুখমন্ডল মুছিয়া ফেলিতেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, নবী করীম (স) অযূ করিবার পর নিজের পরিধানের কাপড়ের কোন এক অংশ দ্বারা হাত ও মুখমন্ডলের পানি মুছিয়া ফেলিতেন। ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত ও হযরত আশেয়া (রা) হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছেঃ অযূ'র পরে অযূ'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ মুছিয়া ফেলিবার জন্য একখানি স্বতন্ত্র কাপড় রাসূলে করীম (স)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। অযূর পর তিনি উহার দ্বারা সিক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুছিয়া ফেলিতেন। অন্যান্য কোন সাহাবীর বর্ণনায়ও এইরূপ একখানি কাপড় নির্দিষ্ট থাকার এবং তাহা দ্বারা অযূর সিক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুছিয়া ফেলিবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্যায়ে বর্ণিত সব কয়টি হাদীস সামনে রাখিয়া বলা যায়, অযূর পর সিক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রুমাল বা তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া ফেলা সম্পূর্ণ জায়েজ এবং না মুছিয়া শরীরের সমস্ত জামা-কাপড় সিক্ত হইতে দেওয়া কোন শরীয়তসম্মত অপরিহার্য কাজ নয়।

'আল-মুনিয়া' নামক ফিকাহ্‌র কিতাবে বলা হইয়াছেঃ

اَلْمِنْدِيْلُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ مُسْتَحَبٌّ ـ (العرف الشذى ص ٣٦)

অযূর পর রুমাল বা তোয়ালে ব্যবহার করা অতীব পছন্দনীয় কাজ।

ফত্‌ওয়ার কিতাব 'কাযীখান'-এ ইহাকে 'মুবাহ' বলা হইয়াছে।

এক অযূতে একাধিক নামায পড়া

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رض يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ قَالَ قُلْتُ وَاَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ ـ

(مسند احمد)

আমর ইবনে আমের হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি হযরত আনাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী করীম (স) প্রত্যেক নামাযের সময় অযূ করিতেন। আমর বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা (সাহাবীরা) কি করিতেন? তখন হযরত আনাস বলিলেন, আমরা তো একই অযূ দিয়া পর পর কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়িতাম, যতক্ষণ না অযূ ভাঙ্গিয়া যাইত।

—মুসনাদে আহমদ

আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট শুনিয়াছেন—এমন কথা জানা যায় নাই। অবশ্য দারে কুত্‌নী ও বায়হাকী অন্য সূত্র হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই সব সূত্রই দুর্বল। অবশ্য তাবরানী হযরত আবূ হুরায়রা হইতেই অপর ভাষায় একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইল, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَزَالُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتّٰى تُحْدِثَ مِنْ ذَالِكَ الْوُضُوْءِ ـ

তুমি যখন অযূ করিবে, তখন বিসমিল্লাহ-আলহামদুলিল্লাহ বল। কেননা তোমার রক্ষাকারীরা তোমার জন্য নেক আমল লিখিতেই থাকিবে, যক্ষণ না তোমার অযূ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

কিন্তু এই হাদীসের সনদও দুর্বল।

ব্যাখ্যা নবী করীম (স) প্রত্যেক নামাযের সময় অযূ করিতেন—ইহার অর্থ একবার অযূ করিবার পর পরবর্তী দ্বিতীয় নামাযের সময় তিনি নূতন করিয়া আবার অযূ করিতেন এবং এই নূতন অযূ দিয়াই পরবর্তী ওয়াক্তের নামায আদায় করিতেন।

হযরত ইবনে উমর বর্ণিত অপর এক হাদীসে এই কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। উহাতে বলা হইয়াছে।

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْغَيْرَ طَاهِرٍ۔ (مسند احمد)

নবী করীম (স)-এর অযূ থাকিতেন কিংবা বিনা অযূতে—উভয় অবস্থায়ই তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় নূতন করিয়া অযূ করিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছিলেন।

ইমাম তাহাভী এই সম্পর্কে লিখিয়াছেনঃ

يَحْتَمِلُ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ خَاصَّةً ثُمَّ نُسِخَ يَوْمَ الْفَتْحِ ۔

সম্ভবত প্রত্যেক নামাযের জন্য নূতন অযূ করার বিশেষভাবে তাহার জন্য ওয়াজিব ছিল। পরে মক্কা বিজয় দিবসে তাহা প্রত্যাহার করা হয়।

মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ ۔

নবী করীম (স) মক্কা বিজয় দিনে এক অযূ দিয়া কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়িয়াছেন।

ইহার আর একটি ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, সম্ভবত নবী করীম (স) নিজে ভালো মনে করিয়াই প্রত্যেক নামাযের সময় নূতন করিয়া অযূ করার নিয়ম করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এইরূপ করিতে থাকিলে সাধারণ মুসলমানের জন্য ইহাকে ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হইতে পারে, তখন তিনি নিজেই ইহা ত্যাগ করিলেন এবং এক অযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করিতে থাকিলেন। কিন্তু মুসনাদে আহমদ বর্ণিত উপরে উদ্ধৃত হাদীসে 'তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন' কথা দ্বারা এই শেষোক্ত ব্যাখ্যা অসার প্রমাণিত হইয়া যায়।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِنَّكَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمَدًا صَنَعْتُهُ ۔ (مسند احمد، مسلم)

সুলায়মান ইবনে বুরাইদা তাঁহার পিতার নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে, নবী করীম (স) মক্কা বিজয়-দিনে একই অযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়িয়াছেন। ইহা দেখিয়া হযরত উমর (রা) নবী করীম (স)-কে লক্ষ করিয়া বলিলেনঃ ইয়া রাসূল, আপনি আজ এমন একটি কাজ করিয়াছেন যাহা ইতিপূর্বে কখনো করিতেন না। উত্তরে তিনি বলিলেনঃ ইহা আমি ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছি। —মুসনাদে আহমদ, মুসলিম

'ইতিপূর্বে কখনো করিতেন না' অর্থ এইরূপ করার আপনার অভ্যাস ছিল না। 'সাধারণত এক অযূ দ্বারা একাধিক নামায পড়া আপনার রীতি ছিল না। বরং প্রত্যেক ওয়াক্তে নূতন করিয়া অযূ করাই আপনার চিরকালের অভ্যাস।

হযরত উমরের এই কথাটির অর্থ এ নয় যে, নবী করীম (স) ইতিপূর্বে কখনোই এবং কোন দিনই একই অযূ দিয়া একাধিক ওয়াক্তের নামায পড়েন নাই। যেমন বুখারী শরীফে হযরত সুয়াইদ ইবনে নু'মান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ আমরা খায়বর যুদ্ধের বৎসরে নবী করীমের সাথে বাহির হইলাম। আমরা যখন 'সাহ্‌বা'[১] নামক স্থানে পৌছিলাম, তখন নবী করীম (স) আমাদের লইয়া

১· ইহা খায়বরের নিকটবর্তী একটি স্থান।

আসরের নামায পড়িলেন। নামাযের পর তিনি সকলের সঙ্গে পানাহার করিলেন; অতঃপর তিনি শুধু কুল্লি করিয়া মাগরিবের নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। নূতন করিয়া অযূ করিলেন না।

এই হাদীস হইতে প্রথমত প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নূতন করিয়া অযূ করার জন্য নবী করীম (স) আদিষ্ট ছিলেন না। কেননা তিনি আদিষ্ট হইয়া থাকিলে তাহার ব্যতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। বরং সত্য কথা এই যে, ইহা ছিল তাঁহার নিজের একটা সাধারণ নিয়ম। নূতন অযূসহ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায পড়াকে তিনি খুবই ভালোবাসিতেন ও পছন্দ করিতেন। কিন্তু কখনো একই অযূ দ্বারা একাধিক নামায পরার প্রয়োজন দেখা দিলেও যে তিনি তাহা করিতেন না, তাহাও নয়। বুখারী উদ্ধৃত উপরিউক্ত হাদীসটি তাহারই অকাট্য প্রমাণ। মুল্লা আলী আল-কারী লিখিয়াছেনঃ

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اَنَّ الْوَضُوْءَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ لَيْسَ مِنْ خُصُوْصِيَاتِهِ ـ

প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নূতন করিয়া অযূ করা যে রাসূল করীমের জন্য বিশেষ কোন বিধান নয়, এই হাদীস তাহারই প্রমাণ।

তিনি আরো লিখিয়াছেনঃ

فيه دليل على ان يصلى صلوات كثيرة بوضوء واحد لاتكره صلوته ـ

এক অযূ দ্বারা একাধিক নামায পড়া যাহার পক্ষে সম্ভব সে নিঃসন্দেহে পড়িতে পারে। তাহার নামায মকরূহ্ হইবে না, এই হাদীসই উহার প্রমাণ। (مرقاة ج ۱ ص ۳۳۸)

প্রত্যেক প্রস্রাব—পায়খানার পর অযূ

عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوْزٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عُمَرُ قَالَ مَاءٌ تَوَضَّأُ بِهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ كَانَتْ سُنَّةً ـ

(ابن ماجه ـ مسند احمد ـ ابوداؤد)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) একবার প্রস্রাব করিলেন। তখন হযরত উমর তাঁহার পিছনে পানির পাত্র লইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে উমর, উহা কি? উমর বলিলেন, ইহাতে পানি আছে, আপনি প্রস্রাবের পর অযূ করিবেন বলিয়াই ইহা লইয়া আসিয়াছি। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ আমি যখনই প্রস্রাব করিব তখনি অযূ করিতে হইবে—আমাকে এমন কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই। যদি আমি তাহা করি, তবে উহা একটা বাধ্যতামূলক ও স্থায়ীভাবে অনুসরণীয় নিয়মে পরিণত হইবে।

ব্যাখ্যা এই হাদীসটি হইতে জানা গেল যে, পায়খানা-প্রস্রাব করিবার পর অযূ করিতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অবশ্য ইহা করা মুস্তাহাব—খুব পছন্দীয় কাজ, সন্দেহ নাই। পায়খানা করিবার পর অযূ করিবার ব্যাপারটিও এইরূপ। অযূ করিলে ভালই। আর নিয়মিত অযূ না করিলেও অন্তত হাতমুখ ধুইয়া ফেলাও যথেষ্ট।

অযূর বিধান

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رض اَنَّهُ دَعَا بِاِنَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ

بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا
يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهٗ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ (بخارى ـ مسلم)

হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ তিনি (এক দিন পানিভরা) পাত্র আনিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার দুই কব্জার উপর তিনবার পানি ঢালিলেন ও কব্জাদ্বয় ধৌত করিলেন। ইহার পর পাত্রের মধ্যে তাঁহার ডান হাত ঢুকাইয়া পানি উঠাইলেন ও কুল্লি করিলেন এবং নাকের ছিদ্রদ্বয় পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। তাঁহার পর তাঁহার মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত দুইখানি হাত তিনবার ধুইলেন। পরে মাথা মসেহ করিলেন ও পা দুইখানা গিরা পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে ঠিক এইরূপ অযূ করিতে দেখিয়াছি যেমন আমি (এইমাত্র) করিলাম। তাহার পর তিনি [নবী করীম (স)] বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি আমার মত অযূ করিবে ও উহার পর দুই রাকাআত নামায পড়িবে এমনভাবে যে, নামাযের রাকাআতদ্বয়ের মাঝে তাহার মনে কোন খারাপ চিন্তা আসিবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পূর্বের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে অযূর বিস্তারিত নিয়ম ও পদ্ধতি জানা যায়। ইহার মূল বর্ণনাকারী হইতেছেন হযরত উসমানের মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম হুমরান। তিনি প্রথমত হযরত উসমানের অযূর বর্ণনা দিয়াছেন। সেই সঙ্গে হযরত উসমান (রা) অযূ করিবার পর যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উসমান অযূ সম্পন্ন করিয়া বলিয়াছেনঃ ঠিক এইভাবেই রাসূলে করীম (স)-কে অযূ করিতে আমি দেখিয়াছি। এবং রাসূলে করীম (স) অযূ করিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। ফলে একই হাদীস হইতে রাসূলে করীম (স), সাহাবী ও তাবেয়ীদের অযূ করিবার নিয়ম ও পদ্ধতি একসঙ্গে জানা গেল। এইদিক দিয়া হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

এই হাদীস হইতে অযূর যে বিস্তারিত নিয়ম জানা যায় তাহা এই যে, প্রথমত হস্তদ্বয় কবজা পর্যন্ত তিনবার ধুইতে হইবে। ইহা সর্বসম্মতভাবে সুন্নাত। ইহার পর তিনবার কুল্লি করার নিয়ম এই যে, মুখে পানি লইয়া চারিদিকে ঘুরাইবে যেন মুখের কোন অংশে পানি পৌঁছাইতে বাকী না থাকে এবং যেন কন্ঠনালী পর্যন্ত পানি পৌঁছায় (রোযা রাখা অবস্থায় ইহা করা মাকরূহ্)। তাহার পর নূতন পানি লইয়া নাকের মধ্যে দিবে ও নাকের ছিদ্রদ্বয়ের ভিতরভাগ ভাল করিয়া ধুইয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে। ইহার পর মুখমন্ডল তিনবার নূতন পানি দ্বারা ধুইবে। ইহাতে কপালের উপর চুলের গোড়া হইতে থুত্নির নীচ ও কর্ণদ্বয়ের গোড়াভাগ পর্যন্ত সবই ভালভাবে ভিজিয়া যাওয়া আবশ্যক। তাহার পর কনুইর উপর পর্যন্ত হস্তদ্বয় তিনবার করিয়া ধুইবে। তাহার পর মাথা মসেহ্ করিবে। মাথা মসেহ্ করার নিয়ম হইতেছে, ভিজা হাত দুইখানি মাথার উপর লাগাইয়া ঘুরাইয়া নিবে। আর শেষ কাজ এই যে, পা' দুইখানি গিরা পর্যন্ত তিনবার ভাল করিয়া ধুইবে।

সকল মুসলিমই এই সম্পর্কে একমত যে, অযূতে নির্দিষ্ট প্রত্যেকটি অঙ্গ একবার করিয়া ধৌত করা ওয়াজিব। আর তিনবার করিয়া ধোয়া সুন্নাত। ইহাই অযূর পূর্ণাঙ্গ রূপ।

মাথা মসেহ্ করা সম্পর্কে সামান্য মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে তিনবার মসেহ্ করা মুস্তাহাব। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, আহমদ ও অন্যান্য ইমামগণের মতে একবার মসেহ্ করা সুন্নাত এবং ইহার অধিক করা উচিত নয়। —নববী, শরহে মুসলিম, পৃঃ ১২০

গোসল

ওয়াজিব গোসল

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْاَرْبَعِ ثُمَّ اَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ۔ (مسلم ۔ ترمذی ۔ مسند احمد)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ স্বামী-স্ত্রী যখন চার শাখা মিলাইয়া বসে ও এক (পুরুষের) লিঙ্গ অপর (স্ত্রীর) লিঙ্গের সহিত মিলিত হয়, তখনই গোসল ওয়াজিব হইয়া যায়।

—মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা যৌন-সঙ্গমে উভয়ের গোসল ওয়াজিব হইয়া যায়। ইহা যেমন কুরআন মজীদের স্পষ্ট ঘোষণা হইতে প্রমাণিত, হাদীস হইতেও ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে, যৌন সঙ্গম সম্পূর্ণতা লাভের পর গোসল ওয়াজিব হইবে, না শুরু হওয়া মাত্র ওয়াজিব হইয়া পড়িবে? আলোচ্য হাদীস এবং এই পর্যায়ের অপরাপর বহু সংখ্যক হাদীস হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুই লিঙ্গ মিলিত হইলেই গোসল ওয়াজিব হইবে। হযরত আলী ও মু'আয ইবনে জাবাল (রা) উভয়ই বলিয়াছেনঃ

اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ۔ (مسند احمد)

দুই লিঙ্গ যখনি পরস্পরের সহিত মিলিত হইবে, তখনি গোসল ওয়াজিব হইবে।

অর্থাৎ যৌন-সঙ্গম সম্পূর্ণতা লাভ না করিলেও লিঙ্গদ্বয় শুধুমাত্র পরস্পরের সাথে মিলিত হইলেই গোসল ওয়াজিব হইবে। তবে একটি অঙ্গ অপর অঙ্গের উপর শুধু রাখা হইলেই গোসল ওয়াজিব হইবে না। গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য আরো কিছু অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। মাহমুদ ইবনে লুবাইদ আনসারী যায়দ ইবনে সাবিত (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ এক ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীর সহিত যৌন কার্য করে; কিন্তু উহার পরিণতি পর্যন্ত না পৌঁছায় অর্থাৎ শুক্র নির্গত না হয়, তাহা হইলে সে কি গোসল করিবে? উত্তরে যায়দ বলিয়াছেনঃ হ্যাঁ, সে অবশ্যই গোসল করিবে—তাহাকে গোসল করিতে হইবে। মাহমুদ বলিলেনঃ কিন্তু হযরত উবাই ইবনে কা'য়ার ভিন্নমত পোষণ করিতেন। এইরূপ অবস্থায় গোসল করাকে তিনি ওয়াজিব মনে করিতেন না। তখন হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলিলেনঃ উবাই ইবনে কা'য়াব শুরুতে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেনঃ কিন্তু পরে মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই মত প্রত্যাহার করেন। আর কেবল তিনিই নহেন, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এই মতের বাতিল হইয়া যাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ এক মত। খোদ নবী করীম (স) হইতেও ইহাই বর্ণিত।

ওয়াজিব গোসলের নিয়ম

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَاُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهٖ عَلٰى شِمَالِهٖ فَيَغْسِلُ فَرْجَهٗ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهٗ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَاْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهٗ فِىْ اُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنْ قَدِ اسْتَبْرَاَ حَفَنَ عَلٰى رَاْسِهٖ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهٖ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ۔ (بخاری ۔ مسلم)

হযরত আয়েশা (রা) হইবে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) যখন জানাবাতের (ওয়াজিব) গোসল করিতেন, তখন শুরু করিয়াই তিনি প্রথমে স্বীয় দুইখানি হাত ধৌত করিতেন। পরে ডান হাতে বাম দিকে পানি ফেলিয়া স্বীয় লজ্জাস্থানসমূহ ধুইতেন। ইহার পর অযূ করিতেন ঠিক সেই রকমের অযূ, যেমন নামায পড়ার জন্য করা হয়। পরে পানি লইয়া মাথার চুলের গোড়ায় পৌছাইতেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি মনে করিতেন যে, তিনি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভালোভাবে পানি পৌছাইয়াছেন, তখন দুই হাতে ভরিয়া-ভরিয়া মাথার উপর পানি ফেলিতেন। পরে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করিতেন। সর্বশেষে দুই পা ধুইতেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত এই হাদীস হইতে রাসূলে করীম (স)-এর ওয়াজিব গোসলের বিস্তারিত নিয়মাদি জানা যাইতেছে। মূলত ইহা আল্লাহ্‌র নির্দেশঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۔ (المائدة: ٦)

তোমরা যদি অপবিত্র অবস্থায় থাক, তাহা হইতে তোমরা পূর্ণমাত্রায় পবিত্রতা অর্জন কর।

এরই পূর্ণ অনুসরণ ও প্রতিপালন নবী করীম (স) নিজে পুরাপুরিভাবে পালন করিতেন। তাঁহার ওয়াজিব গোসলের এই পদ্ধতি সমগ্র মুসলমানের জন্যই অনুসরণীয়। বস্তুত অপবিত্র দেহ পবিত্রকরণের ইহাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি আর কিছুই হইতে পারে না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنْ خَالَتِهٖ مَيْمُوْنَةَ رض قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاَكْفَاَ الْاِنَاءَ بِشِمَالِهٖ عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ فَاَفَاضَ عَلٰى فَرْجِهٖ ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ اَوِ الْاَرْضَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهٗ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى رَأْسِهٖ ثَلَاثًا ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهٖ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ۔ (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) তাঁহার খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা (রা) হইতে বর্ণিত করিয়াছেন, তিনি (মায়মূনা) বলিয়াছেনঃ আমি নবী করীম (স)-এর জন্য গোসলের পানি রাখিয়া দিয়াছিলাম। তিনি উহা দ্বারা স্ত্রী সহবাস জনিত অপবিত্রতা হইতে পাক হওয়ার জন্য গোসল করিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার বাম হাত দ্বারা পানির পাত্রটি তাঁহার ডান হাতের উপর কাত করিলেন এবং তাঁহার হস্তদ্বয় ধুইয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার হাতখানি পাত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের উপর পানি ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি তাহার হাত প্রাচীরগাত্রের কিংবা (বলিয়াছেন) মাটির উপর ঘষিলেন। ইহার পর তিনি কুল্লি করিলেন, নাকের ভিতর দিকে পানি দিয়া ধুইলেন এবং তাঁহার মুখমন্ডল ও দুইটি বাহু ধুইলেন। অতঃপর তাঁহার মাথার উপর তিনবার এবং তাহারও পর তাঁহার সমস্ত দেহের উপর পানি ছাড়িয়া দিলেন। পরে একপাশে সরিয়া গিয়া তাঁহার পা দুইখানি ধুইলেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা হাদীসটির প্রতিপাদ্য হইল, স্বামী-স্ত্রীর যৌন সঙ্গম করিবার পর সমস্ত শরীর নাপাক হইয়া যায় বলিয়া নিয়ম মত গোসল করিয়া লইতে হয়। কেননা নাপাক শরীরে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা চলে না—সম্পূর্ণ হারাম। ইসলামের প্রধান ইবাদত—নামায পড়ার জন্য সর্বপ্রথম গোসল করিয়া নাপাক শরীর পাক করিয়া লওয়া ফরয। এ কারণে উহার পর গোসল করিতে হইবে বিধায় হযরত মায়মূনা (রা) নবী করীম (স)-এর জন্য পূর্বাহ্নেই পানির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেননা আরব মরুভূমিতে তখনকার সময় পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল। পূর্বাহ্নেই উহার ব্যবস্থা করিয়া না রাখিলে পরে প্রয়োজনের সময় বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া স্বভাবিক ছিলঃ

হাদীসের প্রথম বাক্য হইলঃ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلعم غُسْلًا 'আমি নবী করীম (স)-এর জন্য 'গুস্‌ল' (মানে 'গোসলের পানি') রাখিয়াছিলাম'। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত এই হাদীসটিতে এখানকার শব্দ হইল مَاءً لِلْغُسْلِ 'গোসলের জন্য পানি'। যৌন সঙ্গমের পর শরীর নাপাক হওয়ার দরুন নবী করীম (স) এই পানি দিয়া গোসল করিয়াছিলেন। অতঃপর হাদীসে এই গোসল করার ব্যাপারে নবী করীম (স) কি পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন তাহা সবিস্তারে বর্ণিত ও বিবৃত হইয়াছে। হযরত মায়মূনা (রা) নিজ চক্ষে দেখা সেই পদ্ধতির বর্ণনা দিয়াছেন। বলিয়াছেন, নবী করীম (স) প্রথমে পাত্রটি কাত করিয়া নিজে দুইখানি হাত ধুইয়া লইলেন। হাত ধোয়া পানি পাত্রের বাহিরে পড়িল। তাহার পর ছোট পাত্রের অভাবে হাত দ্বারাই পানি তুলিয়া স্বীয় শরীরের ময়লা পরিষ্কার করিলেন। হাতে কোনরূপ ময়লা লাগিয়া থাকিতে পারে বলিয়া তিনি উহা দেওয়াল কিংবা মাটিতে ঘষিয়া সাফ করিলেন। তাহার পর প্রথমে মাথা ও পরে সমস্ত শরীরের উপর তিনবার পানি প্রবাহিত করিয়া দিয়া গোসল সমাপ্ত করিলেন এবং শেষে একপাশে সরিয়া গিয়া তাঁহার পা দুইখানি ধুইলেন।

বস্তুত ইহাই হইল জানাবাত—যৌন সঙ্গমজনিত নাপাকি—হইতে শরীর পাক করার উদ্দেশ্যে করা গোসলের নিয়ম। এ নিয়ম স্বয়ং নবী করীম (স) পালন করিয়াছেন ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য এই পদ্ধতিই রাখিয়া ও শিখাইয়া গিয়াছেন। এই ধরনের গোসলের প্রথম অযূর সময় পা ধুইতে হয় না, পা ধুইতে হয় সর্বশেষ এবং একপাশে সরিয়া গিয়া—যেন সকল প্রকার মলিনতা হইতে নিজেকে রক্ষা করা যায়। বিশেষত কাঁচা মাটির উপর গোসল করিলে এইরূপ করা অবশ্যই জরুরী। কিন্তু গোসলের স্থান পাকা-পোক্ত হইলে ও গোসলের পানি প্রবাহিত হইয়া সরিয়া গেলে সেখানে দাঁড়াইয়া পা ধোয়া যাইতে পারে। অন্যত্র সরিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

জুম'আর দিনে গোসল

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ ـ (بخارى، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ তোমাদের নিকট যখন জুম'আর দিন উপস্থিত হইবে, তখন তোমরা অবশ্যই গোসল করিবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসে জুম'আর দিন গোসল করিতে বলা হইয়াছে। জুম'আর দিনের এই গোসল ওয়াজিব নহে। যে কারণে গোসল করা ওয়াজিব হয়, তাহার কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। সেই গোসলের হুকুম মূলত আল্লাহ্‌ই দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীতও কোন কোন ক্ষেত্রে রাসূলে করীম (স) গোসলের নির্দেশ দিয়াছেন। এসবই নির্দেশ ফরয বা ওয়াজিবের নির্দেশ নহে। সেই নির্দেশ হইতে শুধু সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। জুম'আর দিনে গোসল করা সম্পর্কে রাসূলে করীমের এই নির্দেশ এই পর্যায়ে গণ্য। যদিও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে জুমআর দিনের গোসলকেও 'ওয়াজিব' বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রায় সব ইমাম ও শরীয়তবিদদের মতে পরিভাষায় যাহাকে ওয়াজিব বলা হয়, জুম'আর গোসল সেরূপ নয়। বরং শুধু তাকীদ করাই উহার লক্ষ্য। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত আর এক হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ـ (بخارى، مسلم)

নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী হইল এক সাপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে একদিন—জুম'আর দিন গোসল করা। এই গোসলে সে যেন তাহার মাথা ও শরীর খুব ভালো করিয়া ধৌত করে।

বস্তুত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য সাধারণভাবেও গোসল করা একান্তই বাঞ্ছনীয়। গোসল না করিলে দেহে ময়লা জমিয়া যায়, শরীর হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়। আর ইসলামের দৃষ্টিতে তাহা খুবই ঘৃণ্য। এই কারণে সপ্তাহে অন্তত একবার খুব ভালোভাবে গোসল করা আবশ্যক। নবী করীম (স) অপর এক হাদীসে বলিয়াছেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهٖ وَطِيْبِهٖ ـ (ابوداؤد)

হে লোকেরা, এই জুম'আর দিনটিতে তোমরা অবশ্যই গোসল করিবে এবং ভালো সুগন্ধি ও তেল—যাহাই পাইবে, তাহা অবশ্যই ব্যবহার করিবে।

ঈদের দিনে গোসল

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض. قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحٰى (ابن ماجه)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) দুই ঈদের দিনে —রোযার ঈদ ও কুরবানীর ঈদে গোসল করিতেন। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঈদের দিনে বিশেষভাবে গোসল করা, যতখানি সম্ভব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা মুসলিম জাতির এক সামষ্টিক ও জাতীয় রীতি। এই রীতি নিঃসন্দেহে মুসলমানদের প্রাথমিক কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে এবং ইহা প্রথম চালু হইয়াছে নবী করীমের হিদায়ত অনুযায়ী কিংবা তাঁহার আমল অনুসরণ করার ফলে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই ইহা যে খুবই ভালো কাজ সেই বিষয়ে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না।

কিন্তু সনদের বিচারে এই সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহের সনদ খুবই দুর্বল বিধায় ইহার কোন একটি হাদীস লইয়া খুব জোর করা যাইতে পারে না। 'বদরুল মুনীর' গ্রন্থে বলা হইয়াছেঃ

اَحَادِيْثُ غُسْلِ الْعِيْدَيْنِ ضَعِيْفَةٌ وَفِيْهِ اٰثَارٌ عَنِ الصَّحَابَةِ جَيِّدَةٌ ـ

দুই ঈদের দিনে গোসল করা সম্পর্কিত হাদীস সমূহের সনদ হাদীস তত্ত্ববিদদের বিচারে খুবই দুর্বল। অবশ্য এই পর্যায়ে সাহাবাদের নিজস্ব কথা খুবই উত্তম।

কিন্তু তবুও এইসব হাদীস হইতে এইকথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, দুই ঈদের দিনে গোসল করা সুন্নাত। গোসল না করিলে সুন্নাত তরক হইয়া যাইবে।

তায়াম্মুম

عَنْ عَائِشَةَ رض أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رض بِعَائِشَةَ رض جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا ۔ (بخاری)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হযরত আসমার নিকট হইতে একখানি গলার হার ধার হিসাবে লইয়াছিলেন এবং পরে তাহা তিনি হারাইয়া ফেলেন। তখন রাসূলে করীম (স) এক ব্যক্তিকে (উহার সন্ধানে) পাঠাইয়া দিলেন। সেই ব্যক্তি (গিয়া) তাহা পাইল। তখন তাঁহাদের সম্মুখে নামাযের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহাদের নিকট (অযূ করার) পানি ছিল না। তখন তাঁহারা নামায পড়িলেন। পরে এই বিষয়ে তাঁহারা রাসূলের নিকট অভিযোগ করিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। অতঃপর হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিলেনঃ "আল্লাহ্ আপনাকে বিপুল কল্যাণ দান করুন। আল্লাহ্র শপথ, আপনার সঙ্গে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা আপনি অপছন্দ করেন, কিন্তু আল্লাহ্ উহাকে আপনার ও মুসলমানদের জন্য বিপুল কল্যাণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। —বুখারী

ব্যাখ্যা তায়াম্মুম সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষ এবং তৎসংক্রান্ত বিরাট ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। নবী করীম (স) বনুল মুসতা'লিক যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত আসমা (রা)ও গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পথে মদীনার নিকটবর্তী একস্থানে হযরত আয়েশার গলায় রক্ষিত হার হারাইয়া যায়। তিনি উহার সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পরে নবী করীম (স) হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা)-কে তাঁহার সন্ধানে পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহারা সন্ধানের পর হারানো অলংকার লাভ করেন। ইতিমধ্যে নামাযের সময় উপস্থিত হয়; কিন্তু নামাযের অযূ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পানি কোথাও পাওয়া গেল না। এখন তাঁহারা কি করিবেন; অযূ না করিয়া কিভাবে নামায পড়েন। মদীনায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা রাসূলের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। অতঃপর তায়াম্মুম করিবার অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়। আয়াতটি এইঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۔ (النساء-۴۳)

তোমরা যদি অসুস্থ-রোগাক্রান্ত হও; কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ পায়খানা-প্রস্রাব করিয়া আসে বা স্ত্রী সহবাস করিয়া থাক; কিন্তু অতঃপর পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটির উপরে লক্ষ্য নিবন্ধ কর। আর তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের দুই হাত মসেহ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা দোষ স্খলনকারী ও গুনাহ মাফকারী।

আলোচ্য হাদীস হইতে একথা স্পষ্টভাবে জানা যায় না যে, সাহাবিগণ পানি না পাইয়া কিভাবে নামায পড়িলেন, তায়াম্মুম করিয়া, কি অযূ তায়াম্মুম ব্যতিরেকেই নামায পড়িলেন। তবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে فصلوا শব্দের পরে بغير وضوء কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

অর্থাৎ তাঁহারা বিনা অযূতেই নামায পড়িলেন। কিন্তু তাহাভী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছেঃ

وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلٰى مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ تَيَمَّمَ اِلَى الْكَفِّ وَمِنْهُمْ مَنْ تَيَمَّمَ اِلَى الْمَنْكِبِ وَبَعْضُهُمْ تَيَمَّمَ عَلٰى جِلْدَةٍ -

তাঁহারা যখন পানি পাইলেন না,তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ পাঞ্জা পর্যন্ত মাটি মুছিলেন, কেহ কাঁধ পর্যন্ত মাটি দ্বারা মসেহ করিলেন, আবার কেহ সমস্ত শরীরে মাটি মুছিয়া দিলেন।

অর্থাৎ পানি না পাওয়ার কারণে যখন তাঁহারা অযূ করিতে পারিলেন না তখন তাঁহারা নামাযের জন্য জরুরী পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মাটির দিকে লক্ষ্য করিলেন এবং বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে মাটির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই কাজ যেহেতু অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল ও আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অনুমতি না পাইয়া ও নিয়ম না জানিয়া নিজস্বভাবেই মাটি মাখিয়া নিয়াছিলেন, এইজন্য মনে করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা তায়াম্মুম করেন নাই। 'তাবরানী' বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছেঃ

فَصَلُّوا بِغَيْرِ طُهُوْرٍ - তাঁহারা কোন প্রকার পবিত্রতা অর্জন না করিয়াই নামাজ পড়িলেন।

তবে যদি তাঁহারা শরীরে মাটি মাখিয়াও থাকেন, তবুও তাহার দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। কেননা এই কাজ তাঁহারা করিয়াছিলেন নিজস্ব চিন্তা ও ইজতিহাদের সাহায্যে। উহার পশ্চাতে তখনো শরীয়তের কোন দলীল বর্তমান ছিল না। কিন্তু রাসূলের জীবদ্দশায় এই ধরনের ব্যাপারে এইরূপ ইজতিহাদ করা জায়েয হইয়াছে কিনা তাহা অবশ্য এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। কাহারো মতে মোটামুটিভাবে জায়েয আর ইহাই অধিকাংশের মত। কাহারো মতে ইহা ঠিক কাজ হয় নাই, আবার কাহারো মতে রাসূলের নিকট হইতে দূরবর্তীদের জন্য ইহা সঙ্গত, নিকটবর্তীদের জন্য নহে।

এই হাদীস হইতে মোটামুটি জানা যায় যে, কোন মুসলমান যদি এমন কোন অবস্থায় পড়ে, তখন নামাযের পবিত্রতা অর্জনের জন্য যদি জরুরী পরিমাণ পানি পাওয়া না যায়, তবে তখন সে কুরআনের অনুমতিক্রমে 'তায়াম্মুম' করিবে কিন্তু যদি পানির মত তায়াম্মুম করিবার জন্য মাটিও পাওয়া না যায়, তখন কি করা হইবে? এই সম্পর্কে চারিটি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম এই যে, এইরূপ অবস্থায় কোন প্রকার পবিত্রতা অর্জন ব্যতীতই নামায পড়িবে, কিন্তু পরে অযূ বা তায়াম্মুমের সুযোগ পাইলেই উক্ত নামায পুনরায় আদায় করিবে। দ্বিতীয় মত এই যে, এইরূপ অবস্থায় নামায পড়াই ফরয নয়, বরং মুস্তাহাব মাত্র অর্থাৎ পড়া ভাল, না পড়িলে গুনাহ্ নাই। তবে পরে অবশ্যই উহা কাযা করিতে হইবে। তৃতীয় এই যে, এইরূপ অবস্থায় নামায পড়া হারাম। কেননা সে জরুরী পবিত্র হইতে বঞ্চিত। উহা কাযা করিতে হইবে। ইমাম আবূ হানীফার অভিমত ইহাই। আর চতুর্থ মত এই যে, এইরূপ অবস্থায়ও নামায আদায় করা ওয়াজিব এবং পুনরায় তাহা পড়া ওয়াজিব নহে। আলোচ্য হাদীস এই মতের দলীল। কেননা, নবী করীম (স) এই ঘটনার সহিত জড়িত সাহাবিগণকে পুনরায় নামায পড়িতে বলিয়াছেন বলিয়া কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। ইমাম মালিকের মতে এইরূপ অবস্থা নামায পড়িবে না, আর পরেও উহা পড়িতে হইবে না। বরং এইরূপ অবস্থাকে 'হায়য্' অবস্থা মনে করিতে হইবে।

মোট কথা, ইহাই হইতেছে তায়াম্মুমের গোড়ার কথা। (عمدة القارى - ج ٤ ص ١٢)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رض قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ قَالَ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَلَا مَاءٌ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ -

(بخارى، مسلم)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেনঃ আমরা এক সফরে রাসূলে করীম (স)–এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি লোকদের লইয়া নামায পড়িলেন। এই সময় দেখা গেল, এক ব্যক্তি আলাদা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নবী করীম (স) সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে নামায পড়িতে নিষেধ করিল? সেই ব্যক্তি বলিলঃ আমার শরীর নাপাক হইয়াছে, আর পানি নাই বলিয়া শরীর পাক করিতে পারি নাই। ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ পানি না থাকিলেও কোন অসুবিধা ছিল না, তোমার কর্তব্য ছিল পবিত্র মাটি স্পর্শ করা। ইহাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা শরীর নাপাক হইলে গোসল করিয়া পাক করিতে হয় আর পানি না পাওয়া গেলে শরীর পাক করিবার আর কোন উপায় নাই, হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তির ইহাই ছিল ধারণা। এই কারণে সামনে জামা'আতের সহিত নামায হইতে দেখিয়াও তিনি উহাতে শরীক হন নাই। কেননা তাঁহার শরীর নাপাক, আর নাপাক শরীর লইয়া নামায পড়া যায় না, ইহা তো জানা কথা। তখন নবী করীম (স) লোকটিকে বলিলেনঃ তোমার কর্তব্য ছিল পবিত্র মাটি স্পর্শ করা অর্থাৎ তায়াম্মুম করা এবং ইহাই তোমার জন্য যথেষ্ট। পানি না পাওয়া গেলে শুধু তায়াম্মুম দ্বারাও যে শরীরকে পাক করা যায় এবং এই শরীর লইয়া নামাযও পড়া যায়, উক্ত ব্যক্তি এইবারই সর্বপ্রথম জানিতে পারিলেন। সেই সঙ্গে এই হাদীসের সাহায্যে দুনিয়ার সর্বসাধারণ মুসলমানরাও এই তত্ত্ব জানিতে পারিলেন। ইহা সর্বসম্মত মত। তবে পরে পানি পাওয়া গেলে গোসল করিতে হইবে কিন্তু নামায পুনরায় পড়িতে হইবে না।

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ - (مسند احمد، ترمذى، ابوداؤد)

হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন,নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম—দশ বৎসর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখন যেন সেই পানি দ্বারা স্বীয় শরীর ধুইয়া লয়—ইহাই উত্তম। —মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে জানা গেল যে, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়াও যদি কেহ পানি না পায় এবং তদ্দরুন এতদিন পর্যন্ত অযূ কিংবা গোসল করিতে না পারে তাহা হইলে তায়াম্মুম করিয়াই সে অযূ ও গোসলের কাজ সারিবে। উভয় অবস্থায় তায়াম্মুমই পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট হইবে। হাদীসে এই কথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, উত্তরকালে কোন এক সময় পানি পাইলে তখন অযূ ও গোসল করা তাহার কর্তব্য।

عَنْ عَمَّارٍ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فِىْ سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ هٰذَا فَضَرَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - (بخارى، مسلم)

হযরত আম্মার (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেনঃ এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট আসিয়া বলিলঃ আমি অপবিত্র হইয়াছি—গোসল করা প্রয়োজন, কিন্তু পানি পাইতেছি না বলিয়া গোসল করিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় আমার কি করা প্রয়োজন? (আম্মার বলেন) লোকটির এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি হযরত উমর (রা)–কে সম্বোধন করিয়া বলিলামঃ আপনার হয়ত

স্মরণ আছে, অতীতে কোন এক সময় আমরা এক সফরে ছিলাম, তখন আমাদের গোসলের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু পানি না পাওয়ার কারণে আপনি নামায পড়িলেন না। আর আমি পানি না পাইয়া বালু দ্বারাই সমস্ত শরীর মাখিয়া বালু গোসল করিলাম। পরে নবী করীম (স)-কে এই কথা বলায় তিনি ইরশাদ করিলেনঃ তোমার শুধু এইরূপ করাই যথেষ্ট ছিল—এই বলিয়া তিনি তাঁহার দুইখানি হাত মাটির উপর ফেলিলেন এবং উহাতে ফুৎকার দিয়া মাটি-কণা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। অতঃপর সেই হাত দ্বারা স্বীয় মুখমন্ডল ও বাহু দুইখানি মলিয়া দিলেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা পানি না পাওয়া গেলে শরীর পাক করণ এবং অযূর জন্য শুধু তায়াম্মুম করাই পবিত্রতার্জনের জন্য যথেষ্ট। আর সে তায়াম্মুমের জন্যও সমস্ত শরীরে মাটি মাখার প্রয়োজন করে না। দুইখানি হাত মাটিতে লাগাইয়া উহা হইতে মাটি-কণা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুখমন্ডল এবং কনুই সহ হাত দুইখানি মলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। তবে শর্ত এই যে, মাটিকে অবশ্যই পাক ও পবিত্র হইতে হইবে।

তায়াম্মুম করিয়া একবার নামায পড়িয়া লওয়ার পর পানি পাওয়া গেলে পুনরায় সেই নামায পড়িতে হইবে কিনা, ইহা একটা প্রশ্ন এবং এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগিতে পারে। ইহার জওয়াব পাওয়া যায় আবূ দাউদ ও সুনানে দারেমী বর্ণিত একটি হাদীসে। তাহাতে বলা হইয়াছে, দুইজন লোক সফরে পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িয়াছিলেন। পরে পানি পাইয়া একজন সেই নামায আবার পড়িলেন, অপরজন পড়িলেন না। নবী করমী (স) এই কাহিনী শুনিয়া যে লোক পুনরায় নামায পড়েন নাই, তাঁহাকে বলিলেনঃ

اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَأَتْكَ صَلٰوتُكَ -

তুমি ঠিক সুন্নাত মুতাবিকই কাজ করিয়াছ। তোমার প্রথম নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট।

আর যে ব্যক্তি নামায পুনরায় পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিলেনঃ

لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ - দুইবার নামায পড়ার সওয়াব তুমি অবশ্যই পাইবে।

শরীরে যদি এমন কোন আঘাত বা রোগ থাকে যাহার দরুন পানি ব্যবহার করা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হইতে পারে, তাহার যে তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট, তাহা যেমন কুরআনের আয়াত হইতে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে জানা যায় তেমন আবূ দাউদ ও দারে কুতনী বর্ণিত একটি হাদীস হইতেও জানিতে পারা যায়। নবী করীমের জীবদ্দশায় একজন লোকের শরীরে আঘাত ছিল। তাহার শরীর নাপাক হওয়ার কারণে নিরুপায় মনে করিয়া গোসল করে। ইহার পর তাহার মৃত্যু ঘটে। নবী করীম (স) এই কথা শুনিয়া বলিলেনঃ

قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اِلَّا سَاَلُوْا اِذَا لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَّتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ اَوْ يَنْصِبَ عَلٰى جَرْحِهٖ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهٖ -

লোকগুলি ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে, আল্লাহ্ও উহাদের হত্যা করুন। তাহারা যখন করণীয় জানিত না, তখন তাহারা সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল না কেন? জিজ্ঞাসাই হইল সব বিভ্রান্তির প্রতিবিধান। এই ব্যক্তির গোসল করার পরিবর্তে কেবল তায়াম্মুম করা ও জখমের উপর পানি ছিটাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। অথবা জখমের উপর পট্টি লাগাইয়া উহার উপর ভিজা হাত মলিয়া দেওয়া এবং দেহের অন্যান্য সব অংশ ধুইয়া ফেলাই যথেষ্ট ছিল।

আযান

عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ رض اَنَّ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هٰذَا الْاَذَانَ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ
لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ
ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ مَرَّتَيْنِ
حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ زَادَ اِسْحٰقُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ
(مسلم)

হযরত আবূ মাখ্দুরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) তাঁহাকে আযান দেওয়ার এই পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেনঃ আল্লাহ্ আকবার (আল্লাহ্ বড়) দুইবার, আশ্‌হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ মা'বুদ নাই) দুইবার, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্র রাসূল) দুইবার বলিতে হইবে। অতঃপর এই সাক্ষ্যদ্বয় পুনরায় দুইবার করিয়া উচ্চারণ করিবে। তাহার পর হাই-'আলাস্‌সালাহ্ (নামাযের জন্য আস) দুইবার ও হাই-আলাল ফালাহ্ (কল্যাণের দিকে-কল্যাণময় কাজের জন্য আস) দুইবার বলিবে। ইসহাক বাড়াইয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ আকবার দুইবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার বলিবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসে আযানের বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'আযান' শব্দের অর্থ الاعلام 'জানাইয়া দেওয়া' 'শোনাইয়া দেওয়া'। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে এই শব্দের উল্লেখ করিয়াছেনঃ

اَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ۔ (البرأة - ٣)

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে শোনাইয়া দেওয়া—জানাইয়াদেওয়া। বলিয়াছেনঃ

فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ۔ মুয়ায্যিন আযান দিয়াছে।' (الاعراف:٤٤)

ইহা 'আযান' শব্দের কুরআনী ব্যবহার। নামাযের সময় হইলে লোকদিগকে নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ও জামা'আতে হাযির হওয়ার জন্য আহবান জানানোকেই পরিভাষায় 'আযান' বলা হয়। আযান নামাযের উদ্দেশ্যে ডাকার জন্য ইসলামের স্থায়ী নিয়ম।

একটি হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে, নবী করীম (স) হযরত বিলাল (রা) কে বলিলেনঃ

يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلٰوةِ ۔ হে বিলাল, উঠ এবং নামাযের জন্য ঘোষণা দাও। (مسلم)

রাসূলের এই আদেশ হইতে প্রমাণিত হয় যে, আযান দাড়াইয়া দেওয়া ওয়াজিব, বসিয়া দেওয়া জায়েয নহে। এই সম্পর্কে সকল ইমামই একমত। অবশ্য ইমাম শাফেয়ীর মতে ইহা সুন্নত।

এই হাদীসে শাহাদতের বাক্যদ্বয় দুইবার করিয়া বলিবার পর উহা আবার দুইবার করিয়া বলিবার যে ব্যবস্থার উল্লেখ হইয়াছে, পরিভাষায় উহাকে তারজী (ترجيع) বলা হয়। ইহার অর্থঃ যে কথা একবার নিম্নস্বরে বলা হইয়াছে তাহা আবার সমধিক উচ্চস্বরে বলা। এইরূপ 'তারজী' সহকারে আযান দেওয়ার রীতি মক্কা শরীফে রহিয়াছে। কোন সাহাবী ইহার যথার্থতা অস্বীকার করেন নাই। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ এই হাদীসকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমামগণ তারজী করার রীতি সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের দলীল হইতেছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দের বর্ণিত হাদীস। কেননা তাহাতে এই তারজী'র উল্লেখ নাই। ইমাম তাহাভী হযরত আবূ মাখদূরা বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসে

তারজী'র উল্লেখ হওয়ার কারণ দর্শাইয়া বলিয়াছেনঃ আবূ মাখ্‌দূরা শাহাদতের বাক্যদ্বয় প্রথমে রাসূলের ইচ্ছা মুতাবিক উচ্চস্বরে বলেন নাই। ফলে নবী করীম (স) তাঁহাকে উহা অধিক উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিতে বলেন। তিনি তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফলে শাহাদতের বাক্যদ্বয় দুইবার নিম্নস্বরে বলিবার পর আবার উচ্চস্বরে বলাই আযানের স্থায়ী নিয়ম হইয়া যায় নাই। ইমাম শাফেয়ী এই হাদীসের ভিত্তিতে উহাকে সুন্নত বলিয়াছেন। আর মুহাদ্দিসদের এক বিরাট জামা'আতের মতে ইহা করিলেও দোষ নাই, আর না করিলেও গুনাহ নাই। —নববী শরহে মুসলিম

আযানের ইতিহাস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ رض قَالَ لَمَّا اَجْمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يَّضْرِبَ بِالنَّاقُوْسِ وَهُوَ لَهٗ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ النَّصَارٰى طَافَ بِيْ مِنَ اللَّيْلِ طَائِفٌ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ وَفِيْ يَدِهٖ نَاقُوْسٌ يَحْمِلُهٗ قَالَ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ قَالَ قُلْتُ نَدْعُوْ بِهٖ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى خَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - قَالَ اِسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيْدٍ قَالَ ثُمَّ تَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاَخْبَرْتُهٗ بِمَا رَاَيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِنَّ هٰذِهٖ الرُّؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَمَرَ بِالتَّاْذِيْنِ فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلٰى اَبِيْ بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذٰلِكَ وَيَدْعُوْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ فَجَاءَهٗ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ اِلَى الْفَجْرِ فَقِيْلَ لَهٗ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَائِمٌ فَصَرَخَ بِلَالٌ بِاَعْلٰى صَوْتِهٖ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَاُدْخِلَتْ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ فِى التَّاْذِيْنِ اِلٰى صَلٰوةِ الْفَجْرِ - (مسند احمد)

আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আবদে রাব্বিহি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) যখন নামাযের জন্য লোকদিগকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে শিংগা ফুঁকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন—যদিও তিনি খৃষ্টানদের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে উহাকে অপছন্দ করিতেন—রাত্রিবেলা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে আমি এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম, তাহার পরিধানে

দুইখানি সবুজ বর্ণের কাপড় এবং তাহার হাতের একটি শিংগা রহিয়াছে, যাহা সে বহন করিতেছে। আমি তাহাকে বলিলামঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা। তুমি কি শিংগা বিক্রয় করিবে? লোকটি বলিলঃ তুমি ইহা দ্বারা কি করিবে? আমি বলিলাম, আমরা উহার সাহায্যে লোকদিগকে নামায পড়ার জন্য আহবান জানাইব। লোকটি বলিল, ইহাপেক্ষাও উত্তম ব্যবস্থা কি আমি তোমাকে বলিয়া দিব? বলিলাম, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বলিল, নামাযের উদ্দেশ্যে আহবান করার জন্য তুমি বলিবেঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাই-আলাস সালাহ, হাই-আলাস সালাহ্, হাই-আলাল-ফালাহ্, হাই-আলাল-ফালাহ্, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্—এই পর্যন্ত বলার পর কিছুটা বিলম্ব করিয়া পরে বলিলঃ তুমি যখন নামায কায়েম করিতে যাইবে তখন বলিবেঃ আল্লাহু আকবর, আল্লাহ আকবার, আশহাদু আন্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, হাই-আলাসসালাহ, হাই-আলাল ফালাহ, কাদ-কামাতিসসালাহ্, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

রাত্রি ভোর হইলে আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেনঃ ইহা আল্লাহ্ চাহিলে নিশ্চয়ই একটি অতীব সত্য স্বপ্ন। পরে তিনি আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু বকরের মুক্ত দাস হযরত বিলাল এই সব কথা সহকারে আযান দিতে লাগিলেন এবং ইহার সাহায্যে তিনি রাসূলে করীম (স)-কে নামাযের জন্য আহবান জানাইতেন। পরে একদিন হযরত বিলাল (রা) ফযরের আযান দিতে আসিলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল যে, রাসূলে করীম (স) নিদ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু বিলাল (রা) তাঁহার উচ্চ কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করিলেনঃ আসসালাতু খায়রুম মিনান-নাওম, 'নিদ্রা হইতে নামায উত্তম'। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলিয়াছেনঃ পরে ফজরের নামাযের আযানে এই বাক্যটি শামিল করিয়া দেওয়া হয়। —মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে আযান ও ইকামতের ইতিহাস জানা গেল। ইহাতে এক দিকে যেমন আযান ও ইকামতের উৎপত্তির ইতিহাস বলা হইয়াছে, তেমনি আযান ইকামতে কথ্য বাক্যসমূহও স্পষ্ট ও নিঃসন্দেহভাবে আমাদের নিকট প্রমাণিত হইল।

হাদীসটির বর্ণনাভংগী হইতে মনে হয় যে, কোন সাহাবী আযান ও ইকামতের বাক্যসমূহ স্বপ্ন যোগে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং নবী করীম (স) উহাকে চালু করিয়া দিলেন। অন্য কথায় আযান হইল তদানীন্তন সমাজের সাহাবীদের স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত জিনিস, ওহীযোগে প্রাপ্ত নয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। বরং আসল ব্যাপার হইল, আযান ও উহার বাক্যসমূহ নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ওহীর মাধ্যমে জানিতে পারিয়াছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

إِنَّ فَرْضَ الْأَذَانِ نَزَلَ مَعَ الصَّلٰوةِ ـ

আযান দেওয়ার রীতি নামায ফরয হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কুরআন মজীদের আয়াত হইতে এই কথার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সূরা আল-মায়দার ৫৮ নং আয়াতে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ـ

তোমরা (মুসলমান) যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দাও, তখন কাফিরেরা উহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও খেল-তামাসার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। আর ইহার কারণ এই যে, উহারা বিবেক বুদ্ধিহীন লোক।

'নামাযের জন্য ঘোষণা দাও' অর্থাৎ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلٰوةِ মুয়াযযিন যখন নামাযের জন্য আযান দেয়।

সূরা আল-জুমুয়ার ৯ নং আয়াত বলা হইয়াছেঃ

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ -

জুম'আর দিন যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়—

এই দুইটি আয়াত মদীনার অবতীর্ণ এবং আযান দেওয়ার রেওয়াজ যে মদীনা শরীফেই চালু হইয়াছে তাহা হাদীস হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কাজেই 'আযান' নিছক স্বপ্নযোগে প্রান্ত ব্যাপার নয়। ইহা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ওহীযোগেও অবতীর্ণ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আযান দেওয়ার বর্তমান রেওয়াজ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আযান হইতে গৃহীত। হযরত ইবরাহীমের আযান সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ - (الحج : ٢٧)

এবং লোকদের মধ্যে হজ্জ সম্পর্কে 'আযান' দাও। তাহারা তোমার নিকট পায়ে হাঁটিয়া ও দুর্বল উটের পিঠে সওয়ার হইয়া (দূর দূর অঞ্চল হইতে) আসিবে।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের 'আযান' ঘোষণা দিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। হযরত রাসূলে করীম (স) এই নির্দেশের ভিত্তিতে নামাযের জন্য 'আযান' দেওয়ার রীতি চালু করিলেন। সেই সঙ্গে এই মতও অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'আযান' লইয়া হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলে করীম ((স)-এর নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (عمدة القارى شرح البخارى)

এই প্রেক্ষিতে স্বপ্নযোগে আযান প্রাপ্তি সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সামনে রাখিয়া একথা বলা অযৌক্তিক নয় যে, ওহী অনুযায়ী আযানের বর্তমান বাস্তব রেওয়াজ চালু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এক সঙ্গে বহু সংখ্যক সাহাবী স্বপ্নযোগে আযানের শব্দ ও বাক্যসমূহের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র ওহী ও সাহাবীদের স্বপ্ন একই সময় বাস্তবায়িত হইয়াছিল কিংবা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসা প্রথম এবং স্বপ্নে জানা পরে কিংবা ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহ্-ই কোন কোন সাহাবীকে এই আযান স্বপ্নযোগে জানাইয়া দিয়াছেন এবং রাসূলে করীম (স)-কেও উহা মঞ্জুর করা ও তদনুযায়ী আযান দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। বস্তুত নামায যে ধরনের কাজ সেজন্য লোকদিগকে আহবান জানাইবার জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা শোভনীয় হইতে পারে। উপরন্তু উহাতে যে বাক্য গুলি ঘোষিত হয় তাহা যেমন ইসলামের মর্মবাণী, তেমনি নামাযের সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। অন্য কিছু হইলে তাহা কিছুতেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে না তাহা নিঃসন্দেহ।

ইমাম আবূ দাউদও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে বর্ণনা সূত্রের নিম্নের দিকে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি মূল কথায়ও কিছুটা পার্থক্য এবং কিছু অতিরিক্ত কথা আছে। আবূ দাউদ বর্ণিত হাদীসের শেষের দিকে রহিয়াছেঃ

فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَاَيْتُ فَقَالَ لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَاَيْتَ فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ قَالَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهٖ قَالَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض وَهُوَ فِىْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ اَرٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - (معالم السنن)

সকাল হইলে আমি রাসূলে করীমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আমার স্বপ্নের বিবরণ শোনাইলাম। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ আল্লাহ্ চাহিলে ইহা নিশ্চয়ই বড় সত্য স্বপ্ন। অতএব

তুমি বিলালকে লইয়া দাঁড়াইয়া যাও এবং তোমার স্বপ্নে জানা বাক্যসমূহ তাহাকে শোনাও। কেননা তোমার অপেক্ষা তাহার কণ্ঠস্বর অনেক উচ্চ। স্বপ্নদ্রষ্টা সাহাবী বলেনঃ অতঃপর আমি বিলালের সঙ্গে দাঁড়াইয়া গেলাম এবং তাহাকে আযানের বাক্যসমূহ বলিয়া দিতে লাগিলাম। তিনি উহার দ্বারা আযান দিতে লাগিলেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব ঘরে বসিয়া আযানের ধ্বনি ও বাক্যসমূহ শুনিতে পান। তিনি তখনই গায়ের চাদর টানিতে টানিতে দ্রুততা সহকারে বাহির হইলেন এবং রাসূলে করীম (স)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্যতা সহকারে পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ। ঠিক এইরূপ বাক্যই আমি স্বপ্নে জানিতে পারিয়াছি। নবী করীম (স) ইহা শুনিয়া বলিলেনঃ (তাহা হইলে ত খুবই ভালো)। সব প্রশংসাই আল্লাহ্র জন্য।

আযানের উপর উদ্ধৃত বাক্যসমূহে লক্ষ্য করা যায়, উহাতে 'আল্লাহু আকবার' বাক্যটি বারবার বলার কথা বলা হইয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ ইহাই সব ইসলামবিদের অভিমত। কোন সাহাবীই এই মতের বিপরীত কথা বলেন নাই। উপরিউক্ত হাদীসটিই এই মতের বড় দলীল। আযানের বাক্য সমূহ হযরত বিলাল (রা)-কে শিখাইতে ও তাঁহাকে আযান দিতে বলার কারণস্বরূপ নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ 'তাহার কণ্ঠস্বর অন্যদের তুলনায় উচ্চ'। ইহা হইতে বুঝা গেল, উচ্চ কণ্ঠস্বর ব্যক্তিরই আযান দেওয়া উচিত। যেন বহু দূরের লোকেরাও আযান ধ্বনি শুনিতে পায়।

উপরিউক্ত বাক্যসমূহ মাত্র চার ওয়াক্তের নামাযের আযানে উচ্চারিত হয়। ফযরের আযানে একটি বাক্য অতিরিক্ত বলা হয়। তাহা হইল আস্সালাতু খাইরুম্-মিনান নাওম'—'নিদ্রা অপেক্ষা নামায অতীব উত্তম'। ইহা দুইবার বলা হয়।

কিন্তু ফজরে আযানে এইরূপ বলা কখন হইতে শুরু হইল? ইহা কি পরে প্রচরিত হইয়াছে, না নবী করীম (স)-এর সময় হইতেই ইহা বিধিবদ্ধ? ইহার জওয়াব এই পর্যায়ের প্রথমোক্ত হাদীস হইতেই জানা গিয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, ফজরের আযানের এই অতিরিক্ত বাক্যদ্বয় রাসূলের জীবদ্দশায়ই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার সমর্থনে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ হযরত আবূ মাহযূরাতা (রা) বলেনঃ

عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَذَانَ وَقَالَ اِذَا كُنْتَ فِىْ اَذَانِ الصُّبْحِ فَقُلْتَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - (ابوداؤد، ابن حبان)

আমাকে রাসূলে করীম (স) আযান শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ ফজরের আযানে 'হাই-আলাল-ফালাহ্' বলার পর 'আস্সালাতু খায়রুম্ মিনান নাওম বলিবে।—আবূ দাউদ, ইবনে হাব্বান

ব্যাখ্যা ফজরের নামাযের আযানে অতিরিক্ত বাক্যদ্বয় রাসূলে করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, ইহা নবী করীম (স)-এর নিজের শিক্ষা দেওয়া বাক্য। কাজেই এই বাক্যদ্বয় উত্তরকালে কখনো সংযোজিত হইয়াছে—অতএব ইহা বিদ্আত। এইরূপ ধারণা শুধু ভিত্তিহীনই নয়, চরম অজ্ঞতারও পরিচায়ক।

আযান ও ইকামতের তাকীদ

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يُؤَذِّنُوْنَ وَلَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ - (مسند احمد - ابوداؤد - نسائى)

হযরত আবূদ-দারদা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে কোন তিনজন লোক একত্রে থাকিয়া আযান দিবে না ও একত্রে নামায কায়েম করিবে না, শয়তান তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া লইবে। —মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে জানা যায় যে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য আযান দেওয়া এবং অতঃপর জামা'আতের সহিত নামায পড়া ও ইকামত দেওয়া ওয়াজিব। কেননা ইহা করা না হইলে সেখানে শয়তানের প্রতিপত্তি স্থাপিত হইবে অথচ শয়তানের প্রতিপত্তি খতম করা মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

জামা'আতে নামাযের জন্য আযান দেওয়া ওয়াজিব—এ সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই। ইমাম আল-মাওয়াদী লিখিয়াছেন, আযান ও ইকামত—দুইটি একই সঙ্গে ওয়াজিব। ইহার একটি অপরটির অভাব পূরণ করিতে পারে না। ইহার একটি পরিত্যক্ত হইলে কিংবা উভয়টিই পরিত্যাক্ত হইলে জামা'আতের নামায ক্ষুণ্ন হইবে। ইমাম আতা বলিয়াছেন, ইকামত ওয়াজিব, আযান নয়। ইমাম আওযায়ীও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানীফার মতে আযান ইকামত—দুইটি-ই সমানভাবে সুন্নাত।

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ ـ (بخارى، مسلم)

মালিক ইবনুল হুয়াইরিস হইতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ নামাযের সময় উপস্থিত হইলে তোমাদের একজন যেন অন্য সকলের পক্ষ হইতে আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যেন জামা'আতে ইমামতি করে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা 'তোমাদের একজন' কথাটি হইতে জানা যায় যে, আযান যে কোন বয়সের যে কোন লোকই দিতে পারে এবং তাহা দিলে তাহা সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে। অবশ্য নামাযের ইমামতি করার জন্য এই হাদিসে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট হইল যে, আযানের তুলনায় নামাযের ইমামতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন কাজ।

মুয়াযযিনের সওয়াব

عَنْ مُعَاوِيَةَ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (مسند احمد، مسلم، ابن ماجه)

হযরত মু'আবিয়া (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ মুয়াযযিনগণ কিয়ামতের দিন সব লোকের তুলনায় দীর্ঘ ঘাড়সম্পন্ন হইবে।

—মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা 'কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনগণ দীর্ঘ ঘাড়সম্পন্ন হইবে' অর্থ দুনিয়ায় নামাযের আযান দেওয়ার কাজ যাহারা একটি দ্বীনী কর্তব্য হিসাবে করিবে কিয়ামতের দিন সব লোকের তুলনায় তাহাদের ঘাড় অধিক লম্বা হইবে।

ঘাড় লম্ব হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কি, হাদীস বিশারদরা ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন এই মুয়াযযিনরা আল্লাহ্‌র রহমত লাভের অধিক অধিকারী ও উহাতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং তদ্দরুন অধিক উন্নত মস্তক হইবে। আর ইহারও সোজা অর্থ হইল, তাহারা সকলের তুলনায় অধিক সওয়াব লাভে ধন্য হইবে। কেহ বলিয়াছেন,

তাহারাই সেদিন সকলের সরদার ও নেতৃস্থানীয় হইবে। চারিদিক হইতে লোকেরা তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকিবে এবং এই 'দীর্ঘ ঘাড়' হওয়ার কারণে হাশরের ময়দানের জনসমুদ্রে তাহারা সহজেই সকলের দৃষ্টিগোচর হইত পারিবে। হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীস হইতে ইহার স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হইয়াছেঃ

يُعْرَفُونَ بِطُوْلِ اَعْنَاقِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনরা তাহাদের ঘাড় দীর্ঘ হওয়ার কারণে লোকদের নিকট সহজেই পরিচিত হইবে।

কাহারো মতে ইহাদের অনুসারীর সংখ্যা অন্যান্য সকলের তুলনায় অনেক বেশী। একথার বাস্তব ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, দুনিয়ায় যেহেতু লাখ লাখ মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামা'আতে হাযির হইয়াছে এই মুয়াযযিনদের আযান শুনিয়া, তাই কিয়ামতের দিনও লাখ লাখ লোক তাহাদের নেতৃত্ব মানিয়া লইবে। ইবনুল আরাবী বলিয়াছেনঃ

اَكْثَرُ النَّاسِ اَعْمَالاً ও اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا

আমলের দিক দিয়া ইহারা অধিক আমলকারি প্রমাণিত হইবে।

কাযী ইয়ায প্রমুখ মনীষী বলিয়াছেনঃ

اِعْنَاقٌ ـ অর্থ اِسْرَاعٌ اِلَى الْجَنَّةِ জান্নাতের দিকে দ্রুত গমন।

আবূ দাউদ পুত্র বলিয়াছেনঃ আমি আমার পিতা আবূ দাউদের নিকট শুনিয়াছি এই বাক্যটির অর্থঃ

اِنَّ النَّاسَ يَعْطِشُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِذَا عَطَشَ الْاِنْسَانُ اِنْطَوَتْ عُنُقُهُ وَالْمُؤَذِّنُوْنَ لَا يَعْطِشُوْنَ فَاَعْنَاقُهُمْ قَائِمَةٌ ـ

কিয়ামতের দিন লোকেরা পিপাসার্ত হইয়া পরিবে। আর মানুষ যখন পিপাসাকাতর হয় তখন তাহার ঘাড় ভাঁজ ও খাটো হইয়া যায়। কিন্তু মুয়াযযিনরা যেহেতু কিয়ামতের দিন পিপাসাকাতর হইবে না, এইজন্য তাহাদের ঘাড় উর্ধ্বে উন্নত অর্থাৎ দীর্ঘ হইয়া থাকিবে।

ইহার অপর একটি তাৎপর্যও হইতে পারে। তাহা হইল 'ঘাড় দীর্ঘ হওয়া' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর সেই রূপক অর্থ 'দুঃসাহসী—অসীম সাহসী হওয়া'। কেননা দুনিয়ায় আল্লাহ্-অবিশ্বাসী ও আল্লাহ্-অমান্যকারী লোকদের সম্মুখেঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ ও اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই ইলাহ নাই' 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি, হযরত মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল।

এর মত বিপ্লবী বাণী উদার কন্ঠে নির্ভীক ভংগীতে ঘোষণা করা খুবই দুঃসাহসিকতার কাজ। ইহার তাৎপর্য এই যে, ঘোষণা করা হইতেছে, আমি ইলাহ্-প্রভু ও সার্বভৌম এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও মানি না। দুনিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ প্রভুত্বের দাবিদার যত, তাহাদের সকলকে ও প্রত্যেককেই আমি অস্বীকার করি। আমি ঘোষণা করি যে, ইহাদের কাহারো এইরূপ দাবি করার ও নিজেকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করার কোন অধিকারই নাই। কি বৈষয়িক—কি ধর্মীয়—সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং হযরত মুহাম্মাদের রিসালাত ও নেতৃত্ব আমি মানি। অন্যসব সার্বভৌমত্ব ও নেতৃত্ব উৎখাত করিয়া আমি তাহাই প্রতিষ্ঠিত করিবার আকুল আহবান জানাইতেছি। বস্তুত ইহার মত বিপ্লবী ঘোষণা আজ পর্যন্ত দুনিয়ার আকাশে,

বাতাসে ও জনসমাজে ঘোষিত হয় নাই। অনুরূপ ঘোষণা আকাশের তলে ও যমীনের বুকে আর একটিও নাই। এই কাজ যাহারা দুনিয়ায় করে কিয়ামতের দিন তাহাদের এই বিপ্লবী ও দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কাজের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে নানা বিশিষ্টতা দান করা হইবে। আর ঘাড় দীর্ঘ হওয়া উহাদের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র।

সে যাহাই হোক, বক্ষ্যমান হাদীসটি হইতে আযান ও মুয়াযযিন উভয়ের উচ্চ মর্যাদার কথাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিয়ামতের দিন অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের হইতে তাহারা বিশেষ বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইবে। ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেন, মুয়াযযিনরা কিয়ামতের দিন এই উচ্চ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইবে। তবে সেইজন্য একটি জরুরী শর্ত রহিয়াছে তাহা হইলঃ

إِذَا كَانَ فَاعِلُهُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ أَجْرًا عَلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ فِعْلُهُ لِذَالِكَ مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا وَالسَّعْيِ لِلْمَعَاشِ وَلَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ ۔ (نيل الاوطار ج ٢، ص ١٢)

যদি তাহারা আযান দেওয়ার বিনিময়ে কোন মজুরী গ্রহণ না করিয়া থাকে। কিন্তু যদি মজুরী গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই কাজ দুনিয়া তালাশ ও জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টা পর্যায়ের কাজ বলিয়া গণ্য হইবে, পরকালের জন্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ ۔ (مسند احمد، ابوداؤد، ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ ইমাম দায়িত্বশীল, আর মুয়াযযিন আমানতদার। হে আল্লাহ্! তুমি ইমামগণকে নির্ভুল পথ প্রদর্শন কর এবং মুয়াযযিনদের গুনাহ্ খাতা মাফ করিয়া দাও। —মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা 'ইমাম দায়িত্বশীল' ইহার অর্থ, নামাযের ইমাম নামাযে পঠনীয় কিরাত ও দোয়া–দরূদ ইত্যাদির জন্য যামিন। তাহাকে যথাযথ ও নির্ভুলভাবে কুরআন ও অন্যান্য দোয়া–দরূদ পাঠ করিতে হইবে ও সঠিক নিয়মে নামায পড়াইয়া শেষ করিতে হইবে। নামাযের দোয়ায় ইমামের দায়িত্ব হইল, উহাতে সাধারণ জনগণকে শামিল করিবে, কেবল নিজের কথাই বলিবে না। অপরদিকে 'ইমাম মুক্তাদিদের নামাযের রক্ষাণাবেক্ষণকারী আর মুয়াযযিন আমানতদার' —ইহার অর্থ, নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী ঠিক ঠিকভাবে আযান দেওয়ার কর্তব্য মুয়াযযিনের উপর অর্পিত। কেননা অনেক মানুষ নামাযে শরীক হওয়ার ব্যাপারে মুয়াযযিনের আযানের উপর নির্ভরশীল, উহার জন্য অপেক্ষমান ও সেজন্য উৎকন্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকে। তাহারা যদি আযান ধ্বনি সময় মতো শুনিতে না পায় তাহা হইলে নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইবে না। অতএব এই দায়িত্বশীলতার কথা তাঁহাদের সব সময় মনে রাখা আবশ্যক। হাদীসটি হইতে আযানের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔ (بخارى)

হযরত আবূ সাঈদুল খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ মুয়াযযিনের আওয়াজ যতদূর পৌঁছায়, সে পর্যন্ত যে জিন, যে মানুষ ও যে জিনিসই উহার আওয়াজ শুনিতে পায়, সে কিয়ামতের দিন তাহার পক্ষে অবশ্যই সাক্ষ্য দিবে। —বুখারী

ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের প্রকৃতিতে তাঁহার পরিচিতি লাভ করার যোগ্যতা স্বাভাবিক ও জন্মগতভাবেই দান করিয়াছেন। কুরআন মজীদের নিম্নদ্ধৃত আয়াত হইতে একথার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা হইয়াছেঃ

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ -

দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে তাহার তসবীহ—পবিত্রতা বর্ণনা করে।

এ কারণে মুয়ায্যিন যখন আযান দেয় এবং উহাতে আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, মহানত্ব ও তাঁহার একত্ব এবং তাঁহার রাসূলের রিসালাত ও তাঁহার দ্বীনী দাওয়াতের ঘোষণা দেয়, তখন জিন, মানুষ ও বস্তু—সকলেই তাহা শুনিতে পায় এবং উহার অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারে। কিয়ামতের দিন ইহারা সকলেই সেই মুয়ায্যিনের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। বস্তুত ইহা মুয়ায্যিনের ও তাহার আযানের ফযীলতের কথা সন্দেহ নাই।

আযান ও ইকামতের জওয়াব

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَیَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَیَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (مسلم)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ মুয়ায্যিন যখন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' —('আল্লাহ্ অনেক বড় অনেক মহান' —'আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও মহান') তখন তোমাদের কেহ যদি বলেঃ আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, (মুয়ায্যিন) যখন বলে আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই মা'বুদ নাই) তখন যদি বলেঃ আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যখন বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল), তখন যদি সেও বলেঃ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, যখন বলেঃ হাই আলাসসালাহ্ (নমাযের জন্য আস), তখন যদি বলেঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো কোন শক্তি বা দাপট নাই,) যখন বলেঃ হাই-আলাল ফালাহ্ (কল্যাণের জন্য আস) তখন যদি বলেঃ লা-হওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ্, যখন বলেঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, তখন যদি বলে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, যখন বলেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, তখন যদি বলেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্—এবং বলে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে, তবে সে জান্নাতে দাখিল হইবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসে মুয়ায্যিনের আযানের প্রতিটি বাক্যের জওয়াব দেওয়ার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই জওয়াব দেওয়া আযান শ্রোতা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। এই জওয়াব যদি কেহ পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে দেয়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে বলিয়া নবী করীম (স) খোশ-খবরশোনাইয়াছেন।

মুয়ায্যিনের আযানের কোন বাক্যের জওয়াবে কি বলিতে হইবে, তাহা এই হাদীসে জানাইয়া

দেওয়া হইয়াছে। এখানে আযানের জওয়াব দেওয়ার পরকালীন সওয়াবের দিকটাকেই অধিক স্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে। ইহা পাঠে মনে হইতেছে যে, আযানের জওয়াব দিলে পরকালীন সওয়াব জান্নাত পাওয়া যাইবে। আর না দিলে বুঝি কোন দোষ নাই। কিন্তু এই পর্যায়ের অন্যান্য হাদীসে আযানের জওয়াব দেওয়ার তাকীদ দেখা যায়। হযরত আবূ সায়ীদ বর্ণিত তিরমিযী শরীফের হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ -

তোমরা যখন শুনিবে মুয়ায্যিন আযানের ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছে, তখন তোমরা সে যেসব কথা যেভাবে বলে তোমরাও তাহাই বলিবে।

উপরের হাদীসটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মাত্র দুইটি বাক্য ছাড়া আর সব বাক্যের জওয়াবে শ্রোতাকে তাহাই বলিতে হয়, যাহা মুয়ায্যিন বলে। যে বাক্য দুইটির জওয়াবে অনুরূপ কথা না বলিতে অন্য কথা বলিতে হয় তাহা রাসূলে করীম (স)–এর নির্দেশ অনুসারে, কাহারো ইচ্ছামত নয়।

আযানের জওয়াব দিলে ও শেখানো বাক্যগুলি জওয়াব সরূপ বলিলে জান্নাতে যাওয়ার সওয়াব পাওয়া যাইবে এই কারণে যে, আযানের বাক্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত ইহাতে তাওহীদ—তথা আল্লাহ্র একত্বের ঘোষণা রহিয়াছে, আছে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি এবং তাঁহার নিকট পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অধীনতা স্বীকারের উদাত্ত ঘোষণা। এই বাক্যসমূহের মাধ্যমে মুয়ায্যিন এবং আযান শ্রোতা উভয়ই ঐকান্তিকভাবে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ ঘোষণা করে। আর বস্তুতই যে লোক এই গুণ অর্জন করিতে পারে বুঝিতে হইবে, সে প্রকৃত ঈমানদার। ঈমানের গভীর তাৎপর্য ও ভাবধারা পুরোপুরী লাভ করিতে পারিয়াছে। যাহার এইরূপ ঈমান হইবে সে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানিয়া চলিতে সক্ষম হইবে। আর জান্নাতে যাওয়ার অধিকারীও যে কেবল এই ধরনের লোকই হইতে পারে তাহা স্পষ্ট।

বস্তুত আযানের বাক্যসমূহ ইসলামী ঈমান ও আকীদার অত্যন্ত মৌলিক ঘোষণা। প্রথমতঃ ইহাতে ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহ্ আছেন, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বপ্রকার শিরক হইতে পবিত্র। আল্লাহ্ যে সর্বদিক দিয়াই এক, একক, অনন্য, তাহার শরীক কেহই নাই, এই ঘোষণাই ইহাতে বড় ও বলিষ্ঠ হইয়া দেখা দিয়াছে। আর ইহাই হইতেছে দ্বীন–ইসলামের মূল কথা, দ্বীন–ইসলামের সব কথার প্রথম ও প্রধান কথাই এই।

অতঃপর উহাতে হযরত মুহাম্মাদের আল্লাহ্র রাসূল—সর্বশেষ নবী হওয়ার ঘোষণা সোচ্চার হইয়া আছে। আর আল্লাহ্র একত্ব বা তাওহীদ স্বীকার করিয়া লওয়ার পর ইহাই হইল ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা, যাহা মুসলিম মাত্রেরই ঈমানের অঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ইসলামের এই মৌলিক দুইটি ঘোষণার ফলে ইসলামের জ্ঞানগত সাক্ষ্য সম্পূর্ণতা লাভ করে। ইহার পরই শুরু হয় ইবাদত পালনের আহবান। বলা হয়ঃ নামাযের জন্য আস। বস্তুত যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে নামাযই হইল সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করার পরপরই নামাযের আহবান উচ্চারিত হয় এই কারণে যে, মুসলমানের প্রতি নামায যে ফরয তাহা নবীর নিকট হইতেই জানা গিয়াছে, মানুষ ইহা নিজস্ব বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা উদ্ভাবন করে নাই। ইহার পর বলা হয়ঃ আস মহা কল্যাণের দিকে। বস্তুত প্রথমোক্ত ঈমান ও ঈমানের পর নামায ও অন্যান্য ইবাদত পালনই হইল প্রকৃত কল্যাণের উৎস—সর্বাত্মক কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায়। 'ফালাহ' অর্থাৎ চূড়ান্ত সাফল্য, কল্যাণ ও স্থায়ী নিয়ামতসমূহে স্থিতি। আর তাহা লাভ করার প্রকৃত ক্ষেত্র হইল পরকাল। তাই বলিতে হইবে, এখানে পরকালের প্রতি ঈমানেরও ঘোষণা রহিয়াছে এবং ইহার দ্বারাই ইসলামী ঈমান সম্পূর্ণতা লাভ করে।

আবূ দাঊদ বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَأَجِبْ - মুয়াযযিন যখন আযান দেয়, তখন তুমি উহার জওয়াব দাও।

এই জওয়াব দেওয়ার নির্দেশ পালনের প্রথম কাজ হইল, মুয়াযযিনের বলা কথাগুলির মৌখিক জওয়াব দান—জওয়াবে রাসূলের শেখানো বাক্যসমূহ বলা এবং দ্বিতীয় কাজ হইল নামাযে হাজির হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ। আর এই উভয় জওয়াবই হাদীস অনুযায়ী ওয়াজিব।

আযানের জওয়াব দেওয়া যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, নামাযের পূর্বক্ষণে যে ইকামত বলা হয়, উহার বাক্যগুলির'ও জওয়াব দেওয়া সুন্নাত। আবূ ইমামা ও অন্যান্য সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

إِنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا -

হযরত বিলাল (রা) যখন নামাযের প্রক্কালে 'ইকামত' বলিতে গিয়া قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ 'নামায এখনই কায়েম ও শুরু হইয়া গেল' বলিলেন তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ 'আল্লাহ্ উহাকে চিরদিন কায়েম রাখুন, উহাকে স্থায়ীভাবে চালু রাখুন।'

ইহা হইতে ইকামতের জওয়ার দেওয়ার রীতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় এবং উহার অন্যান্য বাক্যের জওয়াবে আযানের বাক্যগুলির মতই জওয়াব দিতে হইলেও ইকামতদাতা যখন বলিবে, 'কাদ-কামাতিসসালাত' (নামায কায়েম হইল) তখন নামাযে উপস্থিত লোকদিগকে সেই কথা কয়টিই বলিতে হইবে যাহা নবী করীম (স) বলিয়াছেন বলিয়া এই হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের চার ওয়াক্তের আযান উপরোদ্ধৃত বাক্যসমূহই বলিতে হয়, ফজরের আযানে 'হাই-আলাল ফালাহ্' বলা পর বলিতে হয়ঃ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ 'নিদ্রা অপেক্ষা নামায ভালো'। বিশেষ করিয়া ফজরের আযানে এই কথাটি অতিরিক্ত বলিতে হয় এইজন্য যে, এই আযান যখন দেওয়া হয় তখন সাধারণত সব মানুষই রাত্রি শেষের মধুর নিদ্রায় অচেতন হইয়া থাকে। তাই নামাযের সময় উপস্থিত হইলে যে আর কাহারো ঘুমাইয়া থাকা উচিত নয় এবং ঘুমের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায—যাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, একথা ওজস্বিনী ভাষায় ঘোষণা করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

ফজরের আযানের এই অতিরিক্ত বাক্যটির জওয়াবে শ্রোতাকে বলিতে হয়ঃ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ 'তুমি সত্য বলিয়াছ এবং এই কথা বলিয়া তুমি বড় পূণ্যের কাজ করিয়াছ, ইহার তাৎপর্য স্পষ্ট। মুয়াযযিন যখন বলিয়াছে 'নিদ্রা অপেক্ষা নামায অনেক ভালো' তখন শ্রোতার উহার সত্যতার সাক্ষ্য দেওয়া উচিত, স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত যে, হ্যাঁ ঠিকই, নিদ্রা অপেক্ষা নামাযই অনেক উত্তম সে কথা আমিও স্বীকার করি, তোমার ঘোষণার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। অতঃপর অনতিবিলম্বে নামাযের জন্য যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

আযানের দোয়া

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا - غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ - (ترمذی)

হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, মুয়াযযিনের আযান শুনিয়া যে বলিবেঃ আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নাই, তিনি এক ও একক। তাঁহার কেহ শরীক নাই এবং মুহাম্মাদকে রাসূল ও ইসলামকে আমার দ্বীন—পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারূপে মানিয়া লইয়াছি ও গ্রহণ করিয়াছি, তাহার গুনাহ্ খাতা মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা 'আযান' ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের জ্বলন্ত ঘোষণা। মুয়াযযিন যখন এই ঘোষণা আকাশে বাতাসে প্রচার করিয়া দেয়, তখন সমাজের শ্রোতাদের উহা মনোযোগ সহকারে শোনা, উহার বাক্যগুলির নির্দিষ্ট জওয়াব দেওয়া এবং আযান শেষে এই সম্পর্কে একটা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা বিশেষ কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের পথ দেখানো হইয়াছে এই দোয়া শিক্ষা দিয়া। এই দোয়ার মূল চারিটি কথায় আন্তরিক ও অকৃত্রিম স্বীকৃতি শামিল করা হইয়াছে। বস্তুত আযানের প্রচন্ড ঘোষণা শ্রবণের পর এই কথাগুলির স্বীকৃতি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হইয়া থাকে—হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে আল্লাহ্র একত্ব ও হযরত মুহাম্মাদের নবুয়্যাত ও রিসালাতের সাক্ষ্যদানের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্কে রব্, মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারূপে মানিয়া লওয়ার অঙ্গীকার উল্লেখিত হইয়াছে। আর ইসলামে ঈমান ও আকীদার দিক দিয়া এই অঙ্গীকার এবং বারে বারে—দিন রাত্রের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে দেওয়া এই অঙ্গীকার—খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূর প্রভাব বিস্তারকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আযানের পর যে দোয়া পড়া সাধারণভাবে প্রচলিত, তাহাতে পূর্বোক্ত হাদীসে উদ্ধৃত দোয়ার পূর্বে আরো কিছু কথা রহিয়াছে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ কর্তৃক তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই দোয়ার প্রথম অংশ। তাহা এইঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ - اِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (ترمذى)

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক আযানের ধ্বনি শুনিয়া বলিবে, হে আমাদের আল্লাহ্! তুমিই এই পূর্ণাঙ্গ তৌহীদী আহবান ও স্থায়ী চিরন্তন নামাযের রব্, তুমি মুহাম্মদ (স) কে জান্নাতের "অসীলা" নামক মর্যাদা, সর্বোচ্চ সম্মান এবং তোমার ওয়াদা মুতাবিক 'মাকামে মাহমুদ' দান কর, তাহার জন্য কিয়ামতের দিন শাফা'আত অবশ্য প্রাপ্য (ওয়াজিব) হইয়া যাইবে।

এই হাদীসে আযানকে মোটামুটি 'দাওয়াতিত তাম্মাহ্'—'পূর্ণাঙ্গ আবহান' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কেননা আযানে ঘোষিত বাক্যসমূহ আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি তাঁহার বন্দেগীর জন্য আকুল আহবান। ইহাই তাওহীদের দাওয়াত। এই 'দাওয়াত' পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ পরিণত। কেননা ইহাই সব শিরক খতম করে। সব ক্রটি-বিচ্যুতি হইতে ইহা পবিত্র। এই দাওয়াত কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত হইতে পারে না, ইহা কিয়ামত পর্যন্তই স্থায়ী ও অপরিবর্তিত থাকিবে। ইহার বিপরীত কথা দুনিয়ায় ও জীবনে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে অনিবার্যভাবে। এই 'আযান' দিয়া যে নামাযের দিকে মুসলমানকে আহবান করা হয়, তাহা চিরদিন কায়েম থাকিবে, কোন জাতি তাহা পরিবর্তন করিতে এবং কোন শরীয়তই ইহাকে বাতিল করিতে পারিবে না। যতদিন এই বিশ্বলোক—এই পৃথিবী কায়েম আছে, ততদিনই ইহা কায়েম ও স্থায়ী থাকিবে।

এই হাদীসে যে 'মাকামে মাহমুদ'-এর কথা বলা হইয়াছে, ইহা কোন বিশেষ একটি স্থান নয় এবং যেখানেই আল্লাহ্র হামদ্ করা হয় এবং যাহাই অতীব সম্মানজনক স্থান, তাহাই এই নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহা রাসূলে করীম (স)-কে দেওয়া হইবে বলিয়া কুরআন মজীদে ওয়াদা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا - (بنى اسرائيل ٧٩)

তোমার আল্লাহ্ তোমাকে প্রশংসনীয় স্থানে অবশ্য পাঠাইবেন।

আল্লামা ইবনে জাওযীর মতে 'মাকামে মাহমুদ' বলিয়া শাফা'আত করার অধিকার বুঝাইয়াছে এবং কিয়ামতের দিন তিনি এক অতীব প্রশংসনীয় স্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহার উম্মতের জন্য শাফা'আত করিবেন। সেই স্থানেরই হয়ত অপর নাম 'আল-অসীলা' কিংবা 'আল-ফাযীলা'।

বস্তুত ইহা এক ব্যাপক অর্থ ও গভীর ভাবধারাপূর্ণ দোয়া। আযান শোনার পর প্রত্যেকেরই এই দোয়া খুবই আন্তরিকতা সহকারে পাঠ করা উচিত।

মুসলমানেরা আযানের পর সাধারণতঃ যে দোয়া পড়েন, তাহাতে উপরোদ্ধৃত হাদীসে উল্লেখিত দোয়া হইতে দুইটি বাক্য অতিরিক্ত। একটি হইল, وَالْفَضِيْلَةَ এর পর وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ আর দ্বিতীয়টি হইল দোয়ার শেষেঃ

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ - নিশ্চয়ই তুমি—হে আল্লাহ্ ওয়াদা খিলাপ কর না।

এই সম্পর্কে হাদীসবিদদের মত হইল, প্রথম শব্দদ্বয় হাদীসের কোন বর্ণনায়ই উদ্ধৃত হয় নাই। উহার মূল উৎস যে কি তাহা কাহারো জানা নাই। ইমাম বুখারী বলিয়াছেনঃ

لَمْ أَرَهُ فِىْ شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ -

হাদীসের কোন একটি বর্ণনায়ও আমি উহা দেখিতে পাই নাই।

আর দ্বিতীয় বাক্যটি বায়হাকী'র বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। কাজেই উহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

নামায

সুন্নাত নামায

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ - (ترمذى)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) জুহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাক্'আত ও উহার পরে দুই রাক্'আত নামায পড়িতেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা অধিকাংশ হাদীসবিদ, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ী এই হাদীস অনুযায়ী জুহরের ফরযের পূর্বে চার রাক্'আত ও পরে দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়িতেন। ইমাম বুখারী এই পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে যে হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেনঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ -

নবী করীম (স) জুহরের ফরযের পূর্বে চার রাক্'আত ও ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাক্'আত নামায কখনো না পড়িয়া ছাড়িতেন না।

হযরত উম্মে হাবীবা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে সুন্নাত নামাযের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلّٰى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ - (ترمذى)

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, যে লোক দিন ও রাত্রির মধ্যে মোট বারো রাক্'আত (সুন্নাত) নামায পড়িবে, তাহার জন্য জান্নাতে একখানি ঘর নির্মিত হইবে। তাহা জুহরের পূর্বে চার রাক্'আত ও পরে দুই রাক্'আত, মাগরিবের পর দুই রাক্'আত, এশার পর দুই রাক্'আত, আর ফজরের পূর্বে ভোরের নামায দুই রাক্'আত।

ইমাম তিরমিযী ইহাকে একটি উত্তম হাদীস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সব কয়টিই সুন্নাতে মুয়াক্কিদা। তবে ফজরের সুন্নাত দুই রাক্'আত অধিকতর তাকীদপূর্ণ। কেহ কেহ উহাকে ওয়াজিবও বলিয়াছেন। কোন কোন হাদীস হইতে একথাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (স) জুহরের পূর্বে দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়িয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলিয়াছেনঃ

قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهٖ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ - (بخارى، مسلم)

আমি নবী করীম (স) হইতে দশ রাক্'আত সুন্নাত স্মরণ রাখিয়াছি। তাহা হইলঃ জুহরের পূর্বে দুই রাক্'আত ও পরে দুই রাক্'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক্'আত তাঁহার বাড়ীতে, এশার পর দুই রাক্'আত আর ফজরের পূর্বে দুই রাক্'আত।

এই হাদীসে জুহরের পূর্বে দুই রাক্'আত সুন্নাতের কথা বলা হইয়াছে অথচ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত উপরোদ্ধৃত হাদীসে চার রাক্'আত বলা হইয়াছে। ইহার একটি কারণ হইল যিনি যাহা

দেখিয়াছেন, তিনি তাহা বলিয়াছেন অথবা ইবনে উমর (রা) ভুল করিয়া চার রাক্'আতের স্থলে দুই রাক্আত বলিয়াছেন কিংবা নবী করীম (স)-ই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রকম—কখনো চার রাক্'আত কখনো দুই রাক'আত পড়িয়াছেন। ইহা সবই সহীহ বর্ণনা।

ইকামত শুরু হওয়ার পর নামায

عَنْ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصُّبْحَ اَرْبَعًا اَلصُّبْحَ اَرْبَعًا ـ (بخارى، مسلم)

হযরত মালিক ইবনে বুহায়নাতা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) এক ব্যক্তিকে এমন সময় দুই রাক্'আত নামায পড়িতে দেখিতে পাইলেন যখন ইতিপূর্বেই ফরয নামাযের ইকামত বলা হইয়াছে। পরে রাসূলে করীম (স) যখন নামায পড়া শেষ করিয়া ফিরিলেন তখন লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ সকাল বেলা নামায কি চার রাক্'আত? সকাল বেলায় নামায কি চার রাক্'আত? —বুখারী

ব্যাখ্যা হাদীসের শেষ বাক্য—রাসূলে করীম (স)-এর উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা ফজরের নামাযকালীন একটি ঘটনার বিস্তারিত রূপ সম্ভবত এই ছিল যে, ফজরের জামা'আতের ইকামত হওয়ার পর নবী করীম (স) যখন মসজিদে নামায পড়িতে—নামাযেরইমামতি করিতে—আসিলেন, তখন তিনি এক ব্যক্তিকে সুন্নাত নামাযের দুই রাক্'আত পড়িতে দেখিলেন। ইহা তাঁহার মনঃপূত হইল না। ফলে তিনি এমন কিছু বলিয়াছেন, যাহাতে এই বিষয়ে লোকদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল। নামায শেষ হইবার পর লোকেরা নবী করীম (স)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দুইবার বলিলেনঃ ফজরের নামায কি চার রাক্'আত? – ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিলেন না।

এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ফরয নামাযের ইকামত হইয়া যাওয়ার পর সুন্নাত নামায পড়িতে দেখিয়া নবী করীম (স) অসন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন এবং ফজরের ফরয নামায চার রাক্'আত নাকি তাহা রাগতঃ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আর ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইকামত শুরু হওয়ার পর সুন্নাত পড়া শুরু করা যাইতে পারে না—জায়েয নয়। এই কারণেই ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি যে পরিচ্ছেদের নীচে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার শিরোনাম হইলঃ

بَابٌ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ ـ

ফরয নামাযের জামা'আতের ইকামত হইয়া গেলে বা শুরু হইয়া গেলে তখন সেই ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাইবে না—এরঅধ্যায়।

মূলত এই কথাগুলি একটি হাদীসের অংশ, সেই হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থাদিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মূল বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)। বুখারীর উপরিউদ্ধৃত হাদীসটি শুধু ফযরের সুন্নাত সম্পর্কে, কিন্তু মুসলিম ও অন্যান্য সুনান-উদ্ধৃত এই শেষোক্ত হাদীসটি সকল ফরয নামায সম্পর্কে প্রযোজ্য। কাজেই মূল প্রতিপাদ্য অর্থাৎ ইকামত হইতে লাগিলে কিংবা হইয়া গেলে তখন সেই ফরয ছাড়া অন্য কোন নামাযই পড়া যাইবে না—পড়িতে শুরু করা যাইবে না। বুখারী তাঁহার 'তারীখ' গ্রন্থে এবং বাজ্জার প্রমুখ হযরত আনাস (রা) হইতে অপর মরফু হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছেঃ

وَ نَهٰى اَنْ تُصَلِّيَا اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ـ

ফজরের জামা'আতের ইকামত বলা শুরু হইলে কিংবা ইকামত বলা শেষ হওয়ার পর উহার দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়িতে নবী করীম (স) নিষেধ করিয়াছেন।

অপর এক বর্ণনায় সাহাবিগণ স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا رَكْعَتِي الْفَجْرِ -

ইয়া রাসূল। ইকামতের পর ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাতও কি পড়া নিষেধ? ইহার জবাবে তিনি বলেনঃ

وَلَا رَكْعَتِي الْفَجْرِ - (الفتح البارى شرح البخارى)

হ্যাঁ, ফজরের সুন্নাত দুই রাক্'আতও পড়া যাইবে না।

মোট কথা, ইকামত শুরু হইলে সুন্নাত বা নফল কোন নামাযই পড়া যাইবে না। এই পর্যায়ে ইমাম কুরতুবী লিখিয়াছেনঃ

যে লোক মসজিদে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সে ফজর-পূর্ব দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়ে নাই, ওদিকে ইকাতম শুরু হইয়া গিয়াছে এই সময় তাহার কি করা উচিত, এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতবৈষম্য রহিয়াছে। ইমাম মালিক (রা) বলিয়াছেন, সেই লোক ইমামের সঙ্গে ফরয নামায পড়িতে শুরু করিবে, তখন সুন্নাত পড়ায় লাগিয়া যাইবে না। কিন্তু যদি মসজিদে প্রবেশ না করিয়া থাকে ও ওদিকে জামা'আত শুরু হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে মসজিদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সুন্নাত দুই রাক্আত পরিয়া লইবে—অবশ্য যদি জামা'আতের নামাযের এক রাক্'আত হারাইবার ভয় না থাকে, তবে। এই সময় মসজিদের ছেহেনে দাঁড়াইয়া সুন্নাত পড়া শুরু করা জায়েয হইবে না। আর যদি জামা'আতের নামাযের এক রাক্'আত হারাইবার আশংকা হয়, তাহা হইলে তখনই জামা'আতে শামিল হওয়া যাইবে। সুন্নাত পরে পড়িবে।

ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁহার সঙ্গিগণ বলিয়াছেনঃ এই সময় যদি জামা'আতের দুই রাক্'আত নামাযই হারাইয়া ফেলার আশংকা হয়, দ্বিতীয় রাক্'আতের রুকূতেও ইমামের সহিত নামাযে শরীক হইতে পারা সম্ভাবনা না থাকে, তবেই তখন সুন্নাত পড়িতে শুরু না করিয়া ইমামের সহিত শামিল হইয়া যাবে। আর যদি জামা'আতের পূরা এক রাক্'আত নামায পাওয়ারও আশা থাকে, তাহা হইলে মসজিদের বাহিরে দাঁড়াইয়া ফজরের সুন্নাত দুই রাক্'আত পড়িয়া লইবে ও পরে ইমামের সহিত শামিল হইবে। ইমাম আওযায়ীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তবে জামা'আতের শেষ রাক্আতও হারাইবার ভয় না হইলে মসজিদের মধ্যে দাঁড়াইয়াই সুন্নাত দুই রাক'আত পড়া তিনি জায়েয মনে করেন।

ইমাম সওরী বলিয়াছেনঃ জাম'আতের এক রাক্'আতেরও হারাইবার ভয় হইলে ইমামের সহিত শরীক হইয়া যাইবে, সুন্নাত পড়িতে শুরু করিবে না। অন্যথায় মসজিদে প্রবেশ করিয়া থাকিলেও সেখানেই সুন্নাত দুই রাক্'আত পড়িয়া লইবে।

ইবনে হাব্বান বলিয়াছেনঃ ইকামত শুরু হইয়া গেলে কোন অ-ফরয নামায পড়িতে শুরু করা যাইবে না। পরে ফজরের সুন্নাত দুই রাক্'আতের কথা ইহা হইতে স্বতন্ত্র।

ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেনঃ মসজিদে প্রবেশ করিয়া যদি দেখে যে, ইকামত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে ইমামের সঙ্গে জামা'আতের শামিল হইয়া যাইবে। এই সময় সুন্নাত দুই রাকা'আত মাত্রই পড়া যাইবে না। না মসজিদের ভিতরে, না উহার বাহিরে। ইমাম তাবারী ও ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বলও এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতই অধিক যুক্তিসঙ্গত ও সহীহ্ দলীল ভিত্তিক মনে হয়। ইহাদের দলীল রাসূলের পূর্বোদ্ধৃত বাণীঃ ইকামত হইয়া গেলে বা হইতে থাকিলে তখন সেই সময়কার নির্দিষ্ট ফরয ছাড়া অন্য কোন নামাযই পড়া যাইবে না।

ইমাম আবূ হানিফা ও অন্যান্যদের দলীল হইল হযরত আবদুল্লা ইবনে উমর সম্পর্কিত একটি

বর্ণনাঃ 'তিনি নামাযের জন্য আসিলেন, দেখিলেন ইমাম ফজরের নামায পড়িতেছেন। তখন তিনি জামা'আতে শামিল না হইয়া হযরত হাফসার হুজরায় গিয়া সুন্নাত দুই রাক্'আত পড়িলেন। তাহার পর ইমামের সহিত শামিল হইয়া ফরয পড়িলেন। ইমাম সওরী ও ইমাম আওযায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কিত বর্ণনাকে দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, জামা'আত শুরু হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া সুন্নাত দুই রাক্'আত পড়িলেন ও পরে ফরয জামা'আতে শরীক হইলেন। তবে যদি কেহ ইকামত শুরু হওয়ার আগেই সুন্নাত বা নফল পড়িতে শুরু করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে উহা সম্পূর্ণ না করিয়া ছাড়িতে পারিবেন না। কেননা তাহা ছাড়িয়া দিলে সে নামায অসম্পূর্ণ থাকিয়া ও বাতিল হইয়া যায় অথচ কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ ۔ (محمد - ٣٣) তোমরা তোমাদের আমল বিনষ্ট করিও না।

(الجامع الاحكام القران ۔ تفسير القرطبی ۔ اص ١٦٧)

এই পর্যায়ের আরো দুইটি হাদীস এখানে উদ্ধৃত না করা হইলে দায়িত্ব পালন হয় না। তন্মধ্যে একটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মারজাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِىْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِىْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَافُلَانُ بِاَىِّ الصَّلَاتَيْنِ اِعْتَدَدْتَ بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ اَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا ۔ (مسلم، ابوداؤد، نسائی)

এক ব্যক্তি মসাজদে প্রবেশ করিল। তখন নবী করীম (স) ফজরের ফরয নামায পড়তে ব্যস্ত ছিলেন। লোকটি তখন মসজিদের একপাশে দাঁড়াইয়া দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়িল। পরে রাসূলে করীম (স)-এর সহিত জামা'আতে শরীক হইল। নবী করীম (স) নামাযের সালাম ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'হে ব্যক্তি, তুমি কোন্ নামায লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলে, তোমার নিজের একক নামায লইয়া, না আমাদের সঙ্গে তোমার নামায লইয়া?—মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী

এই হাদীসে জানা যায়, নবী করীম (স) ঐ সময় সুন্নাত নামায পড়ার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। পড়িতে একেবারেই নিষেধ করেন নাই এবং যাহা পড়িয়াছিলেন, তাহা আবার পড়িতেও বলেন নাই। ইহা হইতে জামা'আত শুরু হওয়ার পরও সুন্নাত পড়া শুরু করা জায়েজ মনে হয়—যদিও মাক্রূহ্।

দ্বিতীয় হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

كُنْتُ اُصَلِّىْ وَاَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِى الْاِقَامَةِ فَجَذَبَنِىْ نَبِىُّ اللّٰهِ وَقَالَ اَتُصَلِّى الصُّبْحَ اَرْبَعًا ۔

(بيهقی، الطبرانی، ابوداؤد طيالسی، حاكم)

আমি নামায পড়িতেছিলাম। এই সময় মুয়ায্যিন ইকামত বলিতে শুরু করিল। তখন নবী করীম (স) আমাকে টান দিয়া বলিলেনঃ তুমি কি ফজরের চার রাক্আত পড়িবে?

এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম-এর হাদীস গ্রহণের মান অনুযায়ী সহীহ্। তৃতীয় হাদীসটি হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ফজরের না পড়া সুন্নাত

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَدِّهٖ قَيْسٍ رض قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ

فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي فَقَالَ مَهْلًا أَصَلَاتَانِ مَعًا

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ - فَلَا إِذَنْ ۔ (ترمذى)

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম তাঁহার দাদা কায়স (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) বাহির হইয়া আসিলেন, তখন নামাযের একামত বলা হইল ও আমি তাঁহার সহিত ফজরের ফরয নামায পড়িলাম। পরে নবী করীম (স) (পিছনের দিকে) ফিরিলেন ও আমাকে নামায পড়িতে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি বলিলেন, 'হে কায়স! থাম। তুমি কি এক সঙ্গে দুই নামায পড়িতেছ?' আমি বলিলামঃ 'ইয়া রাসূল! আমি ফজরের সুন্নাত দুই রাক্'আত পড়ি নাই (তাহাই এখন পড়িলাম)।' তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেনঃ তাহা হইলে আপত্তি নাই। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা এই হাদীসের মূল বর্ণনাকারী কায়স ইবনে আমর ইবনে সহল আনসারী মদীনার অধিবাসী একজন সাহাবী। তিনি নিজেরই একটি ঘটনা বর্ননা করিয়াছেন এই হাদীসে। এই হাদীসটি হইতে জানা যায়, ফজরের ফরয নামায আদায় করার পর একজন সাহাবীকে নামায পড়িতে দেখিয়া নবী করীম (স) আপত্তি জানাইয়াছিলেন এবং লোকটিকে ডাকিয়া থামিতে ও নামায বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন।

ইহার কারণ এই যে, ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত অন্য কোন নামায পড়া পূর্ব হইতেই নিষিদ্ধ। বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ،

ফজরের ফরয নামাযের পর হইতে সূর্যোদায় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য কোন নামায পড়িতে নবী করীম (স) নিষেধ করিয়াছেন।

কিন্তু আলোচ্য হাদিসের শেষ কথা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাত ফরয দুই রাক্'আতের পূর্বে পড়িতে না পারিলে তাহা সেই সময় সূর্যোদয়ের পূর্বে ফরয নামায শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়া যায়। হযরত কায়েসকে তাহা পড়িতে দেখিয়া নবী রকীম (স) প্রথমত আপত্তি জানাইয়াছিলেন। তিনি কায়েসকে থামিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ

أَصَلَاتَانِ مَعًا ۔ এক সঙ্গে দুই নামায?

এই জিজ্ঞাসা নিষেধাত্মক। অর্থাৎ

أَفَرْضَانِ فِي وَقْتِ فَرْضٍ وَّاحِدٍ إِذْ لَا نَفْلَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ ۔

এক ফরয নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের দুইটি ফরয নামায পড়িতেছে?

অথচ ফজরের ফরয আদায়ের পর সুর্যোদয় পর্যন্ত কোন নফল নামায পড়া জায়েয নহে।

ইহার জবাবে সাহাবী বলিয়াছেনঃ

إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ۔ আমি ফজরের সুন্নাত দুই রাক্'আত পূর্বে পড়ি নাই।

আবূ দাউদের বর্ণনায় কথাটির ভাষা হইলঃ

إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ ۔

আমি ফজরের ফরয দুই রাক্'আতের পূর্বে সুন্নাত দুই রাক্'আত পড়ি নাই। কাজেই তাহা আমি এখনপড়িতেছি।

ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ فَلَا إِذَنْ ইহার অর্থ

إِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا حِيْنَئِذٍ ۔

যদি ব্যাপার তাহাই হইয়া থাকে তাহা হইলে এই সুন্নাত এখন পড়ায় তোমার পক্ষে কোন দোষ নাই।

আবূ দাউদের অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - জওয়াব শুনিয়া নবী করীম (স) চুপ থাকিলেন।

ইবনে মালিক মুহাদ্দিস বলিয়াছেন, রাসূলে করীমের এই চুপ থাকা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ফজরের সুন্নাত ফরযের পূর্বে পড়িতে না পারিলে ফরয পড়ার পরই তাহা পড়া যাইতে পারে। ইমাম শাফেয়ীও এই মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা ইহা সমর্থন করেন নাই। মুল্লা আলী আল-কারী মিশ্‌কাতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, এই হাদীসটি সপ্রমাণিত নয়। তাই ইহা ইমাম আবূ হানীফার মতের বিরুদ্ধে দলীল হইতে পারে না।

ইহার জবাবে বলা হইয়াছে, আলোচ্য তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসটি সনদের দিক দিয়া যয়ীফ ও অপ্রমাণিত হইলেও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেননা এই ঘটনার বিবরণ অন্যান্য কয়েকটি সহীহ্ সনদ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মুহাদ্দিস ইরাকী এই হাদীসের সনদকে حسن বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইবনে আবূ শায়বা ও ইবনে হাব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসও এই বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। আর একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা যে পরস্পরের পরিপূরক ও পরস্পরের ব্যাখ্যা দানকারী তাহা সর্বজন সমর্থিত। আবূ তাইয়্যিব সনদী হানাফী তিরমিযীর আলোচ্য হাদীসটির ব্যাখ্যায় রাসূলে করীম (স)-এর শেষ কথাটির অর্থ করিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

اَىْ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ حِيْنَئِذٍ وَلَا شَىْءَ عَلَيْكَ وَلَا لَوْمَ عَلَيْكَ -

অর্থাৎ আজকের ফজরের সুন্নাতই যদি তুমি এখন পড়িয়া থাক, তাহা হইলে সেইজন্য তোমার কোন দোষ হইবে না, তোমার কোন গুনাহ্ হইবে না এবং সেই জন্য তোমাকে তিরস্কার করা যাইবে না।

ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়া না হইয়া থাকিলে তাহা পরে তিন সময়ে পড়া যায়। হয় ফরয পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে পড়িবে, না হয় সূর্যোদয়ের পর পড়িবে। নতুবা জুহরের নামাযের পূর্বে পড়িবে। কিন্তু ভুলিয়া যাওয়ার ভয়ে ফরযের পর পরই পড়িয়া লওয়া উত্তম—এই কথা অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই পর্যায়ে একটি হাদীস স্পষ্টঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ - (ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক ফজরের সুন্নাত দুই রাক্'আত (ফরযের পূর্বে) পড়ে নাই, সে যেন উহা সূর্যোদয়ের পরে পড়িয়া নেয়। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা হাদীসের মূল কথা সুস্পষ্ট। ফরয পড়িবার পূর্বে ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাত যদি কেহ না পড়িয়া বা পড়িতে না পারিয়া থাকে তাহা হইলে সূর্যোদয়ের পর পড়িয়া নেওয়ার নির্দেশ এখানে স্পষ্ট ভাষায় দেওয়া হইয়াছে।

দারে-কুত্‌নী ও হাকিম-এর বর্ণনায় এই কথাটির ভাষা ভিন্ন ধরণেরঃ

مَنْ لَّمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا -

যে লোক ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাত নামায সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়িতে পারে নাই, সে যেন তাহা পড়িয়া লয়।

মুহাদ্দিস হাকিম একটি স্বতন্ত্র বর্ণনায় এই কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন নিম্নের ভাষায়।

مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ -

যে লোক ফজরের সুন্নাত দুই রাক্'আত পড়িতে ভুলিয়া গিয়াছে, সে যেন তাহা পড়ে তখন, যখন সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী প্রথমোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করিবার পর লিখিয়াছেনঃ

قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض أَنَّهُ فَعَلَهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ -

বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবনে উমর এই হাদীস অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি ফজরের পূর্বে পড়িতে না পারিলে সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়িয়াছেন এবং কোন কোন বিশেষজ্ঞও এইরূপ আমল করিতেন। সুফিয়ান সওরী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায় ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এই পর্যায়ে গণ্য। (تحفة الاحوذى)

ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেনঃ ইমাম শাফেয়ী ফজরের পর এই দুই রাক্'আত নামায পড়িয়াছেন এবং তাহা 'কাযা' গণ্য হইত না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ফজরের ফরযের পূর্বে সুন্নাত পড়া না হইয়া থাকিলে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাহা পড়াই যাইবে না এবং অবশ্যই সূর্যোদয়ের পরে পড়িতে হইবে, এই কথা হাদীসে বলা হয় নাই। ইহাতে শুধু সেই দুই ব্যক্তির জন্যই নির্দেশ রহিয়াছে, যে এই দুই রাক্আত ইতিপূর্বে পড়িতে পারে নাই। তাহাকে বলা হইয়াছে, সে যেন তাহা সূর্যোদয়ের পর পড়িয়া লয়, যেন উহা ভুলিয়া না যায়। কেননা যথাসময়ে উহা না পড়িয়া থাকিলে তাহা তো পরে যে-কোন সময় পড়িতেই হইবে। অতঃপর লিখিয়াছেনঃ

وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ فِعْلِهِمَا بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ -

সেই দুই রাক্'আত সুন্নাত ফরয নামাযের পরই পড়িতে নিষেধ করা হইয়াছে—এমন কথা এই হাদীস হইতে বুঝা যায় না।

বরং দারে কুতনী, হাকেম ও বায়হাকী শরীফে উদ্ধৃত বর্ণনায় এই হাদীসের ব্যাখ্যা হইলঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا -

যে লোক সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সুন্নাত দুই রাক্'আত পড়িতে পারে নাই, সে যেন তাহা পড়িয়া লয়। অর্থাৎ ফরযের পরেই পড়া দোষের নয়। (نيل الاوطار)

জুহরের চার রাক্'আত সুন্নাত

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا (ترمذى)

হযরত আয়েশা (রা) হইত বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) জুহরের পূর্বে চার রাক্'আত সুন্নাত পড়িতে না পারিলে তিনি তাহা উহার পরে পড়িতেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা অর্থাৎ জুহরের ফরয-পূর্বের চার রাক্'আত সুন্নাত নবী করীম (স) কিছুতেই না পড়িয়া ছাড়িতেন না। পূর্বে—যথাসময়ে পড়িতে না পারিলে তাহা পরে পড়িতেন। কিন্তু পরে কখন?—পড়িতেন ফরয পড়ার পর দুই রাক্'আত সুন্নাত আদায় করার পর। ইবনে মাজাহ্ উদ্ধৃত এই হাদীসের ভাষা হইতেই তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। তাহা এইরূপঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ -

রাসূলে করীম (স) জুহরের ফরয-পূর্বে চার রাক্'আত (সুন্নাত) যখন পূর্বে পড়িতে না পারিতেন, তখন তিনি তাহা জুহরের ফরয-পরবর্তী দুই রাক্'আত সুন্নাতের পর পড়িতেন অর্থাৎ ফরয পড়া হইলে প্রথমে দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়িতেন।

এই হাদীস হইতে ফরয-পূর্ব সুন্নাতের পুরাপুরি সংরক্ষণ এবং ফরযের শেষ সময় পর্যন্ত উহা পড়ার সময়সীমা দীর্ঘায়িত হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। কেননা ফরয পড়া হইলেই পূর্ববর্তী না-পড়া সুন্নাতের সময়ে যদি নিঃশেষিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে পরে পড়া নামায 'কাযা' বলিয়া গণ্য হইত এবং তাহা ফরয-পরবর্তী দুই রাক্'আত সুন্নাতের পূর্বেই পড়িতে হইত। কিন্তু হাদীস হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (স) এই চার রাক্'আত সুন্নাত নামাযের ফরযের পূর্বে পড়িতে না পারিয়া পড়িয়াছেন পরবর্তী দুই রাক্'আতের পরে। অবশ্য কথাটিকে উল্টাইয়া এইভাবেও বলা যায় যে, পূর্বে না পড়িয়া থাকিলেও উহা যদি 'কাযা' না-ই হয়—যদি তাহা 'যথাসময়ে আদায়' গণ্য হয় তাহা হইলে তাহা শেষ দুই রাক্'আতের পূর্বেই পড়িতে হইত। কিন্তু তাহা যেহেতু ফরয-পরবর্তী দুই রাক্'আতের পূর্বে পড়া হয় না—পরার বিধান দেওয়া হয় নাই, সেইজন্য দুই রাক্'আতের পরে তাহা পড়িবার নির্দেশ করা হইয়াছে, এই জন্য বলিতে হইবে যে, এই চার রাক্'আত সুন্নাত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠিকভাবেই আদায় করা হইয়াছে। (تحفة الاحوذى شرح الترمذى)

নামাযের ইমামত

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىْ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَأَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهِ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ - (مسلم، ترمذى، نسائى)

হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, নামাযের জামা'আতে ইমামতি করিবে সেই ব্যক্তি, যে উপস্থিত লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব অধিক শুদ্ধভাবে পাঠ করিতে সক্ষম। এই দিক দিয়া সব লোক এক ও সমান হইলে ইমামতি করিবে সেই লোক, যে সুন্নাত ও শরীয়ত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ও বিদ্ধান হইবে। এই গুণেও সকলে সমান হইলে ইমামতি করিবে সেই লোক, যে আগে হিজরত করিয়াছে। হিজরতের সময়ও যদি তাহাদের বয়স সমান ও একই থাকে তাহা হইলে বয়সের দিক দিয়া অগ্রবর্তী ব্যক্তি ইমাম হইবে। (সেই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখিবে যে) কেহ যেন অপর কাহারো প্রভাব প্রতিপত্তির অধীন এলাকা ও পরিবেশে সেই লোকের উপর ইমাম হইয়া না বসে এবং তাহার ঘরে তাহার বসিবার আসনে তাহার অনুমতি ছাড়া যেন কেহ না বসে। —মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা দ্বীন-ইসলামের যাবতীয় আমল ও কাজের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রবর্তী কাজ হইল নামায। দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ বিধানে নামাযের গুরুত্ব ঠিক তাহাই, যাহা মানুষের গোটা দেহ সংস্থায় রহিয়াছে উহার আত্মার বা প্রাণের। কাজেই উহার ইমাম হওয়ার পদমর্যাদা যে অতি বড় দায়িত্বপূর্ণ ও প্রাণ প্রকম্পকারী ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক দিক দিয়া ইহা রাসূলে করীমের নায়েবী বা প্রতিনিধিত্ব করার সমান। এই কারণে মসজিদের মুসল্লী ও মুকতাদীদের মধ্য হইতে এমন ব্যক্তিকেই ইমাম বানাইতে হইবে, এই পদ ও দায়িত্বের জন্য যাহার যোগ্যতা অন্যান্যের তুলনায় অধিক রহিয়াছে। এই দিক দিয়া অপেক্ষাকৃতভাবে যে লোক রাসূলে করীমের অধিক নিকটবর্তী, তাঁহার সহিত যাহার সাদৃশ্য ও একাত্মতা রহিয়াছে অধিক মাত্রায়, রাসূলে করীমের দ্বীনী উত্তরাধিকার যে

লোক বেশী লাভ করিয়াছেন, তাহাকেই ইমাম হইতে হইবে। এই দৃষ্টিতে বিচার-বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে লোক সত্যিকার ঈমান লাভের পর কুরআন মজীদের সহিত বিশেষ ও গভীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে, উহাকে স্মরণে রাখিয়াছে, উহার অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, নিজের মন ও মগজে দৃঢ়মূল করিয়া লইয়াছে, তাঁহার দাওয়াত ও আইন বিধান যে লোক ভাল ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে, উহাকে নিজের মধ্যে প্রতিমূর্ত ও প্রতিফলিত করিয়া লইয়াছে, রাসূলে করীমের উত্তরাধীকারীদের মধ্যে সে-ই বড় উত্তরাধিকারী। আর যাহারা এই দিক দিয়া পশ্চাতে পড়িয়াছে, যাহারা ভাগ্যাহত, তাহাদের তুলনায় নামাযের ইমামত ও সামাজিক নেতৃত্ব করার অধিকার সর্বাপেক্ষা বেশী পাইবে প্রথমোক্ত ধরনের লোকেরা। সব নামাযী যদি এই দিক দিয়া সমান হয়, তাহা হইলে কুরআনের পর সুন্নাতের স্থান ও মর্যাদা বিধায় অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে তাহাকে, যে সুন্নাত, রাসূলের হাদীস ও শরীয়তের ইলমে অন্যদের তুলনায় বেশী পারদর্শী হইবে। এই ক্ষেত্রেও সব লোক সমান হইলে দেখিতে হইবে তাকওয়া পরহেযগারী ও নৈতিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিশিষ্ট কে? এবং এই দৃষ্টিতে যাহাকে অগ্রসর পাওয়া যাইবে তাহাকেই ইমাম বানাইতে হইবে। আর এই দৃষ্টিতে যদি লোকেরা সমান হয়, তাহা হইলে তুলনামূলকভাবে বেশী বয়সের লোককেই ইমাম বানাইতে হইবে। তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসে এখানে শব্দ হইল كبرهم سنا বয়সের দিক দিয়া বড়। কেননা বয়সের বড়ত্ব সর্বজনস্বীকৃত। অল্প বয়সের ইমামের প্রতি আস্থা ও ভক্তি ততটা গাঢ় না হওয়াই স্বাভাবিক।

নামাযের ইমামতের জন্য এখানে বর্ণিত পরম্পরা খুবই যুক্তিসঙ্গত। বিবেক ও বিজ্ঞানের বিচারেও ইহা নির্ভুল। মনে হয় এই ক্ষেত্রে ইহা ছাড়া অন্য কিছু যেন হইতেই পারে না। হইলে অবাঞ্ছনীয় হইয়া যাইবে। বস্তুত রাসূলে করীমের উপস্থাপিত সব ব্যবস্থাই এমনি সুন্দর, নির্ভুল ও অতীব যুক্তিসঙ্গত।

হাদীসের বাক্য اقرأهم لكتاب الله -এর সোজা তরজমা করা হইয়াছে 'যে লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব অধিক শুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে পাঠ করিতে সক্ষম'। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা কুরআন শুধু হেফ্জ করাকেই বুঝায় না, বুঝায় না খুব বেশী মাত্রায় শুধু তিলাওয়াত করা। বরং কুরআন হেফ্য করার সঙ্গে সঙ্গে উহার বিশেষ জ্ঞান ও উহার সহিত বিশেষ সম্পর্ক রক্ষাকারীকেই বুঝানো হইয়াছে। নবী করীম (স)-এর যুগে যাহাদিগকে 'কুররা' বা 'কারী' বলা হইত, ইহাই ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট্যের কারণ। এই হিসাবে হাদীসের তাৎপর্য এই হইবে যে, নামাযের ইমামতের জন্য অধিক যোগ্য হইল সেই ব্যক্তি, যে লোক আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কিত ইল্ম ও উহার সহিত সম্পর্ক রক্ষার দিক দিয়া অন্যদের তুলনায় অগ্রবর্তী। ইহার পর সুন্নাত ও শরীয়ত সম্পর্কিত ইল্ম হইল ফযীলতের দ্বিতীয় মান। বলা বাহুল্য, তদনুযায়ী আমলও উহাতে গণ্য। কেননা আমল ছাড়া ইল্মের কোন মূল্যই সেখানে স্বীকৃত ছিল না।

ফযীলতের তৃতীয় মান হইল নবী করীম (স)-এর বিশেষ যুগ-পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে মক্কা শরীফ হইতে মদিনা শরীফে হিজরত করার ব্যাপারে অগ্রবর্তিতা। আলোচ্য হাদীসে তাই তৃতীয় পর্যায়েই উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য রাসূলের পরে এই হিজরত জিনিসটিই অবশিষ্ট থাকে নাই। এই কারণে ফিকাহবিদগণ এই স্থানে অগ্রাধিকার দানের তৃতীয় মান হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাকওয়া পরহেজগারীকে। আর ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কেননা 'তাকওয়া' হইল মন-মানসিকতা ও আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হিজরত। এই দুই প্রকারের হিজরতের মধ্যে সঙ্গতি ও সাযুজ্য সুস্পষ্ট।

অগ্রাধিকারের চতুর্থ মান হইল বয়সের দিক দিয়া অগ্রবর্তিতা। বলা হইয়াছে, পূর্বোক্ত তিনটি মানের দৃষ্টিতে মুসল্লীরা সমান ও পার্থক্যহীন হইলে বয়সের দিক দিয়া যে লোক অগ্রসর হইবে, তাহাকেই ইমাম বানাইতে হইবে।

হাদীসের শেষাংশে দুইটি জরুরী হিদায়ত দেওয়া হইয়াছে। একটি এই যে, কেহ অপর কাহারো প্রভাবান্বিত এলাকায় গেলে সেখানে যেন সে ইমামতি না করে, বরং সেই স্থানীয় প্রভাবশালী লোকের পিছনেই যেন নামায পড়ে। তবে সেই লোক নিজেই যদি কাহাকেও ইমামতের জন্য অগ্রসর করিয়া দেয়, তবে ভিন্ন কথা।

আর দ্বিতীয় হিদায়ত হইল, কেহ যদি কাহারো ঘরে গমন করে তবে সেই ঘরের মালিকের নিজস্ব বিশেষ আসনে বসিবে না। ঘরের মালিক নিজে বসাইলে তখন অবশ্য কোন আপত্তি থাকিবে না।

এই দুইটি হিদায়তের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট এবং ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, নামায—ইমামের পিছনে জামা'আতের সহিত নামায মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মূর্ত প্রতীক। এ ক্ষেত্রের নেতৃত্বের ব্যাপারটি কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়, বরং উক্ত প্রতীক অনুসারে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা মুসলমানদের দ্বীনী দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইমামত সংক্রান্ত হাদীসসমূহও এই বিশাল ও প্রশস্ততর প্রেক্ষিতে অধ্যয়ন করা আবশ্যক। কেননা এসব হাদীসে কেবল নামাযের ইমামতের কথাই বলা হয় নাই, সমাজ ও রাষ্ট্রও ইহার মধ্যে শামিল।

ইমামের গুণ—বৈশিষ্ট্য

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْا اَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ فَاِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ ۔ (دار قطنى - بيهقى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা উত্তম ও অধিক ভালো লোক, তাহাদিগকেই নিজেদের ইমাম বানাইবে। কেননা তোমাদের রব্ব ও মালিক আল্লাহ্‌র দরবারে তাহারাই হইবে তোমাদের প্রতিনিধি।

—দারে কুত্‌নী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ইমাম নামাযের জামা'আতে আল্লাহ্‌র দরবারে সমস্ত লোকের প্রতিনিধিত্ব করে, ইহা সুস্পষ্ট কথা। এই কারণে জামা'আতের লোকদের—মুক্তাদীদের নিজেদেরই কর্তব্য হইল, এই গুরুত্বপূর্ণ ও মহান উদ্দেশ্যের জন্য তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে অধিকতর উত্তম ও ভালো লোককে নিযুক্ত করিবে।

রাসূলে করীম (স) যতদিন দুনিয়ায় বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তিনি নিজেই সব নামাযে ইমামতি করিতেন। পরে মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ায় তিনি যখন অক্ষম হইয় পড়িয়াছিলেন, তখন ইল্‌ম ও আমল উভয় দিক দিয়া সেই সমাজের সর্বাধিক উত্তম ও অধিকতর যোগ্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে ইমামতি করার জন্য নির্দেশ দান করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত পূর্বোদ্ধৃত হাদীসটির লক্ষ্যও তাহাই। এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ও দারে কুতনী কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, উত্তরকালে মুসলমান সমাজে রাসূলের এই নির্দেশ পুরাপুরি পালিত হয় নাই। ফলে তাহাদের সামাজিক বিপর্যয় অপরিহার্য হইয়া পড়ে। মনে রাখা আবশ্যক যে, হাদীসটির লক্ষ্য কেবল নামাযের ইমামতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইহার লক্ষ্য ব্যাপক—সমগ্র সামাজিক ও জাতীয় ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য ও অনুসরণীয়। রাসূলে করীম (স) এবং তাঁহার পর খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে এই নির্দেশ কাজ হইয়াছে। পরে ইহার গুরুত্ব অনেকটা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। আর এই অবাঞ্ছিত ঘটনার কারণেই মুসলিম সমাজের সামগ্রিক বিপর্যয় সূচিত হইয়াছে। এই হাদীস অনুযায়ী আমল করা হইলে সে বিপর্যয় হইতে মুসলিম জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংস ও অবক্ষয় হইতে আজিও রক্ষা করাযায়।

ইমামের দায়িত্ব ও জওয়াবদিহি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَعْلَمْ اَنَّهُ ضَامِنٌ

مَسْئُوْلٌ لِمَا ضَمِنَ وَاِنْ اَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ ـ (طبرانى فى الاوسط ـ كنز العمال)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি (নামাযের) জামা'আতে ইমামতি করিবে, তাহার উচিত আল্লাহ্কে ভয় করা এবং একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, মুক্তাদীদের নামাযের জন্যও সে-ই দায়ী ও যিম্মাদার। আর তাহাকে তাহার দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই সওয়াল করা হইবে। সে যদি ভালোভাবে নামায পড়াইবার কাজ করে তাহা হইলে তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া যেসব মুক্তাদী নামায আদায় করে তাহাদের মোট সওয়াবের সমান সওয়াব তাহাকে দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহাতে মুক্তাদীদের সওয়াব একবিন্দু কমিয়া যাইবে না। আর নামাযে যে ত্রুটি ও দোষ হইবে, তাহা সম্পূর্ণ একা ইমামের উপরই বর্তিবে। —তাবারানী ফিল-আওসাত, কানযুল উম্মাল

ব্যাখ্যা হাদীসে ইমামের যে কঠিন দায়িত্ব ও সেইজন্য জওয়াবদিহির কথা বলা হইয়াছে, তাহা খুবই স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। একটু ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা কেবল নামাযের ইমাম সম্পর্কেই সত্য হইবে না, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ইমামতি—তথা নেতৃত্ব সম্পর্কেও এই কথা সত্য। কাজেই নামাযের ইমাম ও সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ইমাম তথা নেতা—উভয়েরই কর্তব্য হইল আল্লাহ্কে ভয় করিয়া ও তাহার নিকট জওয়াবদিহির অনুভূতি নিজের মধ্যে জাগ্রত রাখিয়া সব কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়া। অন্যথায় সব দোষ, অন্যায় ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য একা তাহাকেই দায়ী হইতে হইবে এবং আল্লাহ্র নিকট সেই জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ইমাম ও মুকতাদী

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ خَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلّٰى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُوْدًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ اَوْقَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ ـ (ترمذى ـ بخارى ـ مسلم)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তিনি কিছুটা আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি আমাদিগকে লইয়া বসা অবস্থায় নামায পড়িলেন। আমরাও তাহার সহিত বসিয়া বসিয়া নামায পড়িলাম। পরে তিনি মুখ ফিরাইলেন এবং বলিলেনঃ ইমাম—অথবা বলিলেন, ইমাম বানানো হয় —শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তাহার অনুসরণ করা হইবে। অতএব, ইমাম যখন 'আল্লাহু আকবার' বলিবে তোমরাও তখন 'আল্লাহু আকবার' বলিবে, যখন রুকূ দিবে তখন তোমরাও রুকূ'তে যাইবে, যখন মাথা তুলিবে তোমরাও তখন উঠিয়া দাঁড়াইবে, আর যখন বলিবেঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ـ আল্লাহ্ শুনিলেন যে তাঁহার প্রশংসা করিল।

তখন তোমরাও বলিবেঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ـ হে আমার আল্লাহ্! তোমার জন্যই সব প্রশংসা।

যখন ইমাম সিজদা করিবে, তোমরাও তখন সিজদায় চলিয়া যাইবে। আর যখন বসিয়া নামায পড়িবে, তখন তোমরাও সকলে বসিয়া নামায পড়িবে। —তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর বর্ণনা, তিনি রাসূলে করীমের খাদিম ছিলেন। প্রথমেই তিনি রসূলে করীম (স)-এর ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিরমিযী বর্ণিত উপরোদ্ধৃত হাদীসে শুধু তাঁহার আহত হওয়ার কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বুখারী উদ্ধৃত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

فَجُحِشَتْ سَاقُهُ اَوْكَتِفُهُ - তাঁহার পায়ের নলা কিংবা স্কন্ধ আহত হইয়াছে।

অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ - তাঁহার ডান পার্শ্ব আহত হইয়াছে।

আবূ দাউদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন হযরত জাবির (রা) হইতে। তাহাতে বলা হইয়াছে, এই ঘটনাটি মদীনা শরীফে সংঘটিত হয় এবং তাঁহার পা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মূলত ইহা একই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা হইতে পারে, হইতে পারে একাধিক ঘটনার বর্ণনা।

আলোচ্য হাদীসটি হইতে ইমামের পেছনে জামা'আতের সহিত নামায পড়ার নিয়ম জানা যাইতেছে। ইহা হইতে প্রথমে জানা যায় যে, মুক্তাদী নামাযে ইমামকে মানিয়া ও অনুসরণ করিয়া নামায পড়িবে। ইমাম তাকবীর করিলে তাহার পর মুক্তাদি তাকবীর বলিবে, তাহার পূর্বে নয়, সঙ্গে সঙ্গেও নয়। কেননা হাদী ও অক্ষরটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থঃ ইমামের তাকবীর বলা শেষ হইলে পরে মুক্তাদী তাকবীর বলিবে। ইমাম যদি বসিয়া নামায পড়ে—অবশ্য কোন বিশেষ ওজরের কারণে—তাহা হইলে মুক্তাদী অনুরূপ অক্ষম না হইলেও তাহাদিগকে বসিয়াই নামায পড়িতে হইবে। ইহা হইতে ইমামের মর্যাদা ও ইমামকে সর্বতোভাবে মানিয়া ও অনুসরণ করিয়া নামায পড়ার বাধ্যবাধকতা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। এই পর্যায়ে হযরত, আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ 'নবী করীম (স) নিজের ঘরে নামায পড়িলেন—তিনি অসুস্থ থাকায় বসিয়া নামায পড়িলেন। তাঁহার পিছনে যাহারা সমবেত হইয়াছিল তাহারা প্রথমে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল। তখন নবী করীম (স) তাহাদিগকে বসিয়া পড়িতে ইঙ্গিত করিলেন। পরে তিনি তাহাদের প্রতি ফিরিয়া উপরিউক্ত কথাটি বলিলেন (বুখারী, মুসলিম)। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের শুরু কথা হইলঃ

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ -

ইমাম তো অনুসরণ করার জন্যই বানানো হয়। অতএব তাহার হইতে ভিন্নতর নিয়ম অনুসরণ করিয়া কোনরূপ বিরোধ করিও না।

মুসলিম, ইবনে মাজাহ্ ও নাসায়ী (রা) হযরত জাবির (রা) হইতে এই হাদীসটিই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কথা ও ভাষায় কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। সেই বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ রাসূলে করীম (স) অসুস্থতার কারণে বসিয়া নামায পড়িলেন। আমরা তাঁহার পিছনে নামায পড়িলাম। তিনি বসা। আবূ বকর (রা) লোকদিগকে তাঁহার তকবীর শোনাইতেছিলেন—মুকাব্বিরের কাজ করিতেছিলেন। তখন নবী করীম (স) আমাদের দিকে ফিরিলেন ও আমাদিগকে দাঁড়ানো দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। পরে আমরা তাঁহার সহিত বসিয়া বসিয়া নামায পড়িলাম। সালাম ফিরাইবার পর তিনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একটু আগে তোমরা তো পারসিক ও রোমানদের মত কাজ করিতেছিলে। কেননা তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে, আর তাহাদের রাজা-বাদশাহ-নেতারা বসিয়া থাকে। কাজেই তোমরা তাহা করিও না।

اِئْتَمُّوْا بِاَئِمَّتِكُمْ - তোমরা তোমাদের ইমামগণকে অনুসরণ করিয়া চল।

এই হাদীসের মূল তাৎপর্য হইল, ইমামকে অনুসরণ করিয়াই নামায পড়িতে হইবে। ইমাম বসিয়া পড়িলে মুক্তাদীদিগকেও বসিয়া বসিয়া পড়িতে হইবে। তাহার বিরোধিতা করা যাইবে না। সব ফিকাহবিদের চূড়ান্ত মত ইহাই। চারজন প্রধান সাহাবীও এ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন সাহাবীই ইহার বিপরীত মত দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তাবেয়ীদের মতও ইহাই। এই ব্যাপারে তাঁহাদেরও 'ইজমা' হইয়াছে।

ইবনে আবূ শায়বাহ মুহাদ্দিস এই হাদীসের সঙ্গে রাসূলে করীমের একটি বাক্য সহীহ্ সনদে সংযোজিত করিয়াছেন। তাহা হইলঃ

لَا تُبَادِرُوْا اَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ ـ

তোমরা রুকূ বা সিজ্‌দায় ইমামের আগে-ভাগে চলিয়া যাইও না।

অর্থাৎ ইমামের আগে রুকূতে যাইবে না, তাহার সিজ্‌দায় যাওয়ার আগে সিজদায় যাইবে না। যদি কোন মুক্তাদী সিজদা হইতে মাথা তুলিয়া দেখে যে, ইমাম তখনো সিজদায় রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় সিজদায় যাইতে হইবে এবং ইমাম যতক্ষণ সিজদায় থাকিবে ততক্ষণ তাহাকে সিজদায় থাকিতে হইবে। (فتح البارى شرح البخارى)

পূর্বে বিবৃত বিশাল, বিস্তীর্ণ প্রেক্ষিতে এই হাদীসটিও পঠিতব্য।

ইমামকে 'লোকমা' দেওয়া

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلٰوةً فَقَرَأَ فِيْهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِاُبَيٍّ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ ـ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ ـ (ابو داؤد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) একবার নামাযে ইমামতি করিলেন। তিনি নামাযে কুরআন পড়িলেন। কুরআন পড়িতে তাঁহার একস্থানে বাধিয়া গেল। পরে নামায শেষ করিয়া তিনি মুক্তাদীদের প্রতি ফিরিলেন ও হযরত উবায় ইবনে কা'ব (রা)-কে বলিলেনঃ তুমি কি আমাদের সাথে নামায পড় নাই? তিনি বলিলেন, জি হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেনঃ তাহা হইলে কে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিল? —আবূদাউদ

ব্যাখ্যা এই হাদীসটি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম নামাযে কুরআন পড়াকালে ভুল করিয়া বসিলে, কোন আয়াত ছাড়িয়া গেলে কিংবা এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য আয়াত পড়িয়া ফেলিলে অথবা পড়া অগ্রসর না হইলে— আটকাইয়া গেলে মুক্তাদী তাহার এই ভুল শোধরাইয়া দিতে পারে। অনেকের মতে ইহা মুস্তাহাব। করা যাইতে পারে, না করিলে কোন দোষ নাই। মনসূর বিল্লাহ্‌র মতে ইহা করা ওয়াজিব। যায়দ ইবনে আলী ও ইমাম আবূ হানীফা (রা) ইহা করাকে মাকরূহ মনে করিয়াছেন। ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেন, 'লোক্‌মা' দেওয়ার বিষয়ে লোকদের মধ্যে মত-বিরোধ রহিয়াছে। হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বলা হইয়াছঃ

اِنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا ـ তাঁহারা দুইজন এই কাজ করায় কোনরূপ দোষ দেখেন নাই।

আতা, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়ায় প্রমুখ ফকীহ্‌ও এই মত পোষণ করিতেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) ইহাকে মাকরূহ মনে করিতেন আর ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিয়াছেনঃ

اِذَا اسْتَفْتَحَهُ الْاِمَامُ الْفَتْحَةُ عَلَيْهِ ـ

ইমাম যদি চাহে যে, তাহার ভুল শোধরাইয়া দেওয়া হউক, তাহা হইলে তাহার ভুল শোধরাইয়া দাও।

হযরত আলী (রা) বলিয়াছেনঃ

اِذَا اسْتَطْعَمَكَ الْاِمَامُ فَاَطْعِمْهُ ـ

ইমাম খাইতে চাহিলে তাহাকে খাওয়াও অর্থাৎ ভুল শোধরাইয়া দাও।

ইমাম শাওকীন লিখিয়াছেন, ইমামের ভুল শোধরাইয়া দেওয়ার পক্ষের দলীল অকাট্য। যে নামাযে কুরআন উচ্চস্বরে পড়া হয় তাহাতে যদি সে কোন আয়াত ভুলিয়া যায় তবে তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া, কোন 'রুকন' থাকিয়া গেলে তকবীর বা তসবীহ দ্বারা সেই ভুল সারাইয়া দেওয়া মুক্তাদীর উচিত। (نيل الاوطار)

মসজিদে নামায

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا - (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ সব রকমের জনপদ ও জনবসতির মধ্যে তথায় অবস্থিত মসজিদসমূহই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় এবং উহাদের হাট-বাজারগুলিই হইতেছে অধিক অপছন্দনীয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা নামায যে ধরনের ইবাদত, তাহাতে উহার জন্য সামষ্টিক ব্যবস্থা কায়েম হওয়াই শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অপরিহার্যও। নামাযের এই সামষ্টিক ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল হইল মসজিদ। মসজিদেই জামা'আতের সহিত—বহু লোক একত্রিত হইয়া ও কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সারিবদ্ধ হইয়া—নামায পড়া হয়। বস্তুত মুসলমানদের দ্বীনী যিন্দেগী গড়িয়া তোলার ব্যাপারে মসজিদ ও উহাতে জামা'আতের সহিত নামাযের যে কতখানি গুরুত্ব তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই কারণে নবী করীম (স) জামা'আতের সহিত নামায পড়ার যেমন তাকীদ করিয়াছেন, তেমনি মসজিদসমূহের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথাও নানাভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কা'বা ঘরের সাদৃশ্যে মসজিদকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্র ঘর বলিয়াছেন। উহাকেই মুসলিম জাতির মিলনকেন্দ্র বানাইয়াছেন। লোকদের দেহ যেখানেই থাকুক, তাহাদের দিল যেন মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট ও মসজিদের নামাযের জন্য উন্মুক্ত-উদগ্রীব হইয়া থাকে, নবী করীম (স) তাহাই চাহিয়াছেন এবং সেইরূপ কথাই তিনি নানা সময় নানা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্ধৃত হাদীসটি এই পর্যায়েরই একটি বাণী।

এই হাদীসটির সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য মনে রাখা দরকার যে, মানুষের জীবনের দুইটি দিক রহিয়াছে। একটি দিক মালাকূতী ও অধ্যাত্মিক। মানুষের এই দিকটি জ্যোতির্ময়, অতীব সূক্ষ্ম। আর অপর দিকটি হইল বস্তুগত, পাশবিক, অন্ধকারময় ও স্থূল। মানুষের মালাকূতী ও আধ্যাত্মিক দিকটির দাবি হইল আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁহার যিক্র-এ আত্মনিয়োগ। তাহা করা হইলেই মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটির পরিমার্জনা ও পরিপূর্ণতা বিধান হয়। এই কারণেই মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমত ও ভালোবাসার অধিকারী হইতে পারে। আর এই কাজের কেন্দ্রস্থল হইল মসজিদ। মসজিদে এইসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়াই উহাকে 'আল্লাহ্র ঘর' বলা হয়। দুনিয়ার জনপদ ও জনবসতিসমূহের মধ্যে মসজিদ এই কারণেই আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়।

পক্ষান্তরে হাট-বাজার-বন্দর ও বিকিকিনি কেন্দ্রসমূহ মূলত মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্র। আর এখানকার তৎপরতা এতই স্থূল ও বস্তুগত যে, এখানকার ঝামেলায় পড়িয়া মানুষ সাধারণত আল্লাহ্-বিমুখ হইয়া পড়ে। মানুষ এখানে আসিয়া প্রায়ই আল্লাহ্কে ভুলিয়া যায়। এইসব ক্ষেত্রের পরিবেশ মসজিদ সমূহের পরিবেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

হাদীসটির মূল লক্ষ্য হইল, মানুষ যেন মসজিদসমূহের দিকেই আকৃষ্ট থাকে এবং উহাকেই যেন তাহাদের জীবনের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করে। কিন্তু তাহার অর্থ নিশ্চয়ই ইহা নয় যে, মানুষ মসজিদ সর্বস্ব হইয়া থাকিবে, মসজিদের বাহিরের বিশাল জগতের বিপুল তৎপরতা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হইয়া যাইতে হইবে, বরং মসজিদ ও মসজিদ সংক্রান্ত তৎপরতাকেই জীবনের প্রধান

ব্যস্ততায় পরিণত করিতে হইবে এবং উহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে মসজিদের বাহিরে বিশাল বিস্তীর্ণ জীবন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত অপর একটি হাদীস হইলঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهٗ نُزُلَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ ـ (بخارى، مسلم)

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোকই যে সময়ই—সকালে কিংবা সন্ধ্যায় নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদের দিকে গমন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাতের মেহমানীর সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখেন—সেযতবারই—সকাল ও সন্ধ্যায় তথায় গমন করুন না কেন।

—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসের অর্থ মসজিদে যে লোকই যায়, সে-ই হয় আল্লাহ্র মেহমান এবং প্রত্যেকবারই সে আল্লাহ্র নিকট হইতে মেহমানীর সামগ্রী ও মর্যাদা পাইবে।

মসজিদের দোয়া

عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ (مسلم)

আবূ উসাইদ সাঈদী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ হযরত নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যখন মসজিদে প্রবেশ করিবে, তখন যেন সে বলেঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

হে আল্লাহ্! আমার জন্য তোমার রহমতের দুয়ার খুলিয়া দাও।

আর যখন সে মসজিদ হইতে বাহির হইতে থাকিবে, তখন যেন সে দোয়া করেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

হে আল্লাহ্! তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার প্রার্থনা করিতেছি—তুমি তাহা আমাকে দান কর।

ব্যাখ্যা কুরআন ও হাদীসে 'রহমত' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরকালীন, দ্বীনী ও আধ্যাত্মিক নিয়ামত বুঝায়। আর 'ফযল' শব্দটি রিযিক প্রভৃতি বৈষয়িক নিয়ামতের অবদান এবং উহার আধিক্য ও প্রাচুর্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণে নবী করীম (স) মসজিদে প্রবেশকালে রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য দোয়া করার শিক্ষা দিয়াছেন। কেননা মসজিদ হইল দ্বীনী, আধ্যাত্মিক ও পরকালীন নিয়ামত হাসিল করার স্থান। আর মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় আল্লাহ্র নিকট বৈষয়িক নিয়ামতসমূহ হাসিলের জন্য দোয়া করার উপদেশ দিয়াছেন। আর এই উভয় দোয়াই যে নিজ নিজ পরিবেশ ও ক্ষেত্রের সহিত পুরাপুরি সঙ্গতিপূর্ণ, তাহা সকলের নিকট সুস্পষ্ট।

মসজিদে প্রথম নামায

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ ـ (بخارى، مسلم، ترمذى)

আবূ কাতাদা (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন প্রথমেই এবং বসিয়া পড়ার পূর্বেই দুই রাক্'আত নামায পড়িয়া লয়।

—বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী

ব্যাখ্যা মসজিদের সহিত আল্লাহ্‌র বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই কারণে মুসলমানদের উপর উহার একটা বিশেষ হকও রহিয়াছে, আছে উহার ব্যাপারে বিশেষ আদব কায়দা। আর তাহা এই যে, মসজিদে প্রবেশ করিয়াই আসন গ্রহণ করিবে না—বসিয়া পড়িবে না। বরং বসিবার পূর্বেই দুই রাক্'আত নামায পড়িয়া লইবে। এই দুই রাক্'আত নামাযকে পরিভাষায় 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' (تحية المسجد) বলা হয়। ইহার অর্থ 'মসজিদের সম্মানে স্বীকারমূলক দুই রাক্'আত নামায'। তবে ইহা ওয়াজিব-ফরয কিছু নয়। ইহা সব ইমামের মতেই মুস্তাহাব নামায। এই হাদীস হইতে এই কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, মসজিদে প্রবেশ করিয়াই বসিয়া পড়া উচিত নয়, বরং প্রথমেই—বসিবার পূর্বেই—দুই রাক্'আত নামায মসজিদের খাতিরে পড়া আবশ্যক।

ইবনে হাজার আল-আসকালানী বুখারীর 'শরাহ্ ফত্‌হুল বারী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হযরত কাতাদাহ (রা) বর্ণিত এই হাদীসটির বিশেষ কারণ হইল, তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নবী করীম (স) সাহাবিদের পরিবেষ্টনে বসিয়া রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনিও বসিয়া গেলেন। তখন নবী করীম (স) তাঁহাকে বলিলেনঃ ما منعك ان تركع নামায পড়িতে তোমাকে কে নিষেধ করিয়াছে?

তিনি বলিলেনঃ আমি আপনাকে ও অন্যান্য লোকদিগকে বসা দেখিতে পাইলাম, সেইজন্য নামায পড়ি নাই। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তোমাদের কেহ যখন মসজিদে প্রবেশ করিবে, সে যেন তখনই দুই রাক্'আত নামায পড়িয়া লয় (মুসলিম)। নবী করীম (স) নিজেই বলিয়াছেন, মসজিদের হক হইল বসিবার পূর্বে দুই রাক্'আত নামায পড়া।

মসজিদ নির্মাণের সওয়াব

عَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ - (بخارى،مسلم)

হযরত উসমান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে লোক আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার নিকট হইতে সওয়াব পাইবার আশায়—মসজিদ নির্মাণ করিবে, মসজিদ নির্মাণের জন্য চেষ্টা চালাইবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাতে একটি জাঁকজমকপূর্ণ মহল নির্মাণ করিবেন।

—বুখারী মুসলিম

ব্যাখ্যা কুরআন মজীদ ও হাদীস হইতে এই কথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মানুষ দুনিয়ায় খালিস নিয়্যতে যে কাজই করিবে, পরকালে উহার সওয়াব পাইবে। কাজেই দুনিয়ায় মসজিদ নির্মাণ করিলে পরকালে জান্নাতে আল্লাহ্‌র বিশেষভাবে নির্মিত কোন প্রাসাদ লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক হইবে না। বরং আল্লাহ্‌র বিশাল ব্যবস্থার সহিত ইহা পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। মনে রাখা আবশ্যক, একখানা ঘর, পাকা বিল্ডিং কিংবা কাঁচাঘর তুলিয়া দিলেই 'মসজিদ' নির্মাণ হয় না। মসজিদ নির্মাণের মূল লক্ষ্য হইল, এমন একটা কেন্দ্র স্থাপন, যেখানে মুসলমান জনগণ দিন-রাত্রে পাঁচবার ও প্রতি শুক্রবার জুমআর সময় অবাধে ও নির্বিশেষে উপস্থিত ও একত্রিত হইয়া নামায পড়িতে ও সব রকমের দ্বীনী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে পারে। এই কাজের ফলে মুসলিম সমাজের জনগণ দ্বীনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হইয়া উঠিবে। আর এই কাজ যে অতুলনীয়, তাহা নিঃসন্দেহ।

অবশ্য মুসলমানদের জন্য সমস্ত যমীনই মসজিদের মতো এই হিসাবে যে, সব পাক-জায়গায়ই নামায পড়া সম্পূর্ণ জায়েয। রাসূলে করীমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল, পাক যমীনের যে কোন স্থানে নামায পড়া তাঁহার ও উম্মতের জন্য সম্পূর্ণ জায়েয করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নামায ইসলামের ভিত্তি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ـ (بخارى، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। তাহা হইলঃ আল্লাহ্ ছাড়া কেহ ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল—এই কথার সাক্ষ্যদান, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা।

—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসে ইসলামের মৌল ব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেশ করা হইয়াছে। বস্তুত কালিমায়ে তায়্যিবার প্রতি ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত—এই চারিটি কাজও মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এইভাবেই ইসলাম পূর্ণত্ব লাভ করে। হাদীসের কথাটি দৃষ্টান্তমূলক। একটি তাঁবু দাঁড় করাইতে হইলে উহার জন্য চারিদিকে চারিটি এবং মাঝখানে একটি—এই পাঁচটি খুঁটির আবশ্যক। এই খুঁটি না হইলে তাঁবু দাঁড় করা যাইতে পারে না। ইসলামও এই পাঁচটি জিনিস ছাড়া রূপলাভ করিতে পারে না। এই পাঁচটি হইল উহার খুঁটি বিশেষ। খুঁটিগুলি সরাইয়া দিলে যেমন তাঁবুটি নীচে পড়িয়া যাইবে, এই পাঁচটি না হইলেও ইসলাম খতম হইয়া যাইবে।

এই দৃষ্টান্তমূলক কথা হইতে বুঝা গেল যে, পাঁচটি জিনিস সম্পূর্ণ ইসলাম নয়, এই পাঁচটি জিনিস হইলেই ইসলামের সবকিছু হইয়া গেল না—ঠিক যেমন পাঁচখানি খুঁটিই একটি দাঁড় করা তাঁবুর সবকিছু নয়। পাঁচখানি খুঁটি হইলেই একটি পূর্ণাঙ্গ তাঁবু বা ঘর দাঁড়াইয়া গেল না। ইসলামের ব্যাপারও তাই। উক্ত পাঁচটি কাজ করা হইলেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম হইয়া যায় না। যেমন এই পাঁচটি কাজ কিংবা ইহার কোন একটি ছাড়াও ইসলামের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই হাদীসটিতে একসঙ্গে কালিমা-নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত এই সবকয়টির গুরুত্ব অকাট্য ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইমাম নববী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ

اِعْلَمْ اَنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَصْلٌ عَظِيْمٌ فِىْ مَعْرِفَةِ الدِّيْنِ وَعَلَيْهِ اِعْتِمَادُهٗ وَقَدْ جَمَعَ اَرْكَانَهٗ ـ

জানিয়া রাখ, এই হাদীসটি দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ব্যাপারে একটি বিরাট মূলকথা। দ্বীন ইহার উপর নির্ভরশীল, ইহাতে দ্বীনের সবকয়টি স্তম্ভ একত্রে উল্লেখিত হইয়াছে।

মুসনাদে আহমদ-এ জিয়াদ ইবনে নয়ীম আল-হাজরামী বর্ণিত একটি হাদীস এই পর্যায়ে উল্লেখ্য। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللّٰهُ مِنَ الْاِسْلَامِ فَمَنْ اَتٰى بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِيْنَ عَنْهُ شَيْئًا حَتّٰى يَاْتِىَ بِهِنَّ جَمِيْعًا الصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ ـ (مسند احمد)

আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামে চারিটি ইবাদত মৌলিকভাবে ফরয করিয়াছেন। কেহ উহার মধ্য হইতে মাত্র তিনটি কাজ করিলে পূর্ণ ইসলাম পালনের দায়িত্বের দিক দিয়া তাহা কখনো যথেষ্ট হইতে পারে না, যতক্ষণ না এই সব কয়টিই সে পালন করিবে। সেই ইবাদত চারিটি হইলঃ নামায, যাকাত, রমযান মাসের রোযা ও আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ।

নবী করীম (স)-এর অপর একটি হাদীসে এই কথাটি আরো স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। হাদীসটি এইঃ

اَلدِّيْنُ خَمْسٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا دُوْنَ شَيْءٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَبِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ هٰذِهٖ وَاحِدَةٌ وَالصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ عَمُوْدُ الدِّيْنِ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ الْاِيْمَانَ اِلَّا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةُ طَهُوْرٌ مِّنَ الذُّنُوْبِ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ الْاِيْمَانَ وَلَا الصَّلٰوةَ اِلَّا بِالزَّكٰوةِ فَمَنْ فَعَلَ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَ ثُمَّ جَاءَ رَمَضَانُ فَتَرَكَ صِيَامَهٗ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ الْاِيْمَانَ وَلَا الصَّلٰوةَ وَلَا الزَّكٰوةَ فَمَنْ فَعَلَ هٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعَةَ ثُمَّ تَيَسَّرَ لَهُ الْحَجُّ وَلَمْ يُوْصِ بِحَجَّتِهٖ وَلَمْ يَحُجَّ عَنْهُ بَعْضُ اَهْلِهٖ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ الْاَرْبَعَ الَّتِيْ قَبْلَهَا ـ (نيل الاوطار ج ١، ص ٧١)

দ্বীন ইসলামের পাঁচটি কাজ এমন যে, উহার একটি ছাড়া অপর কোনটি আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন না। তাহা হইলঃ আল্লাহ্ ছাড়া কেহ মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ্ তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার কিতাব, জান্নাত ও জাহান্নাম, মৃত্যুর পর জীবন—এই সব কয়টির প্রতি বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান। ইহা পাঁচটির একটি আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায হইল দ্বীন ইসলামের খুঁটি। আল্লাহ্ নামায না পড়িলে তাহার ঈমান কবুল করিবেন না। যাকাত হইল গুনাহ হইতে পবিত্রতা লাভের উপায়, আল্লাহ্ ঈমান ও নামায কবুল করিবেন না যকাত আদায় না করিলে (অবশ্য যাহার উপর যাকাত ফরয তাহার সম্পর্কেই এই কথা)। যে লোক এই তিনটি করিল, কিন্তু রমযানের মাস আসিলে সে ইচ্ছা করিয়াই রোযা তরক করিল, আল্লাহ্ তাহার ঈমান, নামায ও যাকাত কবুল করিবেন না। যে লোক এই চারিটি কাজ করিল, পরে হজ্জ করা তাহার পক্ষে সহজ হইলেও তাহা করিল না, সেই জন্য কাহাকেও অসিয়ত করিয়াও গেল না এবং তাহার বংশের কোন লোকও তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিল না, আল্লাহ্ তাহার পূর্বোদ্ধৃত চারিটি কাজ কবুল করিবেন না।

মুহাদ্দিস ইবনে আবূ হাতিম তাঁহার পিতার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, উপরোদ্ধৃত দীর্ঘ বাণীটি কোন হাদীস নয়, বরং বলা যায় ইহা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যা হিসাবেই এখানে ইহা উদ্ধৃত হইল। উপরন্তু এই ব্যাখ্যা যে নিঃসন্দেহে সত্য এবং ইসলামের মৌল ভাবধারা ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শের সহিত পুরামাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ, তাহা স্পষ্ট ও অকাট্য। (نيل الاوطار ج ١، ص ٧١)

নামায আদায়ের গুরুত্ব

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضـ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ ـ اِنَّ اَهَمَّ اَمْرِكُمْ عِنْدِيْ الصَّلٰوةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ ـ (موطا مالك)

ইমাম মালিক হইতে বর্ণিত, তিনি নাফে হইতে এবং তিনি ইবনে উমরের পুত্র আবদুল্লাহ্‌র মুক্ত দাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁহার খিলাফতের কর্মচারীদের প্রতি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তোমাদের যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল নামায কায়েম করা। যে লোক উহাকে রক্ষা করে ও উহার সংরক্ষণ দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করে, সে তাহার দ্বীনকে রক্ষা করে। আর যে লোক উহাকে বিনষ্ট করে, সে এই নামায ছাড়াও অন্যান্য সবকিছু অধিক নষ্ট করে। —মুয়াত্তা মালিক

ব্যাখ্যা উপরে উদ্ধৃত বাক্যটি রাসূলে করীম (স)–এর মুখ নিঃসৃত বাণী নহে। ইহা হযরত উমর ফারূকের একটি ফরমান। এই ফরমান তিনি তাঁহার বিরাট খিলাফতের সরকারী কর্মচারীদের প্রতি লিখিয়াছেন। তাঁহার ফরমানটি দীর্ঘ ছিল, উহার প্রথম অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহা হযরত উমরের বলা বা লেখা কথা হইলেও মূলত ইহা নবী করীম (স)–এরই বাণী। হযরত উমর ফারূক (রা) রাসূলে করীম (স)–এর কথার উপর ভিত্তি করিয়া এই বাণীটি তৈয়ার করিয়াছেন। অতএব ইহাও হাদীস। কেননা হাদীস বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাহাবীর কথাও হাদীস নামে অভিহিত হয়।

ইহা যে হযরত উমরের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত কোন কথা নয়, তাহার প্রমাণ এই যে, স্বয়ং রাসূলে করীম (স)–এরই এতদ্‌সম্পর্কিত একটি বাণী উমর হইতে ইকরামা—এই সূত্রে হাদীসের মরফূ বা রাসুলের নিজের কথা হিসাবে বায়হাকী কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)–এর সমীপে প্রশ্ন করিল।

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ عِنْدَ اللّٰهِ فِى الْاِسْلَامِ -

হে রাসূল! ইসলামে আল্লাহ্‌র নিকট কোন্ কাজটি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়? নবী করীম (স) বলিলেনঃ

اَلصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ فَلَا دِيْنَ لَهُ وَالصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ مَنْ حَفِظَهَا وَحَفِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ -

সময় মতো নামায পড়া। যে লোক নামায তরক করে, তাহার দ্বীন (ধর্ম) বলিতে কিছুই নাই। আর নামায হইল দ্বীন–ইসলামের খুঁটি কিংবা দাঁড়াইবার ভিত্তি। যে লোক উহাকে রক্ষা করে এবং উহার পুরাপুরি হেফাযত করে, সে তাহার দ্বীনকে রক্ষা করিতে পারে। আর যে লোক উহাকে নষ্ট করে, সে উহা ছাড়াও অন্যান্য সব কিছুকে অধিক নষ্ট করে।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, প্রথমোদ্ধৃত ফরমানটি হযরত উমরের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত কোন কথা নহে, বরং নবী করীমের কথাকেই তাঁহার নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলের বাণীকেই তিনি সরকারী পর্যায়ে একটি অর্ডিন্যান্স হিসাবে জারী করিয়াছিলেন মাত্র।

এই হাদীস হইতে দ্বীন–ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। নামায দ্বীন–ইসলামের ভিত্তি, দ্বীন–ইসলামের খুঁটি। দ্বীন–ইসলামের সমগ্র বিধানটি এই নামাযের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। বস্তুত যে জিনিসের যাহা ভিত্তি, সেই ভিত্তি অক্ষত না থাকিলে সেই জিনিসটিও টিকিয়া থাকিতে পারে না, ইহা খুবই স্পষ্ট কথা। কাজেই নামায যদি দ্বীন–ইসলামের ভিত্তি বা খুঁটি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নামায কায়েম না করা হইলে দ্বীন–ইসলাম থাকিবে কি করিয়া? এই কারণে হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁহার সরকারী কর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ও এই সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, তোমাদিগকে বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে, নামাযও তোমাদের দায়িত্বের একটি কাজ। কিন্তু সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে নামাযের স্থান সবকিছুর উপরে। নামাযের গুরুত্ব সর্বাধিক। ইহা দ্বীনী কাজের মধ্যে সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

নামায সংক্রান্ত রাসূলে করীম (স)–এর একটি বাণীকে হযরত উমর ফারূক (রা) সরকারী ফরমানরূপে জারী করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, কুরআনের ন্যায় হযরতের বাণী (সুন্নাত)ও ইসলামের অন্যতম উৎস, সরকারী শক্তির সাহায্যে কার্যকর হওয়ার যোগ্য। শুধু যোগ্যই নয়, ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকদের দায়িত্বই হইল কুরআনের ন্যায় সুন্নাতকেও রাষ্ট্র ক্ষমতা—তথা সরকারী শক্তিবলে বাস্তবায়িত করিয়া তোলা, সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা কুরআন ও সুন্নাকে কার্যকর করা। সেই সঙ্গে নামায কায়েম করার জন্য চেষ্টা করা মুসলমানদের গভর্ণমেন্টের কর্তব্য। ইহা না করিলে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালিত হইতে পারে না। বিশেষত কুরআন মজিদে তো ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই বলা হইয়াছে নামায কায়েম করাঃ

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ـ (الحج-٤١)

আমরা যাহাদিগকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করিব তাহারা অবশ্যই নামায কায়েম করার ব্যবস্থা করিবে।

অর্থাৎ একজন মুসলিম ব্যক্তির যেমন প্রথম ও সর্বাদিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নামায কায়েম করা, ঠিক তেমনি গোটা মুসলিম সমাজের তথা—ইসলামী রাষ্ট্রেরও সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল সমগ্র রাষ্ট্রে নামায আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর করা। যে লোক নামায পড়ে না, সে দ্বীন–ইসলাম পালন করে না, তেমনি যে রাষ্ট্র বা সরকার নামায কায়েমের ব্যবস্থা করে না, তাহাও ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী সরকার নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়।

হাদীসে বলা হইয়াছে। مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا একই حفظ শব্দের দুইটি রূপ। حفظ অর্থ, যে সব কাজ না হইলে নামায শুদ্ধ হয় না, যেমন অযু, সঠিক সময় এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য জরুরী কার্যাবলী—তাহা নির্ভুলভাবে জানিয়া উহা যথাযথভাবে আদায় করা। ইহার পর বলা হইয়াছে حافظ عليها অর্থাৎ নামায যথাযথভাবে আদায় করার পূর্ণ ব্যবস্থা করা, নামায কেহ তরক না করে—কেহ উহার প্রতি একবিন্দু অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শন না করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। এই দুইটি কাজই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুত নামায রীতিমত ও নিয়মিত আদায় করিলে নামাযীর মধ্যে যেমন দায়িত্ব–জ্ঞান, আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহ্‌র নিকট জওয়াবদিহির চেতনা তীব্রভাবে বর্তমান থাকে তেমনি সেইসঙ্গে তাহার যাবতীয় বৈষয়িক (?) দায়িত্ব পালনেও সে সব সময় কর্মতৎপর হয়। কিন্তু যদি কেহ নামাযই সঠিকভাবে আদায় করিতে প্রস্তুত না হয়, তবে সে যে তাহার অন্যান্য দায়িত্বও পালন করিবে তাহার নিশ্চয়তা কি থাকিতে পারে।

যাহারা মনে করে যে, বেনামাযী লোকও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয় ও দায়িত্ব পালন করে, তাহারা এক মারাত্মক বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। তাহাদের দৃষ্টি স্থূল। প্রকৃতপক্ষে কি হইতেছে—বেনামাযীতাহার নিজের, গোটা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের যে কি সাংঘাতিক ক্ষতি করিতেছে, তাহা বুঝিবার মতো কোন ক্ষমতাই তাহাদের নাই।

নামাযের পরকালীন মূল্য

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَّهُ نُوْرًا وَّلَا بُرْهَانًا وَّلَا نَجَاةً وَّكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ ـ (احمد، دارمى، بيهقى، طبرانى، ابن حبان)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস হইতে তাঁহার কর্তৃক নবী করীম (স) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা তিনি নামাযের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিলেন। বলিলেন, যে লোক এই নামায সঠিকভাবে ও যথাযথ নিয়মে আদায় করিতে থাকিবে তাহাদের জন্য কিয়ামতের দিন একটি নূর, অকাট্য দলীল এবং পূর্ণ মুক্তি নির্দিষ্ট হইবে। পক্ষান্তরে যে লোক নামায সঠিকভাবে আদায় করিবে না, তাহার জন্য নূর, অকাট্য দলীল এবং মুক্তি কিছুই হইবে না। বরং কিয়ামতের দিন তাহার পরিণতি হইবে কারুন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফ্ এর সহিত।

—আহমদ, দারেমী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসটিতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায নিয়মিত ও যথাযথভাবে আদায় করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। من حافظ عليها 'যে লোক নামায সংরক্ষণ' করিল,

ইহার অর্থ হইতেছে প্রতিটি ওয়াক্তের নামায সঠিক সময়ে ও যথানিয়মে আদায় করিতে থাকা এবং কোন এক ওয়াক্তের নামাযও তরক না করা বা কামাই না দেওয়া। এই কাজ যে লোক করিবে, হাদীসে বলা হইয়াছে কিয়ামতের দিন এই নামায তাহার জন্য নূর হইয়া দেখা দিবে। উহার আলোকে সেই কঠিনতম অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে পুলসীরাত পার হইয়া সে তড়িৎবেগে ও নির্ভুলভাবে জান্নাতে চলিয়া যাইতে পারিবে। উহা তাহার জন্য অকাট্য দলীল হইয়া দেখা দিবে; সে যে প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম, নিয়মিত ও যথাযথভাবে পড়া এই নামাযই হইবে উহার অকাট্য প্রমাণ। এই নামাযের দৌলতেই সে জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায যে এইরূপভাবে সংরক্ষণ করিবে না, নিয়মিত ও পূর্ণ সতর্কতার সহিত পড়িবে না; সে সেদিন চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে। তাহার মুমিন মুসলমান হওয়ারও কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না এবং তাহার ভাগ্যে জাহান্নাম হইতে মুক্তিও জুটিবে না। শুধু তাহাই নয়, তাহাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হইতে হইবে।

এই নিকৃষ্ট পরিণতির কথা বুঝাইবার জন্য নবী করীম (স) এই হাদীসটিতে মানবেতিহাসের চারিজন নিকৃষ্টতম ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সে লোক কিয়ামতের দিন এই চার ব্যক্তির সঙ্গী হইবে। এই চার ব্যক্তির সঙ্গী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কায়্যিম লিখিয়াছেনঃ হয় সে তাহার ধন-সম্পদের ব্যাপারে বেশী মশগুল হওয়ার দরুন নামায সংরক্ষণ করিবে না, নয় দেশ শাসনের রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন অথবা ওজারতী ও সরকারী-বেসরকারী চাকুরীজনিত ব্যস্ততার কারণে কিংবা ব্যবসায়-বাণিজ্য কাজে ব্যতিব্যস্ততার দরুন। নামায সংরক্ষণ না করার প্রথম কারণটি হইলে তাহার পরিণতি কারুনের সহিত হইবে। দেশ শাসনে রাষ্ট্রীয় কাজের দরুন হইলে তাহার পরিণতি হইবে ফিরাউনের সঙ্গে। আর ওজারতী বা দায়িত্বপূর্ণ চাকুরীর কারণে হইলে সে পরকালে হামানের সঙ্গী হইবে। আর ব্যবসায়-বাণিজ্যের কারণে হইলে পরকাল তাহাকে উবাই ইবনে খালফের সাহচর্যে থাকিতে হইবে। (فقه السنة ج ۱)

কিন্তু ইহাদের সঙ্গী হওয়ার অর্থ কি? ইহারা যেমন চিরকাল জাহান্নামে থাকিতে বাধ্য হইবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায অসংরক্ষণকারী বা তরককারীকেও কি চিরকাল জাহান্নামে থাকিতে হইবে?

ইহার জওয়াব এই যে, যদি কোন মুসলমান মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে ফরয বলিয়া বিশ্বাস না করে, তবে তাহাকে এই নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের সঙ্গে চিরকালই জাহান্নামে থাকিতে হইবে। ইহাদের সঙ্গী হওয়ার অর্থ ইহাই। কিন্তু যদি কেহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয বিশ্বাস করিয়াও উহা আদায় করিতে ত্রুটি করে, তাহা হইলেও সে ইহাদের সহিতই জাহান্নামী হইবে সন্দেহ নাই,— যদিও আযাবের মাত্রা ও পরিমাণে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য হইবে এবং শেষ পর্যন্ত উহা হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে বলিয়া আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতি আশা পোষণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু হাদীসটিতে নামায তরককারীর প্রতি কঠোর তিরস্কার ও তীব্র ভীতির উল্লেখ প্রকট ও প্রচন্ড হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে একথাও জানা যায় যে, নামায নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে আদায় করিতে না থাকিলে এবং মাঝে-মধ্যে বা কখনো কখনো পড়িলে সে নামাযের কোন অর্থও হয় না, নামাযী উহা হইতে পরকালে কোন ফায়দাই পাইতে পারিবে না।

হাদীস হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে,নামায তরক করা নিশ্চিতই কুফরি কাজ। ইমাম শাওকানী ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, নামায ফরজ—একথা অস্বীকার করিয়া যদি কেহ নামায তরক করে তবে তাহার কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই—এই ব্যাপারে মুসলিম সমাজে কোন মতদ্বৈততাও নাই। তবে কোন নূতন মুসলমান যদি এরূপ করে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে কাফির বলা যাইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সেই ব্যক্তি কাফির হইবে না বটে,তবে নামায নিয়মিত না পড়ার অপরাধে তাহাকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে তাহাকে কয়েদ করিতে হইবে—যতদিন না সে নামায নিয়মিত পড়িতে প্রস্তুত হয়। (نيل الاوطار)

কোন কোন হাদীসবিদ বলিয়াছেন, মুসলমান হইয়াও যদি কেহ নামায না পড়ে তবে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। কেননা নবী করীম (স)-এর বাণীঃ

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ -

মুসলিম বান্দা ও কাফির ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হইল নামায তরক করা—মুসলমান নামায তরক করে না, কাফির তাহা করে।

এই ভিত্তিতে নামায তরককারী কাফির-উপযোগী ব্যবহার পাইবার যোগ্য। আর কোন মুসলমান যদি কাফির অর্থাৎ মুর্তাদ হইয়া যায়, তবে ইসলামী শরীয়তে তাহার শাস্তি—মৃত্যুদন্ড।

মোটকথা, মুসলমান হইতে এবং মুসলমান থাকিতে হইলে নামায রীতিমত পড়িতেই হইবে। তাহা না পড়িলে কেহ মুসলিম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এবং পরকালে সে জাহান্নামে যাইতে বাধ্য হইবে। (بلوغ الامانى شرح الفتح الربانى)

নামাযের তাকীদ

عَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَهْدَ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ -

(مسند احمد، ترمذى، نسائى، ابن ماجه)

হযরত বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ নিশ্চয় আমাদের ও ইসলাম গ্রহণকারী সাধারণ লোকদের পরস্পরে নামাযের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। কাজেই যে লোক নামায তরক করিবে, সে যেন কুফরির পথ গ্রহণ করিল।

—মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা এই হাদীস অনুযায়ী কাফির ও মুসলমানদের মধ্যের পার্থক্যের ভিত্তি ও মানদন্ড হইতেছে নামায তরক করা। যে লোক নামায পড়ে না, সে 'মুসলিম রূপে' গণ্য নয়। যে নামায পড়ে—তরক করে না সে মুসলমান। এই কারণে নবী করীম (স) ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের নিকট হইতে নামায পড়ার ও তরক না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতেন। এই পর্যায়ের লোকদের সাথে যে চুক্তি গৃহীত হইত তাহার ভিত্তি ছিল নামায। কেননা নামায পড়াই ঈমানের ও মুসলমান হওয়ার বাস্তব প্রমাণ। ইহাই ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দশন।

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ - (مسلم)

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র বান্দা, কুফর ও শিরক-এর মাঝে নামায ত্যাগ করাই ব্যবধান মাত্র। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ইমাম নববী লিখিয়াছেন, যে-যে কাজ না করিলে কুফরি হইয়া যায় তাহা দেখানোই এই ধরনের হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে বলিয়াছিলেন আদমকে সিজদা করার জন্য। কিন্তু ইবলীস এই আদেশ অমান্য করে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া কুরআন মজীদ বলিয়াছেনঃ

كَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ - সে কাফির হইয়া গেল।

নামায পড়ার জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা বারবার নির্দেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেনঃ

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ - নামায কায়েম কর।

এই নির্দেশ পালন না করিলে ও অমান্য করিলেও কাফির হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত। ইহা শুধু নামায তরক করা বা না পড়া সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু যদি কেহ ইবলীসের ন্যায় অহংকারবশতই নামায প্রত্যাখ্যান করে কিংবা নামাযকে ফরয মানিয়া না লয়, তাহা হইলে তাহার

কাফির হইয়া যাওয়া অকাট্য ও অবধারিত। এইরূপ ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার যোগ্য। অবশ্য নিছক গাফিলতির কারণে যদি কেহ নামায না পড়ে; কিন্তু উহা ফরয হওয়ার প্রতি তাহার পূর্ণ বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে এবং মানে যে ফরয, তাহা হইলে এই ব্যক্তি 'কাফির' গণ্য হইবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে সে লোক কাফির নয়, সে ফাসিক। তাহাকে তওবা করিয়া রীতিমত নামায পড়িবার জন্য প্রস্তুত করা আবশ্যক। যদি সে তওবা না-ই করে তাহা হইলেঃ

قَتَلْنَاهُ حَدًّا كَالزَّانِي الْمُحْصِنِ ـ (نووی شرح مسلم)

আমরা তাহাকে মৃত্যুদন্ড দিব—বিবাহিত ব্যক্তি জ্বিনা করিলে যেমন দন্ড দেওয়া হয় ঠিক সেইরূপ।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ মনীষী ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন; তাহাকে মৃত্যুদন্ড নয়, সাধারণ শাস্তি দানই বিধেয়।

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رض قَالَ اَوْصَانِي خَلِيلِي اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلٰوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ـ

(ابن ماجه)

হযরত আবূদ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার প্রিয় বন্ধু ও সুহৃদ নবী করীম (স) আমাকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছেনঃ (১) আল্লাহ্‌র সহিত এক বিন্দু পরিমাণও শির্‌ক করিবে না—তোমাকে ছিন্নভিন্ন ও টুকরা টুকরা করা কিংবা আগুনে ভস্ম করিয়া দেওয়া হইলেও। (২) সাবধান, কখনো ইচ্ছা বা সংকল্প করিয়া কোন ফরয নামায ত্যাগ করিবে না। কেননা যে লোক ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করে, তাহার উপর হইতে আল্লাহ্ তা'আলার সেই দায়িত্ব শেষ হইয়া যায়, যাহা অনুগত ও ঈমানদার বান্দার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করিয়াছেন। (৩) আর কখনো মদ্য পান করিবে না। কেননা উহা সর্ব প্রকার অন্যায়, পাপ ও বিপর্যয়ের কুঞ্চিকা —ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা হাদীসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের স্পষ্ট পথ-নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম বলা হইয়াছেঃ আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকে ও কোন জিনিসকেই শরীক করিও না। এমনকি শির্‌ক না করার জন্য যদি নিহত হইতে—ছিন্নভিন্ন ও টুকরা টুকরা হইতে কিংবা অগ্নিকুন্ডলিতে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়, তবুও তাহা করা যাইবে না। অন্ততঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তিই তাহা করিতে পারে না। ঈমান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে হইলেও ঈমানদার লোকদের অকুণ্ঠিত চিত্তে ও নির্ভীক হৃদয়ে সেইজন্য প্রস্তুত হওয়াই ঈমানের ঐকান্তিক দাবি।

প্রসঙ্গত মনে রাখা আবশ্যক, অনুরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যদি কেহ কেবলমাত্র মুখে কুফরি কিংবা শির্‌কী কথার উচ্চারণ করে, তবে আল্লাহ্‌র নিকট সে নিশ্চয়ই কাফির বা মুশরিক হইয়া যাইবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

وَمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ (النحل - ١٠٦)

যে লোক আল্লাহ্‌র সহিত কুফরি করিবে তাহার ঈমান গ্রহণের পর' — তবে যাহাকে বাধ্য করা হইবে, অথচ তাহার দিল ঈমানের ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত—কিন্তু যাহার হৃদয়, অন্তর

কুফরিতে পূর্ণ উন্মুক্ত, তাহাদের উপরই আল্লাহ্র গজব এবং তাহাদের জন্যই বড় আযাব নির্দিষ্ট।
—সূরা নহলঃ ১০৬

এই আয়াতে প্রধানত দুইটি কথা বলা হইয়াছে। প্রথম, ঈমানের পর যাহারা কুফরি কবুল করিবে ও তাহাতেই তাহাদের হৃদয় মন নিকৃষ্ঠ ও আশ্বস্ত হইবে, আল্লাহ্র গজব তাহাদের উপরই এবং তাহাদের জন্যই বড় আযাব নির্দিষ্ট। আর দ্বিতীয় হইল, যাহাদিগকে কুফরি বা শিরক করিতে বাধ্য করা হইবে, তাহাদের হৃদয় মন যদি আল্লাহ্র প্রতি ঈমানে পূর্ণ উন্মুক্ত নিশ্চিত ও আশ্বস্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্র গজব ও আযাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখিয়াছেন, যে লোক কেবলমাত্র মুখের ভাষায় আল্লাহ্র সহিত কুফরী বা শিরক করিবে ও কেবল মৌখিক কথায় কাফির মুশরিকদের সহিত একাত্ম প্রকাশ করিবে—এই কারণে যে, তাহা করার জন্য তাহার উপর জোর-জবরদস্তি করা হইয়াছে, মারধোর করা হইয়াছে—কিন্তু আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে যাহারা হৃদয় মন অন্তর সম্পূর্ণ স্থির ও সম্পূর্ণ অবিচল থাকিবে, সে লোক আয়াতে কথিত আল্লাহ্র গজব ও আযাব হইতে মুক্ত থাকিবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এই আয়াতটি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। তাঁহাকে মুশরিকরা নির্মমভাবে নিপীড়িত ও অত্যাচারিত করিয়াছিল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি কুফরী করার জন্য। তিনি ইহাতে অতিষ্ঠ ও নিরুপায় হইয়া তাহাদের প্রতি ঐক্য প্রকাশ করেন। পরে তিনি রাসূলে করীমের নিকট এই ঘটনা বিবৃত করেন। ইহার পরই কিংবা এই প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাযিল হয়।

তখন নবী করীম (স) হযরত আম্মার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ "তুমি তোমার মনের অবস্থা কিরূপ পাইতেছে?" তিনি বলিলেনঃ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ ঈমানে অবিচল ও পূর্ণ আশ্বস্ত। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ إِنْ عَادُوا فَعُدْ তাহা হইলে কোন আশংকাই নাই। তাহারা যদি আবার তোমাকে বাধ্য করে, তবে তুমিও মৌখিক ঐক্য জানাইবার কাজ করিতে পার। (تفسير ابن كثير)

আলোচ্য হাদীসে দ্বিতীয় বলা হইয়াছে ফরয নামায সম্পর্কে। ইচ্ছা করিয়া কখনই ফরয নামায তরক করিবে না। কেননা যে লোক ইচ্ছা করিয়া ফরয নামায তরক করে তাহার সম্পর্কে আল্লাহ্র গ্রহণ করা রহমত দান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পরিত্যক্ত হইয়া যায়।

বস্তুত প্রত্যেক রাষ্ট্রের উপর উহার প্রজা-সাধারণের অনেক কিছু অধিকার থাকে। থাকে প্রজা-সাধারণের প্রতি রাষ্ট্র সরকারের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইহা স্বাভাবিকভাবেই হইয়া থাকে। প্রজা-সাধারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্রোহ পর্যায়ের কোন বড় ও কঠিন অপরাধ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র-সরকার প্রজা-সাধারণের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে থাকে এবং প্রজা-সাধারণও সেই অধিকারসমূহ পাইতে থাকে। ইহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল কথা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনও অনুরূপভাবে সমস্ত ঈমানদার লোকদের জন্য কিছু বিশেষ অনুগ্রহ ও নিয়ামত দানের দায়িত্ব স্বীয় দয়া ও মেহেরবানীর কারণেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই হাদীসে নামায পর্যায়ে বলা হইয়াছে, ইচ্ছাপূর্বক ফরয নামায ত্যাগ করা একটা সাধারণ, সামান্য ও নগণ্য গুনাহ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহ্র বিরোধিতামূলক একটা অতিবড় অপরাধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অপরাধ করিবার পর কোন লোকই আল্লাহ্র সেই বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ লাভের অধিকারী থাকিতে পারে না। তখন আল্লাহ্র নিজের দয়ায় গ্রহণ করা দায়িত্ব আপনা আপনি নিঃশেষ হইয়া যায়। আলোচ্য হাদীসে ফরয নামায ইচ্ছাপূর্বক তরক করিবার পরিণাম সম্পর্কে এই কথাই বলা হইয়াছে।

নামায সম্পর্কিত অপর একটি হাদীসের শেষভাগে রাসূলে করীম (স)-এর এই বাক্যাংশে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ -

যে লোক ইচ্ছা করিয়া ফরয নামায তরক করিবে, সে মুসলিম মিল্লাত হইতে—মুসলিম সমাজ ও জাতি হইতে—বাহির হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে হইবে।

এইসব হাদীসে দুইটি মূল কথা বলা হইয়াছে। একটি এই যে, ফরয নামায তরক করা কুফরী পর্যায়ের কাজ। আর দ্বিতীয় হইল, ইহার দুরুন কার্যত মুসলিম মিল্লাত হইতে বাহির হইয়া যাওয়া হয়। ইহার কারণ এই যে, নামায ইসলামের সর্ব প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ইহা ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করা এমন একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ, যাহা হইতে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, আল্লাহ্, রাসূল ও দ্বীন–ইসলামের সহিত এই লোকটির কার্যত কোন সম্পর্ক নাই এবং সে নিজেকে নামাযী লোকদের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী সমাজ ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত করে না। সে নিজেই নিজেকে উহার বাহিরে লইয়া গিয়াছে। বিশেষত রাসূলে করীমের সোনালী যুগে কোন মুসলমান নামায তরককারী হইতে পারে তাহা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই সে কালে নামায পড়া মুসলমান হওয়ার এবং নামায তরক করা কাফির হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে পরিগণিত হইত। তাবেয়ী আলিম আবদুল্লাহ ইবনে শফীক (র) সাহাবীদের এ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ

كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِّنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلٰوةِ - (ترمذى)

রাসূলে করীম (স)–এর সাহাবিগণ কোন কাজ তরক করাকে কুফরী মনে করিতেন না। একমাত্র নামাযকেই এই পর্যায়ের কাজ বলিয়া মনে করিতেন।

অর্থাৎ নামায তরক করিলে কুফরী হয়, ইহাই ছিল সাহাবীদের বিশ্বাস, তৃতীয় বলা হইয়াছে মদ্যপান সম্পর্কে। ইহাতে মদ্যপান করিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের আয়াতেই মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও সম্পূর্ণ বর্জনীয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছেঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - (المائدة - ٩٠)

হে ঈমানদার লোকেরা! নিশ্চয় জানিও, মদ্য, জুয়া, পূজ্য দেবতা ও যাদু ইত্যাদি শয়তানী কাজের ঘৃণ্য ও মলিনতা। অতএব তোমরা উহার প্রত্যেকটিই পরিহার কর। সম্ভবত তোমরা কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করিবে।

আয়াতের বক্তব্য হইল, মদ্য প্রথমত অপবিত্র, দ্বিতীয়ত উহা পান করা সম্পূর্ণ শয়তানী কাজ। তৃতীয়ত উহা পরিহার কর—ইহা স্পষ্ট নির্দেশ এবং চতুর্থ উহা পরিহার করিলেই কল্যাণের আশা করা যায়। আর মদ্যপানে এই সমস্ত অন্যায় ও মলিনতায় নিমজ্জিত হওয়া অনিবার্য। পরবর্তী আয়াতে এই নিষেধের কারণ বলা হইয়াছেঃ শয়তান এই মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্র যিক্র ও নামায হইতে লোকদিগকে বিরত রাখে।

আলোচ্য হাদীসে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম বড় কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে। আর তাহা হইল, মদ সকল প্রকার পাপের ও অন্যায় অনাচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। বস্তুত যে লোক মদ্যপান করে, সে কেবল মদ্যপান করিয়া থামিয়া থাকে না। বরং রসাতলে ভাসিয়া যাওয়ার ইহাই হয় তাহার প্রথম পদক্ষেপ। অতঃপর লজ্জা–শরম, আল্লাহ্ ভীতি, ন্যায়পরতা, মানবিকতা ও সাধারণ লোকচরিত্র—সব কিছুই এক এক করিয়া বিলীন হইয়া যায়। শুরু হয় চরম পাশবিকতা, কদর্যতা, নিষ্ঠুরতা ও ক্রূর হিংস্রতা। ব্যক্তি জীবন হইতে শুরু করিয়া পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, সর্বস্তরেই চরম বিপর্যয় নামিয়া আসে অতি দ্রুতগতিতে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ـ (ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীম (স)কে বলিতে শুনিয়াছিঃ কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তাহার নামায সম্পর্কে হিসাব লইবে। তাহার নামায যদি যথাযথ প্রমাণিত হয় তবে সে সাফল্য লাভ করিবে। আর যদি নামাযের হিসাবই খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। নামাযের ফরযের হিসাবে যদি কিছু কম পড়ে, তবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তখন বলিবেনঃ তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামায বা নফল বন্দেগী আছে কিনা, যদি থাকে, তাহা হইলে উহার দ্বারা ফরযের কমতি পূরণ করা হইবে। পরে তাহার অন্যান্য সব আমল উহারই ভিত্তিতে বিবেচিত ও অনুরূপভাবে কমতি পূরণ করা হইবে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ইসলামী ইবাদতসমূহের মধ্যে নামায সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই নামায সঠিকভাবে ও রীতিমত আদায় করা না করার উপরই বান্দার পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। আর বান্দার উপর আল্লাহ্র হক্ সমূহের মধ্যে এই নামায সম্পর্কেই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হিসাব লওয়া হইবে। এই হিসাবে যদি কাহারো নামায ঠিক ঠিকভাবে পড়া হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয় তবেই সে নিষ্কৃতি পাইবে, পাইবে কল্যাণ ও সাফল্য। বুঝিতে হইবে সেই লোক তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিয়াছেন। আর যদি কাহারো নামাযের হিসাবে দেখা যায় যে, সে তাহা পড়ে নাই কিংবা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু নির্ভুলভাবে নয়, এমনভাবে পড়িয়াছে যাহা ভুল ও গ্রহণ অযোগ্য, তবে তাহার ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্থতা অবধারিত। সে সাফল্য ও কল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। আযাব পাওয়া হইতে তাহার নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব হইবে না।

নামায পড়িয়াছে এমন বান্দার হিসাবে যদি দেখা যায় যে,ফরয নামায আদায়ের ব্যাপারে কিছু কমতি পড়িয়াছে, মাত্রা কিংবা মান যথাযথ রক্ষিত হয় নাই, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নফল নামায বা নফল বন্দেগী দ্বারা সেই কমতি পূরণ করিয়া দিবেন। মুসনাদে আহমদ-এ এইখানে আল্লাহ্র হুকুমের ভাষা হইলঃ

فَكَمِّلُوْا بِهَا فَرِيضَتَهُ ـ সেই নফল দ্বারা তাহার ফরয সম্পূর্ণ করিয়া লও।

এই সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقْبَلُ مِنَ التَّطَوُّعَاتِ الصَّحِيحَةِ عِوَضًا مِّنَ الصَّلَوٰتِ الْمَفْرُوضَةِ ـ

আল্লাহ্ তা'আলার বান্দার সহীহ্ভাবে আদায় করা নফল নামায বা নফল বন্দেগীসমূহ ফরয নামাযের বদলে ও বিকল্পরূপে কবুল করিবেন।

ইহা যে একান্তভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ঐকান্তিক অনুগ্রহ মাত্র, তাহা বলার দরকার করে না। (تحفة الاحوذى)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رض يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ

الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكٰوةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا أَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ۔ (مسلم)

তাল্‌হা ইবনে উবায়দুল্লাহ্‌ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, নজদের অধিবাসীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিল। লোকটির মাথার চুল আউলানো-ঝাউলানো ছিল। তাহার মুখনিঃসৃত শব্দ আমরা শুনিতে পাইতেছিলাম কিন্তু উহার কোন অর্থ আমরা বুঝিতেছিলাম না। পরে সেই লোকটি রাসূলে করীম (স)-এর নিকটে উপস্থিত হইল এবং সহসা সে ইসলামের দিক দিয়া (অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে) প্রশ্ন করিতে লাগিল। তখন রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ দিন রাত্রের মধ্যে পাঁচবার নামায পড়িতে হইবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইহা ছাড়া আরও নামায পড়া কি আমার কর্তব্য? বলিলেনঃ না, তবে তুমি যদি অতিরিক্ত কর। আর (দ্বিতীয় কর্তব্য হইল) রমযান মাসের রোযা পালন। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইহা ছাড়াও রোযা রাখা আমার কর্তব্য কি? বলিলেনঃ না, তবে তুমি যদি অতিরিক্ত কর। অতঃপর রাসূলে করীম (স) সেই লোকটিকে যাকাতের কথা বলিলেন। বলিল, ইহা ছাড়াও আমার উপর কর্তব্য আছে কি? বলিলেন, না, তবে তুমি যদি অতিরিক্ত কর। ইহার পর লোকটি এই কথা বলিতে বলিতে পিছনে সরিয়া গেল যে, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি ইহার উপর কিছুই বাড়াইব না ও ইহা হইতে কিছুই কমাইব না। এই কথা শুনিয়া রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ যদি লোকটি সত্য বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা এই হাদীসে এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে রাসূলে করীম (স)-এর বলা কথাগুলি হইতে ইসলামের চরিটি প্রধান রুকনের মধ্যে তিনটির উল্লেখ পাওয়া গেল। তাহা হইলঃ নামায, রোযা ও যাকাত। নামায পর্যায়ে জানা গেল, দিন রাত্রের মধ্যে মাত্র পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়া ফরয এবং ইসলামের আরোপিত অবশ্য কর্তব্য। রোযার পর্যায়ে জানা গেল, কেবলমাত্র রমযানের একটি মাস রোযা থাকা কর্তব্য। আর যাকাত পর্যায়ে বলা হইয়াছে, কেবল যাকাত আদায় করাই ফরয। ইহার পরও কিছু কর্তব্য আছে কিনা, প্রত্যেকটির উল্লেখের পর লোকটি রাসূলে করীম (স)-কে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কথাটি হইলঃ

لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ -"না, তবে তুমি যদি অতিরিক্ত কিছু কর।' এই বাক্যটির দুটি অর্থ হইতে পারে। একটিঃ لٰكِنْ يُسْتَحَبُّ لَكَ أَنْ تَطَوَّعَ তবে তুমি অতিরিক্ত আরো কিছু কর, ইহাই তোমার জন্য ভালো।

অর্থাৎ কেবল ফরয নামায পড়িয়াই ক্ষান্ত হইয়া থাকিও না। উহা ছাড়া অতিরিক্ত নফল হিসাবে তোমার আরও নামায পড়া উচিত, যেমন বিতর, সুন্নাত এবং নফল নামায ইত্যাদি। কেবল রমযান মাসের রোযা থাকিয়া দায় এড়াইতে চাহিও না, বরং কিছু কিছু নফল রোযা রাখাও ভালো। আর কেবলমাত্র শতকরা চল্লিশ ভাগ হিসাব করিয়া ও গণিয়া গণিয়া যাকাত আদায় করিয়াই মনে করিও না যে, আর একটি পয়সাও কাহাকেও দিতে হইবে না। না, উহা আদায় করার পরও সাধারণ দান হিসাবে নফল স্বরূপ দান সাদকা করা উচিত। এই বাক্যটির দ্বিতীয় অর্থ হইলঃ

مَنْ شَرَعَ فِيْ صَلَاةٍ نَفْلٍ أَوْ صَوْمٍ نَفْلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُهُ ـ

(নামায ও রোযার ফরয আদায়ের পর) কেহ যদি নফল নামায পড়িতে নফল রোযা রাখিতে শুরু করে, তাহা হইলে উহাকে সম্পূর্ণ করা তাহার উপর ওয়াজিব।

এই সব প্রশ্নোত্তর শেষ হওয়ার পর লোকটি চলিয়া যাইবার কালে যে কথাটি বলিয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। লোকটি বলিয়াছিলঃ আমি ইহার উপর কিছুই বাড়াইব না এবং ইহা হইতে কিছুই কমাইব না। ইহা প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উক্তি। বস্তুত ইসলামের মৌল ভাবধারা যাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, সে কখনও ইসলামের মূল বিধানের উপর নিজ হইতে কিছু বৃদ্ধি করে না, মূল বিধান হইতে কাট-ছাট করিয়াও লয় না। বরং মূল বিধান ও ব্যবস্থাকেই পূর্ণ আন্তরিকতা ও অপরিসীম আল্লাহ্-ভক্তি সহকারে অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করাই ঈমানদার লোকের কাজ। কেননা ইসলাম সম্পূর্ণত আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ। ইহা কোন লোকের মনগড়া বিধান নয়। ইচ্ছা করিয়া কেহ ইহার উপর বৃদ্ধিও করিতে পারে না, কেহ কমও করিতে পারে না। তাহা করার কাহারো অধিকার নাই। বৃদ্ধি কিংবা কমতি যাহাই করা হউক না কেন, তাহাতে উহা আল্লাহ্র বিধান থাকিবে না। তাহার মনগড়া বিধান হইয়া যাইবে।

ঠিক এই কারণেই লোকটির উক্ত কথা শুনিয়া রাসূলে করীম (স) বলিয়াছিলেনঃ লোকটি সত্য বলিলে নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করিবে। 'সত্য বলিলে' অর্থ বৃদ্ধি না করার ও কম না করার কথা যাহা লোকটি বলিতেছে তাহা যদি সত্যে পরিণত করে—যদি যেমন বলিতেছে তেমনই করে, তবে তাহার সাফল্য সন্দেহাতীত। কেননা যাহাই ইসলামের বিধান তাহা করাই সাফল্যের নিয়ামক।

মনে রাখা আবশ্যক, 'আমি ইহার উপর কিছু বৃদ্ধি করিব না, ইহা হইতে কিছু কমও করিব না' লোকটির এই কথার অর্থ এই নয় যে, এই নামায, রোযা ও যাকাত ছাড়া ইসলামের অন্যান্য আর কোন বিধান পালন করিব না। বরং ইহার অর্থ ইসলামের মূল বিধানের উপর আমি কিছু বৃদ্ধিও করিব না এবং মূল বিধান হইতে কিছু কমও করিব না। কেননা বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটিতে লোকটির কথা এই ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ وَلَا اَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَىَّ شَيْئًا۔

আল্লাহ্ তা'আলা যাহা আমার প্রতি ফরয করিয়া দিয়াছেন, আল্লাহ্র শপথ আমি তাহার উপর কিছু বৃদ্ধিও করিব না, উহা হইতে কিছু কমও করিব না।

কেননা এই হাদীসে ইসলামে সম্পূর্ণ বিধান ও সব কয়টি ফরযের কথা উল্লেখিত হয় নাই। ইহার অর্থ এই নয় যে, হজ্জ বুঝি ইসলামের বিধান নয়। উহার উল্লেখ এখানে না হওয়ার কারণ হইল, হাদীসটির বর্ণনাকারী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। সমস্ত কথার উল্লেখ করেন নাই। (نووی شرح مسلم)

নামায ফরয হওয়ার ইতিহাস

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ خَمْسِيْنَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتّٰى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُوْدِىَ يَامُحَمَّدُ اِنَّهٗ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَاِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ۔

(مسند احمد، نسائى، ترمذى)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স)-এর প্রতি মিরাজের রাতে প্রথমত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হইয়াছিল। পরে উহা কম করিয়া মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত করিয়া রাখা হয়। অতঃপর উদাত্তভাবে ঘোষণা করা হয়, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয় জানিও, আমার নিকট গৃহীত সিদ্ধান্ত কখনও পরিবর্তিত হয় না। তোমার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। —মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, তিরমীযি

ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হাদীসটি 'হাদীসুল-ইসরা'—মিরাজ সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। ইহা হইতে প্রথমত জানা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হইয়াছে মিরাজের রাত্রে, যখন নবী করীম

(স) আল্লাহ্‌র অতীব নিকটে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি প্রথমত দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়া দেন। কিন্তু এত বেশী নামায যথারীতি আদায় করা মুসলমানদের পক্ষে অপরিসীম কষ্টকর হইবে বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হইয়া শেষ পর্যন্ত শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই বহাল রাখিলেন এবং এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান সওয়াব বাহক হইবে, এই কথাও তিনি জানাইয়া দিলেন।

এই হাসীদটি হইতে এই কথাও জানা গেল যে, ফরয নামায কেবলমাত্র এই পাঁচ ওয়াক্ত। ইহা ছাড়া আর কোন নামায ফরয নয়। জুম'আর নামায শুক্রবার দিনের জুহরের স্থলাভিষিক্ত, জুহরের পরিবর্তে উহা পড়া হয় এবং উহাও ফরয।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয—ইহা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। মিরাজের পূর্বে নবী করীম (স) নামায পড়িতেন। কিন্তু তখনকার নামায ছিল প্রধানত রাত্রিকালীণ এবং তখন নামাযের রাকআতও নির্দিষ্ট ছিল না, এমন কি তখন উহার জন্য সময়ও নির্ধারিত ছিল না। (عمدة القارى ج ٢ ص ১২৮)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের ফল

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَٰلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا۔ (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি রাসূলে করীম (স)-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, তোমরা কি মনে কর, যদি কাহারও ঘরের দরজায় কোন খাল থাকে এবং তাহাতে সে প্রত্যেক দিন পাঁচবার করিয়া নিয়মিত গোসল করে তবে ইহা কি তাহার শরীরে কোন ময়লা থাকিতে দিবে?— তোমরা কি বল? সাহাবাগণ বলিলেনঃ না, তাহার দেহে কোন ময়লাই থাকিতে দিবে না। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্তও ঠিক এইরূপ, আল্লাহ্ উহার সাহায্যে যাবতীয় গুনাহ-খাতা দূর করিয়া দেন। —বুখারী

ব্যাখ্যা পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত ও সঠিকভাবে পড়ার গুরুত্ব ও উহার উপকারিতা বুঝাইবার জন্য রাসূলে করীম (স) আলোচ্য হাদীসে একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ কেহ যদি তাহার ঘরের সম্মুখস্থ খালে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তাহাতে যেমন তাহার শরীরে কোন ময়লা থাকিতে পারে না, অনুরূপভাবে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়িলেও কাহারও মনে ও অন্তরে কোন পাপ চিন্তা ও পাপ কাজের কোন অভ্যাস থাকিতে পারে না। বরং পাঁচবার গোসলের ফলে যেমন দেহের মলিনতা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়া যায়, অনুরূপভাবে পাঁচবার নামায পড়িলে মনের সকল কুটিলতা, পাপচিন্তা ও যাবতীয় গুনাহ খাতা দূরীভূত হইয়া যায়। পানি দ্বারা ধৌত করার ফল দৈহিক মলিনতা দূর হওয়া, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া হইতেছে মানসিক ও বাস্তব পাপ দূর করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এখানে দেহের সহিত মনেরও পাঁচবার ধৌত করাকে পাঁচবার নামায পড়ার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কুরআন মজীদে এই নামাযের ফল বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছেঃ

إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔

নিশ্চয়ই নামায (মানুষকে) লজ্জাষ্কর ও নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত রাখে।

রাসূলে করীম (স) উপরিউক্ত হাদীসে এই আয়াতেরই অর্থ নিজস্ব ভাষায় ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝাইয়দিয়াছেন।

ঘরের দরজার সম্মুখস্থ খালের দৃষ্টান্ত দেওয়ার উদ্দেশ্য হইতেছে এই কথা বুঝানো যে, খাল যেমন ঘরের সম্মুখে বর্তমান এবং উহাতে আপনা-আপনি পানি আসতে থাকে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আপনা-আপনি একজন নামাযীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোথাও হইতে তাহা টানিয়া আনিতে হয় না। আর ঘরের দরজার সম্মুখে সদা প্রবহমান খাল থাকিলেও যদি কেহ উহাতে গোসল করিয়া স্বীয় দেহের মলিনতা দূর না করে তবে বুঝিতে হইবে, সে ময়লাকেই ভালবাসে, ময়লাযুক্ত হইয়া থাকাকেই সে পছন্দ করে। দেহের ময়লা বিদূরণের স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সে উহাতে অবগাহন করিয়া মলিনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে প্রস্তুত নয়। অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময় একজনের নিকট একের পর এক আসিয়া উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে নামায পড়ার ও নামায পড়িয়া নিজেকে পাপ মুক্ত করার কিছুমাত্র উদ্যোগী না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে পাপকেই ভালবাসে এবং নিজেকে পাপী করিয়া রাখাকেই সে পছন্দ করে। অন্যথায় এই সুবর্ণ সুযোগ সে কিছুতেই হারাইতে প্রস্তুত হইত না।

ঝর্ণাধারা একটি প্রবহমান জিনিস, নামাযও একটি স্থায়ী আবর্তনশীল ও গতিবান ব্যবস্থা। ঝর্ণার স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করিলে যেমন দেহ ও কাপড় পরিষ্কার হইয়া যায়, নামাযও তেমনি মানুষের মনকে শান্ত-সুস্থ ও পবিত্র করিয় দেয়। ইবনুল আরাবী বলিয়াছেনঃ

اَلصَّلَوَاتُ تُطَهِّرُ الْعَبْدَ مِنْ اَقْذَارِ الذُّنُوْبِ حَتّٰى لَاتُبْقِىْ لَهٗ ذَنْبًا اِلَّا اَسْقَطَتْهُ وَكَفَّرَتْهُ -

(عمدة القارى ج ٥ - ص ١٢)

নামাযসমূহ বান্দাকে পাপের মালিন্য হইতে পবিত্র করিয়া দেয়, শেষ পর্যন্ত এই নামায কোন গুনাহই অবশিষ্ট রাখে না, বরং সবকিছুই দূর করিয়া দেয়—বিলীন করিয়া দেয়।

আলোচ্য হাদীসের প্রকাশ্য শব্দের দৃষ্টিতে যদিও মনে হয়, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িলে সকল প্রকার গুনাহই মাফ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহার সঠিক ধারণা মেলে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীস হইতে। হাদীটি এইঃ

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ - (مسلم)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহাদের মধ্যবর্তী সময়ের সব গুনাহ মাফ করিয়া দেয়—যদি কবীরা গুনাহ না করা হয়। —মুসলিম

ইবনে বাত্তাল বলিয়াছেনঃ হাদীস হইতে এই অর্থ গ্রহণ করাই বাঞ্ছণীয় যে, রীতিমত নামায পড়িলে সব সগীরা গুনাই মাফ হইয়া যাইবে। কেননা আলোচ্য হাদীসে এই গুনাহকে তুলনা করা হইয়াছে ময়লার সাথে। আর অন্যান্য বড় বড় মলিনতার তুলনায় ইহা ছোট। তাই পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথারীতি পড়িলে ছোট ছোট গুনাহ সবই মাফ হইয়া যাইবে, যদি কবীরা গুনাহ না করা হয়। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায যে পড়ে না, সে কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিতে পারে না। কেননা এই নামায তরক করাই কবীরা গুনাহ।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার গুরুত্ব

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض اَنَّهٗ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ اَتٰى بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَاِنَّ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا

اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ -

(بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع)

হযরত উবাদা ইবনুসসামেত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছিঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের উপর ফরয করিয়াছেন। যে লোক ইহা যথাযথভাবে আদায় করিবে এবং উহার অধিকার ও মর্যাদার প্রতি অসম্মান দেখাইতে গিয়া, উহার হক একবিন্দু নষ্ট হইতে দিবে না তাহার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, তিনি তাহাকে বেহশ্তে দাখিল করিবেন। আর যে লোক উহা পড়িবে না, তাহার জন্য আল্লাহ্র নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে আযাব দিবেন, আর ইচ্ছা করিলে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। —বাদায়েউস্সানায়েও

ব্যাখ্যা এই নামাযসমূহ ফরয হইয়াছে মহা অনুগ্রহকারীর সীমা সংখ্যা পরিমানহীন ও কল্পনাতীত নিয়ামত সমূহের শোকর আদায়স্বরূপ। প্রথম নিয়ামত বান্দাকে সৃষ্টি করা, সৃষ্টি করা অতীব উত্তম রূপ, আকার-আকৃতি ও গঠন—প্রভৃতিতে মানুষ ও মনুষ্যত্বকে তিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোচ্চ দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ -

আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামো ও আকার আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। তোমাদিগকে উত্তম আকার-আকৃতি দান করিয়াছেন।

প্রত্যেকটি মানুষ তাহার নিজের চেহারা ও মুখাকৃতিকে বেশী পছন্দ করে—অন্য লোকের দৃষ্টিতে তাহা যতই কুৎসিত হউক না কেন। তিনি মানুষকে সুস্থ ও কর্মক্ষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করিয়াছেন। এমন কোন খুঁত বা অপূর্ণতা রাখেন নাই, যাহার দরুন মানুষ এইগুলি ব্যবহার করিতে অসমর্থ থাকিতে পারে। ইহাও মানুষের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। অথচ ইহা মানুষের নিজের কৃত কোন কাজের ফল বা বিনিময় নয়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার এই গোটা দেহ সত্তা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহারই ইবাদতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাও শোকর আদায়স্বরূপ। কেননা—

شُكْرُ النِّعْمَةِ اِسْتِعْمَالُهَا فِىْ خِدْمَتِ الْمُنْعِمِ -

নিয়ামতের শোকর হইল সেই নিয়ামতকে নিয়ামতদাতার আরাধনা, উপাসনা ও আনুগত্যমূলক কাজে ব্যবহার করা।

নামাযে দাঁড়াইবার, রুকূ-সিজদা করা, বসা ও বসা হইতে উঠিবার কাজ করিতে হয়। এই সব কাজেই বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয়। আর আভ্যন্তরীণ শক্তি মন-মগজ, চেতনা, ইচ্ছা-বাসনা ইত্যাদি সব কিছুকে আল্লাহ্র দিকে রুজূ করিতে হয়। তাঁহার শাস্তির ভয় ও রহমতে মাগফিরাত পাওয়ার আশা অন্তর ভরিয়া পোষণ করিতে হয়। বিবেক-বুদ্ধিকে সেই দিকে সদা সচেতন ও সক্রিয় রাখিতে হয়—যেন প্রত্যেক অঙ্গের আমল মহান দাতার শোকর স্বরূপ আদায় হইয়া যায়। দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলি মসৃণ করা হইয়াছে। এই কারণেই সেইগুলি নামাযের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে। ইহারও শোকর করিতে হইবে নামাযে এইগুলিকে যথযথভাবে ব্যবহার করিয়া। কেননা কৃতজ্ঞতা—উপকারীর উপকার স্বীকার করা যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির সব বিচারেই কর্তব্য। সব ইবাদতই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের নির্দেশ পালন! মানুষ আল্লাহ্র বান্দা—

বান্দার কর্তব্য ও ফরয মা'বুদের সব নির্দেশ পালন করা। চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্তই তাঁহার সম্মুখে বিনয়াবনতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেও এই কৃতজ্ঞতা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু মা'বুদ বান্দার প্রতি সে আদেশ করেন নাই। বিশেষ বিশেষ ইবাদতের জন্য তিনি সময় ও মিয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাও তাঁহারই অনুগ্রহ। অন্যথায় বান্দার পক্ষে তাহা করা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। মানুষ সাধারণত গুনাহ খাতায় নিমজ্জিত হইয়া থাকে। তাহা হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাইয়া যাওয়া মানুষের সাধ্যতীত। এইজন্য পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ্ নামাযের কর্তব্য চাপাইয়া দিয়াছেন, যেন উহার বাহিরে যেসব গুনাহ বান্দার হয়, তাহা এই নামাযের দরুন মাফ হইয়া যায়। তাই বলা হয়ঃ

فُرِضَتِ الصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ تَكْفِيْرًا لِذٰلِكَ -

এইসব গুনাহ খাতা কাফ্ফারাস্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হইয়াছে। (بدائع الصنائع)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهٖ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمْسِكْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ - (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর-ইবনুল আ'স (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, জুহরের নামাযের সময় হয় তখন, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়ে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ছায়া তাহার দৈর্ঘ্যের সমান হয়। আর ইহা আসরের নামাযের সময় হওয়া পর্যন্ত থাকে। আসরের নামাযের সময় সূর্যের হলুদ বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত স্থায়ী হয়, মাগরিবের নামাযের সময় অস্ত আকাশের লালিমা বিলীন হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত থাকে। এশার নামাযের সময় থাকে মধ্যম রাত্রি পর্যন্ত। আর ফজরের নামাযের সময় প্রথম ঊষা লগ্ন হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে। কিন্তু যখন সূর্যোদয় হইতে থাকে তখন নামায পড়া হইতে বিরত থাক। কেননা উহা শয়তানের দুই শৃংগের মধ্যবর্তী স্থানে উদিত হয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচবার নামায পড়ার সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং নামাযের ওয়াক্তের সূচনা ও শেষ সীমা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। এই ওয়াক্তসমূহ নিম্নরূপঃ

১. জুহরের সময় সূর্যের মধ্য আকাশ হইতে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়ার সময় হইতে আসরের নামাযের সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়াছে কিনা তাহা অনুমান করার জন্য হাদীসে একটি মানদণ্ডের উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, একজন মানুষের ছায়া যখন তাহার দৈর্ঘ্যের সমান হইবে, তখনি জুহরের নামাযের সময় হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

২. আসরের নামাযের সময় হয় ইহার পর—সূর্যের দীপ্ত খরতাপ যখন কিছুটা নিস্তেজ হইয়া আসিবে এবং সূর্যরশ্মির ফ্যাকাশে রঙ ধারণ করা পর্যন্ত তাহা স্থায়ী হইবে।

৩. মাগরিবের নামাযের সময় হয় সূর্যাস্ত হওয়ার পর মুহূর্ত হইতে এবং তাহা স্থায়ী থাকে পশ্চিম আকাশের লালিমা বিলীন না হওয়া পর্যন্ত।

৪. অস্ত আকাশের লালিমা বিলীন হইয়া গেলে তখন এশার নামাযের সময় উপস্থিত হয়। ইহা স্থায়ী থাকে অর্ধেক রাত্র পর্যন্ত।

৫. পূর্ব আকাশে প্রথম উষার উদয় হইলে ফজরের নামাযের সময় হয় ও সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা স্থায়ী থাকে। সূর্যোদয় হইতে শুরু করিলে তখন নামায পড়া নিষেধ।

ইহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছেঃ উহা শয়তানের দুই শৃংগের মধ্যবর্তী স্থানে উদিত হয়ঃ 'শয়তানের শৃংগ' অর্থ, উহার সম্মুখভাগ, উহার ললাট দেশ। সূর্যোদয়ের সময় শয়তান উহার সম্মুখদেশে নিজেকে স্থাপন করে এবং সূর্যপূজারীদের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করে। কিন্তু কার্যত সূর্যের পরিবর্তে শয়তানের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শয়তান মনে করে, ইহারা সূর্যের নয়, তাহারই পূজা করিতেছে। এইজন্য ঠিক এই সময় নামায পড়িতে নবী করীম (স) নিষেধ করিয়াছেন। কেননা এই সময় নামায পড়িলে সূর্যপূজারীদের সহিত সাদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلصَّلٰوةِ أَوَّلًا وَّاٰخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ - وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ - حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ - وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ - (ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক নামাযেরই একটা প্রথম সময় রহিয়াছে এবং রহিয়াছে একটা শেষ সময়। উহার বিবরণ এই যে, জুহরের নামাযের প্রথম সময় শুরু হয় তখন, যখন সূর্য মধ্য আকাশ হইতে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়ে। উহার শেষ সময় আসরের নামাযের সময় শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত থাকে। আসরের নামাযের প্রথম সময় শুরু হয় ঠিক উহার সময় সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। আর উহার শেষ সময় তখন পর্যন্ত থাকে যখন সূর্যরশ্মি হরিৎবর্ণ ধারণ করে। মাগরিব নামাযের সময় শুরু হয় যখন সূর্যাস্ত ঘটে। আর উহার শেষ সময় তখন পর্যন্ত থাকে যখন সূর্যাস্তকালীন রক্তিম বর্ণের লালিমা নিঃশেষে মুছিয়া যায়। এশার নামাযের প্রথম সময় সূচিত হয় যখন সূর্যাস্তকালীন রক্তিম আভা নিঃশেষ হইয়া যায় এবং উহার শেষ সময় দীর্ঘায়িত হয় অর্ধেক রাত পর্যন্ত। আর ফযরের নামাযের প্রথম সময় শুরু হয় প্রথম উষার উদয়লগ্নে এবং উহার শেষ সময় সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে।

ব্যাখ্যা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় এবং উহার আরম্ভ ও শেষ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (স) এই হাদীসের কথাগুলি বলিয়াছেন। হাদীসটি পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, নবী করীম (স) যাঁহাদের সম্মুখে নামাযের সঠিক সময়ে এই ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাঁহারা নামাযের সময় সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই কারণেই কথার ধরন এমন

হইয়াছে, যেমন আসরের নামাযের প্রথম সময় শুরু হওয়া সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ 'আসরের নামাযের সময় শুরু হয় ঠিক উহার সময় সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।' 'আসরের নামাযের শেষ সময় সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ উহা তখন পর্যন্ত থাকে, যখন সূর্যরশ্মি হরিৎ বর্ণ ধারণ করে অর্থাৎ সূর্যরশ্মি হরিৎবর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত আসরের নামাযের জন্য ভালো ও পছন্দসই সময়। কিন্তু উহার পর যে আসরের নামায আর পড়া যাইবে না এমন নহে। কেননা প্রয়োজনের সময় সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত এই নামায আদায় করা যাইতে পারে। তবে সূর্যরশ্মি হরিৎবর্ণ ধারণ করার পূর্বেই আসরের নামায পড়িয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। আর যদি কাহারো পক্ষে কোনদিন যথাসময়ে আসরের নামায আদায় করিয়া লওয়া বিশেষ কোন কারণে সম্ভবপর না-ই হয়, তবে সে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত আদায় করিতে পারিবে। তাহাতেও নামায হইবে। এই পর্যায়ে নবী করীম (স)-এর অপর দুইটি বাণী স্মরণীয়। একটিতে তিনি বলিয়াছেনঃ

مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ-

যে লোক সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক্'আত নামাযও পড়িতে পারিল, সে পুরা আসরই পাইল।

অপর হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

مَنْ اَدْرَكَ سَجْدَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ-

যে লোক সর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের একটি সিজদাও দিতে পারিল সে যে পূর্ণ আসরই পড়িতে পারিল।

ইহার অর্থ এই যে, যদি কেহ যথাসময়ে আসরের নামায পড়িতে না-ই পারে, সময় যদি শেষ হইয়াই যায়, তাহা হইলে সে যে আসরের নামায পড়িবে না তাহা নয়, বরং অনতিবিলম্বে তাহাকে নামাযে দাঁড়াইয়া যাইতে হইবে। সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাক'আত পড়িতে পারিলেও ধরা যাইবে যে, সে সেই দিনের আসরের নামায পড়িয়াছে।

জামা'আতের সহিত নামায

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً - (بخارى، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ জামা'আতের সহিত পড়া নামায একাকী নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ অধিক উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসে জামা'আতের সহিত নামায পড়ার জন্য উৎসাহ দান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ একাকী পড়া নামাযের তুলনায় জামা'আতের সহিত পড়া নামায অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এই হাদীসে সাতাশ গুণ অধিক মর্যাদার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে পঁচিশ গুণ অধিক মর্যাদার উল্লেখ করা হইয়াছে। আসলে এই সংখ্যা পার্থক্যের কোন গুরুত্ব নাই। কেননা এইগুলির মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নাই। আর কুরআন ও হাদীসে আমলের ফযীলত প্রসঙ্গে যত সংখ্যারই উল্লেখ হইয়া থাকে, উহার মূল্য লক্ষ্য বিশেষ কোন সংখ্যা বোঝানো নয়, বরং পরিমাণ বা মাত্রার আধিক্য বুঝানোই উহার উদ্দেশ্য। ইহাও হইতে পারে যে, প্রথমে রাসূলে করীম (স) কম সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে অধিক সংখ্যা জানাইয়া দিয়াছেন

কিংবা নামায ও নামাযীর অবস্থার পার্থক্যের দৃষ্টিতে জামা'আতের সহিত নামায পড়ার মর্যাদা মাত্রায়ও পার্থক্য হইতে পারে। ফলে কাহারো জামা'আত সহকারে নামায পড়ায় পঁচিশ গুণ অধিক মর্যাদা হইতে পারে, আর কাহারো হইতে পারে সাতাশ গুণ অধিক।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ نَاسًا فِىْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْهَا فَاٰمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوْا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوْتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا لَشَهِدَهَا يَعْنِىْ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ

(بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কোন নামাযে নবী করীম (স) কিছু সংখ্যক লোককে দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেনঃ আমি স্থিরভাবে মনস্থ করিয়াছি যে, একজনকে লোকদের লইয়া নামায পড়িতে আদেশ দিয়া আমি সেই সব লোকের নিকট চলিয়া যাইব, যাহারা নামাযে অনুপস্থিত থাকে। অতঃপর কাষ্ঠ জমা কারিয়া তাহাদের ঘর জ্বালাইয়া দিতে বলিব। তাহাদের কেহ যদি জানিতে পারিত যে, তাহারা (নামাযে আসিলে) কোন চর্বিদার হাড় পাইতে পারিবে, তবে তাহারা অবশ্যই নামাযে অর্থাৎ এশার নামাযে উপস্থিত হইত। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা বুখারী শরীফে নবী করীম (স)-এর আলোচ্য কথার শুরুতে এই শপথ উদ্ধৃত হইয়াছেঃ والذى نفسى بيده সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যাঁহার মুঠির মধ্যে আমার প্রাণ নিবদ্ধ রহিয়াছে। ফলে এই হাদীসটি অত্যন্ত জোরদার হইয়াছে। ইহাতে জামা'আতে হাযির হওয়ার গুরুত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে এবং যাহারা জামা'আতে হাযির হয় না, তাহাদের প্রতি রাসূলে করীম (স)-এর প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, যাহারা নামাযের জামা'আতে অনুপস্থিত থাকে, তাহাদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়ার মত কঠিন শাস্তি দানেরও ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা হইতে জামা'আতে হাযির হওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

এই হাদীস এবং এই পর্যায়ের অন্য কয়েকটি হাদীসের ভিত্তিতে বলা হইয়াছে যে, জামা'আতের সহিত নামায পড়া ওয়াজিব। কেননা উহা সুন্নাত হইলে উহার দরকারীর জন্য রাসূলে করীম (স) এতবড় কঠিন শাসন বাণী উচ্চারণ করিতেন না। আর যদি 'ফরযে কিফায়া' হইত, তবুও এইরূপ ভীতি প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল না। কেননা, কিছু লোক তো রাসূল (স)-এর সহিত জামা'আতে নামায পড়িতেই ছিলেন। কিছু সংখ্যক তাবেয়ী আলিম উহাকে 'ফরযে আইন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মালিকী ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী বহু আলিমের মতে ইহা ফরযে কিফায়া। আর অপরাপর আলিমদের মতে ইহা সুন্নাত। ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেনঃ জামা'আতে নামায পড়া যদি ফরয হইত, তবে নবী করীম (স) জামা'আতে অনুপস্থিত লোকদিগকে কেবল মৌখিক শাসন ও ভীতি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। আসলে ইহা কেবলমাত্র শাসন বাণী। লোকদিগকে জামা'আতের গুরুত্ব বুঝাইবার ও জামা'আতে রীতিমত শরীক হইতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ কথা বলা হইয়াছে।

কাযী ইয়ায বলিয়াছেনঃ প্রথমে জামা'আতে নামায পড়া ফরয ছিল। পরে ইহা রহিত হইয়াছে। আবার কেহ বলিয়াছেন যে, আসলে এই কঠোর শাসন বাণী কেবলমাত্র জুম'আর নামাযে অনুপস্থিত লোকদের জন্যই উচ্চারিত হইয়াছে। অন্যান্য নামায সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য নহে।

(نيل الاوطار- ج ٣- ص ١٥٢)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اٰخُذَ شُعَلًا مِّنْ نَّارٍ فَاُحَرِّقَ عَلٰى مَنْ لَّا يَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ بَعْدُ ۔

(بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, মুনাফিকদের পক্ষে ফজর ও ইশার নামায অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক ও দুঃসাধ্য কাজ আর কিছু নাই। কিন্তু এই দুইটি নামাযের কি সওয়াব ও পুরস্কার এবং বরকত নির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে তাহা যদি তাহারা জানিত, তাহা হইলে তাহারা এই নামাযে অবশ্যই উপস্থিত হইত। সেই জন্য হাঁটুতে ভর দিয়া ও হামাগুড়ি দিয়া আসিতে হইলেও ইহা হইতে পিছ পা হইত না। (অতঃপর তিনি বলেন) আমার ইচ্ছা হয়, কোন দিন মুয়াযযিনকে জামা'আতের জন্য ইকামত বলিতে নির্দেশ দিয়া এবং আমার পরিবর্তে অপর একজনকে ইমামতি করার দায়িত্ব দিয়া আমি আগুনের মশাল হাতে লইয়া বাহির হইব এবং যাহারা আযান-ইকামত হওয়ার পরও জামা'আতে শরীক হইবে না তাহাদের সহ তাহাদের ঘরগুলি জ্বালাইয়া দিব। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিও পূর্বোক্ত হাদীসেরই অনুরূপ। দুইটি হাদীস একই বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত। ইহাতেও জামা'আতে অনুপস্থিত লোকদের জন্য কঠিন শাস্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা রাসূলে করীম (স)-এর সময়ের লোকদের সম্পর্কে তাঁহার উক্তি। হযরত উসামা (রা) হইতে বর্ণিত এ পর্যায়ের হাদীসটি অধিকতর স্পষ্ট। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ

لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ اَوْ لَاُحَرِّقَنَّ بُيُوْتَهُمْ ۔ (كنز العمال، ابن ماجه)

জামা'আতের সহিত নামায পড়া হইতে বিরত থাকা লোকদের ত্যাগ করা উচিত। অন্যথায় আমি তাহাদের ঘরসমূহে আগুন ধরাইয়া দিব।

মোটকথা, জামা'আতের সহিত নামায পড়াই ইসলামের বিধান। জামা'আতে অনুপস্থিত থাকা অতি বড় গুনাহ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জামা'আতের কাতার সোজা করা

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ ۔

(بخارى، مسلم)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা সকলে নামাযের কাতারসমূহ সমান সমান করিয়া লইবে। কেননা কাতার সোজা ও সমান করার ব্যাপারটি সঠিকভাবে নামায কায়েম করারই একটা বিশেষ অংশ। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা কুরআন মজীদে 'নামায কায়েম' করার যে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহা মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য, তাহা পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে আদায় করার অন্যতম শর্ত হইল জামা'আতের কাতারসমূহ সরল রেখার মত দাঁড় করা। সমান সমান ও সোজা করা। বস্তুত মুসলমানদের সামাজিক জীবনের প্রধান স্তম্ভ হইল জামা'আতের সহিত নামায। এইজন্য কাতারসমূহ সোজা ও ঠিক ঠিক ভাবে দাঁড় করানো অপরিহার্য শর্ত করা হইয়াছে। আর নামাযের মত উন্নত সামষ্টিক ইবাদতের জন্য

ইহা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইসঙ্গে ইহারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, নামাযের প্রথম কাতার সর্বপ্রথম পূর্ণ করিতে হইবে। পরে পর পর কাতারগুলো সমান ও সোজাভাবে দাঁড় করাইতে হইবে। একজন এক ইঞ্চি সম্মুখে ও একজন এক ইঞ্চি পিছনে দাঁড়াইবে না বরং কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ও পায়ে পা মিলাইয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলে কাতার সোজা ও ঋজু হইবে।

আবূ দাউদ বর্ণিত অপর কয়েকটি হাদীস হইতে জানা যায় যে, নবী করীম (স) প্রত্যেক নামায কালে ডানদিকের লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেনঃ তোমরা সোজা হইয়া দাঁড়াও। পরে বামদিকে মুখ করিয়াও অনুরূপ কথা বলিতেন।

عن النعمان بن بشير رض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح حتى رأى انا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم - (مسلم)

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) আমাদের নামাযের সারিগুলোকে এতদূর সমান ও সোজা করিতেন যে, ইহা দেখিয়া মনে হইত, তিনি বোধ হয় উহা দ্বারা তীরগুলোকে সোজা করিবেন। এইভাবে করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত তিনি মনে করিলেন যে, আমরা হয়ত উহার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। পরে একদিন একটা ঘটনা ঘটিল। নবী করীম (স) হুজরার বাহিরে আসিলেন এবং নামায পড়াইবার জন্য নিজের স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। তাকবীর বলিয়া নামায শুরু করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। সহসা এক ব্যক্তির উপর তাঁহার নযর পড়িল, যাহার বুক কাতার হইতে কিছুটা সম্মুখের দিকে অগ্রসর দেখা যাইতেছিল। তখন তিনি বলিলেনঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সমান ও সোজা কর। অন্যথায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদিগকে পরস্পর বিরোধী করিয়া দিবেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসের বাক্য حتى كانما يسويها القداح মনে হইতেছিল তিনি যেন কাতারগুলোর সাহায্যে তীর সোজা করিবেন।

এই কথার অর্থ বুঝিবার জন্য এই কথা জানিয়া লওয়া দরকার যে, তদানীন্তন আরববাসীরা শিকার বা যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য যে সব তীর তৈয়ার করিত, তাহাকে সম্পূর্ণ সোজা ও ঋজু করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা হইত। এই কারণে কোন জিনিস সোজা ও ঋজু হওয়ার গুণ বর্ণনায় উদাত্তভাবী হইয়া বলা হইতঃ উহা এমন সমান ও ঋজু যে, উহার সাহায্যে তীরগুলোকে সোজা করা যাইতে পারে। অন্য কথায় তীরগুলিকে সোজা করার উহাই যেন মানদণ্ড। হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত নু'মান ইবনে বশীরের কথার তাৎপর্য শুধু এই যে, রাসূলে করীম (স) নামাযের কাতারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সোজা করিতে চেষ্টা করিতেন এবং উহাতে এক চুল পরিমাণও বক্রতা থাকিতে দিতেন না। এই ভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর রাসূলে করীম (স) বুঝিতে পারিলেন যে, আমরা কাতার সোজা করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছি। এইরূপ অবস্থায় একদিন তিনি আমাদেরই একজনের দ্বারা কিছু ব্যতিক্রম হইতে দেখিয়া সম্ভবত খুবই দুঃখ পাইয়াছিলেন। তাই উদাত্ত কণ্ঠে সমবেত লোকদের সম্বোধন করিয়া কাতার সোজা করিবার তাকীদ করিলেন এবং বলিলেন যে, এই ব্যাপারে তোমরা ত্রুটি করিলে তোমাদের দিলও বাঁকা হইয়া যাইবে, তোমাদের দিল পরস্পর বিরোধী হইয়া যাইবে। অন্যথায় ইসলামী আদর্শে গড়া সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিবে। আর এই সামাজিক ভাঙ্গন যে এক একটি জাতির জীবনে চরম বিপর্যয় আনিয়া দিতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য।

নামাযের কাতারে পারম্পর্য বিধান

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىْ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُولُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - (مسلم)

হযরত আবূ মাসউদ আল-আনসারী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন রাসূলে করীম (স) নামাযের জামা'আতে দাঁড়াইবার কালে আমাদিগকে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমাদের স্কন্ধে হাত রাখিতেন এবং বলিতেনঃ সমান হইয়া দাঁড়াও এবং আগে-পিছে অসমান হইয়া দাঁড়াইও না। অন্যথায় আল্লাহ্ না করুন, উহার শাস্তিস্বরূপ তোমাদের দিল পরস্পর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি আরো বলিতেনঃ তোমাদের মধ্য হইতে বুদ্ধিমান ও সমঝদার লোক যাহারা, তাহারা যেন নামাযে আমার নিকট ও কাছাকাছি দাঁড়ায়। তাহাদের পর তাহারা দাঁড়াইবে যাহারা উক্ত গুণের দিক দিয়া প্রথোমোক্তদের নিকটবর্তী। আর তাহাদের নিকটবর্তী যাহারা, তাহারা দাঁড়াইবে ইহাদের পর। —মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদিসটিতে নবী করীম (স) প্রথমত নামাযের কাতার সমান করার তাকীদ করিয়াছেন। পরে এই কাতার রচনা সম্পর্কে একটি গুণমূলক বিধান জারী করিয়াছেন। তাহা হইল এই যে, রাসূলে করীম (স)-এর পিছনে প্রথম কাতারে দাঁড়াইবে সেই সব লোক, যাহারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিদ্যায় অপেক্ষাকৃতভাবে বিশিষ্ট। পরবর্তী কাতারগুলোও এই পারম্পর্য অনুসারেই রচনা করিতে বলিয়াছেন। আর এইরূপ পারম্পর যে খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নামাযের মধ্যে জ্ঞানে-বুদ্ধিতে-বিদ্যায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর লোকদেরই নবী করীম (স)-এর নিকটে দাঁড়ানো উচিত। ইহা কোন শ্রেণীবিভেদ নহে। বরং সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়াও যেমন ইহার মূল্য রহিয়াছে, তেমনি রাসূলে করীম (স)-এর সব কাজেই যেহেতু সাধারণ শিক্ষা দানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত থাকে এবং সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে অধিকতর বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকেরাই অধিক সক্ষম হইয়া থাকে, এই কারণেই এই নির্দেশের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

নামাযে কিবলামুখী হওয়ার গুরুত্ব

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ - (بخارى)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, যে লোক আমাদের ন্যায় নামায পড়িল, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করিল এবং আমাদের যবাই করা জন্তু আহার করিল, সে-ই মুসলমান। তাহার জন্য আল্লাহ্‌র ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব রহিয়াছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত তাঁহার গ্রহণ করা দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা বা ওয়াদা ভঙ্গ করিও না। —বুখারী

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে ইসলামী সমাজ বিধানের তিনটি মৌলিক ভিত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমটি হইল, আমাদের ন্যায় নামায পড়া। দ্বিতীয়টি আমাদের কিবলাকে কিবলা মানিয়া লওয়া ও

সেই কিবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়া এবং তৃতীয় হইল, আমাদের নিজস্ব নিয়মে যবাই করা জন্তুর গোশ্‌ত নিঃসংকোচে আহার করা–আহার করিতে প্রস্তুত থাকা। এই তিনটি কাজ যে লোক যথাযথভাবে করে, সে-ই মুসলমান এবং দুনিয়ার যে সব লোক এই কাজ তিনটি করে ও তাহাতে কোনরূপ সংকোচ বা ঘৃণা বোধ করে না, তাহারাই বৃহত্তর মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত। মুসলিমরূপে পরিচিতি লাভ এবং মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত গণ্য হওয়ার জন্য এই তিনটি হইল মৌলিক শর্ত বিশেষ। এই শর্তত্রয়ের কোন একটিও যদি কেহ অস্বীকার বা অমান্য করে কিংবা এই কাজ তিনটি করিতে কোনরূপ সংকোচ বোধ করে, সে আর যাহাই হউক, মুসলিম হইতে পারে না। মুসলিম জাতির মধ্যে গণ্য হওয়ার তাহার যোগ্যতা নাই।

আমাদের ন্যায় নামায পড়ার অর্থ, রাসূলে করীম (স)-এর প্রদর্শিত ও অনুসৃত নিয়ম পদ্ধতিতে এবং অনুরূপ ভাবধারায় নামায পড়া। এই পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতি রাসূলে করীম (স)-এর মনগড়া বা স্ব-কপোলকল্পিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁহাকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। এই কারণেই তিনি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেনঃ

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي۔ (بخاری)

তোমরা আমাকে যেভাবে ও যে নিয়ম-পদ্ধতিতে নামায পড়িতে দেখ, তোমরাও ঠিক সেইভাবে ও সেই নিয়ম-পদ্ধতিতে নামায পড়।

কেননা সেইভাবে নামায পড়িলে সরাসরি আল্লাহ্‌র মনোনীত নিয়ম-পদ্ধিতিতে নামায পড়া সম্পন্ন হইবে। অন্যথায় নয়।

বস্তুত যে লোক রাসূলে করীম (স)-এর নবুয়্যাত ও রিসালাতের প্রতি ঈমান আনে, সে তো সেই সব বিষয়ের প্রতি স্বতঃই ঈমান আনিবে যাহা তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পাইয়াছেন। আর নামাযের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি যে আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই পাওয়া, তাহা নিঃসন্দেহ। এই কারণে নামাযকে লোকদের ইসলাম গ্রহণের বাস্তব প্রমাণ ও প্রতীকরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র একত্ব ও রাসূলের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার সাক্ষ্যদানের কথা এখানে উল্লেখ করা হয় নাই। কেননা তাহা নামাযের মধ্যেই শামিল রহিয়াছে। উহার পুনরুল্লেখ পূনরাবৃত্তি মাত্র এবং নিস্প্রয়োজন।

আমাদের কিবলার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ার অর্থ কা'বা মুখী বা কা'বার দিক মুখী হইয়া নামাযে দাঁড়ানো। 'কা'বা' আল্লাহ্‌র ঘর। ইহা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য কিবলা। যে বিশেষ জিনিসকে লক্ষ্য করিয়া ও উহার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়া হয়, পরিভাষায় তাহাকেই 'কিবলা' (قبله) বলা হয়। দুনিয়ার যেখানে যে মুসলমান রহিয়াছে, তাহাকেই এবং সেখান থেকেই কা'বার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। ইহা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব। মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ۔

তুমি যখন নামায পড়িতে প্রস্তুত হইবে, তখন পুরাপুরিভাবে অযূ করিবে। অতঃপর কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহার পর তাকবীর বলিবে।

বস্তুত কা'বার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ানো নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত বিশেষ। অবশ্য যদি কোন কারণে কিবলামুখী হওয়া না যায় কিংবা কিবলার দিক নিঃসন্দেহে জানা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে অন্য যে কোন দিকে মুখ করিয়া নামযয পড়া যাইবে। এই অবস্থায় যে দিকে ফিরিয়া নামায পড়িবে সেই দিকই কিবলা—একথা মনে দৃঢ়মূল করিয়া লইতে হইবে। হযরত আমের ইবনে রবীয়া (রা) বলিয়াছেনঃ আমরা এক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে ছিলাম, সেখানে

কিবলা কোন দিকে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তখন আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারণা মতে কিবলা ঠিক করিয়া সেই দিকে ফিরিয়া নামায পড়ে। সকাল বেলা বিষয়টি লইয়া রাসূলে করীমের সাথে যখন আলোচনা হইল, তখন আল্লাহ্‌র ফরমান আমাদের সামনে উপস্থিত হইলঃ

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ - (البقرة:١١٥)

যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইবে, সে দিকেই আল্লাহ্‌ রহিয়াছেন।

ইহা ওযরের সময়ের পথ-নির্দেশ। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কা'বাই হইল একমাত্র কিবলা। কা'বা শরীফকে মুসলমানদের কিবলা নির্দিষ্ট করার ইতিহাস কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হইয়াছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) প্রথমে মসজিদে আকসা'র দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতেন। হযরত বরা ইবনে আযেব (রা)-এর বর্ণনায় ইহার মেয়াদ ১৬ মাস কি ১৭ মাস উদ্ধৃত হইয়াছে। —বুখারী

সেই সময় কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - (البقرة:١٤٤)

আকাশমণ্ডলের দিকে তোমার দৃষ্টির আবর্তন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই জন্য আমরা এমন কিবলার দিকে তোমাকে অবশ্য ফিরাইব, যাহা তুমি পছন্দ করিবে—সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিবে। কাজেই তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদে হারামের—কা'বার—দিকে ফিরাও।

এই নির্দেশ শোনামাত্রই নবী করীম (স) ও মুসলমানগণ কা'বার দিকে ফিরিয়া নামায পড়িতে শুরু করিলেন। অতঃপর মুসলিম জাহানের জন্য এই কা'বা শরীফই হইল চিরন্তন কিবলা। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ কুবা'র মসজিদে লোকেরা নামায পড়িতেছিলেন। তখন একজন সাহাবী ঘোষণা করিলেনঃ গত রাত্রে রাসূলের প্রতি কুরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছেঃ

وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ -

এবং কা'বাকে কিবলা বানাইয়া নামায পড়িতে আদেশ করা হইয়াছে।

এই কথা শোনামাত্রই

وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ -

তাহারা সিরিয়ার মসজিদে আকসা'র দিকে নামায পড়িতেছিলেন, এই কথা শুনিয়াই তাহারা কা'বার দিকে ঘুরিয়া গেলেন। —বুখারী

হযরত বরা ইবনে আযেব (রা) বলিয়াছেনঃ

صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ - (مسلم)

আমরা নবী করীম (স)-এর সাথে বায়তুল মাকদিসমুখী হইয়া ষোল কিংবা সতের মাস নামায পড়িয়াছি। পরে আমরা কা'বার দিকে ফিরিয়া গেলাম।

আলোচ্য হাদীস অনুযায়ী কিবলামুখী হওয়া নামাযের শুদ্ধতার জন্য অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু তাহার পরও কিবলার এই গুরুত্ব ঘোষণার কারণ হইল, কিবলা নামায অপেক্ষা অধিক পরিচিত। পরিচিত লাভের দিক দিয়া ইহা অধিকতর উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত। কেননা নামায না জানিলেও কিবলার কথা প্রত্যেকেই জানে। বিশেষত আমাদের নামাযের ন্যায় 'কিয়াম'—দাঁড়ানো ও 'কিরাত'—উপাসনায় আল্লাহ্র কালাম পাঠ প্রভৃতি অন্যদের ইবাদতের অনুষ্ঠানেও রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের 'কিবলা' কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের জন্যই নির্দিষ্ট। ইহা অন্য কাহারও কিবলা নয়। অন্য কেহ আমাদের কিবলামুখী হইয়া 'উপাসনা' করে না।

আলোচ্য হাদীসে তৃতীয় উল্লেখ করা হইয়াছে এমন একটা অভ্যাস বা ইবাদতের, যাহা মুসলমানকে অন্যদের হইতে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (Distinguished) করিয়া দেয়। তাহা হইল, আমাদের যবাই করা জীব ভক্ষণ করা, ভক্ষণ করিতে কোনরূপ দ্বিধা–সংকোচ বোধ না করা। কেননা যাহারা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার নয় কিংবা উহার প্রতি বিদ্বেষী দেখা গিয়াছে, তাহারা ইসলামী রীতিতে ও এক আল্লাহ্র নামে যবাই করা জীবের গোশ্ত খাইতে সংকোচ বোধ করিয়া থাকে। (ইহার ব্যতিক্রম নাই এমন দাবি অবশ্য করা যাইতেছে না) এই কথাটি বিশেষভাবে ইয়াহুদী—আরো বিশেষভাবে তদানীন্তন মদীনার ইয়াহুদী সমাজের প্রতি প্রয়োজ্য। কেননা তাহারা বিশেষভাবে মুসলমানের যবাই করা জীবের গোশ্ত খাইতে প্রস্তুত হইত না।

মনে রাখা আবশ্যক, মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এখানে যে তিনটি বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত মৌলিক এবং বুনিয়াদী পর্যায়ের। কিন্তু ইহাই চূড়ান্ত ও শেষ কথা নয়। এই তিনটিরও স্থান আল্লাহ্র তাওহীদ ও রাসূলের রিসালাতের প্রতি ঈমানের সাক্ষ্যদানের পর। এই সাক্ষ্যদানের উচ্চারণ ও ঘোষণা দানের পরই ইসলামে প্রবেশ প্রমাণিত হয়। অতঃপর এই তিনটি কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয় ব্যক্তির ইসলামী সমাজভুক্ত ও মুসলিমরূপে গণ্য হওয়া।

আলোচ্য হাদীসটির দৃষ্টিতে এই তিনটি কাজ যে করিবে, সে মুসলমানরূপে গণ্য হইবে। এই মুসলিমের প্রতি রহমত দান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল গ্রহণ করিয়াছেন। অপর একটি হাদীসে রাসূলে করীমের এই দায়িত্ব গ্রহণের কথা ঘোষিত হইয়াছে নিম্নের ভাষায়ঃ

فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ۔ (بخارى)

এই মুসলমানদের রক্ত ও মাল–সম্পদ আমাদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। তবে শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী অন্য কোন আচরণ গ্রহণ করিতে হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। আর তাহাদের হিসাবে গ্রহণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্র। —বুখারী

আলোচ্য হাদীস হইতে আরও জানা যায়, মানুষের অন্তরের গভীর গহনে কি লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা সহসা জানিবার কোন নির্ভরযোগ্য উপায় না থাকায় মানুষের বাহ্যিক আচার–আচরণ দেখিয়াই তাহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই ইসলামের নীতি। কাজেই যে লোক ইসলামের মৌল সংস্কৃতি অনুসরণ করিয়া চলে—তাহার কর্তৃক উহার বিপরীত আচরণ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত—তাহাকে মুসলমানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় জানা গেল, কিবলামুখী হইয়া নামায পড়া নামাযের বিশুদ্ধতার জন্য জরুরী শর্ত। কেননা নামায হইল আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ–উপায়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নামাযে যে লোক ইচ্ছাপূর্বক কিবলামুখী হওয়া পরিহার করিবে, তাহার নামায সহীহ্ হইবে না। সে দ্বীন–ইসলামের অনুসারী নয়। কাজেই যাহারা কা'বা শরীফের প্রতিবেশী, তাহারা তো কা'বাকেই সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িবে। আর যাহারা কা'বা হইতে দূরে অবস্থিত, তাহারা কা'বা যে দিকে, সেই দিকে جهة الكعبة ফিরিয়া নামায পড়িবে। কারখী, আবূ বকর আররাযী ও হানাফী মাযহাবের আলিমগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। বায়হাকী শরীফে উদ্ধৃত হইয়াছে।

الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرام والمسجد الحرام قبلة أهل مكة ممن يصلي في بيته ومكة قبلة أهل الحرام والحرام قبلة لأهل الآفاق ۔ (عمدة القاري)

কা'বা আল্লাহ্‌র ঘর—কিবলা সেই লোকদের যাহারা মসজিদে হারামে—কা'বার চতুষ্পার্শের স্থানে নামায পড়ে। মসজিদে হারাম কা'বার চতুষ্পার্শের স্থান—কিবলা মক্কার অধিবাসীদের, যাহারা নিজেদের ঘরে নামায পড়ে তাহাদের জন্য। মক্কা নগর কিবলা বিস্তীর্ণ হেরেম অধিবাসীদের জন্য। আর বিস্তীর্ণ হেরেম এলাকা কিবলা হইল সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য।

হাদীসটি সনদের দিক দিয়া যয়ীফ হইলেও ইহার বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবনীয়।

নামাযের শুরু ও শেষ

عن أبي سعيد الخدري رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلوة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلوة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها ۔ (ترمذي، ابو داؤد، بخاري، مسلم، ابن ماجه)

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ নামায শুরু করার উপায় হইল পবিত্রতা অর্জন করা, নামাযের তাহরীমা বাঁধিতে হয় তাকবীর বলিয়া এবং উহাকে শেষ করিতে হয় সালাম ফিরাইয়া। আর তাহার নামায হয় না, যে আলহামদু সূরা পড়ার পর আর একটি সূরা না পড়ে—তাহা ফরয নামায হউক, আর অন্য।

—তিরমিযী, আবূ দাউদ, বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা নামায শুরু করিবার একমাত্র অস্ত্র বা উপায় হইল পবিত্রতা অর্জন অর্থাৎ প্রথমে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করিয়া—অযূ ও প্রয়োজন হইলে গোসল করিয়া—নামায শুরু করিতে হয়। ইহা ছাড়া নামাযে দাঁড়ানোই জায়েয নয়। নামাযের তাহরীমা বাঁধিতে হয় 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া ও সেই সঙ্গে দুই হাত বাঁধিয়া। ইহাকে তাহরীমা বাঁধা বলা হয় এইজন্য যে, ইহার পর নামায ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় কাজ সম্পূর্ণ হারাম হইয়া যায়। আর নামায শেষ করিতে হয় সালাম করিয়া—ডান ও বাম দিকে ফিরিয়া আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া-রাহ্‌মাতুল্লাহ' বলিয়া।

এইখানে স্মরণীয় যে, হযরত নবী করীম (স)-এর নামায পড়া সংক্রান্ত যাবতীয় রীতি-নীতি ও আদেশ-উপদেশ পর্যায়ের সব হাদীস খুঁজিয়া দেখিলেও নামাযের পূর্বে প্রচলিত ধরনে গদবাঁধা আরবী ভাষায় নিয়্যত পড়ার কোন উল্লেখই পাওয়া যাইবে না। তিনি নিজে এইরূপ নিয়্যত পড়েন নাই, পড়িয়াছেন বলিয়া কেহ বর্ণনা করেন নাই। সহীহ-যয়ীফ কোন প্রকারের বর্ণনায়ই ইহার উল্লেখ করা হয় নাই। কোন সাহাবী বা তাবেয়ী কিংবা কোন ইমামও ইহা পড়েন নাই। (زاد المعاد-ابن القيم ج ۱ ص ۷۱)

তবে মনে মনে যে কিবলামুখী হওয়ার, ইমামের পিছনে ইক্‌তিদা করার ও যে ওয়াক্তের নামায পড়িতেছ তাহার কথা স্মরণ করিতে হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

হাদীসের শেষ বাক্যে নামাযে অবশ্য পঠিতব্য সূরার কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ তাহরীমা বাঁধার পর 'সুবনহানাকা' পড়িতে হয় এবং তাহার পর প্রথমে সূরা ফাতিহা—যাহার শুরু হইল আলহামদুলিল্লাহ—পড়িতে হয় ও উহার পর আর একটি সূরা বা কুরআন মজীদের যে কোন আয়াত

পাঠ করিতে হয়। ইহা না পড়িলে নামায হয় না। নামায হওয়ার জন্য ইহা অপরিহার্য শর্ত। এই ব্যাপারে ফরয নামায, ওয়াজিব নামায ও সুন্নাত বা নফল নামাযে কোনই পার্থক্য নাই। সব নামাযেরই এই একই ও অভিন্ন নিয়ম।

একটি হাদীসে নবী করীম (স)-এর নামায পড়ার নিয়ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاْءَةِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

(مسلم)

নবী করীম (স) নামায শুরু করিতেন আল্লাহু আকবার বলিয়া এবং কুরআন পাঠ শুরু করিতেন— নামায শুরু করার পর কুরআনের অংশ হিসাবে সূরা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করিয়া।

হযরত রাফে ইবনে রাফায়াতা ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। নবী করীম (সা) বলিয়াছেনঃ

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ امْرِئٍ حَتّٰى يَضَعَ الطُّهُوْرَ مَوْضِعَهٗ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَقُوْلَ اللّٰهُ اَكْبَرُ۔

(نسائى، ترمذى، طبرانى)

আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন করিবে, কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইবে ও আল্লাহু আকবার বলিবে।

অর্থাৎ তাহারাত অর্জনের পর কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইতে ও আল্লাহু আকবার বলিয়া নামায শুরু করিতে হইবে। নতুবা নামায কবুল হইবে না। (এই বর্ণনার ভাষা যথাযথ নয় বলিয়া মুহাদ্দিসগণ আপত্তি তুলিয়াছেন।) অপর বর্ণনার ভাষা এইরূপ, নবী করীম (স) নামাযীর নামায ঠিকভাবে হইতেছে না দেখিয়া শেষে বলিলেনঃ

اِنَّهٗ لَا تَتِمُّ صَلٰوةٌ لِاَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ فَيَضَعَ الْوُضُوْءَ مَوَاضِعَهٗ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

(طبرانى)

যথাযথভাবে অযূ করিয়া ও আল্লাহু আকবার বলিয়া শুরু করিলেই একজনের নামায পূর্ণ হইবে, নতুবা নয়।

আবূ হুমাইদের বর্ণনায় এই হাদীসের ভাষা নিম্নরূপঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ اِعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ۔

(ابن ماجه، ابن خزيمة، ابن حبان)

প্রথম উদ্ধৃত হাদীসে যে বলা হইয়াছেঃ وتحريمها التكبير ইহার অর্থ هو قول الله اكبر 'আল্লাহ আকবার' শব্দটি বলা ও উচ্চারণ করা। হযরত আলী (রা) বলিয়াছেনঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

নবী করীম (স) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন তখন বলিতেনঃ আল্লাহু আকবার।

হযরত ইবনে উমর বলিয়াছেনঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ وَرَفَعَ - উঠাবসা করার প্রত্যেকটি সময়ে আল্লাহু আকবার বলা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ - (بخارى، مسلم)

তুমি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াইতে যাইবে, তখন পূর্ণ মাত্রায় অযূ কর, পরে কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াও অতঃপর তাকবীর বল।

'তাকবীরে তাহরীমা' জমহুর ফুকাহার মতে নামাযের রুকন। হানাফীদের মতে ইহা নামাযের শর্ত। শাফেয়ীরও একটি মত এইরূপ। কেহ সুন্নাত বলিয়াছেন কিন্তু ইবনুল মুনযির বলিয়াছেনঃ

لَمْ يَقُلْ بِهٖ اَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِىْ - তাকবীরে তাহরীমা সুন্নাত একথা যুহরী ছাড়া আর কেহই বলেন নাই।

ইমাম নববী লিখিয়াছেন, হাদীসের ভাষাঃ

اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ -

যখন নামাযে দাঁড়াইবে তখন দুই হাত তুলিয়া তাকবীর বলিবে। ইহা হইতে তাকবীরে তাহরীমা প্রমাণিত হয়।

নবী করীম (স) তাঁহার মতই নামায পড়িতে বলিয়াছেন। আর তিনি বলিয়াছেনঃ

اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبِّرْ - যখন নামাযে দাঁড়াইবে, তখন আল্লাহু আকবার বল।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে,তাকবীরে তাহরীমা ওয়াজিব। ইমাম করখী হানাফী মাযহাবের এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে নামাযী ইমামকে রুকূ'তে পাইবে তাহার জন্য রুকূ'র তাকবীর বলিয়া রুকূতে চলিয়া যাওয়াই যথেষ্ট। (فتح البارى)

নামায শুরু করার জন্য তাকবীরে তাহরীমা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইহা না বলিলে নামায শুরুই করা যায় না। সুফিয়ান সওরী, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ এক বাক্যে বলিয়াছেনঃ

اِنَّ تَحْرِيْمَ الصَّلٰوةِ التَّكْبِيْرُ وَلَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ دَاخِلًا فِى الصَّلٰوةِ اِلَّا بِالتَّكْبِيْرِ -

নামাযের তাহরীমা হইল তাকবীর বলা এবং এই তাকবীর না বলিয়া কেহ নামাযে প্রবেশই করিতে পারে না।

ইমাম মালিক বলিয়াছেনঃ

لَا يَصِيْرُ شَارِعًا اِلَّا بِقَوْلِهٖ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - 'আল্লাহু আকবার' না বলা পর্যন্ত নামায শুরুই হয় না।

ইমাম আবূ হানীফার মতে ফার্সী ভাষায় ইহার তরজমা বলিয়া নামায শুরু করিলেও জায়েয বা নামায শুরু করা হইবে। (تحفة الاحوذى - زاد المعاد - تحفة الفقهاء)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ لِلصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا -

(بخارى، مسلم، ترمذى، ابوداؤد، نسائى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার দুইখানি হাত দীর্ঘ করিয়া উপরের দিকে তুলিতেন।
—বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা হাদীস হইতে'তাকবীরে তাহরীমা' বলার সময় দুই হাত উপরের দিকে তোলার নিয়ম জানা যায়। নবী করীম (স) নিজে ইহা করিতেন। এই পর্যায়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত ও গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হাদীসটির শেষ শব্দটির (مَدًّا) দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি এই যে, তিনি তাঁহার হস্তদ্বয় তাঁহার মস্তকের দিকে দীর্ঘায়িত অবস্থায় উর্ধ্বে তুলিতেন অথবা উহার অর্থ তাঁহার হস্তদ্বয়কে উপরে মাথা পর্যন্ত উচু করিয়া তুলিতেন।

'তাকবীরে তাহরীমা' বলার সময় দুইখানি হাত উপরে তোলার শরীয়ত ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহা বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদীস হইতে প্রমাণিত। অবশ্য দুইটি বিষয়ে বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি হইল, হাত উপরে কতদূর তুলিতে হইবে এবং দ্বিতীয় হইল, তাকবীর বলা ও হাত তোলা এই দুই কাজের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

কাহারো কাহারো মতে হাত দুইখানি দুই কাঁধ পর্যন্ত তুলিতে হইবে। তাঁহাদের দলীল হইল হযরত ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস। হাদীসটির প্রথম অংশ এইঃ

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ -

(بخاری، مسلم)

নবী করীম (স) নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া দুইখানি হাত উপরে এতটা তুলিতেন যে, হাত দুইখানি তাঁহার দুই স্কন্ধের সমান উচ্চতায় পৌঁছিয়া যাইত। —বুখারী, মুসলিম

আবার অপরাপর ফিকাহ্‌বিদরা মনে করেন, হাত দুইখানি দুই কান পর্যন্ত উপরে তুলিতে হইবে। তাঁহারা দলীল হিসাবে যহরত বরা' ইবনে আযেব (রা) বর্ণিত হাদীসটির উল্লেখ করিয়াছেন। সেই হাদীসটির ভাষা হইলঃ

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ أُذُنَيْهِ -

(ابو داؤد، دارقطنی)

আমি রাসূলে করীম (স)-কে নামায শুরু করার সময় তাঁহার দুই হাত তাঁহার দুই কানের নিকট পর্যন্ত উর্ধ্বে তুলিতে দেখিয়াছি। —আবূ দাউদ, দারে কুতনী

সনদের দিক দিয়া এই দুইটি হাদীসই সহীহ্ ও সপ্রমাণিত। তাকবীর বলা ও উর্ধ্বে হাত তোলার সময় আপেক্ষিকতা পর্যায়েও দুই ধরনের হাদীসের বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রা) সম্পর্কে বলা হইয়াছে।

إِنَّهٗ رَأٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرَةِ - (مسند احمد، ابو داؤد)

তিনি রাসূলে করীম (স)-কে তাকবীর বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাত দুইখানি উর্ধ্বে তুলিতে দেখিতে পাইয়াছেন। —মুসনাদে আহ্‌মদ, আবূ দাউদ

শাফেয়ী ও মালিকী মাযহাব এই মতই সমর্থন করেন।

প্রথমে হাত তোলা ও পরে তাকবীর বলা কিংবা প্রথমে তাকবীর বলা ও পরে হাত তোলা—এই উভয় ধরনের হাদীসের বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মালিক ইবনে হুয়াইরিস বর্ণিত হাদীসের ভাষা হইলঃ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ - (مسلم)

তিনি প্রথমে তাকবীর বলিয়াছেন এবং তাহার পর হাত দুইখানি উপরে তুলিয়াছেন।

আর ইবনে শিহাব বর্ণিত হাদীসের ভাষা এইরূপঃ

رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ (مسلم) প্রথমে হাত দুইখানি উপরে উঠাইয়াছেন ও তাহার পর তাকবীর বলিয়াছেন।

হানাফী মাযহাবের মতে প্রথমে হাত দুইখানি উপরে তোলা ও পরে তাকবীর বলা বিধেয়। 'হিদায়া' গ্রন্থে ইহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছেঃ

لِاَنَّ الرَّفْعَ صِفَةُ نَفْيِ الْكِبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرُ اِثْبَاتُ ذٰلِكَ لَهُ وَالنَّفْيُ سَابِقٌ عَلَى الْاِثْبَاتِ كَمَا فِيْ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ -

হাত দুইখানি ঊর্ধ্বে তোলার তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছুর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্ব হরণ বা অস্বীকার করা। আর তাকবীর বলার তাৎপর্য, এইসব কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র জন্য প্রমাণ ও ঘোষণা করা। আর কালিমায়ে শাহাদাত-এ যেমন রহিয়াছে, হরণ বা অস্বীকৃতির স্থান প্রথমে, তাহার পরই উহা নিরংকুশভাবে কাহারো জন্য প্রমাণ করা যাইতে পারে।
(شرح الزرقانى على الموطاء)

নামাযে হাত বাঁধা

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض رَفَعَهُ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ اَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ تَعْجِيْلُ الْاِفْطَارِ وَتَاْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ - (الطبرانى)

হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীমের এই কথাটি বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনটি কাজ নবুয়্যাতের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য। তাহা হইলঃ ইফতার ত্বরান্বিত করা, খুব বিলম্বে সেহরী খাওয়া এবং নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধা। —তাবারানী

ব্যাখ্যা তাকবীরে তাহরীমা'র পরই নামায শুরু হইয়া যায়। অতঃপর হাত দুইখানি কিভাবে রাখিতে হইবে, উপরিউক্ত হাদীসটিতে তাহাই বলা হইয়াছে। হাদীসটির বক্তব্য অনুযায়ী নামাযে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং হাত বাঁধার নিয়ম হইল, বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধা। নামাযে এইরূপ হাত বাঁধিয়া দাঁড়ানো নবীগণের নৈতিক বৈশিষ্ট্য।

ইমাম মালিকের এক বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فِى الصَّلٰوةِ يَضَعُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى -

(موطا امام مالك)

নামাযে একটি হাত অপর হাতটির উপরে রাখা অর্থাৎ ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা নবীর নির্দেশ।

ইয়া'লা ইবনে মুররা রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি বর্ণনা করিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

ثَلَاثٌ يُحِبُّهَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تَعْجِيْلُ الْإِفْطَارِ وَتَاخِيْرُ السَّحُوْرِ وَضَرْبُ الْيَدَيْنِ اِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرٰى فِى الصَّلٰوةِ - (الطبرانى)

তিনটি কাজ আল্লাহ্ তা'আলা খুবই পছন্দ করেন। তাহা হইলঃ ইফতার ত্বরান্বিত করা, সেহ্‌রী বিলম্বিত করা এবং নামাযে দুই হাতের একখানা অপরখানার সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখা। —তাবারানী

প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসটিতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার কথা বলা হইয়াছে। আর তৃতীয় হাদীসটিতে শুধু দুইটি হাত নামাযে মিলাইয়া রাখিবার কথা বলা হইয়াছেঃ

সহল ইবনে সা'দ বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে।

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ -

(مؤطا امام مالك)

লোকদিগকে নামাযে বাম হাতের বাজুর উপর ডান হাত রাখিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইত।

—মুয়াত্তা ইমাম মালিক

এই হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিস আবূ হাযিম বলিয়াছেনঃ ইহা 'মরফু' হাদীস অর্থাৎ ইহা রাসূলে করীম (স)-এর কথা। এই হাদীসে নামাযে বাম হাতের বাজুর উপর ডান হাত রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে 'নির্দেশ দেওয়া হইত' শব্দ হইতে স্পষ্ট হয় যে, নির্দেশদাতা রাসূলে করীম (স) ছাড়া আর কেহই নয়। আর 'লোকদিগকে' বলিতে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বুঝানো হইয়াছে।

কিন্তু হাত দুইখানি বুকের দিকে কোনখানে স্থাপন করিতে হইবে?— এই বিষয়ে ইবনে হুবাইব বলিয়াছেনঃ

لَيْسَ لِذٰلِكَ مَوْضَعٌ مَعْرُوْفٌ - ইহার জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই।

অর্থাৎ বুকের দিকে যে কোন স্থানে রাখিলেই চলিবে। আবদুল ওয়াহহাব বলিয়াছেনঃ

اَلْمَذْهَبُ وَضْعُهُمَا تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السُّرَّةِ -

হাত দুইখানি বুকের নীচে ও নাভির উপরে রাখাই নিয়ম।

ইমাম আবূ হানীফা (রা) বলিয়াছেনঃ

اَلسُّنَّةُ وَضْعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ - হাত দুইখানি নাভীর নীচে রাখাই সুন্নাত।

আর সেই সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, ডান হাত দিয়া বাম হাতের কব্‌জা চাপিয়া ধরিতে হইবে, যাহাতে বাম হাতের বাজুর কিছুটা অংশ ধরা হয়। কিন্তু উহাতে জোর প্রয়োগ করা বা শক্ত করিয়া ধরা যাইবে না। হাদীস ব্যাখ্যাকারীরা বলিয়াছেনঃ

اَلْحِكْمَةُ فِى هٰذِهِ الْهَيْئَةِ اَنَّهُ صِفَةُ السَّائِلِ الذَّلِيْلِ وَهُوَ اَمْنَعُ مِنَ الْعَبَثِ وَاَقْرَبُ اِلَى الْخُشُوْعِ -

নামাযে এইভাবে হাত ধরিয়া দাঁড়ানোর তাৎপর্য এই হয় যে, বিনয়াবনত প্রার্থনাকারী দাঁড়াইয়া আছে। ইহা নামাযীকে বাজে খেয়াল হইতে রক্ষা করে এবং নামাযে বিনয় বিহবলতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে। (الزرقانى شرح الموطا)

প্রত্যেক উঠা—বসায় তাকবীর

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ ـ (بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন, তখন তাকবীর বলিতেন। আবার তাকবীর বলিতেন যখন রুকূ করিতেন। পরে রুকূ হইতে যখন তাঁহার পিঠ খাড়া করিতেন তখন তাকবীর বলিতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় বলিতেন 'হে আল্লাহ্, তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা'। পরে আবার তাকবীর বলিতেন যখন নীচের দিকে চলিয়া যাইতেন। পরে তাকবীর বলিতেন যখন মথা তুলিতেন। আবার তাকবীর বলিতেন যখন সিজদা করিতেন। আবার তাকবীর বলিতেন যখন তাঁহার মাথা তুলিতেন। এইভাবে তাঁহার সমস্ত নামাযেই উহা সম্পূর্ণ করা পর্যন্ত করিতে থাকিতেন। দুই রাকা'আতের পরে বসা হইতে যখন উঠিয়া দাঁড়াইতেন তখনও তাকবীর বলিতেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)। তিনি ইহাতে নবী করীম (স)-এর নামায পড়ার ধরনের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাতে বিশেষভাবে তাকবীর বলার বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই হাদীসে দেখা যায়, নামাযের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি উঠা বসায় রাসূলে করীম (স) তাকবীর বলিতেন। কেবলমাত্র রুকূ হইতে উঠার সময় ছাড়া আর প্রত্যেকটি কাজের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলিতেন। 'আল্লাহু আকবার' না বলিয়া তিনি না দাঁড়াইতেন, না রুকূতে যাইতেন, না সিজদায় যাইতেন, না সিজদা হইতে মাথা উঠাইতেন, না বসিতেন, না বসা অবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতেন। কেবলমাত্র রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া ও সোজা হইয়া দাঁড়াইবার কালে বলিতেনঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ـ আল্লাহ্ তাহার কথা শুনিয়াছেন, যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছে।

হাদীসের শব্দ ও ভঙ্গী হইতে এই কথাও বুঝিতে পারা যায় যে, যখনই কিছু করিতে শুরু করা হয়, তখনই তাকবীর বলিতেও শুরু করিতে হয় এবং উহা দীর্ঘ হইবে—যতক্ষণ না সেই কাজের শেষ পর্যন্ত পৌছা যাইবে। অনুরূপভাবে রুকূ হইতে উঠা শুরু করিতেই سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলিতে শুরু করিতে হয় এবং তাহা উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ানো পর্যন্ত দীর্ঘ করিতে হয়। কিন্তু ইহা সর্বসম্মত কথা নয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

إِنَّهُ كَانَ لَا يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا۔

দুই রাক'আতের পর উঠিয়া যতক্ষণে সোজা হইয়া না দাঁড়াইতেন, ততক্ষণ তিনি তাকবীর বলিতেন না।

অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ উঠিয়া দাঁড়াইবার পরই তাকবীর বলিতেন, তাহার পূর্বে নয়। ইমাম মালিকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানের মূল হাদীসটি মিশকাত শরীফ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বুখারী শরীফের মূল গ্রন্থে এই হাদীসটির এখানে অতিরিক্ত কথা হইলঃ

ثُمَّ يَقُوْلُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَّسْجُدَ ۔

অতঃপর সিজদায় যাওয়ার পূর্বে রাব্বানা ওয়া–লাকাল–হামদ

হে আমার আল্লাহ্ এবং তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা—বলিতেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ইমাম রকূ হইতে উঠিবার কালে বলিবেঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ আর উঠিয়া দাঁড়ানোর পর সিজদায় যাওয়ার আগে বলিবেঃ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ। কিন্তু এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইবনুল হুমাম বলিয়াছেনঃ মুক্তাদী سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলিবেন না।

আর ইমাম আবূ হানীফার মতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ই এই দুইটি কথা বলিবেঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ও سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

তবে ইহা তখন, যখন এক ব্যক্তি একাকী নামায পড়ে তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একাকী নামাযীর একসঙ্গে এই দুইটি বাক্য বলার ব্যাপারে ইজমা—সম্পূর্ণ ঐক্যমত রহিয়াছে। আর ইমাম আবূ হানীফার মতে ইমাম প্রথম বাক্যটিই বলিবে, দ্বিতীয়টি নয়। (عمدة القارى۔ مرقات)

عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ

اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ۔ (ترمذى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স) যখন নামায শুরু করিতেন, তখন বলিতেনঃ হে আমাদের আল্লাহ্! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং তোমার হামদ সহকারে, তোমার নাম মহান বরকতওয়ালা, তোমার মর্যদা অনেক উচ্চ ও বিরাট এবং তুমি ছাড়া ইলাহ কেহই নাই—হইতে পারে না। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা নামাযের তাহারীমা বাঁধার পর এই দোয়া পাঠ করা একান্তই জরুরী। নবী করীম (স) নিজে ইহা নিয়মিত পড়িতেন। দোয়ার অর্থের দিকে তাকাইলে ইহার গুরুত্ব সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বুঝিতে পারা যায়, নবী করীম (স) এই দোয়া কেন নিয়মিত পড়িতেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তাহরীমা বাঁধিয়া নামায শুরু করার পূর্বে মুসল্লীর উপর নামাযের স্থানে দাঁড়াইয়া ও কিবলামুখী হইয়া সর্বপ্রথম পড়িতে হয়ঃ

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔ (الانعام-٧٩)

আমি নিজের সত্তা ফিরাইতেছি সেই মহান আল্লাহ্র দিকে , যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি অন্য সব দিক হইতে নিজের মন ও সত্তাকে ফিরাইয়া আল্লাহ্র দিকে একমুখী হইয়া দাঁড়াইতেছি। আর আমি আল্লাহ্র সহিত শিরক্কারীদের মধ্যে সামিল নই।

এই দোয়াটি মূলত কুরআনের আয়াত। ইহা হযরত ইবরাহীমের আল্লাহ্র তাওহীদের সহিত পরিচিত হওয়ার পর তাঁহার উদাত্ত ঘোষণা হিসাবে কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হইয়াছে। বস্তুত শিরক অস্বীকার ও আল্লাহ্র একত্বে নিজেকে পুরাপুরি সমর্পণ করার জন্য ইহাপেক্ষা বড় বিপ্লবী ঘোষণা আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব তাওহীদবাদীদের কর্তব্য নামায পড়ার পূর্বক্ষণেই কিবলামুখী হইয়া সর্বপ্রথম এই দোয়া পাঠ করা । এহা নামায পড়ার নিয়মের মধ্যে বিধিবদ্ধ। মুসলিম শরীফে হযরত আলী বর্ণিত হাদীসে এই দোয়া পাঠের উল্লেখ হইয়াছে। (ইহা ফরয ও নফল সব নামাযের পূর্বেই পঠনীয়।) (تحفة الاحوذى)

হযরত আলী (রা) বলিয়াছেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ الخ۔

নবী করীম (স) যখন নামাযের জন্য দাঁড়াইতেন ও তাকবীর বলিতেন, তাহার পর اِنِّىْ وَجَّهْتُ শেষ পর্যন্ত বলিতেন। —আবূ দাউদ

এই হাদীসেও এই দোয়াটি পাঠ করার উল্লেখ করা হইয়াছে, অবশ্য ইহাতে বর্ণনার কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমে তাকবীর বলা, তাহার পর এই দোয়া পড়ার তাৎপর্য দূর্বোধ্য। সম্ভবত বর্ণনাকারী আগে পরে নির্বিশেষে নামাযের শুরুতে রাসূলে করীম (স) কি কি পড়িতেন তাহার মোটামুটি উল্লেখ করিতে চাহিয়াছেন।

অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণনাটি এই ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ الخ

রাসূলে করীম (স) নামায পড়ার জন্য যখন দাঁড়াইতেন তখন এই দোয়া পড়িতেন। ইহাই যথাযথ বর্ণনা।

দাঁড়াইয়া এই দোয়াটি পড়া বিধেয়। ইহার প্রভাব ও ফল সুদূরপ্রসারী।

নামাযের অন্তর্নিহিত ভাবধারা

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهٗ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهٗ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ۔ (مسند احمد، ابوداؤد)

হযরত উবাদাহ্ ইবনুস সামেত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করিয়াছেন। কাজেই যে ব্যক্তি

এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অযূ উহাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অতি উত্তমভাবে সম্পন্ন করিবে এবং সেই নামাযসমূহের রুকূ এবং আল্লাহ্‌ভীতি বিনয় সংক্রান্ত পূর্ণামাত্রায় আদায় করিবে, তাহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অবশ্য পালনীয় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে যে, তিনি তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন। আর যে লোক তাহা করিবে না, তাহার জন্য আল্লাহ্‌র অবশ্য পালনীয় কোন্ ওয়াদা নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর ইচ্ছা করিলে তাহাকে আযাব দান করিবেন।

—মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা এই হাদীসটির প্রথম বক্তব্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, যেন-তেন প্রকারে এই নামায সমূহ পড়িলেই বুঝি নামায পড়িবার সমস্ত দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে ও নামায ফরয করার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝি অর্জিত হইয়া যাইবে। এমন কথা চিন্তা করা ও নামায সম্পর্কে সেরূপ মনোভাব পোষণ করা নিতান্তই বাতুলতা মাত্র। নামাযের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করিবার জন্য উহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। নামায মূলতই কি জিনিস এবং উহা আদায় করার সঠিক ভাবধারা কি, তাহা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সেই সঙ্গে উহা আদায় করিবার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন নির্ভুলভাবে জানিতে হইবে।

এই পর্যায়ে প্রথম কথা, মানুষের জন্য অযূ করিতে হইবে। অযূহীন অবস্থায় নামায পড়া তো দূরের কথা, সেইজন্য দাঁড়ানোও যাইতে পারে না। পরন্তু অযূ অর্থ নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ শুধু ধৌত করা নয়। অযূ অর্থ, নিজেকে নামাযে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড় করার যোগ্য বানাইবার উদ্দেশ্যে মনে-মগজে পবিত্র ভাবধারা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তাঁহার রাসূলের শিখানো নিয়মে ধৌত করা। হাদীসের শব্দ প্রয়োগ ভঙ্গী হইতে স্পষ্ট হয় যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নূতন করিয়া অযূ করাই বাঞ্ছনীয়। অযূ থাকিলে নূতন করিয়া অযূ করার শরীয়তের পক্ষ হইতে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অনেকে ইহাকে ইসরাফ বা বেহুদা কাজ বলিতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নূতন করিয়া অযূ করার একটা বিশেষ মূল্য আছে এবং একটা বিশেষ সওয়াব পাওয়ার সুযোগ। উহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

দ্বিতীয়ত মূল নামায আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। নামাযের কার্যাবলী এই মনোভাব লইয়া সম্পন্ন করিতে হইবে যে, আমি বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। তিনিই আমার একমাত্র মাবুদ। আমি কেবলমাত্র তাঁহারই দাসানুদাস। আমি কেবলমাত্র তাঁহারই সম্মুখে মাথা নত করি। কেবল তাঁহার নিকটই জবাবদিহি করিতে প্রতি মুহূর্তেই আমি বাধ্য। বস্তুত নামাযের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ইহাই। নামাযে কিয়াম, রুকূ, সিজদা, বসা ইত্যাদি বহু কয়টি বড় বড় কাজ রহিয়াছে। কিন্তু এই হাদীসে কেবলমাত্র রুকূরই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উহাকে সম্পূর্ণতা দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। 'রুকূ' শব্দের অর্থ নতি স্বীকার। দাঁড়ানো অবস্থা হইতে নামাযীকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে সর্বপ্রথম মাথা নত করিতে হয় এই রুকূতে। ইহার পর সিজদা। ইহাও আল্লাহ্‌র সম্মুখে নতি স্বীকার তবে রুকূ নতি স্বীকারের প্রথম দৃষ্টান্ত, আর চূড়ান্ত নতি স্বীকারের প্রতীক হইল সিজদা। এখানে কেবলমাত্র রুকূ'র উল্লেখ হইলেও নতি স্বীকারের সব কয়টি কাজই এখানে লক্ষ্য। আর সব কয়টি কাজই যথাযথভাবে সম্পন্ন করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। রুকূর সঙ্গে বলা হইয়াছেঃ خُشُوْعُ خُشُوْعَهُنَّ শব্দের অর্থ

هَيْئَةٌ فِى النَّفْسِ يَظْهَرُ مِنْهَا فِى الْجَوَارِحِ سُكُوْنٌ وَتَوَاضُعٌ -

মনের এমন একটা অবস্থা, যাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ধীরস্থির ও বিনয়-নম্রতার ভাব পরিব্যাপ্ত ও পরিস্ফুট হয়।

কাতাদাহ বলিয়াছেন:

اَلْخُشُوْعُ فِى الْقَلْبِ وَ هُوَ الْخَوْفُ وَغَضُّ الْبَصَرِ فِى الصَّلٰوةِ -

খুশু' একটা মানসিক ভাবধারা। ভীতি ও আতঙ্কের অনুভূতি এবং নামাযে চক্ষু অবনতকরণ।

সুফিয়ান সওরী বলিয়াছেনঃ

وَتَخْشَعُ لِلّٰهِ فِى كُلِّ فَرْضٍ اِفْتَرَضَ عَلَيْكَ -

প্রত্যেকটি ফরয কাজে—যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি ফরয করিয়া দিয়াছেন—আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

এই সব তাৎপর্যই নিহিত রহিয়াছে আল্লাহ্‌র বাণীতে উদ্ধৃত শব্দে।

কুরআনের আয়াতঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - (المؤمنون - ٢)

যেসব লোক তাহাদের নামাযে আল্লাহ্‌র ভয় সহকারে অবনত মস্তকে দাঁড়ায়, তাহারাই মুমিন এবং এই মুমিন লোকেরাই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিতে পারে।

(الجامع لاحكام القران - تفسير القرطبى ج ١ - ص - ٣٧٥ - ٣٧٤)

বস্তুত এইরূপ খুশু'র কথাই বলা হইয়াছে আলোচ্য হাদীসে। নামাযে এইরূপ খুশু না হইলে নামাযের মূল লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। নামাযে এই খুশুকে পূর্ণ মাত্রায় জাগরূক রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করাই এই হাদীসের উদ্দেশ্য। আর এইভাবে যাহারা নামায আদায় করিবে, তাহাদিগকে ক্ষমা করার ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা করিয়াছেন। — এইরূপ নামাযীরাই যে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু যাহারা এইরূপ অন্তর্নিহিত ভাবধারা সম্বলিত নামায আদায় করিবে না, তাহাদিগকে ক্ষমা করার কোন ওয়াদা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসে নাই। সাধারণভাবে ক্ষমা করা কিংবা না করিয়া আযাব দেওয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। এই লোকদের ব্যাপারে এই কথাই প্রযোজ্য।

عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَنَسُ اِجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ - (بيهقى)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ হে আনাস। তোমার সিজদার স্থানে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা নামাযে দৃষ্টি যাহাতে দিগ্বিদিক ঘুরিতে না থাকে ও মনের একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা যাহাতে বিঘ্নিত হইতে না পারে, সেই জন্য নবী করীম (স) নির্দেশ দিয়াছেন যে, নামাযে সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে। অন্যথায় গভীর নিবিষ্টভাবে নামায আদায় করা সম্ভব হইবে না।

বস্তুত নামাযে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক তাকানো বা নানা দিকে চোখ ঘোরানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই পর্যায়ে বহু হাদীস বর্ণিত ও গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত আনাস (রা) হইতে অপর একটি বর্ণনায় মহানবীর উক্তি হইলঃ

يَا بُنَىَّ اِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلٰوةِ هَلَكَةٌ - (ترمذى)

হে প্রিয় বালক! নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো ও লক্ষ্য দেওয়া হইতে নিজেকে সতর্কতার সহিত সংযত রাখ। কেননা নামাযে এদিক ওদিক তাকানো ও লক্ষ্য দেওয়া ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে।

কুরআন মজীদে এই নামায প্রসঙ্গেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছেঃ

وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ـ (البقرة : ٢٣٨)

তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য (নামাযে) বিনয়াবনত ও নীরব নিস্তব্ধ হইয়া —কুনূত সহকারে —দাঁড়াও।

আর 'কুনূত' অর্থঃ

طُوْلُ الرُّكُوْعِ وَالْخُشُوْعِ وَغَضُّ الْبَصَرِ وَخَفْضُ الْجَنَاحِ ـ (تفسير القرطبى)

রুকূ দীর্ঘময় করা, খুশু গভীর করা, দৃষ্টি নিম্নদিকে নিবদ্ধ রাখা এবং বাহু নম্র ও অবনত করা।

রাসূলে করীম (স)-এর এইসব বাণী কুরআন মজীদের এই স্পষ্ট নির্দিশের সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপরোদ্ধৃত হাদীস ও কুরআনের আয়াতের প্রেক্ষিতে এই কালের মুসলমানদের নামায পড়ার অবস্থা বিচার করিলে দুঃখ ও লজ্জার সীমা থাকে না। অনেককে খুব তাড়াহুড়া করিয়া অযূ করিতে, সব কয়টি অঙ্গ যথার্থভাবে ধৌত হইল কিনা সেদিকে লক্ষ্য না দিতে, নামাযে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দুর্বিনীত, অনমনীয় ও অবজ্ঞা ভরা ভঙ্গীতে দাঁড়াইতে এবং মোরগের আধার খাওয়ার ন্যায় খুব দ্রুততার সহিত রুকূ সিজদার কাজ সারিতে দেখা যায়। কিন্তু এইভাবে আর যাহাই হউক, নামায পড়া যে হয় না, তাহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

নামায পড়ার নিয়ম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اِنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الَّتِىْ بَعْدَهَا عَلِّمْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا ـ

(بخارى ، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইত বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিল। রাসূলে করীম (স) তখন মসজিদের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই ব্যক্তি নামায পড়িল। পরে রাসূলে করীম (স)–এর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিল। রাসূলে করীম (স) সালামের জওয়াব দিয়া বলিলেনঃ তুমি ফিরিয়া যাও এবং আবার নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড় নাই। লোকটি এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া গেল এবং আবার নামায পড়িল। পরে ফিরিয়া আসিয়া রাসূলে করীম (স)–কে আবার সালাম বলিল। রাসূলে করীম (স) সালামের জওয়াব দিলেন এবং বলিলেনঃ তুমি আবার গিয়া নামায পড়িয়া আস, কেননা তুমি যে নামায পড়িয়াছ তাহা হয় নাই। পরে তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার লোকটি বলিলঃ হে রাসূল! কিভাবে নামায পড়িতে হইবে, তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন। তখন নবী করীম (স) নামায পড়া শিক্ষা দেওয়া প্রসঙ্গে বলিলেনঃ তুমি যখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিবে, তখন প্রথমেই খুব ভালো ও পূর্ণমাত্রায় অযূ করিবে। তাহার পর কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার পর 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। পরে নামাযে কুরআনের আয়াত যতটা তোমার পক্ষে পাঠ করা সম্ভব পাঠ করিবে। তাহার পর রুকূ' দিবে—উহাতে সম্পূর্ণ প্রশান্ত হইয়া যাইবে। তাহার পর মাথা তুলিয়া একেবারে সমান হইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। তাহার পর সিজদায় যাইবে—সিজদায় একেবারে স্থিত হইয়া থাকিবে। পরে মাথা তুলিয়া উঠিয়া ধীরস্থির হইয়া বসিবে। পরে আবার সিজদায় যাইবে—উহাতেও স্থিত হইয়া থাকিবে। পরে উঠিয়া বসিবে। অপর এক বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ অতঃপর মাথা তুলিয়া উঠিয়া একেবারে সমান হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার পর নামাযের অন্যান্য সব কাজ অনুরূপ স্থিতি ও ধীরতা সহকারে সম্পন্ন করিবে।

ব্যাখ্যা এ দীর্ঘ হাদীসে যথাযথভাবে নামায পড়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা দিয়াছেন স্বয়ং নবী করীম (স)। রাসূলের জনৈক সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। এই নামায ছিল 'তাহায়্যাতুল মসজিদ'–এর নামায। আর লোকটি ছিলেন খাল্লাদ ইবনে রাফে, ইবনে আবূ শায়বা এই কথা বলিয়াছেন। তিনি নামায পড়িয়া রাসূলের সামনে আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিলেন। মনে হয়, লোকটি প্রথমে আল্লাহর হক আদায় করিয়া পরে রাসূলের হক আদায় করিলেন। আর স্বয়ং রাসূলে করীমের ইহাই শিক্ষা। অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময় একটি লোক মসজিদে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নামায না পড়িয়া রাসূলে করীম (স)–কে সালাম করেন। তখন তাহাকে তিনি বলেনঃ

اِرْجِعْ فَصَلِّ ثُمَّ ائْتِ فَسَلِّمْ عَلَىَّ - (مرقاة ج ٢، ص ٢٤٩)

তুমি আগে গিয়া নামায পড়, তাহার পর আমাকে সালাম করিবে।

উপরিউক্ত লোকটি বারবার নামায পড়া সত্ত্বেও বারে বারে নবী করীম (স) তাঁহাকে বলিলেনঃ তুমি যাও, আবার নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড় নাই। 'নামায পড় নাই' ইহার অর্থ নামায যে রীতি–পদ্ধতি ও ভাবধারা সহকারে পড়িতে হয়, তুমি সেইভাবে নামায পড় নাই। কাজেই তোমাকে আবার নামায পড়িতে হইবে। বারবার পড়া সত্ত্বেও তাঁহার নামায হইতেছে না কেন, তাহা লোকটি বুঝিতে পারেন নাই। শেষ কালে ইহার আসল কারণ বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজেই রাসূলে করীমের নিকট নামায পড়ার সঠিক পদ্ধতি জানিতে চাহিলেন। সেই অনুযায়ী নবী করীম (স) তাঁহাকে নামায পড়ার নিয়ম ও পদ্ধতি সবিস্তারে বলিয়া দিলেন। তিনি এই পর্যায়ে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট হয় যে, এখানে নামাযের মোটামুটি নিয়ম পদ্ধতি বলিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্যে ছিল। ইহাতে নামাযে যে বড় বড় কয়টি কাজের কথা স্পষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলঃ পূর্ণাঙ্গভাবে অযূ করা, কিবলামুখী হইয়া দাঁড়ানো, তাকবীরে তাহরীমা, সূরা ফাতিহা ও অপর কিছু আয়াত পাঠ, রুকূ,

সিজদা এবং রুকু সিজদায় পূর্ণ তা'দীলে আরকান পালন করা রুকূর পর সোজা হইয়া দাঁড়ানো ও দুই সিজদার মাঝে ধীরস্থির হইয়া বসা। বস্তুত এই কাজগুলি রাসূলে করীমের শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী সুস্পন্ন করা না হইলে প্রকৃত নামায যে যথাযথভাবে আদায় হইতে পারে না তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই কয়টি কাজই ফরয পর্যায়ের—যদিও তা'দিলে আর কান কাহারো কাহারো মতে ওয়াজিব এবং কাহারো কাহারো মতে সুন্নাত। সে যাহাই হউক, নামায পড়ার এই পদ্ধতিই রাসূলে করীম (স) শিক্ষা দিয়াছেন এবং এই পদ্ধতি অনুযায়ীই সব মুসলমানের নামায পড়া কর্তব্য।

নামাযে কুরআন পাঠ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - (رواه الجماعة)

হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেন, যে লোক (নামাযে) সূরা ফাতিহা পড়ে নাই, তাহার নামায (হয়) নাই। —সিয়াহ্ সিত্তাহ

ব্যাখ্যা নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া না হইলে নামায হয় না, ইহাই হইল হাদীসটির আসল বক্তব্য। এই পর্যায়ে আরও বহু বর্ণনা বহু সূত্রে হাদীস গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। দারে কুতনী হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসটির ভাষা হইলঃ

لَا تَجْزِئُ صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

যে লোক সূরা ফাতিহা পড়ে নাই, তাহার নামায যথার্থ হয় নাই।

মুসলিম, আবূ দাউদ ও ইবনে হাব্বান হাদীস গ্রন্থসমূহে উক্ত কথার শেষে একটি শব্দ অতিরিক্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইল ' فَصَاعِدًا অতঃপর উহারও বেশী।' ইহার অর্থ দাঁড়ায়, যে লোক নামাযে সূরা ফাতিহা এবং উহারও বেশী কুরআন পড়ে না তাহার নামায (যথেষ্ট) হয় না।

দারে কুতনী বলিয়াছেন, এই হাদীসটির সনদ সহীহ। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত এই হাদীসটি ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান নিজ নিজ হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা দারে কুতনী বর্ণিত ভাষার সত্যতার সাক্ষী। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হাদীসটির ভাষা হইলঃ

لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ -

উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়া হয় না যে নামাযে, তাহা গৃহীত হয় না।

এই ভাষার হাদীস মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) হইতে আবূ দাউদ ও নাসায়ী গ্রন্থে হযরত আবূ কাতাদাহ হইতে, ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে, মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে, ইবনে মাজাহ্ ও নাসায়ীতে হযরত আবূ দারদা হইতে, ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে হযরত জাবির (রা) হইতে এবং বায়হাকী শরীফে হযরত আলী, হযরত আয়েশা ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে হাদীসটির বিরাট গুরুত্ব ও মহান মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাইতে পারে।

এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য সূরা ফাতিহা নির্দিষ্ট। উহা ছাড়া কোন নামাযই হয় না। উহা পড়া ফরয। অন্য কিছু উহার বিকল্পও হইতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী এবং সাহাবী ও তাবেয়ীনের অধিকাংশ এই মত পোষণ করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব মনে করিয়াছেন। তিনি ফরয মনে করেন নাই। তিনি দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন কুরআন মজীদের আয়াতঃ

فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ কুরআনের যাহা এবং যতটুকু পড়া সহজ ও সম্ভব তাহাই তোমরা পড়।

ইহাতে কোন সূরা বা আয়াত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। কুরআনের যে কোন অংশ পড়িলেই নামাযে কুরআন পড়ার ফরয আদায় হইয়া যাইবে। কাজেই সূরা ফাতিহা নির্দিষ্টভাবে নামাযে পড়া ফরয হইলে কুরআন মজীদের দেয়া এই অনির্দিষ্ট নির্দেশ বাতিল হইয়া যায়। ইমাম আবূ হানীফার মতে ইহা জায়েয নয়।

এই কথা প্রমাণের জন্য কতিপয় হাদীসও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই কারণে সূরা ফাতিহা পড়া না হইলে নামায একেবারে হইবেই না—এমন কথা বলিতে হানাফী মাযহাবের লোকেরা রাযী নহেন। তাঁহারা বলেন, সূরা ফাতিহা ছাড়াও নামায হইয়া যায়। তবে সূরা ফাতিহা পড়ার তাকীদ সম্বলিত হাদীসসমূহের দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায সম্পূর্ণ ও নিখুঁত হয় না। দ্বিতীয়ত সূরা ফাতিহা পড়াকে নামাযের শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত মনে করাও ঠিক নয়। কেননা নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পড়ার যত তাকীদই হউক না কেন, তাহা কেবলমাত্র হাদীস ও সুন্নাত হইতেই প্রমাণিত। আর যাহা ছাড়া নামায হয় না, এমন জিনিস ফরয ছাড়া কিছু নয় এবং কুরআন-বহির্ভূত কোন দলীল দ্বারা এই ফরয প্রমাণিতও হয় না।

কুরআনের উপরিউক্ত আয়াত ও উপরোদ্ধৃত পর্যায়ের হাদীসসমূহের ভিত্তিতে কতিপয় বিশেষজ্ঞ মত দিয়াছেন যে, সূরা ফাতিহা ও উহার সহিত কুরআনের অন্য কোন অংশ পড়া উভয়ই কর্তব্য। নতুবা নামায হইবে না। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে আবূ দাউদ শরীফে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ -

সূরা ফাতিহা ও কুরআনের অপর যে অংশ পড়া সহজ এই উভয়ই পড়ার জন্য আমাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে।

এই হাদীসের সনদ সহীহ্ এবং ইহার বর্ণনাকারী সবাই সিকাহ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। (نيل الاوطار)

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى صَلوٰةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ - (مسند احمد، ابن ماجه)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি হযরত রাসূলে করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে লোক যে কোন নামায পড়িল, কিন্তু তাহাতে সূরা ফাতিহা পড়িল না তাহার সে নামায অসম্পূর্ণ— পঙ্গু। —মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা এই হাদীসটির বক্তব্য হইল, সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন নামায ফরয কিংবা সুন্নাত বা নফল—পড়া হইলে তাহা পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত হইবে না, তাহা পঙ্গু হইবে, ক্ষতিসম্পন্ন হইবে, অসম্পূর্ণ হইবে। আর বিশেষজ্ঞদের মতে এই অপূর্ণাঙ্গতা, পঙ্গুতা, অসম্পূর্ণতা ও ক্ষতিসম্পন্নতা এমন, যাহাতে মূল নামাযই বাতিল হইয়া যায়। ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেনঃ (উপরিউক্ত হাদীসের ভাষা)

فَهِىَ خِدَاجٌ اَىْ نَاقِصَةٌ نَقْصَ بُطْلاَنٍ وَفَسَادٍ -

উহা পঙ্গু, অসম্পূর্ণ অর্থাৎ এমন পঙ্গু ও অসম্পূর্ণ যে উহার দরুন মূল নামাযই বাতিল ও বিনষ্ট হইয়া যায়।

বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَاتَجْزِئْ صَلٰوةٌ لَايَقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ وَ قَالَ إِقْرَأْ فِيْ نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ۔

যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া হয় না তাহা সম্পূর্ণ হয় না। আমি বলিলাম—আমি যদি জামা'আতে ইমামের পিছনে নামায পড়ি তাহা হইলেও কি আমাকে সূরা ফাতিহা পড়িতে হইবে? এই কথা শুনিয়া তিনি আমার দুই হাত ধরিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, হে পারস্যদেশবাসী, তুমি তোমার মনে মনেই তাহা পড়।

এই সব হাদীস হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায পড়া হইলে তাহার এমনই অঙ্গহানি হইবে যে, তাহাতে নামায হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ইহা হইতে এই কথাও প্রমাণিত হয় যে, কেবল সূরা ফাতিহাই নয় উহার সহিত কুরআনের অপর কিছু আয়াত পড়াও একান্তই জরুরী, তাহা হাদীসে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُوْرَةٍ۔

(ابن ماجه)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ প্রত্যেক রাক'আত নামাযে যে লোক সূরা ফাতিহা ও সেই সঙ্গে অপর কোন সূরা না পড়ে, তাহার নামায হয় না।

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক রাক'আত নামাযে সূরা ফাতিহা তো পড়িতে হইবেই, সেই সঙ্গে কুরআনের অপর কোন সূরা বা কিছু আয়াত পড়াও অবশ্য কর্তব্য। নামায হইবে না। ইহা অবশ্য দুই রাক'আত বিশিষ্ট ফরয নামায সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু নামায যদি তিন বা চার রাক'আতের হয়, তাহা হইলে প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে কুরআনের অপর কিছু পড়িতে হইবে। আর পরবর্তী রাক'আতে বা রাক'আত দ্বয়ে শুধু সূরা ফাতিহা পড়িতে হইবে। ইহাই নামায পড়ার নিয়ম, যাহা রাসূলে করীম (স) শিক্ষা দিয়াছেন। (نيل الاوطار)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا۔ (بخارى، مسلم، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ ইমাম তো অনুসরণ করার জন্যই নিযুক্ত করা হয়। কাজেই ইমাম যখন তাকবীর বলিবে, তোমরাও তখন তাকবীর বলিবে এবং ইমাম যখন কুরআন পড়িবে, তোমরা তখন গভীর মনেযোগ সহকারে ও নীরবে তাহা শ্রবণ কর। —বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ইমামের পিছনে জামা'আতে শামিল হইয়া নামায পড়িলে নমাযের প্রত্যেকটি কাজে ও ব্যাপারে মুক্তাদীকে ইমামের অনুসরণ করিতে হইবে। ইমাম বানাইবার মূল উদ্দেশ্য ইহাই। কাজেই

কোন ব্যাপারে ইমামের বিরোধিতা করা, ইমামের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ও তাহাকে ছাড়াইয়া যাওয়া এবং তাঁহার আগে কোন কাজ করা জায়েয নয়। তবে শরীয়ত যে কাজের অনুমতি দিয়াছে, তাহা অবশ্য করা যাইতে পারে। যেমন দাঁড়ানো ইমামের পিছনে ওযরের কারণে বসিয়া নামায পড়া। ইমামের সঙ্গে সঙ্গেও কোন কাজ মুক্তাদী করিতে পারিবে না, করিতে হইবে তাঁহার করিবার পর। فَكَبِّرُوْا শব্দের শুরুতে যে ف অক্ষরটি রহিয়াছে তাহাই এই কথা প্রমাণ করে। অতএব ইমাম তাকবীর বলিলে তাহার পর মুক্তাদী তাকবীর বলিবে। রুকূ সিজদায় যাওয়া ও উহা হইতে উঠার কাজ ইমামের আগে তো করা যাইবে না, সঙ্গে সঙ্গেও নয়। বরং পরে পরে করিতে হইবে।

হাদীসের শেষ কথাটি হইল, ইমাম যখন কুরআন পড়িবে—তাহা সূরা ফাতিহা হউক কিংবা অন্য কোন অংশ—তখন মুক্তাদীদিগকে নীরবে ও গভীর মনোযোগ সহকারে তাহা শুনিতে হইবে। তাহার পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদী কিছুই পড়িবে না, শুধু শুনিবে। যায়দ ইবনে আলী, হাদী, কাসেম, আহমদ ইবনে ঈসা, ইস্হাক ইবনে রাহওয়াই, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক প্রমুখ ফকীহ্ মনে করেন, ইহা কেবল উচ্চস্বরে কুরআন পড়া হয় যে নামাযে সেই নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু হানাফী মাযহাবের মনীষিগণ মনে করেন, নিঃশব্দে কুরআন পড়িবার নামায ও উচ্চস্বরে কুরআন পড়িবার নামায—এই উভয় ক্ষেত্রেই রাসূলে করীম (স)-এর এই নির্দেশ অনুসরণীয়। এই পর্যায়ের একটি দলীল এইঃ হযরত জাবিরের কথাঃ

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا وَرَاءَ الْاِمَامِ -

যে লোক সূরা ফাতিহা ছাড়া এক রাক'আত নামাযও পড়িল, সে যেন আদপেই নামায পড়িল না। তবে ইমামের পিছনে যে নামায পড়িল, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

অর্থাৎ ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কুরআন বা সূরা ফাতিহা পড়িবার দরকার নাই। ইমামের পড়াই তাহার জন্য যথেষ্ট।

আবূ দাউদ ও তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই পর্যায়ে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ উচ্চস্বরে কুরআন পড়া হয়—এমন এক নামায সমাপ্ত করিয়া নবী করীম (স) মুক্তাদীদের প্রতি ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এইবার নামাযের মধ্যে তোমাদের কেহ কি আমার সঙ্গে সঙ্গে কুরআন পড়িয়াছে? এক ব্যক্তি বলিলঃ ইয়া রাসূল! আমি পড়িয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, কি ব্যাপার, আমি কি কুরআন লইয়া ঝগড়া বাঁধাইয়াছি? ইহার পর যেহরী নামাযের সঙ্গে সঙ্গে কুরআন পড়া লোকেরা পরিত্যাগ করিল। তখন তাহারা রাসূলের কুরআন পড়া মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিত।

এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয়, যে নামাযে কুরআন উচ্চস্বরে পড়া হয়, তাহাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কুরআন পড়া জায়েয নয়। ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেন। এই ব্যাপারে কোনই বিতর্ক নাই। বিতর্ক হইল যে নামাযে কুরআন নিঃশব্দে পড়া হয় তাহাতে মুক্তাদীরও কুরআন পড়া সম্পর্কে। (نيل الاوطار)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কুরআন পড়া সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য তিন পর্যায়ের। এক, ইমাম যখন নিঃশব্দে কুরআন পড়ে কেবল তখন মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়িবে। ইহা ইবনুল কাসিমের মত। দুই, মুক্তাদী ইমামের পিছনে কখনই সূরা ফাতিহা পড়িবে না। ইবনে ওহাব ও আশহব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিন, ইমামের পিছনে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা সর্বাবস্থায় পড়িবে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হাকীম এই মত দিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, মুক্তাদী সূরা ফাতিহা না পড়িলেও নামায হইয়া যাইবে। সম্ভবত তিনি উহা পড়া 'মুস্তাহাব' মনে করিয়াছেন। কিন্তু

وَالْاَصَحُّ عِنْدِىْ وُجُوْبُ قِرَأَتِهَا فِيْمَا اُسِرَّ وَتَحْرِيْمُهَا فِيْمَا جُهِرَ۔

আমার মতে নির্ভুলতর মত হইল নিঃশব্দে কুরআন পড়া নামাযে মুক্তাদীর পক্ষে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। আর উচ্চস্বরে পড়া হয় যে নামাযে, তাহাতে সূরা ফাতিহা পড়া হারাম।

ইহার কারণ দর্শাইয়া তিনি আরও বলিয়াছেন, ইমাম যখন উচ্চস্বরে কুরআন পড়ে, তখন তাহা মনোযোগ সহকারে ও নীরবে শ্রবণ করা মুক্তাদীর কর্তব্য। তবে কোন মুক্তাদী যদি ইমাম হইতে অনেক দূরবর্তী স্থানে থাকে ও ইমামের কণ্ঠস্বর সে শুনিতে না পায়, তখন সে যেন সেই নামায পড়িতেছে যে নামাযে কুরআন নিঃশব্দে পড়া হয়। (عمدة القارى شرح البخارى)

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَأَةَ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَأَةٌ۔

(موطا ابى حنيفة بحواله عمدة القارى)

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ যে লোক ইমামের পিছনে নামায পড়ে, ইমামের কুরআন পড়াই তাহার জন্য যথেষ্ট।

—মুয়াত্তা আবূ হানীফা—উমদাতুলকারী

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, জামা'আতের নামাযে ইমামের কুরআন পড়াই মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট। মুক্তাদীকে কুরআন পড়িতে হইবে না। এমনকি সূরা ফাতিহাও নয়। এই ব্যাপারে নীরবে কুরআন পড়ার নামায ও উচ্চস্বরে কুরআন পড়ার নামায উভয়ই সমান। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এই পর্যায়ে লিখিয়াছেন যে, আশি জন বড় বড় সাহাবী ইমামের পিছনে কুরআন পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহাদের এই সর্বসম্মত মত শরীয়তে ইজমার সমতুল্য। (عمدة القارى)

নামাযে কুরআন পাঠ সংক্রান্ত এই দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা শেষে একটি হাদীস স্মর্তব্য। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ فِىْ صَلٰوةٍ قَبْلَ الْقِرَأَةِ ۔ (قرطبى)

নবী করীম (স) নামাযে কুরআন পাঠ শুরু করার পূর্বেই আয়ূজুবিল্লাহ পড়িতেন, নবী করীমের এই আয়ূজু পড়া মূলত কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশেরই বাস্তব অনুসরণ। কুরআনের নির্দেশ।

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ (نحل : ٩٨)

তুমি যখনই কুরআন পড়িতে প্রস্তুত হও তখনই আল্লাহ্র নিকট শয়তান হইতে পানাহ চাও।

নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো ও অধিক রুকূ—সিজদা করা

عَنْ جَابِرٍ اَنَّهٗ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ ۔

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ কোন্ ধরনের নামায উত্তম? উত্তরে তিনি বলিয়াছেনঃ দীর্ঘক্ষণ বিনয়াবনত অবস্থায় দাঁড়াইয়াথাকা। —তিরমিযী,—আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা 'কুনূত' শব্দের কয়েকটি অর্থ হইতে পারে। কিন্তু এখানে উহার অর্থ কিয়াম—দাঁড়ানো। কুরআনে আল্লাহ্‌র নির্দেশঃ

(البقرة، ٢٣٨) قُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ۔ আল্লাহ্‌রই জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নীরব নিস্তব্ধ ও বিনয় হইয়া দাঁড়াও।

দাঁড়ানোর এই নির্দেশই পালন করা হয় নামাযে দাঁড়াইয়া। আবদুল্লাহ ইবনে হাবশী বর্ণিত হাদীসের ভাষা এইরূপঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ۔ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ۔ (ابو داؤد)

নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ ধরনের নামায উত্তম? তিনি বলিলেনঃ নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা।

طُوْلُ الْقُنُوْتِ ও طُوْلُ الْقِيَامِ একই অর্থবোধক শব্দ এবং ইহা হাদীসের বিশেষ পরিভাষা। একই কথা বুঝাইবার জন্য এই দুইটি শব্দ হাদীসে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বস্তুত নামাযের একটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন হইল কিয়াম বা দাঁড়ানো। এই দাঁড়ানো ঐকান্তিক গভীর, বিনয় ও আনুগত্যের ভাবধারা সহকারে এবং এই ধীরস্থির মনোভাব লইয়া যে, আমি আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি, আমি তাঁহাকে দেখিতেছি, অন্ততঃ তিনি আমাকে দেখিতেছেন। বস্তুত বান্দার মনের এই ভাবধারাই হইল ইবাদতের মূল কথা, ইবাদতের প্রাণশক্তি। এই ভাবধারা মনে না থাকিলে একটি কাষ্ঠখণ্ডের মত দাঁড়াইয়া থাকার কোনই তাৎপর্য নাই। এইরূপ ভাবধারা মনে লইয়া দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা এবং বিনয়াবনতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যে নামায আদায় করা হয়, রাসূলে করীম (স)—এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাহাই উত্তম নামায।

কিন্তু এই দাঁড়ানোটা নিছক দাঁড়ানো মাত্র নয়। কেবলমাত্র চুপচাপ নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা নয়। সেই সঙ্গে কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত পাঠ করাও জরুরী। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ বিনয়াবনত অবস্থায় আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁহার রহমত পাওয়ার আকুল আগ্রহ সহকারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কুরআন মজীদ পাঠ করিতে থাকা হয় যে নামাযে, বস্তুত সেই নামাযই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। যে নামাযে এইরূপ দাঁড়ানো হয় না—যে নামায এইরূপ কিয়াম সহকারে সম্পন্ন করা হয় না, বরং দায়সারা গোছের দাঁড়ানো দ্বারাই নামায শেষ করা হয়, তাহা কখনও আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নামায হইতে পারে না।

এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের অন্যান্য কাজের তুলনায় এইভাবে কিয়াম করা রুকূ-সিজদা অপেক্ষাও অধিক উত্তম। বস্তুত এই 'কিয়াম' ফরয। একটি প্রশ্নের জবাবে নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ ' صَلِّ قَائِمًا · দাঁড়াইয়া নামায পড়।' —বুখারী

আবূ দাউদ ও নাসায়ী আবদুল্লাহ ইবনে হুবশী ও আনাস ইবনে মালিক হইতে এবং আহমদ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম হযরত আবূ যর (রা) হইতে এই মর্মের হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন।

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىِّ رض قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يَنْفَعُنِىَ اللّٰهُ بِهٖ وَيُدْخِلُنِىَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ۔ فَسَكَتَ عَنِّىْ مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ

عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً ۔ (ترمذی، احمد، مسلم، ابوداؤد)

মা'দান ইবনে তালহা আল-ইয়া'মুরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-এর মুক্ত দাস সওবান (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম যে, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যাহার দরুন আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করিবেন ও তিনি আমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আমার কথা শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। আমার জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিলেন না। পরে তিনি আমার প্রতি তাকাইলেন এবং বলিলেন, বহু সিজদা করা তোমার কর্তব্য। কেননা আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে বান্দাই আল্লাহ্র জন্য একটি সিজদা করে, আল্লাহ্ তা'আলা উহার দরুন তাহার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করিয়া দেন। উহার দরুন তাহার গুনাহ খাতা মার্জনা করেন। —তিরমিযী, আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা এই হাদীসটির বর্ণনাকারী মা'দান একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী। আর সওবান হইলেন রাসূলে করীম (স)-এর আযাদ করা গোলাম। তিনি রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবী ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। উদ্ধৃত হাদীসটির প্রথম কথা, একজন তাবেয়ী রাসূলের একজন সাহাবীর নিকট কল্যাণকর ও পরকালে জান্নাতে যাওয়ার নিমিত্ত যে সব কাজ সেই বিষয়ে জানিতে চাহিয়াছেন। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন না; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। কেননা প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বিরাট বিষয়ের। ঠিক কোন্ কথাটি বলিলে প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব হইতে পারে ইহা তাঁহাকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হয়। অতঃপর তিনি যাহা বলিলেন তাহা হইল সিজদার বিশেষ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের কথা। কিন্তু তাহাও তিনি নিজের জবাবে যে কথাটি বলিলেন, কল্পনা বা ধারণা বিশ্বাসের ভিত্তিতে বলেন নাই। তিনি রাসূলে করীমের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহার ভিত্তিতেই তিনি জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন। এই কথাটি আহমদ, মুসলিম ও আবূ দাউদের হাসীদ গ্রন্থসমূহের একটি বর্ণনায় নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً ۔

তোমার বেশী বেশী সিজদা কর্তব্য। কেননা তুমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যে সিজদাই কর না কেন, তাহা একটি হইলেও আল্লাহ্ তা'আলা উহার সাহায্যে তোমরা মর্যাদা অনেক উচ্চ ও উন্নত করিয়া দিবেন।

ইমাম শাওকানী এই হাদীসের ভিত্তিতে লিখিয়াছেনঃ

وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ السُّجُوْدِ مُرَغَّبٌ فِيْهَا وَالْمُرَادُ بِهِ السُّجُوْدُ فِي الصَّلٰوةِ وَسَبَبُ الْحَثِّ عَلَيْهِ،

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ইসলামী শরীয়তে খুব বেশী সিজদা করার জন্য উৎসাহ দান করা হইয়াছে। আর এই সিজদা বলিতে নামাযের সিজদাই বুঝানো হইয়াছে। এই জন্যই এই কাজে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

আর তাহার অর্থ, বেশী বেশী নামায পড়া, যাহাতে বেশী বেশী সিজদা করা হয়।

সিজদার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসের অংশ উল্লেখ্য। তাহা হইলঃ

إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ۔

সিজদাকারী ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া থাকে।

আর এই কথাটি আল্লাহ্ তা'আলার এই ফরমানের অনুরূপঃ

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۔ (العلق - ١٩) সিজদা কর এবং নিকটবর্তী হইয়া যাও।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সবচাইতে বড় উপায় হইল সিজদা এবং যে যত সিজদা করিবে, সে তত বেশী আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সমর্থ হইবে। এই কারণে অনেক মনীষী মনে করেন, দাঁড়ানোর তুলনায় সিজদা করা অধিক উত্তম ও অধিক মাহাত্ম্য ও মর্যাদাপূর্ণ। ইমাম তিরমিযী তাই এই হাদীসটির উদ্ধৃতির পর লিখিয়াছেনঃ

قَالَ بَعْضُهُمْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ۔

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর তুলনায় বেশী বেশী রুকূ' সিজদা করা অধিক উত্তম।

আলোচ্য হাদীসটি এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর মর্যাদা বর্ণনাকারী পূর্বোদ্ধৃত হাদীসের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য বা বিরোধ নাই। বরং প্রত্যেকটিই নিজস্ব পরিসরে উত্তম হওয়ার অধিকারী। অর্থাৎ কিয়াম ও সিজদা—দুইটিই আল্লাহ্‌র নৈকট্য বিধানকারী কাজ। দুইটি কাজই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়।

রুকূ ও সিজদার তসবীহ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهٗ وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِيْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهٗ وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ ۔ (ترمذی)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন রুকূতে যাইবে তখন সে তাহার রুকূতে 'সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম'—'আমার মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বলিতেছি আমি' তিনবার বলিবে, তাহা হইলে তাহার রুকূ সম্পূর্ণ হইবে। আর ইহাই তাহার নিকটবর্তী। আর যখন সে সিজদায় যাইবে, তখন সে তাহার সিজদায় 'সুবাহানা রাব্বীয়াল আ'লা'—'আমার মহান উচ্চ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা প্রকাশ করিতেছি' তিনবার বলিবে। তাহা হইলে তাহার সিজদা সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। আর ইহাই তাহার নিকটবর্তী। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা হাদীসে রুকূ ও সিজদায় যে দুইটি তসবীহ পড়ার নির্দেশ করা হইয়াছে আসলে উহা কুরআন মজীদেরই দুইটি আয়াতের দুইটি নির্দেশের বাস্তব অনুসরণের ব্যবস্থা। উকবা ইবনে আমের (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِجْعَلُوْهَا فِيْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى قَالَ اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ ۔ (ابوداؤد، مسند احمد، ابن ماجه)

কুরআনের আয়াত (যাহার অর্থ) 'অতঃপর তোমরা উচ্চ আল্লাহ্‌র নামে তসবীহ্ কর, নাযিল হইল, তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ উহাকে তোমাদের রুকূ'তে স্থাপন কর। অতঃপর যখন 'তোমার মহান আল্লাহ্‌র নামে তসবীহ্ কর' নাযিল হইল, তখন তিনি বলিলেনঃ ইহাকে তোমাদের সিজদাসমূহে পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লও।

উপরিউক্ত হাদীসে তিনবার করিয়া এক একটি তসবীহ পড়িবার কথা বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে 'ইহা তাহার নিকটবর্তী' অর্থাৎ এই তিনবার সংখ্যা পূর্ণত্বের নিকটবর্তী। আর পূর্ণত্ব জ্ঞাপক সংখ্যা হইল সাতবার এবং মধ্যম সংখ্যা পাঁচবার।

মা ওয়ার্দী বলিয়াছেনঃ পূর্ণত্ব লাভের সংখ্যা হইল ১১ কিংবা ৯ বার এবং মধ্যম মানের সংখ্যা পাঁচবার। আর একবার করিয়া পড়িলেও তসবীহ পড়া হইয়া যায়। এই পর্যায়ে হযরত আনাস (রা)-এর একটি কথা উল্লেখ্যে বলিয়াছেন।

مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى - يَعْنِىْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رة قَالَ فَحَذَرْنَا فِىْ رُكُوْعِهٖ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَفِىْ سُجُوْدِهٖ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ - (احمد، ابو داؤد، نسائى)

রাসূলে করীম (স)-এর পরে তাঁহার সদৃশ নামায এই যুবক উমর ইবনে আবদুল আযীয ছাড়া আর কাহারও পিছনে পড়ি নাই। আমরা ধারণা করিয়াছি, তিনি তাঁহার রুকূতে দশ তসবীহ ও সিজদায় দশ তসবীহ করিয়া পড়িতেন।

দশ তসবীহ করিয়া পড়িলে রুকূ ও সিজদা পূর্ণত্ব লাভ করে—এই মত যাহাদের হযরত আনাসের এই কথাটি তাঁহাদের দলীল। তবে অধিক সত্য কথা এই যে, একাকী নামায পড়িলে বেশী সংখ্যায় বেশী বার তসবীহ পড়া সঙ্গত। তখন যত বেশী তসবীহ করিবে ততই উত্তম। তাহাও নবী করীম (স) হইতে তাঁহার একাকী নামাযের যত সংখ্যা প্রমাণিত আছে ততটাই পড়া উচিত, তাহার অধিক নয়। কিন্তু ইমামের পক্ষে নামায সংক্ষিপ্ত করা তো একান্তই কর্তব্য। কেননা তাহার মুক্তাদীদের শক্তি ও অবসর সম্পর্কে তাহার কোন ধারণা থাকার কথা নয়। আর অধিক সময় রুকূ' সিজদায় থাকার শক্তি মুক্তাদীদেরআছে—এরূপ জানা সত্ত্বেও নামায সংক্ষিপ্ত করাই ইমামের কর্তব্য। কেননা নামাযে অধিক সময় অতিবাহিত হইলে কাহার কি অবস্থা দেখা দিবে বা কাহার কি ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে, তাহা কখনই নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না।

ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেনঃ হাদীস বিশারদগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেন এবং

يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ لَّا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيْحَاتٍ -

তিন তসবীহর কম পড়া তাঁহারা কাহারও জন্য পছন্দ করেন না।

ইহাই মুস্তাহাব। আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রা) বলিয়াছেনঃ

اَسْتَحِبُّ لِلْاِمَامِ اَنْ يُّسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيْحَاتٍ لِكَىْ يُدْرِكَ مَنْ خَلْفَهٗ ثَلَاثَ تَسْبِيْحَاتٍ -

ইমাম পাঁচ তসবীহ পড়িলে মুক্তাদীরা অন্ততঃ তিনটি তসবীহ পড়িতে পারিবে। এই কারণে ইহাই আমি পছন্দ করি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ ـ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ـ (بخارى، مسلم)

রাসূলে করীম (স) যখন রুকূ হইতে পিঠ সোজা করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন سمع الله لمن حمده যে লোক আল্লাহ্‌র হামদ করিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার হামদ শুনিতে পাইয়াছেন' বলিতেন। পরে দাঁড়ানো অবস্থায় বলিতেন ربنا لك الحمد 'আমাদের আল্লাহ্! তোমার জন্যই সমস্ত হামদ, নামাযে এইরূপ বলাই বিধেয়।

এইরূপ বলিলেই রাসূলের অনুরূপ নামায পড়া হয়। রিফায়াতু ইবনে রাফে বলিয়াছেনঃ আমরা একদিন রাসূলে করীম (স)-এর পিছনে নামায পড়িতেছিলাম। নামাযে এক মুক্তাদী রুকূ হইতে উঠিয়া বলিলঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ ـ

হে আল্লাহ্! তোমার জন্য সব হামদ, বহু হামদ অতি পবিত্র উত্তম এবং বরকতওয়ালা হামদ।

নামায শেষে নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এইরূপ কে বলিয়াছে? লোকটি বলিলঃ আমি। তখন তিনি বলিলেনঃ

رَأَيْتُ بِضْعَةً وَّثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَتَبَادَرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلًا ـ (بخارى)

আমি ছত্রিশ জন ফেরেশতাকে দেখিলাম ইহার দিকে দৌড়াইতেছেন যে, কে উহা সকলের আগে লিখিবে।

নামাযে তাশাহহুদ পাঠ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ فِى الصَّلٰوتِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ فَاِذَا قَالَهَا اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْئَلَةِ مَا شَاءَ ـ (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-এর পিছনে নামায পড়িতে গিয়ে আমরা বলিতামঃ আল্লাহ্‌র প্রতি সালাম, অমুকের প্রতি সালাম। এই সময়

একদিন রাসূলে করীম (স) আমাদিগকে বলিলেনঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই হইতেছেন সালাম। কাজেই তোমাদের কেহ যখন নামাযে বসিবে তখন সে যেন আত্তাহিয়্যাতু পড়ে, বলেঃ আল্লাহ্র জন্যই সব সালাম সম্বর্ধনা, সব নামায দোয়া ও সব পবিত্র বাণী। হে নবী! তোমার প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত এবং বরকত সর্ববিষয়েই শ্রী-বৃদ্ধি। সালাম ও শান্তি-নিরাপত্তা আমাদের প্রতি ও আল্লাহ্র সব নেক বান্দার প্রতিও। এই কথা যখন বলা হইবে, তখন এই বাক্যসমূহ আসমান ও জমীনে অবস্থিত আল্লাহ্র সব নেক বান্দার জন্যই ইহা যথার্থভাবে পৌঁছিবে। (ইহার পর বলিবেঃ) আমি সাক্ষ্য দিতেছিঃ আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ কেহই নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতঃপর যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা প্রার্থনা পেশ করিবে।

ব্যাখ্যা নামাযের এক বা দুইটি বৈঠকেই এই দোয়া পড়ার নিয়ম। ইহাকে প্রচলিত ভাষায় 'আত্তাহিয়্যাতু' বলা হয়। আর হাদীসের পরিভাষায় বলা হয় 'তাশাহ্হুদ' অর্থাৎ সাক্ষ্যদান।

এই তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব, না সুন্নাত-এ সম্পর্কে ফিকাহ্বিদগণ বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী ও অপর কতিপয় হাদীসবিদ বলিয়াছেন, প্রথম বৈঠকের পথম তাশাহহুদ সুন্নাত এবং দ্বিতীয় বৈঠকের তাশাহ্হুদ ওয়াজিব। বেশীর ভাগ মুহাদ্দিসের মতে এই দুইটিই ওয়াজিব। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রথমটি ওয়াজিব ও দ্বিতীয়টি সুন্নাত মনে করেন। ইমাম মালিক (র) এবং জমহুর ফকীহ বলিয়াছেন, এই দুইটি সুন্নাত। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর স্পষ্ট মতে এই দুটিই ওয়াজিব। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেন রাসূলে করীম (স)-এর কথাঃ

فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اِلٰى اٰخِرِهٖ فَدَلَّ عَلٰى اَنَّ التَّشَهُّدَ فِىْ اٰخِرِ الصَّلٰوةِ وَاجِبٌ لِقَوْلِهٖ فَلْيَقُلْ لِاَنَّ مُقْتَضَى الْاَمْرِ الْوُجُوْبُ۔

সে যেন আত্তাহিয়্যাতু বলে—ইহা হইতে জানা গেল যে, নামাযের শেষে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব। কেননা নবী করীম (স) বলিয়াছেন 'সে যেন বলে, ইহা আদেশ। আর রাসূলের আদেশ অবশ্য পালনীয় ওয়াজিব।

এই দোয়াটিকে তাশাহহুদ বলা হয় এই জন্য যে, ইহাতে তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে স্পষ্ট সাক্ষ্য উচ্চারিত হইয়াছে। 'আল্লাহ্ই 'সালাম' অর্থ 'সালাম' আল্লাহ্র অন্যতম একটি নাম। অর্থাৎ তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি, অভাব-অসম্পূর্ণতা, নিত্য পরিবর্তন ও শির্ক হইতে মুক্ত ও পবিত্র। আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহ্ অর্থ যাবতীয় সম্মান মর্যাদা স্থিতি সার্বভৌমত্ব, বিরাটত্ব ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য। এসবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও একবিন্দু অংশ নাই, অধিকার নাই। ইহাতে নবীর প্রতি সালাম বর্ষিত হওয়ার কথাও রহিয়াছে। সালাম বর্ষণের কথা রহিয়াছে সব নামাযীদের ও আল্লাহ্র সব নেক বান্দার প্রতিও। ইহার অর্থ, আল্লাহ্র নিকট এই সবের জন্য আশ্রয় ও সংরক্ষণ প্রার্থনা করা হইতেছে সবরকম বৈষয়িক পারলৌকিক অশান্তি ও দুঃখ বিপদ হইতে। এইভাবে একই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র হক ও বান্দাদের হক উভয়ই একসঙ্গে আদায় করা হয়। 'তাশাহহুদের' শেষ কথাটি—যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা প্রার্থনা করার অনুমতি—হইতে জানা যায়, তাশাহহুদের পরে এবং শেষ সালামের পূর্বে যে কোন দোয়া করা মুস্তাহাব—অতীব পছন্দনীয় কাজ। উপরন্তু পরকালীন ও বৈষয়িক যে কোন কল্যাণের জন্য এই সময় দোয়া করা বৈধ। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিয়াছেনঃ

لَا يَجُوْزُ اِلَّا الدَّعْوَاتُ الْوَارِدَةُ فِى الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ۔

এই সময় কুরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত দোয়া ছাড়া অন্য কোন দোয়া করা জায়েয নয়।

হে নবী। তোমার প্রতি সালাম—'এই কথাটিতে সরাসরি নবী করীম (স) কেই সম্বোধন করা হইয়াছে। শুধু নবীর প্রতি 'সালাম' এইরূপ পরোক্ষে বলার পরিবর্তে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করার মূলে কি মাহাত্ম্য নিহিত রহিয়াছে? ইঁহাতে রাসূলে করীম (স)-কে কি সম্মুখে উপস্থিত মনে করা হয় না এবং ইহা কি দূষণীয় নয়? হাদীস ব্যাখ্যাতা তায়্যিবী এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। বলিয়াছেনঃ

نَحْنُ نَتَّبِعُ لَفْظَ الرَّسُوْلِ بِعَيْنِهِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ -

আমরা তো রাসূলের হুবহু সেই শব্দগুলিই পড়ি যাহা সাহাবায়ে কিরাম পড়িতেন।

কাজেই ইহাতে প্রত্যক্ষ সম্বোধন থাকিলে তাহাতে কোনই দোষ হইতে পারে না। কুরআনের আয়াতে এইরূপ প্রত্যক্ষ সম্বোধন অনেক রহিয়াছে এবং তাহা নামাযেও পড়া হয়। আর তাহাতে যখন কোন দোষ হয় না, তখন সরাসরি নবী করীম (স)-এর শেখানো দোয়া হুবহু পড়িলে দোষ হইবে কেন?

তাশাহহুদে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে প্রথমে বলা হইয়াছে 'আল্লাহ্র বান্দা' ও পরে 'তাঁহার রাসূল', এই পর্যায়ে উল্লেখ্য, একদা নবী করীম (স) সাহাবীদিগকে তাশাহহুদের এই দোয়া শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন একজন বলিলেনঃ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুহু ওয়া-আবদুহু। নবী করীম (স) ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, আবদু-হু ওয়া রাসূলুহু' বল। কেননা আমি তো প্রথমে আল্লাহ্র বান্দা, তাহার পরে আল্লাহ্র রাসূল।

নামাযে দরূদ পাঠ

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِىْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رض فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ رض اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

(مسند احمد، مسلم، نسائى، ترمذى)

হযরত আবূ মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমাদের নিকট রাসূলে করীম (স) এমন সময় আসিলেন, যখন আমরা সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা)-এর মজলিসে বসিয়াছিলাম। তখন বশীর ইবনে আদ রাসূলে করীম (স) কে জিজ্ঞাসা করিলেন; আমাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি দরুদ পড়িতে নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা কিভাবে ও কেমন করিয়া আপনার প্রতি দরুদ পড়িব? অতঃপর রাসূলে করীম (স) চুপ করিয়া থাকিলেন। তখন আমাদের মনে হইল, তাঁহাকে যেন কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কিছুক্ষণ পর রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তোমরা বলঃ হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের লোকদের প্রতি দরূদ পৌঁছাও যেমন তুমি ইবরাহীমের প্রতি দরূদ পাঠাইয়াছ এবং মুহাম্মাদের প্রতি বরকত দাও, যেমন তুমি ইবরাহীম ও ইবরাহীমের লোকদের প্রতি বরকত দিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি উচ্চ প্রশংসিত ও মহান পবিত্র। ইহার পর সালাম—যেমন তোমরা জান। —মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী

ব্যাখ্যা রাসূলে করীম (স)-এর প্রতি দরূদ পাঠাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে নির্দেশ দিয়াছেন। বলিয়াছেনঃ

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۔ (الاحزاب: ٥٦)

তোমরা সকলে নবীর প্রতি দরূদ পাঠাও পূর্ণ মাত্রায় সালাম পেশ কর।

দরূদ পড়ার ইহা সাধারণ নির্দেশ এবং এই নির্দেশ পালনে প্রত্যেক মুসলমান বাধ্য। আলোচ্য হাদীসে রাসূলে করীম (স) নিজে তাঁহার প্রতি দরূদ পাঠাইবার জন্য মুসলমানগণকে নির্দেশ দিয়াছেন। নাসায়ী শরীফে এই দরূদের ভাষা ও কথা অনেকটা ভিন্ন রকমের এবং তাহা এইঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

এইসব হাদীসের ভিত্তিতে বলা হইয়াছে, নামাযে তাশাহহুদের পর দরূদ পড়া ওয়াজিব। হযরত উমর (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত ইবনে মসউদ, জাবির ইবনে যায়দ (রা), শা'বী মুহাম্মাদ ইবনে কায়াব কুরাজী আবূ জাফর বাকেরা, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ মুহাদ্দিস ফকীহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস ফকীহর মতে ইহা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ সওরী আওযায়ী প্রমুখ ফকীহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনে জরীব, তাবারী ও তাহাভী মুহাদ্দিসদ্বয় বলিয়াছেনঃ

اَجْمَعَ الْمُتَقَدِّمُوْنَ وَالْمُتَاَخِّرُوْنَ عَلٰى عَدَمِ الْوُجُوْبِ ۔

প্রাথমিক কালের ও পরবর্তী কালের ইমাম ফকীহগণ এই কথায় ইজমা করিয়াছেন যে, নামাযে দরূদ পড়া ওয়াজিব নয়।

উপরন্তু ইমাম শাফেয়ী ছাড়া আর কেহই ইহাকে ওয়াজিব বলেন নাই।

রাসূলে করীম (স)-এর দরূদ পড়ার নির্দেশ যে প্রশ্নের জবাবস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে হযরত ইবনে মাসউদের (রা) বর্ণনায় তাহা হইলঃ

كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ اِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِيْ صَلَاتِنَا ۔ (بيهقى، دارقطنى)

আমরা যখন নামাযে আপনার প্রতি দরূদ পাঠাইতে চাহি তখন কিভাবে দরূদ পড়িব?—

বায়হাকী, দারে কুতনী

অপর একটি বর্ণনায় প্রশ্নটি হইলঃ

كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فِيْ صَلَاتِنَا ۔

আমরা আমাদের নামাযে আপনার প্রতি কিভাবে দরূদ পাঠাইব?

এই প্রশ্নের জবাবেই নবী করীম (স) দরূদ শিক্ষা দিয়াছেন ও নামাযে উহা পড়িতে বলিয়াছেন। নবী করীম (স) এই দরূদের জন্য বিশেষ তাকীদ করিয়াছেন। একটি হাদীসে তিনি বলিয়াছেনঃ

اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ

যে লোকের নিকট আমার উল্লেখ হইবে সে যদি আমার প্রতি দরূদ না পড়ে, তবে বুঝিবে, সে নিতান্তই কৃপণ ব্যক্তি।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলিয়াছেনঃ

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِطُهُوْرٍ وَالصَّلٰوةِ عَلَىَّ ـ (بیهقی، دارقطنی)

পূর্ণ মাত্রায় পবিত্রতা ও আমার প্রতি দরূদ পড়া না হইলে নামায হয় না।—বায়হাকী, দারেকুতনী

হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

شَقِىٌّ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ ـ (طبرانی)

যে লোকের নিকট আমার উল্লেখ হয় সে যদি তখনি আমার প্রতি দরূদ না পড়ে তবে সে হতভাগ্য—পাষাণ হৃদয়। —তাবারানী

যেহেতু তাশাহহুদ পড়ার মধ্যেই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উল্লেখ হইয়া থাকে সেহেতু উহার পরেই তাঁহার প্রতি দরূদ পাট করা বাঞ্ছনীয়।

নামাযের শেষ দোয়া

عَنْ عَائِشَةَ رض زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْا فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهٗ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ ـ (بخاری، ابوداؤد، نسائی)

হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (স)-এর স্ত্রী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি সংবাদ জানাইয়াছেন যে, রাসূলে করীম (স) নামাযে এই দোয়াটি পড়িতেনঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহি কবর আযাব হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহি দাজ্জাল মসীহর বিপদ-জাল হইতে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহি জীবন ও মৃত্যুর বিপদ জাল হইতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহি (খারাপ) পাপ হইতে ও ঋণ হইতে। একজন লোক রাসূলের নিকট প্রশ্ন করিলঃ ইয়া রাসূল! ঋণ হইতে আপনি অনেক বেশী পানা চাহিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ এক ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন কথা বলিলে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করিলে তাহা ভঙ্গ করে, বিরোধিতা করে। —বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে একটি দোয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন, নবী করীম (স) এই দোয়াটি নামাযে পড়িতেন। কিন্তু কখন, কোন্‌খানে কোন্‌ সময়ে? ইমাম বুখারী ইহার শিরোনাম দিয়াছেনঃ

اَلدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَامِ - সালাম ফিরাইবার পূর্বে পড়ার দোয়া।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী কিরমানী বলিয়াছেনঃ নামাযে প্রত্যেকটি স্থানের জন্য একটি বিশেষ দোয়া বা যিকর রহিয়াছে। এই দোয়াটির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে সবকিছু হইতে অবসর লওয়ার পর। আর তাহা হইল, নামাযের সর্বশেষ স্থান। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ 'নামাযে দাঁড়ানো আছে, রুকূ সিজদা আছে ও বসা আছে। দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন পড়িতে হয়, রুকূ সিজদার জন্য নির্দিষ্ট দোয়া-তসবীহ আছে। বসা অবস্থায় তাশাহহুদ পড়িতে হয়। অতএব এই দোয়াটির জন্য নির্দিষ্ট স্থান হইল তাশাহহুদের পর ও সালামের পূর্বে এবং ইহাই সেই দোয়া'। ইবনে খুজায়মা উদ্ধৃত একটি হাদীসে ইহার স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। তাউস বলিয়াছেনঃ

اِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ كَلِمَاتٍ يُعَظِّمُهُنَّ جِدًّا

নবী করীম (স) তাশাহহুদের পর খুব বেশী বড় মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি বাক্য বলিতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ - তোমাদের প্রত্যেকে যেন তাশাহহুদের পর এই দোয়া পড়ে।

আরও স্পষ্ট ভাষায় ইহার স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে ইমাম আওযায়ী বর্ণিত হাদীসেঃ

اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِيْرِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ اَرْبَعٍ -

তোমাদের প্রত্যেকে যেন শেষ তাশাহহুদ পড়ার পড় চারিটি জিনিষ হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চায়।

অন্য কথায় নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ এবং তাহার পর এই দোয়া পড়িতে হয়।

এই দোয়ায় প্রথমে কবর আযাব হইতে পানাহ চাওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পানাহ চাওয়া হইয়াছে মসীহ দাজ্জালের বিপদ-জাল হইতে। 'দাজ্জাল শেষ যামানায় আত্মপ্রকাশ করিবে। সে হইবে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারক। তাহাকে 'মসীহ' বলা হয় এইজন্য যে, সমস্ত কল্যাণ তাহার নিকট হইতে দূরে পালাইয়া গিয়াছে কিংবা এইজন্য যে, তাহার একটি চক্ষু মুখাবয়বে মিশিয়া একাকার হইয়া থাকিবে। তৃতীয় পানাহ চাওয়া হইয়াছে জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা-বিপদ জাল হইতে। জীবনের বিপদ যে কত রূপে আসে তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারে। আর মৃত্যুর বিপদ বলিতে মৃত্যুকালীন কিংবা মৃত্যু পরবর্তী কালের আযাব বুঝায়। চতুর্থ পানাহ চাওয়া হইয়াছে খারাপ পাপ ও ঋণগ্রস্ততা হইতে। খারাপ পাপ অর্থ যে পাপ মানুষকে কঠিন বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করে ও যাহার দরুন কঠিন আযাবে ভুগিতে হইবে। আর ঋণ- গ্রস্ততার আযাব যে কতটা সাংঘাতিক, তাহা স্বয়ং নবী করীম (স)-ই আলোচ্য হাদীসে এক প্রশ্নের জবাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা হইল, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হয়। কেননা সে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে নানা কথা বলিতে বাধ্য হয় কিন্তু কোন কথাই যথার্থ হয় না। আর সে ঋণ শোধ দেওয়ার বারে বারে নির্দিষ্ট ওয়াদা করে। কিন্তু কোন ওয়াদা রক্ষা করাই তাহার পক্ষে সাধারণত সম্ভবপর হয় না। তাই ওয়াদা খিলাফ করে।

বস্তুতঃ এই দোয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে যেসব বিষয় হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাওয়া হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি অত্যন্ত ভয়ানক ও সাংঘাতিক। আর নামাযের সর্বশেষে ইহা পড়ার জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, এই কথাগুলি যেন নামাযীর মনে-মগজে সব সময় জাগরূক হইয়া

থাকে এবং নামাযের বাহিরে বিশাল জীবনের বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ইহা হইবে বাঁচিবার জন্য বাস্তব কর্মনীতি অবলম্বন করিতে সদা সচেষ্ট হয়।

রাসূলে করীম (স)–এর শিখানো এই দোয়াটিতে কবর আযাব অবশ্যম্ভাবী বলিয়া প্রমাণিত। শেষকালে দাজ্জাল বাহির হইবে, ইহারও সুস্পষ্ট ঘোষণা ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সব রকমের বিপদ–আপদ হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাওয়ার শিক্ষাও ইহাতে রহিয়াছে এবং উহা হইতে বাঁচিবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা রহিয়াছে। ইহা হইতে এই ধারণা জাগ্রত করাই উদ্দেশ্য যে, বিপদ–আপদ হইতে মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই উদ্ধার বা রক্ষা করিতে পারে না। অতএব উহা হইতে কেবল তাঁহার নিকটই পানাহ চাহিতে হইবে। শেষ বাক্যে ঋণ–গ্রস্ততার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলিয়া লোকদিগকে ইহা হইতে দূরে থাকার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মুনাফিক হইতে বাধ্য হয়। কেননা মিথ্যা কথা বলা ও ওয়াদা খিলাফ করা সুস্পষ্টরূপে মুনাফিকীর লক্ষণ। (আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এই সব ফেতনা হইতে রক্ষা করুন, আমীন।) (عمدة القارى شرح البخارى)

জুম'আর নামায

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اُحْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَادْنُوْا مِنَ الْاِمَامِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِهَا (مسند احمد)

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন যে, 'তোমরা জুম'আর নামাযে হাযির হও এবং ইমামের নিকটে দাঁড়াও। কেননা যে ব্যক্তি জুম'আর নামাযে সকলের পিছনে উপস্থিত হইবে, পরিনামে সে জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারেও সকলের পিছনে পড়িয়া থাকিবে। অথচ সে নিশ্চয়ই উহারই উপযুক্ত।

—মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা উপরিউক্ত হাদীসটিতে জুম'আর নামযে হাজির হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ উল্লেখিত হইয়াছে। ইসলামে কেবলমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয নহে, তাহার পর প্রতি জুম'আর দিনে জুম'আর নামাযও ফরয, সন্দেহ নাই।

জুম'আর দিন নামাযে হাজির হওয়া সম্পর্কে আদেশ দানের পর রাসূলে করীম (স) এই নামাযে ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াইবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে কোন প্রকার গড়িমসি করিতে কিংবা পিছনে ও বিলম্বে মসজিদে যাইতেও নিষেধ করিয়াছেন। ইহার কারণস্বরূপ রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন যে, জুম'আর নামাযে আগে–ভাগে হাযির হওয়া বিশেষ ফযীলতের কাজ। যে তাহা করিবে, সে জান্নাতেও সর্বাগ্রে প্রবেশ করিতে পারিবে। আর যে 'পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে' সে জান্নাতে প্রবেশ করার সময়ে অগ্রগামী লোকদের সঙ্গী হইতে পারিবে না, বরং এই কারণে সে সকলের পিছনে থাকিয়া যাইবে ও বহু বিলম্বে প্রবেশ করিতে পারিবে। কাজেই যে লোক অগ্রগামীদের সহিত বেহেশতে দাখিল হইতে ইচ্ছুক, সে যেন জুম'আর নামাযে বিলম্বে উপস্থিত না হয়। বরং সে যেন সর্বাগ্রে মসজিদে হাযির হয় ও যথাসম্ভব ইমামের নিকট আসন গ্রহণ করিতে চেষ্টিত হয়।

বস্তুত জুম'আর নামায মুসলিম জাতির জন্য এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। বহু মুসলিমের একত্রিত হইয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজদায় অবনত হওয়ার ও নিজেদের মধ্যে ঐক্যগ্রন্থি অধিকতর মযবুত করার জন্য ইহা এক বিশেষ সামাজিক ও সামষ্টিক অনুষ্ঠান।

বিনা ওযরে এই নামায ত্যাগ করা অন্যতম কবীরা গুনাহ্। এই সম্পর্কে রাসূলের নিকট হইতে অত্যন্ত কঠোর বাণী বর্ণিত হইয়াছে। যদি কেহ বিনা ওযরে জুম'আর নামায ত্যাগ করে, তবে তাহাকে যেমন 'জুহর আদায় করিতে হইবে' তেমন হযরত সামুরা বর্ণিত এক হাদীস অনুযায়ী তাহার কাফ্ফারাও আদায় করিতে হইবে। জুহর আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে কাফ্ফারাও না দিলে সে কঠিন শাস্তির যোগ্য হইবে।

(بلوغ الاماني - فتح الرباني - ج ٦ ، ص ٢٤)

জুম'আর নামাযের গুরুত্ব

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَّمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ ـ (ابو داؤد)

হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রা) হইতে বর্ণিত হয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, জুম'আর নামায সঠিক সত্য বিধান। ইহা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব। তবে চারি পর্যায়ের মানুষ এই বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত। তাহারা হইলঃ ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা প্রত্যেক শুক্রবার জুহরের নামাযের সময় উহার পরিবর্তে জামা'আতের সহিত যে দুই রাক্'আত নামায পড়া হয় তাহাকেই জুম'আর নামায বলে। দিন-রাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। ইহা জামা'আতের সহিত আদায় করা আবশ্যক, কিন্তু যদি কেহ বিশেষ কোন কারণে জামা'আতে যোগ দিতে না পারে, তাহা হইলে সে একাকী পড়িবে এবং ইহাতেও নামাযের ফরজিয়াত আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু সপ্তাহে একটি দিনের এক ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে করিয়াছেন যে, তাহা একমাত্র জামা'আতের সহিতই পড়িতে হয়। জামা'আত না পাইলে জুম'আর নামায পড়ার আর কোন ব্যবস্থা নাই। তখন উহার পরিবর্তে জুহর পড়িতে হয়। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এক স্থানের মুসলমান জনগণকে পরস্পর নিকটবর্তী ও ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামা'আতের সহিত ফরয করিয়াছেন। আর সপ্তাহের একটি সময় প্রত্যেক এলাকার অধিক সংখ্যক মুসলমানকে একত্রিক করার উদ্দেশ্যে জুম'আর নামায জামা'আতের সহিত পড়া ফরয করিয়াছেন। ইহাতে বেশী সংখ্যক লোক বাধ্যতামূলকভাবে শরীক হয় বলিয়াই এই নামাযকে সালাতুল জুম'আত বা জুম'আর নামায বলা হয় অর্থাৎ ইহা সেই নামায, যাহা কেবলমাত্র জাম'আতের সহিতই আদায় করিতে হয়—জামা'আত ছাড়া আদায় করা যায় না।

আল্লাহ্ তা'আলা এই জুম'আর নামায সমস্ত মুসলমানদের উপর ফরয করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য চারি ধরনের লোকের পক্ষে ইহাতে রীতিমত উপস্থিত হওয়া অসুবিধাজনক বলিয়া তাহাদের উপর ইহা ফরয করা হয় নাই। ক্রীতদাসের পক্ষে মালিক মুনিবের অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়া-আসা করা সম্ভব হয় না। নিজ গৃহে বা জেলখানায় বন্দী লোকদের সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। নারীদের পক্ষে বেশী সময়ের জন্য নিজেদের বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি ছাড়িয়া জুম'আর মসজিদে উপস্থিত থাকা বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে। শিশুদের উপর তো শরীয়াতের কোন বিধি-নিষেধই আরোপিত হয় না। আর রুগ্ন ব্যক্তিদের পক্ষে নিজেদের বাড়ী হইতে দূরে মসজিদে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ইসলাম যেহেতু মানুষের কল্যাণ সাধন ও রহমতের জন্য আসিয়াছে, দুঃসহ ও দুঃসাধ্য কাজের দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া মানুষকে কষ্ট দিতে বা অসুবিধায় নিক্ষেপ করিতে আসে নাই। এই কারণে উহার কোন বিধানই এমন হইতে পারে না, যাহাতে মানুষ বাস্তবিকই কোন কষ্টের সম্মুখীন হইয়া পড়িতে পারে। ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেনঃ

اِذَا سَمِعَ الْمُسَافِرُ الْاَذَانَ فَلْيَحْضُرِ الْجُمُعَةَ -

মুসাফির ব্যক্তি আযান শুনিতে পাইলে জুম'আর নামাযে উপস্থিত হওয়া তাহার কর্তব্য।

এই হাদীস হইতে বুঝা যায় জুম'আর নামায ফরযে আইন। কোন কোন ফকীহ উহাকে ফরযে কিফায়া বলিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার পক্ষে কোন দলীল নাই।

এই হাদীসের মূল বর্ণনাকারী তারেক রাসূলে করীম (স)-কে দেখিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার কোন কথা নিজে শুনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহার প্রমাণ নাই।

বস্তুত জুম'আর নামায মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক মেরুদণ্ড দৃঢ়তরকরণের জন্য এক চিরন্তন ব্যবস্থা। সপ্তাহের একটি দিন এলাকার সমস্ত মুসলমান এক স্থানে মিলিত হইয়া যেমনি আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে, তেমনি দেশের, দুনিয়ার, সামাজিক, রাষ্ট্রীও, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও উহার প্রেক্ষিতে বাস্তব কর্মনীতি গ্রহণ করিবে ও সকলকে তাহা জানাইয়া দিবে। সামষ্টিকভাবে কুরআন-হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অধ্যয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে এলাকার জনগণকে ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিবান করিয়া তুলিবে। জুম'আর এই সাপ্তাহিক নামাযের সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ইহাই। এক কথায় বলা যায়, জুম'আর নামায ইসলামী দাওয়াতের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের একটি সাপ্তাহিক সম্মেলন বিশেষ। এই কারণে এখানে কেবল নামায পড়িতে হয় না, ইমামকে উপস্থিত জনতার সামনে 'খুত্‌বা'ও পেশ করিতে হয়। 'খুতবা' অর্থ মান্ধাতার আমলের অবোধ্য ভাষায় লিখিত কোন শ্লোকবাক্য পাঠ করা নয়। ইহার সঠিক অর্থ 'ভাষণ দান'। যদিও বর্তমানে ইহা অতীব হাস্যকর পরিস্থিতিতে পড়িয়া সাধারণ গণ-মানুষের জন্য একেবারে নিরর্থক হইয়া গিয়াছে এবং জনগণের কোন কল্যাণই সাধন করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থার পরিবর্তন একান্তই আবশ্যক।

عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًابِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ -

(ابو داؤد، ترمذى، نسائى، ابن ماجه، دارمى، مالك)

হযরত আবূ জায়াদ যামরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি পরপর তিনটি জুম'আ বিনা ওযরে ও উপেক্ষাবসত ছাড়িয়া দিবে—পড়িবে না, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার দিলে মোহর লাগাইয়া দিবেন।

—আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌, দারেমী, মালিক

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে জুম'আর নামাযের গুরুত্ব প্রমাণিত হয় এবং বিনা ঠেকায় জুম'আর নামায না পড়া যে অতিবড় অপরাধ তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। পরপর তিনটি জুম'আ পরিহার করা এবং বিনা কারণে—শুধু উপেক্ষা ও অবহেলাবশত পরিহার করা মারাত্মক পরিণতি বহন করিয়া আনে। রাসূলে করীম (স)-এর কথা হইতে জানা যায়, এই অপরাধের পরিণামে তাহার দিলের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা মোহর লাগাইয়া দিবেন।

হাদীসের শব্দ تهان অর্থ الترك عن غير عذر 'বিনা ওযরে বিনা কারণে পরিহার করা'। আর মোহর করার অর্থঃ

يَصِيْرُ قَلْبُهُ مُنَافِقٌ - তাহার দিলটা মুনাফিক হইয়া যাইবে।

অর্থাৎ উহার দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে, উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। উহার সব কোমলতা বিলুপ্ত

হইবে। ফলে কোন কল্যাণই উহা হইতে নিঃসৃত হইবে না। মুর্খতা, বর্বরতা হিংসা-দ্বেশ ও নির্মমতা উহাতে পূঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে। যে লোক কোনরূপ ওযর বা কারণ ব্যতীতই জুম'আর নামায পরিত্যাগ করে, সে যে উহার গুরুত্ব স্বীকার করে না বরং উহার প্রতি উপেক্ষা পোষণ করে অথবা এমন চরম এক গাফিলতিতে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে যে, সে জুম'আর ন্যায় এতবড় গুরুত্বপূর্ণ নামাযেও যাইতে প্রস্তুত ও তৎপর হয় না, তাহা স্পষ্ট। আলোচ্য হাদীসটি অত্যন্ত মূল্যবান। ইহা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ

ইমাম মালিক এই হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ -

যে লোক তিনবার বিনা ওযরে ও বিনা কারণে জুম'আর নামায পরিহার করিবে আল্লাহ্ তাহার দিলের উপর মোহার করিয়া দিবেন।

ইবনে আবদুল বার হযরত কাতাদাহ হইতে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এই ভাষায়।

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ الخ-

যে লোক জুম'আর নামায তিনবার তরক করিল বিনা প্রয়োজনে—

হযরত ইবনে আব্বাস-এর বর্ণনার ভাষা হইলঃ

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْاِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهٖ -

যে লোক পরপর তিনটি জুম'আ পরিত্যাগ করিবে, সে ইসলামকে পিছনের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স) যে নামায সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছেন যে, উহাতে যে উপস্থিত হয় না, আমি তাহার ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিব, তাহা এই জুম'আর নামায।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهُمَا قَالَ سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْلَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ - (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা দুই জনই বলিয়াছেনঃ আমরা রাসূলে করীম (স)-কে তাঁহার মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, জুম'আ ত্যাগকারী লোকেরা হয় নিজেদের এই খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকুক নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই গুনাহের শাস্তিতে তাহাদের দিলের উপর মোহর করিয়া দিবেন। পরে তাহারা আত্মভোলা হইয়া যাইবে আর সংশোধন লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসে জুম'আর নামায তরককারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর শাসন ও সাবধান বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। অন্য কথায় ইহা নবী করীম (স)-এর পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ বিশেষ। ইহার সারকথা হইলঃ জুম'আর নামায কখখনই এবং কিছুতেই পরিহার করিও না। অন্যথায় তোমাদের দিলকে আল্লাহ্ তা'আলা মোহর করিয়া দিবেন। এই কথা বলিবার জন্য এখানে ختم

শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ختم অর্থ শেষ করা, বন্ধ করা। মানুষ যখন বাতিল মতে ও নাফরমানীর কাজে চরমে পৌঁছায়, সত্য মত ও সঠিক কাজের দিকে যখন মানুষ লক্ষ্য ও উৎসাহ হারাইয়া ফেলে, তখন পাপ ও নাফরমানীর কাজই তাহার ভালো লাগে, সে সেইদিকেই চলিতে থাকে এবং কোন বাধা-নিষেধ মানিতে রাজী হয় না। তখন বলা হয়ঃ 'তাহার দিলের উপর মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।' অর্থাৎ সৎ চিন্তা ও সৎকাজের প্রবণতা তাহার দিল হইতে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এই দিক দিয়া তাহার দিলের দুয়ার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত বারবার দ্বীন-ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দেওয়ার পরও যাহারা তাহা গ্রহণ করে নাই এবং আল্লাহ্র অস্বীকৃতি ও আল্লাহ্দ্রোহিতার দিকেই দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে কুরআন মজীদে তাহাদের সম্পর্কেই বলা হইয়াছেঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ۔

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদে দিলসমূহ তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর 'মোহর' বসাইয়া দিয়াছেন।

বস্তুত ব্যক্তির নিজের মানসিকতার দরুন এইরূপ করিয়া দেওয়াই আল্লাহ্ তা'আলার স্থায়ী নিয়ম। জুম'আ তরককারীদেরও এইরূপ পরিণতি অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ দিলের উপর মোহর করিয়া দেওয়ার অর্থ দিলের সব কোমলতা-দয়ার্দ্রতা ও কল্যাণের সব ভাবধারা নিঃশেষ হইয়া যাওয়া। আর ইহাই কুফরী চরিত্র। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে লোক কোনরূপ কারণ ব্যতীতই নিতান্ত উপেক্ষা ও অবহেলাবশত জুম'আর নামায পরিহার করে, তাহার চরিত্র ও মানসিকতা কুফরী পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়।

হাদীসের বর্ণনাভংগী ও শব্দ প্রয়োগ হইতে স্পষ্ট হয় যে, জুম'আর নামায 'ফরযে আইন'—প্রত্যেক ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষভাবে ফরয। আল্লামা কুরতুবী লিখিয়াছেনঃ

وَهٰذَا حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ فِىْ وُجُوْبِ الْجُمُعَةِ وَفَرْضِيَّتِهَا۔

জুম'আর নামায ওয়াজিব ও ফরয, এই হাদীসটি তাহার সুস্পষ্ট দলিল।

দ্বিতীয়ত নবী করীম (স) মিম্বরের কাঠের উপর দাঁড়াইয়া এই কথা বলিয়াছেন, এইরূপ উল্লেখ করায় এই কথাও স্পষ্ট হয় যে, মিম্বরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুম'আর খুতবা দেওয়া অতীব উত্তম। রাসূলে করীম (স)-এর ইহাই নিয়ম ছিল। অতএব সুন্নাত এই ব্যাপারে কোন দ্বিমত নাই।

عَنْ جَابِرٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَّا مَرِيْضٌ اَوْ مُسَافِرٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ اَوْ صَبِيٌّ اَوْ مَمْلُوْكٌ فَمَنِ اسْتَغْنٰى بِلَهْوٍ اَوْ تِجَارَةٍ اِسْتَغْنَى اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ۔ (دارقطنى)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি যে লোকের ঈমান আছে, জুম'আর দিন জুম'আর নামায পড়া তাহারই কর্তব্য। তবে রুগ্ন পথিক কিংবা স্ত্রীলোক, বালক কিংবা ক্রীতদাস এই কর্তব্য হইতে মুক্ত। অতএব যে লোক খেলা-তামাসা কিংবা ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যস্ততায় মশগুল হইয়া এই নামাযে অনুপস্থিত থাকিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দিক হইতে বিমুখ হইয়া যাইবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা বস্তুতই পরমুখাপেক্ষীহীন এবং পূর্ণ মাত্রায় স্বতঃই প্রশংসিত। —দারে কুতনী

ব্যাখ্যা হাদীসে উল্লেখিত পাঁচ ধরনের লোক ছাড়া আর সব মুসলমানের উপরই যে জুম'আর নামায ফরয তাহাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নাই। এই পর্যায়ে এই হাদীসটিতে অত্যন্ত কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার মাত্রেরই জুম'আর নামায পড়া কর্তব্য। যে লোক জুম'আর নামাযে যায় না, নামাযের সময় আনন্দ-ফূর্তি ও খেলা-তামাসায় কিংবা ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজে ব্যস্ত হইয়া থাকে, সে প্রকারান্তরে এই মনোভাব ও মানসিকতারই প্রকাশ ঘটায় যে, সে আল্লাহ্‌র বা আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশের পরোয়া করে না। আর যাহারই এইরূপ মানসিকতা সে যে কত বড় পাষণ্ড, কত বড় আল্লাহ্‌দ্রোহী তাহা বলার অবকাশ রাখে না। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে হিদায়তের পথে ফিরিয়া আসা সুদূর পরাহত ব্যাপার। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলাও এই ব্যক্তির দিক হইতে তাঁহার রহমতের দৃষ্টি ফিরাইয়া নিবেন। তিনি এই লোকটির প্রতি বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। এই ব্যক্তির নামায পড়ার কোন প্রয়োজনই আল্লাহ্‌র নাই। এই লোকটি জুম'আর নামায না পড়িলে আল্লাহ্‌র একবিন্দু ক্ষতি নাই। তিনি তো স্বতঃই মুখাপেক্ষীহীন। কাহারও নামায পড়া তো দূরের কথা—কোন কিছুর প্রতি আল্লাহ্‌র একবিন্দু মুখাপেক্ষিতা নাই। তিনি স্বতঃ প্রশংসিত।

জুম'আর দিনের ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ সূর্যোদয় হওয়ার সবগুলি দিনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হইল জুম'আর দিন। এই জুম'আর দিনেই আদম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জুম'আর দিনেই তাঁহাকে জান্নাতে দাখিল করা হইয়াছে এবং এই জুম'আর দিনেই তাঁহাকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া এই দুনিয়ায় পাঠানো হইয়াছে (যেখানে তাঁহার হইতে মানব বংশের ধারা সূচিত হইয়াছে) এবং কিয়ামতও এই জুম'আর দিনেই অনুষ্ঠিত হইবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে জুম'আর দিনের ফযীলতের একটি দিক তুলিয়া ধরা হইয়াছে। তাহা এই যে, এই দিনে মানব ইতিহাসে কতগুলি বড় বড় ঘটনা অতীতে সংঘটিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। মনে রাখা কর্তব্য যে, হাদীসে যে সব বড় বড় ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা জুম'আর দিনের ফযীলত বর্ণনার উদ্দেশ্যে বলা হয় নাই। কেননা আদমকে বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত করা ও কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়াই ফযীলতের ব্যাপার নহে। এই সবের উল্লেখ করা হইয়াছে এই দৃষ্টিতে যে, এই সব বড় বড় ঘটনা জুম'আর দিনে ঘটিয়াছে বা ঘটিবে। আর তাহাও এইজন্য যে, মানুষ আল্লাহ্‌র রহমত লাভের এবং তাহার আযাব হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে এই দিনটিতে খুব বেশী বেশী নেক আমল করিবে। ইহা মনীষী কাযী ইয়াযের ব্যাখ্যা। কিন্তু আবূ বকর ইবনুল আরাবী তাঁহার তিরমিযী'র ব্যাখ্যা 'আল আহ ওয়াযী' গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ এই সব কয়টিই ফযীলতের ব্যাপার, সন্দেহ নাই। আর আদমের জান্নাত হইতে বাহির হওয়াই দুনিয়ায় মানব বংশের এই বিরাট সয়লাব প্রবাহিত হওয়ার মূল কারণ। ইহার ফলেই দুনিয়ায় নবী-রাসূল, সালেহ ও অলী লোকদের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইয়াছে। আদম যদি দুনিয়ায়ই না আসিতেন, তাহা হইলে এই সবের কিছুই হইতে পারিত না। আর আদমকে জান্নাত হইতে বিতাড়িত করা হয় নাই; বরং তাঁহার বৈষয়িক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে দুনিয়ায় পাঠানো হইয়াছিল এবং তাহাও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। পরে আবার তাঁহাকে জান্নাতে পৌঁছানো হইবে।

কিয়ামতও জুম'আর দিনে হইবে। ইবনে আরাবীর মতে ইহাও এই দিনটির ফযীলতের ব্যাপার। কেননা দুনিয়ায় নেক আমলকারীদের পরকালীন পুরস্কার লাভের একমাত্র উপায় হইল কিয়ামত সংঘটিত হওয়া। কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা তাহাদের নেক আমলের প্রকৃত প্রতিফল কিছুই পাইবে না। কাজেই ইহাও এই দিনের এক মহা মঙ্গল ও কল্যাণময় দিক যে, এই দিনই কিয়ামত হইবে এবং এই দিনই আল্লাহ্র নবী-রাসূল, অলী-শহীদ ও অন্যান্য নেক আমলকারীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য মর্যাদা সম্মান ও সওয়াব দেওয়া হইবে। ইমাম নববী এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেনঃ

وَفِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَضِيْلَةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَزِيَّتُهُ عَلٰى سَائِرِ الْاَيَّامِ ـ

এই হাদীসটি জুম'আর দিনের ফযীলত এবং অপরাপর সব দিনের তুলনায় ইহার উচ্চ মর্যাদা হওয়ার অকাট্য দলীল।

কিন্তু প্রশ্ন হইল, জুম'আর দিনটির নাম يوم الجمعة 'জুম'আর দিন' নির্দিষ্ট করা হইয়াছে কেন? এই পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করা হইয়াছেঃ তিনি বলিয়াছেনঃ

لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَمَعَ فِيْهِ خَلْقَ اٰدَمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ـ

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এই দিনে আদম (আ) সৃষ্টিকে একত্রিত করিয়াছেন।

অর্থাৎ ইহা মানুষের আদি পিতার একত্রিত হওয়ার দিন। 'জুম'আ' শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া, দলবদ্ধ হওয়া। একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

فِيْهِ جَمَعَ اَبُوْكُمْ ـ এই দিন তোমাদের পিতা (আদম) একত্রিত হইয়াছেন।

এইদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ইহার অপর এক নাম يوم القيامة 'কিয়ামতের দিন।'

জাহিলিয়াতের যুগে এই দিনটির নাম ছিল العروبة আল-আরুবা। এই দিনের 'জুম'আর দিন' নামকরণ ইসলামের অবদান। মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর মুসলমানরাই এই নাম দিয়াছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ ـ فَالنَّاسُ فِيْهِ تَبَعٌ ـ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ ـ (بخارى، نسائى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি রাসূলে করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেনঃ আমরা সর্বশেষ, আর কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রবর্তী। পার্থক্য শুধু এই যে, অন্যান্যকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে আমাদের পূর্বে। পরে এই দিনের সম্মান করা তাহাদের জন্য ফরয করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে পথ দেখাইলেন। অতএব এই ব্যাপারে অন্যান্য লোকেরা অনুগমনকারী। ইয়াহুদীদের দিন আগামীকাল এবং খৃষ্টানদের দিন আগামীকল্যের পরের দিন—পরশু।

—বুখারী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা এই হাদীসে জুম'আর দিনের সম্মান ও জুম'আর নামায ফরয হওয়ার কথা ঘোষিত হইয়াছে। 'আমরা সর্বশেষ আর কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রবর্তী' এই কথার অর্থ, কালের হিসাবে আমরা—হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাহার উম্মত সর্বশেষে দুনিয়ায় আসিয়াছি; কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরাই সর্বাগ্রবর্তী হইব, সর্বপ্রথম আমরাই আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইব। অথবা ইহার অর্থঃ কালের হিসাবে আমরা সর্বশেষে আসিলেও মর্যাদার দিক দিয়া অন্যান্য সকলের তুলনায় আমরাই সর্বাগ্রবর্তী। দ্বিতীয়, এই হিসাবেও আমরা সর্বশেষের যে, আমাদিগকে আল্লাহ্র কিতাব অন্যান্য সকলের শেষে দেওয়া হইয়াছে, অন্যান্যদিগকে দেওয়া হইয়াছে আমাদের পূর্বে। আর আমরা সর্বাগ্রবর্তী এই কারণেও যে, এই জুম'আর দিনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে হিদায়ত দিয়াছেন, ফলে আমরাই এই দিনটিকে বিশেষ ইবাদতের জন্য নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করিয়াছি সকলের আগে। আর জান্নাতে সর্বপ্রথম ও সকলের অগ্রভাবে আমরাই প্রবেশ করিব।

আমাদের—মুসলমানদের—অন্যান্যের তুলনায় অগ্রবর্তী হওয়ার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হইল সপ্তাহের দিনগুলির মধ্যে যে দিন কয়টি সারা দুনিয়ায় জাতীয় সাপ্তাহিক ইবাদতের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট, তন্মধ্যে আমাদের জাতীয় দিনটি অন্যান্যদের জাতীয় দিনের আগে আসে। আমাদের দিন শুক্রবার, ইয়াহূদীদের দিন শনিবার ও খৃষ্টানদের দিন রবিবার।

এই দিনটি অর্থাৎ শুক্রবারের দিনটি অন্যান্যদের প্রতি ফরয করা হইয়াছিল অর্থাৎ এই দিনে শরীয়াত পালনের জন্য তাহাদের নিকট প্রস্তাব হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা পারস্পরিক মতবিরোধের কারণে এই দিনটিকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ হইয়াছিল এই বিষয়ে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই দিনটিকে তাহাদের জন্য অকাট্যভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, না উহার পরিবর্তে অন্য কোন দিন গ্রহণ করার সুযোগ আছে। এই বিষয়ে তাহারা ইজতিহাদ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছে। এই দিনকে তাহারা গ্রহণ করে নাই (নববী)। তাহারা উহার পরিবর্তে শনিবার ও রবিবার গ্রহণ করিয়াছে। ইবনে আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَى الْيَهُوْدِ الْجُمْعَةَ فَابَوْا وَقَالُوْا يَا مُوْسٰى إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَخْلُقْ يَوْمَ السَّبْتِ شَيْئًا فَاجْعَلْهُ لَنَا فَجَعَلَهُ عَلَيْهِمْ-

আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের প্রতি জুম'আর নিদটি ফরয করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। তাহারা বলে, হে মূসা! আল্লাহ্ তা'আলা শনিবার দিন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। অতএব এই দিনটিকে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিন। ফলে এই দিনটি তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

অবশ্য ইহা ইয়াহূদীদের পক্ষে খুবই সম্ভব। কেননা 'শুনিলাম; কিন্তু মানিলাম না—অমান্য করিলাম' ইহাই তাহাদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষ পরিচিতি।

পরে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতকে এই দিনটির হিদায়ত দান করেন। অন্য ভাষায় বলা যায়ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই দিনটির জন্য তাহাদিগকে ও আমাদিগকে হিদায়ত দেন। কিন্তু তাহারা পথভ্রষ্ট হয় আর আমরা হিদায়ত লাভ করি।

এই কথাটির সারমর্ম হইলঃ

إِنَّا سَبَقْنَا بِالْفَضْلِ إِذْ هُدِيْنَا لِلْجُمْعَةِ مَعَ تَأَخُّرِنَا فِي الزَّمَانِ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ ضَلُّوْا عَنْهَا مَعَ تَقَدُّمِهِمْ-

(قاضى عياض)

আমরা মর্যদায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছি। কেননা আমরা জুম'আর দিনটির হিদায়ত লাভ করিয়াছি—এই দিনটিকে ইবাদতের দিনরূপে গ্রহণ করিয়াছি, যদিও কালের হিসাবে আমরা পশ্চাদবর্তী। ইহার কারণ এই যে, তাহারা কালের হিসাবে অগ্রে আসিয়াও এই দিনটির ব্যাপারে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে ও পিছনে থাকিয়া গিয়াছে। (فتح البارى)

জুম'আর নামায শহরে ও গ্রামে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجَوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ - (بخارى، نسائى، ابوداؤد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স)—এর মসজিদে জুম'আর নামায আদায় করিবার পর সর্ব প্রথম জুম'আর নামায পড়া হয় বাহরাইনের জাওয়াসাই নামক স্থানে অবস্থিত আবদুল কাইস মসজিদে।—বুখারী, নাসায়ী, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা রাসূলে করীম (স)—এর মসজিদ মদীনায় অবস্থিত। এই মসজিদেই সর্বপ্রথম জুম'আর নামায পড়া হয়। ইহার পর সর্বপ্রথম অন্য যে মসজিদে জুম'আর নামায পড়া হয়, তাহার নাম 'মসজিদে আবদুল কাইস'—আব্দুল কাইসের মসজিদ। এই মসজিদটি বাহরাইন নামক দেশের 'জাওয়াসাই' নামক স্থানে অবস্থিত। 'আব্দুল কাইস' একটি গোত্রের নাম। ইহারা বাহরাইনে বাস করিত। আর বাহরাইন হইল আম্মার সাগরের নিকটবর্তী একটি স্থান। বর্তমানে ইহা একটি উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্র। আবূ দাউদের উস্তাদ উসমান বর্ণনা করিয়াছেনঃ

جُوَاثَى قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ -

জাওয়াসাই আব্দুল কাইস গোত্রের গ্রামসমূহের মধ্যের একটি গ্রাম।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ

هِىَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ - ইহা বাহরাইনের গ্রামসমূহের মধ্যে একটি গ্রাম।

হাদীসটির মূল কথা, আব্দুল কাইস গোত্রের 'জাওয়াসাই' নামক স্থানে জুম'আর নামায পড়া হইয়াছে। 'জাওয়াসাই'কে قرية বলা হইয়াছে। আর ·قرية· শব্দটি আমাদের ভাষানুযায়ী গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরবী সাহিত্যে এইরূপ ব্যবহার বিরল নয়। অবশ্য বলা যাইতে পারে, শহরকে গ্রাম বলা আভিধানিক অর্থে যথার্থ হইতে পারে, ব্যবহারিক অর্থে নয়।

'জাওয়াসাই' নামক স্থানে জুম'আ পড়া হইয়াছে। অতএব এই ধরনের স্থানে জুম'আর নামায পড়া জায়েয। কিন্তু প্রশ্ন হইল 'জাওয়াসাই'কে আমাদের ব্যবহার অনুযায়ী শহর বলিব, না গ্রাম? যাঁহারা ইহাকে প্রচলিত অর্থে গ্রাম মনে করিয়াছেন, তাহারা এই হাদীসের ভিত্তিতেই বলিয়াছেন, গ্রামে জুমা'আ পড়া যাইতে পারে। শুধু তাহাই নয়, সেখানেও তাহা শহরের মতই ফরয।

ইমাম শাফেয়ী (র) এই হাদীসের ভিত্তিতেই বলিয়াছেনঃ

اِنَّ الْجُمُعَةَ تُقَامُ فِى الْقَرْيَةِ اِذَا كَانَ فِيْهَا اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا اَحْرَارًا مُقِيْمِيْنَ -

যে গ্রামে চল্লিশজন স্বাধীন নাগরিক স্থায়ীভাবে বসবাসকারী হইবে, তাহাতেই জুম'আর নামায কায়েম করা যাইবে।

কিন্তু আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী 'জাওয়াসাই'কে সাধারণ অর্থে গ্রাম মানিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রচলিত অর্থে ইহা একটি শহর বিশেষ। কেননা সেখানে চার হাজারেরও বেশী লোক বসবাস করিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে আর গ্রাম তো এ রকম হয় না। অর্থাৎ গ্রামে চার হাজার লোক একত্রে কোথাও বসবাস করে না। এই কথা অনুসারে যেখানে চার হাজার লোক একত্রে বসবাস করে তাহাকে গ্রাম বলা হউক, কি শহর— সেখানেই জুম'আর নামায পড়া যাইবে।

ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেনঃ

كُلُّ قَرْيَةٍ فِيهَا مَسْجِدٌ اَوْسُوقٌ فَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى اَهْلِهَا وَلَا تَجِبُ عَلَى اَهْلِ الْعُمُودِ وَاِنْ كَثُرُ لِاَنَّهُمْ فِى حُكْمِ الْمُسَافِرِيْنَ -

যে গ্রামেই জামে' মসজিদ আছে কিংবা হাট–বাজার আছে, সেখানকার বসবাসকারী লোকদের উপর জুম'আ পড়া ওয়াজিব (বা ফরয)। যাযাবরদের সংখ্যা যত বেশীই হউক না কেন, তাহাদের জন্য জুম'আ ওয়াজিব বা ফরয নয়। কেননা তাহারা তো পথিক বা পরিব্রাজকদের পর্যায়ে গণ্য।

ইমাম আবূ ইউসূফ এমন প্রত্যেক স্থানকেই 'শহর' ও তথায় জুম'আ ফরয বলিয়াছেনঃ

هُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ يَكُوْنُ فِيْهِ كُلُّ مُحْتَرِفٍ وَيُجَدُ فِيْهِ جَمِيْعُ مَايَحْتَاجُ اِلَيْهِ النَّاسُ مِنْ مَعَايِشِهِمْ عَادَةً وَبِهِ قَاضٍ يُقِيْمُ الْحُدُوْدُ -

যেখানে সকল প্রকার পেশাদারী লোক থাকে, মানুষের স্বাভাবিক জীবন জীবিকার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং শাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে—(তাহাইশহর)।

অন্য একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে, যে স্থানের সর্বাপেক্ষা বড় মসজিদে সেখানকার সব লোক একত্রিত হইলে সংকুলন হয় না, এমন সব স্থানে জুম'আ পড়া যাইবে। এমন সব স্থানকে مصر جامع বিপুল জনসমাবেশের শহর মনে করা যায় এবং হযরত আলী (রা)–এর কথাঃ

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ -

'বিপুল জনসমাবেশের শহর ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে জুম'আ জায়েয নহে'—অনুযায়ী ঐসব স্থানেই জুম'আ জড়া যাইতে পারে। (عمدة القارى)

কাজেই জুম'আ হয় না— এমন স্থান বর্তমান যুগে আমাদের এতদাঞ্চলে কোথাও আছে কি?

হযরত উমর (রা) বাহরাইনবাসীদের প্রতি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেনঃ

جَمِّعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ - তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন, সেখানেই জুম'আ কায়েম কর।

হযরত উমরের এই কথায় শহর ও গ্রামে কোনই পার্থক্য নাই। (ইবনে আবূ শায়বা) লাইস ইবনে সা'য়াদ বলিয়াছেনঃ 'শহর ও গ্রাম যেখানেই জামা'আত হয় সেখানেই জুম'আর নামায পড়। কেননা হযরত উমর (রা) ও উসমান (রা)–এর সময় তাঁহাদের আদেশে সব শহর ও উপকূলবর্তী লোকেরাই জুম'আর নামায পড়িত। (فتح البارى)

জুম'আর আযান

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رض قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رض فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رض وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ۔

(بخارى، ابوداؤد، ترمذى، نسائى)

সায়িদ ইবনে ইয়াযীদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স), হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)–এর সময়ে জুম'আর দিনের ঘোষণা বা ডাক প্রথম দেওয়া হইত তখন, যখন ইমাম মিম্বরের উপর বসিত। পরে হযরত উসমানের আমলে যখন লোকসংখ্যা বিপুল হইয়া গেল, তখন তিনি তৃতীয় ঘোষণা যাওয়া'র উপর দেওয়ার প্রচলন বৃদ্ধি করিলেন।

—বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা হাদীসে نداء শব্দ বলা হইয়াছে। ইহার অর্থঃ ডাক বা ঘোষণা। কিন্তু এই শব্দ বলিয়া বুঝানো হইয়াছে 'আযান'। কুরআন মজীদেও এই আযানকে 'নিদা' বলা হইয়াছে।

إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ۔ (الجمعة)

জুমা'আর দিনে নামাযের জন্য যখন ঘোষণা বা আযান দেওয়া হইবে।

এই হাদীসে জুম'আর দিনের মোট তিনটি আযানের কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি দেওয়া হইত ইমাম যখন মিম্বরের উপর উঠিয়া বসিত, তখন। আর দ্বিতীয় আযান কোনটি? তাহার উল্লেখ ইহাতে করা হয় নাই। তবে তাহা যে, 'ইকামত' এবং 'ইকামত'কেও একটি আযান বা ঘোষণা বলা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। ইবনে আযীযি'র বর্ণনায় একথা পরিষ্কার ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رض أَذَانَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔

রাসূলে করীম (স) এবং আবূ বকর ও উমর (রা)–এর যুগে জুম'আর দিনের আযান ছিল দুইটি।

ইহার প্রথমটি ইমাম মিম্বরের উপর বসিলে দেওয়া হইত। আর দ্বিতীয়টি হইল নামাযের ইকামত। ইমাম যুহরীর বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

كَانَ بِلَالٌ رض يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذٰلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رض۔ (نسائى)

নবী করীম (স) যখন মিম্বরের উপর বসিতেন, তখন হযরত বিলাল (রা) আযান দিতেন। আর তিনি যখন মিম্বরের উপর হইতে নামিতেন তখন তিনি ইকামত বলিতেন। পরে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)–এর সময়েও এই নিয়মই চলিয়াছে।

আবূ দাউদের বর্ণনায় বলা হইয়াছে:

كَانَ يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ -

হযরত বিলাল (রা) রাসূলে করীম (স) এবং হযরত আবূ বরক ও উমর (রা)-এর সামনে মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া আযান দিতেন।

আবদ ইবনে হুমাইদ তাঁহার তফসীরে লিখিয়াছেনঃ

فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَامَّةِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَلَمَّا تَبَاعَدَتِ الْمَنَازِلُ وَكَثُرَ النَّاسُ اَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ فَلَمْ يَعِبْ ذٰلِكَ عَلَيْهِ -

রাসূলে করীম (স), আবূ বরক, উমর ও উসমানের খিলাফতের এক বছর কাল পর্যন্ত এই নিয়মই চলিয়াছে। কিন্তু পরে যখন লোকদের ঘরবাড়ী দূরে দূরে হইতে লাগিল ও লোকসংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়া গেল, তখন হযরত উসমান তৃতীয় ঘোষণার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সেই জন্য কেহই তাঁহার দোষ ধরিল না।

ইবনে আবূ যি'ব-এর বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

ثُمَّ اَحْدَثَ عُثْمَانُ الْاَذَانَ الْاَوَّلَ عَلَى الزَّوْرَاءِ -

পরে হযরত উসমান (রা) প্রথম আযান 'যাওরা'র উপর দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন।

ইহার সারকথা হইল, রাসূলে করীম (স)-এর সময় হইতে হযরত উসমানের খিলাফতের প্রথম এক বৎসরকাল পর্যন্ত মসজিদের ভিতরে ইমাম মিম্বরে উঠিলে পর আযান এবং নামাযের ইকামত দেওয়ার রীতিই প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সর্বপ্রথম যে আযান দেওয়া হয়, তাহা সেই কালে চালু ছিল না। হযরত উসমান (রা)-ই প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়া সর্বপ্রথম উহা চালু করেন।

কিন্তু এই সব বর্ণনাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে অপর একটি বর্ণনা। তাহাতে বলা হইয়াছে, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালেই এই প্রথম আযানটি চালু হইয়াছে। তিনি নিজেই বলিয়াছেনঃ

اَمَّا الْاَذَانُ الْاَوَّلُ فَنَحْنُ ابْتَدَعْنَاهُ لِكَثْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاضِيَةٌ

জুম'আর দিনের প্রথম আযান আমরাই সর্ব প্রথম প্রবর্তন করিয়াছি মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী হওয়ার কারণে। ইহাও রাসূলে করীম (স)-এর প্রচলিত সুন্নাতের পর্যায়ে গণ্য।

মোটকথা, জুম'আর দিনের প্রথম আযান যাহা মসজিদের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেওয়া হয়—পূর্বে ইহার রেওয়াজ ছিল না। হযরত উমরের যামানায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হইয়া পড়ার কারণে তিনি সর্বপ্রথম ইহার প্রবর্তন করেন। আর ইহাও রাসূলে করীম (স)-এর প্রবর্তিত সুন্নাতের মতই অনুসরণীয়। আলোচ্য হাদীসে ইহাকে اَلنِّدَاءُ الثَّالِثُ 'তৃতীয় ঘোষণা' বলা হইয়াছে যদিও ইহা দেওয়া হয় সর্বপ্রথম। কিন্তু চালু করার ক্রমিকতার হিসাবে ইহা তৃতীয়। পূর্বে দুইটি আযান ছিল, পরে প্রবর্তিত হইয়াছে এই তৃতীয়টি। কিন্তু ঘোষণা দেওয়ার বর্তমান ক্রমিকতার দিক দিয়া ইহা প্রথম। (عمدة القارى)

আলোচ্য হাদীস অনুযায়ী এই তৃতীয় প্রবর্তিত আযানটি যাওরা'র উপর দেওয়া হইত। যাওরা হইলঃ حَجَرٌ كَبِيْرٌ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ - মসজিদের দ্বারদেশে রক্ষিত বিরাট পাথর।

আর ইবনে মাজাহর বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

دَارٌ فِى السُّوْقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ - ইহা বাজারের একটি ঘর, যাহাকে 'যাওরা' বলা হইত।

তাবারানীর বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

فَاَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْاَوَّلِ عَلٰى دَارٍ لَّهُ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَكَانَ يُوَذِّنُ لَهُ عَلَيْهَا -

প্রথম আযানটি এমন একটি ঘরের উপর দয়াড়াইয়া দিবার নির্দেশ দিলেন যাহার নাম 'যাওরা'। অতঃপর ইহার উপরই এই আযান দেওয়া হইত।

অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

فَاَذَّنَ بِالزَّوْرَاءِ قَبْلَ خُرُوْجِهٖ لِيَعْلَمَ النَّاسُ اِنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ حَضَرَتْ -

পরে এই আযান যাওরা'য় দিলেন ইমামের বাহির হইয়া আসার পূর্বে, যেন লোকদিকে জানাইয়া দেওয়া যায় যে, জুম'আর নামাযের সময় সুমপস্থিত। فتح الباری

আর যাওরা নামক ঘরের উপর আযান দেওয়া হইত এইজন্য যেঃ

وَكَانَتْ اَرْفَعُ دَارٍ بِالْمَدِيْنَةِ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ -

মদীনায় মসজিদের নিকটে ইহা অতীব উচ্চ ঘর ছিল।/কিংবা ইহা ছিল একটি মিনারা।

(تفسیر ابن کثیر) (تفسیر خازن)

জুম'আর দিন সর্বপ্রথম মসজিদের বাহিরে যে আযান দেওয়া হয়, উহা নবী করীম (স)-এর যামানায় প্রচলিত ছিল না। হযরত উমর (রা)[১] কিংবা হযরত উসমান (রা)-ই ইহা প্রথম চালু করেন। এই কারণে অনেকে ইহাকে 'বিদআত' বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মূলত ইহা মোটেই 'বিদআত' নয়। কেননা একে তো আযান দেওয়ার রেওয়াজ রাসূলে করীমের জীবদ্দশায় তাঁহারই কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং যে উদ্দেশ্যে সেই 'আযান' প্রবর্তিত হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য তখন পূর্ণ হইত সেই আযান দ্বারা যাহা ইমামের মিম্বরের উপর বসার পর দেওয়া হইত। কেননা তখন লোকসংখ্যা অনেক কম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে লোকসংখ্যা বেশী হইয়া যাওয়া ও লোকদের বসতি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত হওয়ায় ইমামের সম্মুখে দেওয়া আযান দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিতেছিল না। তখন মসজিদের বাহিরে দাঁড়াইয়া অধিক উচ্চ ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে একটা আযান বা ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। আর এই আযানের প্রবর্তন করায় সেই সময়ে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে কেহই ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ আপত্তি জানান নাই। ফলে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, এই আযানের বৈধতা সম্পর্কে সাহাবীদের 'ইজমা'—ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই ইহাকে বিদআত বলার কোন কারণ নাই।

এতদ্ব্যতীত কুরআন মজীদের যে আয়াতে জুম'আর নামায ফরয হইয়াছে, তাহাতেও এই প্রথম আযানের কথাই—যাহা মসজিদের বাহিরে দেওয়া হয়—বলা হইয়াছে। আয়াতটি হইলঃ

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ - (الجمعة)

---

১. ইবনে হাজার আসকালানী লিখিয়াছেনঃ হযরত উমর (রা) এই আযান প্রবর্তিত করিয়াছেন—এই বর্ণনা দুর্বল সনদের কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা উহা মকহুল মুআয হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর মকহুল মুআযের সাক্ষাৎ পান নাই। (فتح الباری)

জুম'আর দিনে নামাযের জন্য যখন ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দিকে প্রস্তুত হইয়া যাও এবং ক্রয়-বিক্রয় ছাড়িয়া দাও।

এই ঘোষণাই হইল সেই আযান, যাহা মসজিদের বাহিরে দেওয়া হয়। হানাফী ফিকাহতে বলা হইয়াছেঃ

وَيَجِبُ السَّعْيُ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْاَذَانِ الْاَوَّلِ وَاِنَّمَا اعْتُبِرَ لِحُصُوْلِ الْاِعْلَامِ بِهٖ -

কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী প্রথম আযান শোনা মাত্রই ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কেনা-বেচা পরিহার ও নামাযের জন্য দৌড়ানো ওয়াজিব। এই প্রথম আযানই কুরআনের বলা ঘোষণার বাস্তব রূপ। এই কারণে যে প্রকৃত প্রথম জানান তো এই আযান দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। হানাফী মাযহাবের আলিমদের ইহাই মত। (تفسير روح المعانى)

জুম'আর সুন্নাত নামায

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا -

(مسلم، ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যদি জুম'আ পড়ে, তবে সে যেন উহার পর আরও চার রাক'আত পড়ে। —মুসলিম, তিরমিযী

ব্যাখ্যা এই হাদীসে জুম'আর নামাযের পরে আনুসঙ্গিক সুন্নাত নামায সম্পর্কে বলা হইয়াছে। এই পর্যায়ে বহুসূত্রে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উপরোদ্ধৃত হাদীসে চার রাক্'আত বা'দাল-জুম'আ —জুম'আ—পরবর্তী চার রাক্'আত সুন্নাত— পড়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই জন্য উৎসাহ দান করা হইয়াছে। অবশ্য একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اِنَّهٗ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ -

নবী করীম (স) জুম'আর নামাযের পর দুই রাক্'আত (সুন্নাত) পড়িতেন।

অনেকে এই হাদীসটির ভিত্তিতে জুম'আ পরবর্তী সুন্নাত দুই রাক্'আত বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা রাসূলে করীম (স)-এর নিজের আমল। তিনি সাধারণ মুসলমানকে চার রাক্'আতই পড়িতে বলিয়াছেন। এই পর্যায়ের হাদীসগুলির ভাষা হইলঃ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا -

তোমাদের মধ্যে যে লোক জুম'আর পরে নামাযী হইবে—নামায পড়িবে, সে যেন চার রাক্'আত পড়ে।

এই হাদীসটির বর্ণনাকারী ও হযরত উবূ হুরায়রার (রা) অপর একটি হাদীসে সরাসরি আদেশের ভঙ্গীতে বলা হইয়াছেঃ

اِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ صَلُّوْا اَرْبَعًا -

তোমরা যখন জুম'আর ফরযের পর নামায পড়িবে, তখন তোমরা চার রাক্'আত পড়িবে।

তিরমিযী শরীফে প্রথমোক্ত হাদীসটির উদ্ধৃতির পর বলা হইয়াছেঃ

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ؓ اَنَّهٗ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا ـ

(ترمذی، طبرانی، مصنف عبد الرزاق)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি জুম'আর (ফরযের) পূর্বে চার রাক্'আত এবং পরে চার রাক্'আত (সুন্নাত) পড়িতেন।

ইহা হইতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)–এর নিজের আমল জানা গেল।

ইবনুল হাজার আল–আসকালানী অবশ্য এই হাদীসটির সনদের দুর্বল ও পরস্পর ছিন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সমর্থনে আরও বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ ـ

নবী করিম (স) জুম'আর (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্'আত পড়িতেন এবং এই চার রাক্'আতের মধ্যে কোন জিনিস (সালাম) দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করিতেন না।

অর্থাৎ একসঙ্গে ও একই সালামে চার রাক্'আত পড়িতেন। দুই রাক্'আত করিয়া চার রাক্'আত নয়। এই পর্যায়ে হযরত উবু হুরায়রা (রা) হইতে অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ـ (ابن ماجه)

নবী করীম (স) নিজে জুম'আর (ফরযের) পূর্বে দুই রাক্'আত ও উহার পরে দুই রাক্'আত নামায পড়িতেন।

হযরত জাবির ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একই ভাষায় বলিয়াছেন, মুলাইকুল গাতফানী নাকম এক সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করিলেন। নবী করীম (স) তখন খুতবা দিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেনঃ

اَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تَجِيْءَ ـ

এখানে আসার পূর্বে তুমি দুই রাক্'আত নামায পড়িয়াছ কি?

জবাবে তিনি বলিলেন, 'না।' তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ

فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ـ তাহা হইলে তুমি দুই রাক্'আত নামায পড়িয়া লও।

এই সব উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায়, জুম'আর পূর্বে ও পরে সুন্নাত নামায পড়ার ব্যবস্থা স্বয়ং নবী করীম (স)–ই করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিজেও ইহা পড়িতেন এবং সকলকে পড়িতে বলিতেন। অবশ্য তিনি কত রাক্'আত পড়িতেন এবং আমাদেরই বা কত রাক্'আত পড়িতে হইবে সেই বিষয়ে বিভিন্ন রাক্'আতের উল্লেখ হওয়ায় বিশেষ মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। ইমাম শাফেয়ীর 'কিতাবুল উম' হইতে জানা যায়, তিনি বা'দ জুম'আ চার রাক্'আত পড়িতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলিয়াছেনঃ

اِنْ شَاءَ صَلّٰى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَاِنْ شَاءَ صَلّٰى اَرْبَعًا ـ

ইচ্ছা হইলে বা'দ জুম'আ দুই রাক্'আতও পড়িতে পারে, আর ইচ্ছা হইলে চার রাক্'আতও পড়া যাইতে পারে।

অপর একটি বর্ণনায় তিনি ছয় রাক্'আতের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা খোদ নবী করীম (স) হইতে কোন সূত্রেই প্রমাণিত নয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে জুম'আর পূর্বেও চার রাক্'আত এবং পরেও চার রাক্'আত সুন্নাত পড়িতে হয়। তবে জুম'আর ফরযের পরবর্তী চার রাক্'আত অকাট্য হাদীসের দলীলে প্রমাণিত।

জুম'আর খুতবা

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الْاٰنَ۔

(بخاری، مسلم، ترمذی)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ হযরত নবী করীম (স) (মিম্বরের উপর) দাঁড়াইয়া ভাষণ দিতেন। পরে বসিতেন এবং তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইতেন—যেমন তোমরা আজকাল করিতেছ। —বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, জুম'আর নামাযের পূর্বে মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া ইমামকে নামাযীদের সম্বোধন করিয়া ভাষণ দিতে হয়। এই ভাষণই হইল জুম'আর খুতবা। নবী করীম (স) প্রত্যেক জুম'আর নামাযের পূর্বে মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া এই খুতবা পেশ করিতেন।

হাদীসের ভাষায় স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে যে, নবী করীম (স) প্রথমে মিম্বরের উপর উঠিয়া বসিতেন। এই সময় মুয়াযযিন আযান দিত। বর্তমানে এই আযান যদিও দ্বিতীয় আযান; কিন্তু নবী করীম (স)-এর যুগে ইহাই ছিল প্রথম আযান। আযান হইয়া গেলে তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়াইতেন ও খুতবা শুরু করিতেন। কিছুক্ষণ খুতবা দেওয়ার পর তিনি মিম্বরের উপর বসিয়া পড়িতেন ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। তাহার পর আবার দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেন। এইভাবে দুইটি খুতবা পেশ করা হইত। এই খুতবা যে জুম'আর খুতবা বুখারীর উপরোদ্ধৃত হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহাতে যে জুম'আর খুতবার কথাই বলা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা ঠিক এই কথাটাই ইমাম আহ্মদ, তাবারানী ও বাযযার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন নিজের নিজের হাদীস গ্রন্থে এই ভাষায়ঃ

اِنَّهٗ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا۔ নবী করীম (স) জুম'আর দিনে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেন।

ইমাম যখন খুতবা দিবে তখন সে নামাযীদের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে নামাযীগণ ইমামের দিকে মুখ করিয়া বসিবে এবং ইমামের খুতবা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাকিবে। ইমাম বুখারী এই পর্যায়ের হাদীসের শিরোনামা দিয়াছেনঃ

يَسْتَقْبِلُ الْاِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الْاِمَامَ اِذَا خَطَبَ۔

ইমাম যখন খুতবা দিবে তখন সে জনগণের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে এবং জনগণ মুখ করিয়া থাকিবে ইমামের দিকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলিয়াছেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا اسْتَوٰى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا۔

রাসূলে করীম (স) যখন মিম্বরের উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন, তখন আমরা আমাদের মুখমণ্ডল তাঁহার দিকে ফিরাইয়া বসিতাম।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম সুফিয়ান সওরী বলিয়াছেনঃ রাসূলের সাহাবিগণ খুতবা দেওয়ার সময় ইমামের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতে খুবই ভালোবাসিতেন। আল্লামা বদরুদ্দীন লিখিয়াছেনঃ

اَلْحِكْمَةُ فِىْ اِسْتِقْبَالِهِمْ لِلْخَطِيْبِ اَنْ يَّتَفَرَّغُوْا لِسِمَاعِ مَوْعِظَتِهٖ وَتَدَبُّرِ كَلَامِهٖ وَلَا يَشْتَغِلُوْا بِغَيْرِهٖ -

ইমামের খুতবা দানের সময় তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসার মূল উদ্দেশ্য হইল নামাযীরা তাহার উপদেশবাণী শুনিবে, তাহার কথাগুলি গভীরভাবে অনুধাবন ও চিন্তা-বিবেচনা করিবে এবং উহা ছাড়া অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিবে না।

খুতবার ধরন ও বিষয়বস্তু

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَقْرَأُ اٰيَاتٍ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ - (مسلم، ابوداؤد)

হযরত জাবির ইবনে সামুরাতা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেন। দুই খুতবার মাঝখানে বসিতেন, খুতবায় কুরআনের আয়াত পাঠ করিতেন ও জনগণকে উপদেশ-নসীহত দিতেন। —মুসলিম, আবূদাউদ

ব্যাখ্যা এই হাদীসে খুতবা দানের আসল রূপ ও পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু রাসূলে করীমের খুতবার বিষয়বস্তু কি হইত—জুম'আর ভাষণে তিনি কি বলিতেন, তাহারও উল্লেখ আছে।

খুতবার ভাষণে রাসূলে করীম (স) কুরআন মজীদের আয়াত পড়িতেন এবং জনগণকে নানা জরুরী বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এই খুতবা দুই ভাগে বিভক্ত হইত। দুই খুতবার মাঝখানে তিনি মিম্বরের উপর কিছুক্ষণের জন্য বসিতেন।

কিন্তু সেই ভাষণ খুব দীর্ঘ হইত না। হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُطِيْلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِنَّمَا هِىَ كَلِمَاتٌ يَسِيْرَاتٌ -

নবী করীম (স) জুম'আর দিন খুব দীর্ঘ ওয়ায করিতেন না। বরং সহজ সরল কতিপয় বাক্য ও বাণী পেশ করিয়াই ভাষণ সমাপ্ত করিতেন।

ইমাম শাওকানী এই হাদীসের ভিত্তিতে বলিয়াছেনঃ জুম'আর খুতবায় জনগণকে উপদেশ দান বিধেয় এবং উহাকে দীর্ঘায়িত করার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত করাই উত্তম। নবী করীম (স) নিজে বলিয়াছেনঃ

فَاَطِيْلُوا الصَّلٰوةَ وَاَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ - অতএব তোমরা নামায দীর্ঘ কর এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত কর।

এই খুতবার শুরুতে আল্লাহ্‌র হামদ ও কালিমায়ে শাহাদাতের উল্লেখ একান্তই জরুরী। নতুবা খুতবা নিখুঁত ও সুন্দর হইতে পারে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস হইতে তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهٗ وَاشْتَدَّ غَضَبُهٗ حَتّٰى كَاَنَّهٗ مُنْذِرُ جَيْشٍ -

রাসূলে করীম (স) যখন খুতবা দিতেন, তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইত, কণ্ঠস্বর উচ্চমার্গে পৌঁছিয়া যাইত এবং ক্রোধ তীব্র হইয়া উঠিত। মনে হইত তিনি যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। (نيل الاوطار)

ইহা হইতে খুতবা দানের যে ধরন স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাই বিধেয়। মরা মানুষের মত নিস্তেজ কণ্ঠে খুতবা দেওয়ার কোন অর্থ নাই কেননা জুম'আর নামাযের এই খুতবা তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ও সমাজপ্রধান হিসাবেই দিতেন। কাজেই তাহা নিশ্চয়ই এমন ভাষায় দেওয়া বাঞ্ছনীয় যাহা শ্রোতৃবৃন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। অন্যথায় সব কথাই মাঠে মারা যাইবে। এই খুতবা ওয়াজিব। কুরআনের দৃষ্টিতে ইহা জুম'আর নামাযেরই অংশ। কুরআনের নির্দেশঃ

فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ـ আল্লাহ্র যিকরের দিকে প্রস্তুত হইয়া যাও।

'যিকরুল্লাহ' বলিতে নামায ও খুতবা দুইটিই বুঝানো হইয়াছে। আল্লামা কুরতুবী লিখিয়াছেনঃ

اِنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ الصَّلٰوةُ فَالْخُطْبَةُ مِنَ الصَّلٰوةِ ـ

যিক্র অর্থ নামায। কাজেই খুতবা নামাযেরই অংশ।

বিত্রের নামায

عَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ـ

(ابو داؤد)

হযরত বুরায়দা (রা) হইতে বর্নিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি নবী করীম (স)–কে বলিতে শুনিয়াছি যে, বিত্রের নামায সত্য, যে লোক বিত্রের নামায পড়িবে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নহে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা 'বিত্র' শব্দের অর্থ বেজোড়, একক। উপরিউক্ত হাদীসে নবী করীম (স) বিত্রের নামায পড়ার জন্য তাকীদ করিয়াছেন ও সেইজন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। অপর এক হাদীসে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ ـ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে এমন এক নামায দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন, যাহা তোমাদের জন্য বহুমূল্যবান লাল বর্ণের উষ্ট্র অপেক্ষাও উত্তম। আর তাহা হইতেছে বিত্রের নামায। —তিরমিযি, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্

আবূ দাউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলের নিম্নোক্ত কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ـ

তোমরা সকলে বিত্রের নামায অবশ্যই পড়িবে, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা 'বিত্র'—বেজোড় ও একক এবং তিনি বিত্র খুব পছন্দ করেন।

প্রথমোক্ত হাদীসে 'বিত্রকে 'হক্কুন' حق বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বিত্রের নামায প্রমাণিত এবং সত্য। এই নামায মুসলিম মাত্রেরই পড়া উচিত।

বিত্‌রের নামায কখন পড়িবে উহার সময় সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস ও হাদীসের অংশ হইতে স্পষ্ট জনা যায়। আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত উপরে উল্লিখিত হাদীসের শেষাংশে বলা হইয়াছেঃ

جَعَلَهَا لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ -

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য এই নামায এশার নামায হইতে ফজর হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়ারব্যবস্থাকরিয়াছেন।

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اِجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا - রাত্রিবেলা বিত্‌রকে তোমাদের শেষ নামায বানাইয়া লও।

অর্থাৎ বিত্‌রের নামায পড়ার সময় হইতেছে রাত্রে এশার নামাযের পর। এই এশার নামাযেই দিন-রাত্রের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে সর্বশেষ নামায এবং এই এশার পরই বিত্‌রের নামায পড়িতে হয়।

কিন্তু বিত্‌রের নামায পড়া কি ফরয? ওয়াজিব? সুন্নাত? এই সম্পর্কে হাদীস ও ফিকাহ্‌বিদদের বিভিন্ন মতের উল্লেখ হইয়াছে। ইমাম খাত্তাবী আবূ দাউদ বর্ণিত এক হাদীসে 'আহলুল কুরআনদের সম্বোধন দেখিয়া বলিয়াছেনঃ ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বিত্‌র ওয়াজিব নহে। কেননা ওয়াজিব হইলে সর্বসাধারণ মুসলিমকেই সম্বোধন করা হইত। আর পরিভাষায় 'আহ্‌লুল কুরআন' বলিতে বুঝায় কুরআনের হাফেয, কারী ও আলিম। জনসাধারণ উহার অন্তর্ভুক্ত নহে। অপর এক হাদীসে এক বেদুঈনের প্রশ্নের জবাবে নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَيْسَ لَكَ وَلَا لِاَصْحَابِكَ - ইহা বিত্‌র তোমার জন্যও নহে, আর তোমার সঙ্গী-সাথীদের জন্যও নহে। (معالم السنن ج ١ - ص ٢٨٥)।

উপরে উদ্ধৃত এক হাদীসে বিত্‌র সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর ব্যবহৃত শব্দ হইতেছে امدكم। তায়্যিবা ও মুল্লা আলীকারীর মতে ইহার অর্থঃ

جَعَلَهَا زِيَادَةً لَكُمْ فِىْ اَعْمَالِكُمْ -

বিত্‌রকে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা আমলের মধ্যে এক অতিরিক্ত নামায বানাইয়া দিয়াছেন।

তিরমিযী শরীফে একটি পরিচ্ছেদই এই অর্থে রাখা হইয়াছে। উহার শিরোনামা হইতেছে।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ - বিত্‌র ফরয নহে এই মর্মের হাদীসসমূহের পরিচ্ছেদ।

অতঃপর হযরত আলী (রা)-এর নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلٰوتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (ترمذى ج١ص٥)

বিত্‌রের নামায 'ফরয' নহে যেমন তোমাদের অন্যান্য ফরয নামায রহিয়াছে। বরং নবী করীম (স) ইহাকে সুন্নাতরূপে কায়েম করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুত বিত্‌রের নামায যে অন্যান্য ফরয নামাযের মত ফরয নহে তাহা সর্ববাদীসম্মত কথা। কোন আলিম বা কোন ইমামই উহাকে ফরয বলেন নাই। ইমাম আবূ হানীফা উহাকে ওয়াজিব বলিয়াছেন মাত্র। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আলিমই উহাকে সুন্নাত বলিয়াছেন। আবূ হামিদ বলিয়াছেনঃ 'বিত্‌র সুন্নাতেমুয়াক্কাদাহ—ফরয নহে।' আবূ হানীফা ব্যতীত অপরাপর ইমামগণেরও এই মত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে বিত্‌রের নামায সুন্নাত নহে, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নহে; বরং ইহা ওয়াজিব। ইমাম আবূ

হানীফার এই মত বিশেষ অকাট্য দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত আবূ দাউদ বর্ণিত আলোচ্য হাদীস। ইহাতে যেমন বিত্‌রকে বলা হইয়াছে হক্কুন حق (প্রমণিত—সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য) তেমনি কঠোর ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

وَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا - যে লোক বিত্‌রের নামায পড়ে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নহে।

রাসূল এই কথাটি তিন তিনবার বলিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠোর বাণী এবং এইরূপ কথা রাসূলে করীম (স) যে আমল সম্পর্কে বলিয়াছেন, তাহা ফরয না হইলেও ওয়াজিব অবশ্যই হইবে। কোন সুন্নাত কাজ সম্পর্কে রাসূলের এইরূপ তাকীদবাণী উচ্চারিত হয় নাই। আল-মুগনী ও আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে ইমাম আহমদ ও মুজাহিদ হইতে বলা হইয়াছেঃ

هُوَ وَاجِبٌ وَلَمْ يُكْتَبْ - বিত্‌রের নামায ওয়াজিব, ইহা ফরয করা হয় নাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা), হুযায়ফা (রা), ইবরাহীম নাখয়ী এবং ইমাম শাফেয়ীর উস্তাদ ইউসুফ ইবনে খালিদ উহাকে ওয়াজিব বলিয়াছেন। সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবূ উবায়দাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও দহহাক প্রমুখ বড় বড় ফিকাহবিদের মতও ইহাই। যাঁহারা উহাকে সুন্নাত বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নহনে। আর

جَهْلُ الشَّخْصِ بِالشَّيْءِ لَا يَنْفِي عِلْمَ غَيْرِهِ -

এক ব্যক্তির অজ্ঞতা অপর ব্যক্তির জ্ঞানের অনস্তিত্ব প্রমাণ করে না।

রাসূলে করীম (স) যে হাদীসে 'আহলুল কুরআন'দের সম্বোধন করিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে- أَوْتِرُوْا 'বিত্‌রের নামায পড়' বলিয়া। আর এই নির্দেশই উহার ওয়াজিব হওয়ার কথা প্রমাণ করে। কেননা 'আহলুল কুরআন' বলিতে সেই সমস্ত লোকদেরই বুঝায়; যাহাদের নিকট কুরআনের কোন অংশ মজুদ আছে। একটি আয়াত থাকিলেও সে ইহার অন্তর্ভুক্ত মনে করিতে হইবে। দ্বিতীয় বলা হইয়াছেঃ 'আল্লাহ্ বিত্‌র, তিনি বিত্‌র ভালোবাসেন'। ইমাম তাহাভী বর্ণিত অপর এক হাদীসেও বিত্‌রের নামাযের জন্য তাকীদ করা হইয়াছে এবং উহা সহীহ্ সনদে বর্ণিত হাদীস। রাসূলে করীমের ব্যবহৃত শব্দ أَمَدَّكُمْ হইতে ইমাম খাত্তাবী মনে করিয়াছেনঃ ইহা অতিরিক্ত নামায, ওয়াজিব নহে, দরকারী নহে। কিন্তু তাহা ঠিক নয় একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই নামাযের ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ্ করিয়াছেন, রাসূল নিজের তরফ হইতে করেন নাই। আর যে কাজ আল্লাহ্র তরফ হইতে করিতে বলা হয়, তাহা অবশ্যই ওয়াজিব হইবে, নফল নহে।

অতঃপর দেখিতে হইবে বিত্‌রের নামায কত রাক'আত। এই রাক'আতের সংখ্যা লইয়াও ইমামগণের মধ্যে বিভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কেননা এই পর্যায়ে হাদীসের বর্ণনাও বিভিন্ন।

ইমাম শাফেয়ীর মতে বিত্‌রের নামায এক রাক্‌আত। তাঁহার দলীল হইতেছে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস। তাহাতে নবী করীম (স)-এর রাত্রিকালীন নামাযের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছেঃ

وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ - নবী করীম (স) এক রাক্‌আত বিত্‌রের নামায পড়িতেন।

কিন্তু আসলে এখানে এক রাক্‌আত অর্থ করাই ঠিক নহে। কেননা হযরত আয়েশারই বর্ণিত অপর এক হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ -

নবী করীম (স) তিন রাক'আত বিতরের নামায পড়িতেন এবং একেবারে শেষ রাক্'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইতেন।

এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। যদিও ইহাকে তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই। ইমাম হাকেম ইহাকে তাঁহার 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাঁহারা বলিয়াছেন কোন হাদীস দশজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইলে তাহা 'মুতাওয়াতির'। এই হিসাবেও এই হাদীসটি মুতাওয়াতির। কেননা এই হাদীসটি বারোজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। যদিও উহার ভাষা ও সনদ বিভিন্ন এবং সে সনদে বহু যয়ীফ ও আপত্তিজনক বর্ণনাকারী রহিয়াছেন। তবু কয়েকটি বর্ণনার সনদ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ

وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلٰوةُ الْمَغْرِبِ۔

দিনের বেজোর নামায হইতেছে মাগরিবের নামায, আর রাত্রের বেজোর নামায হইতেছে তিন রাক্'আত বিত্র।

ইমাম দারে কুতনী ও ইমাম বায়হাকী এই হাদীসকে নিজ নিজ কিতাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী হযরত ইবনে উমরের সনদে উল্লেখ করিয়াছেনঃ

صَلٰوةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلٰوةِ النَّهَارِ فَاَوْتِرُوْا صَلٰوةَ اللَّيْلِ۔

মাগরিবের নামায দিনের বেলার নামাযের বিত্র–বেজোর। অতএব তোমরা রাত্রেও বিত্রের নামায পড়।

এখানে মাগরিবের নামাযের সহিত তুলনা করা হইয়াছে রাত্রের বিত্রের নামাযকে। আর মাগরিবের নামায যখন সর্বসম্মতভাবে তিন রাক্'আত, তখন রাত্রের বিত্রের নামাযও তিন রাক্'আত হইবে। হাসানুল বসরী ও ইমাম কর্খী বলিয়াছেনঃ

اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثَةٌ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ۔

সমস্ত মুসলমানের ইজমা এই যে, বিত্রের নামায তিন রাক্'আত, উহার শেষ রাক্'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইতে হইবে, তাহার পূর্বে নয়। (عمدة القارى شرح البخارى)

বিত্রের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ۔

(ابن ابى شيبه ، دار قطنى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) বিত্রের নামাযে রুকূ দেওয়ার পূর্বে দোয়া কুনূত পড়িতেন। —ইবনে আবূ শায়বাহ, দারে কুতনী

ব্যাখ্যা নবী করীম (স) দোয়া কুনূত কখনো কখনো নামযে পড়িয়াছেন, ইহা অসংখ্য হাদীস হইতে প্রমাণিত। কিন্তু সে পর্যায়ে যত বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে একথা স্পষ্ট যে, বিশেষ ঘটনা দুর্ঘটনাকালে নবী করীম (স) নামাযে কুনূত পড়িয়াছেন, কুনূত পড়িয়াছেন জুহর, আসর, এশা

ও মাগরিবের নামাযে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীসসমূহের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, এই সব নামাযে নবী করীমের কুনূত পাঠ নিতান্তই সাময়িক ছিল এবং কিছু দিন পরই তিনি উহা ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে কথা স্পষ্ট হইয়াছে যে, নবী করীম (স) বিত্‌রের নামাযে দোয়া কুনূত স্থায়ীভাবে পাঠ করিয়াছেন। কখন কুনূত পাঠ করিয়াছেন, রুকূর পূর্বে না রুকূ হইতে উঠিবার পর, এই পর্যায়েও বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত ও গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। বহু হাদীসে বলা হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) রুকূ হইতে মাথা তুলিয়া দোয়া কুনূত পড়িতেন। হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেনঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ ـ

রাসূলে করীম (স) রুকূ দেওয়ার পর—রুকূ হইতে মাথা তুলিয়া উঠিয়াই সোজা দাঁড়াইয়া গিয়া দোয়া কুনূত পড়িতেন।

কিন্তু উপরোদ্ধৃত হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বিত্‌রের নামাযে শেষ রাক্‌'আতে রুকূতে যাইবার পূর্বে দোয়া কুনূত পড়িয়াছেন। এই মর্মের হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ ছাড়া হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।

নামাযের কোন্ রাক্‌'আতের রুকূতে যাওয়ার পূর্বে দোয়া কুনূত পড়িয়াছেন, এই সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ ـ (دارقطنى ـ نيل الاوطار)

রাসূলে করীম (স) বিত্‌রের নামাযের শেষ রাক্‌'আতে (রুকূতে যাওয়ার পূর্বে) দোয়া কুনূত পাঠ করিয়াছেন। —দারে কুত্‌নী, নায়লুল আওতার

কুনূত পাঠের সময় হাত তুলিয়া তাকবীর বলিতে হইবে। হযরত আলী (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছেঃ

كَانَ اِذَا اَرَادَ الْقُنُوْتَ كَبَّرَ وَقَنَتَ ـ

তিনি যখন কুনূত পাঠ করার ইচ্ছা করিতেন, তখন তাকবীর বলিতেন ও কুনূত পড়িতেন।

অপর একটি যয়ীফ বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তাকবীর বলার সময় হাত উপরে তুলিতে হইবে। (تحفة الفقهاء للسمرقندى)

ঈদের নামায

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَاُ بِهِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ وَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْ يَاْمُرُ بِشَىْءٍ اَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ـ

(بخارى، مسلم)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল-আজহার দিন ঈদের ময়দানে চলিয়া যাইতেন। সর্বপ্রথম তিনি নামায পড়াইতেন। নামায পড়ানো শেষ করিয়া লোকদের দিকে ফিরিয়া খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইতেন। তখন

লোকেরা যথারীতি নিজেদের কাতারে বসিয়া থাকিত। এই সময় নবী করীম (স) লোকদিগকে ওয়াজ ও নসীহত করিতেন, শরীয়াতের আদেশ-নিষেধ শোনাইতেন। তখন যদি কোন সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিয়া কোন দিকে পাঠাইবার ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তিনি (দুই ঈদের খুতবার পরে) তাহা পাঠাইয়া দিতেন কিংবা কোন বিশেষ বিষয়ে কোন নির্দেশ জারী করা তাঁহার লক্ষ্য হইত, তবে এই সময় তিনি তাহাও সম্পন্ন করিতেন। অতঃপর তিনি (ঈদগাহ হইতে) প্রত্যাবর্তন করিতেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীস হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, নবী করীম (স) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায পড়ার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া ময়দানে চলিয়া যাইতেন। ইহাও ছিল তাঁহার সাধারণ নিয়ম। ঈদের নামাযের জন্য তিনি মদীনার বাহিরে অবস্থিত কোন খোলা মাঠ মনোনীত করিয়া লইতেন এবং সেখানেই নামাযের জন্য লোকদিগকে সমবেত হইবার নির্দেশ দিতেন। অবশ্য বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে ময়দানে সমবেত হওয়া সম্ভব না হইলে ঈদের নামায মসজিদেও পড়া যাইতে পারে। স্বয়ং নবী করী (স)-ও এইরূপ অবস্থায় তাহাই করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ۔

একবার ঈদের দিন বৃষ্টি হওয়ায় নবী করীম (স) লোকদিগকে লইয়া মসজিদে নববীতেই ঈদের নামায আদয় করিলেন। —আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ

হাদীসটি হইতে প্রথমত দুই ঈদের নামায পড়ার কথা জানা যায়। সেই সঙ্গে জানা যায় যে, নামাযের পরে সমবেত নামাযীদের সামনে ইসলামী হুকুম-আহকাম ও ওয়াজ-নসীহত সমন্বিত ভাষণ পেশ করার রীতিও স্থায়ীভাবে বর্তমান। বস্তুত ঈদ যেমন সার্বজনীন আনন্দোৎসব তেমনি এ উৎসবের প্রধানতম কার্যসূচী হইল উম্মুক্ত ময়দানে সমবেত হইয়া বিরাট জামা'আত সহকারে আল্লাহ্র সম্মুখে সিজদায় অবনমিত হওয়া—দুই রাক্'আত নমায পড়া। শুধু নামায পড়াই নয়; সেই সঙ্গে যাবতীয় জাতীয় ও সামষ্টিক বিষয়ে ঈদের মজলিসে আলোচনা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণও বিধেয়—বরং বাঞ্ছনীয়। নবী করীম (স) তাহাই করিয়াছেন।

ঈদের দিনের কর্মসূচী

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تَخْرُجَ اِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَّاَنْ تَاكُلَ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ۔ (ترمذی)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, ঈদের নামাযের জন্য পায়ে হাটিয়া যাওয়া এবং বাহির হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া সুন্নাত—রাসূলে করীম (স)-এর রীতি। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঈদের দিনে ময়দানে নামাযের জন্য পায়ে হাটিয়া যাওয়া এবং পায়ে হাটিয়াই ফিরিয়া আসা বাঞ্ছনীয়। কেননা এই দিনটি সর্বসাধারণ মানুষের মহামিলনের দিন। এই দিন পায়ে হাটিয়া ময়দানে যাতায়াত করিলেই সাধারণ মানুষের এই মহামিলনের উৎসবে পূর্ণ মাত্রায় অংশ গ্রহণ বাস্তবায়িত হইতে পারে। এই দিন যাহারা উষ্ট্রের পিঠ কিংবা আধুনিক যানবাহনে চড়িয়া ময়দানে যায় তাহারা সাধারণত জন-মানুষ হইতে বিচ্ছিন্নই থাকিয়া যায়। জনগণের কাতারে দাঁড়ানো তাহাদের ভাগ্যে কখনই সম্ভব হয় না। আর ইহা কখনই বিশ্বনবীর আদর্শ হইতে পারে না। বরং সত্যকথা এই যে, ঈদের এই সার্বজনীন উৎসব ও মহামিলনের ব্যবস্থাই তাহাদের নিকট অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় যাহারা

এই দিনটিতেও বড়লোকি যানবাহন পরিহার করিয়া সাধারণ মানুষের কাতারে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে না, পারে না সমস্ত মানুষের সাথে একাকার হইয়া মিলিয়া মিশিয়া যাইতে। ইহাতে ঈদের এই মহান ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হইয়া যাইতে বাধ্য। তাই রাসূলে করীম (স) এই দিনে পায়ে হাটিয়া যাতায়াত করার সুন্নাতের প্রচলন করিয়াছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে তাই বলা হইয়াছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا ۔ (ابن ماجه)

রাসূলে করীম (স) ঈদের নামাযের ময়দানে পায়ে হাটিয়া যাইতেন এবং পায়ে হাটিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন। —ইবনে মাজাহ্

কেবল তিনি নিজে পায়ে হাটিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। নির্বিশেষে সর্বসাধারণ মুসলমানও যাহাতে এই আদর্শ বাস্তবভাবে অনুসরণ করিয়া চলে সেইজন্য তিনি বলিয়াছেনঃ

اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَمْشُوْنَ ۔

ঈদের দিনে তোমরা যখন নামাযের জন্য যাইবে তখন অবশ্যই পায়ে হাটিয়া চলিয়া যাইবে।

ঈদুল ফিতরের দিনে সকাল বেলা—নামাযের জন্য বাহির হওয়ার পূর্বে—কিছু খাওয়াও রাসূলে করীম (স)-এর প্রতিষ্ঠিত ও অনুসৃত নীতি। হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ تَمَرَاتٍ ۔ (بخارى، ابن ماجه)

রাসূলে করীম (স) ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খাইয়া সকাল বেলা নামাযের জন্য রওয়ানা হইতেন না। —বুখারী, ইবনে মাজাহ্

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলিয়াছেনঃ

كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَاْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَّخْرُجَ اِلَى الْمُصَلّٰى ۔ (ابن ابى شيبه البزار)

নবী করীম (স) ঈদুল ফিতরের দিন ময়দানের দিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আহার করিতেন।

ঈদুল ফিতরের সকাল বেলা কিছু খাওয়ার রীতির তাৎপর্য সুস্পষ্ট। দীর্ঘ একমাস কাল রোযা পালন করা হইয়াছে। এই মাসের মধ্যে সকাল বেলা ও সারাটি দিনে কিছুই পানাহার করা হয় নাই। আজকার এই ঈদের দিনের সকাল বেলাও— যে দিনে রোযা রাখা হইতেছে না, রোযা রাখা হারাম— কিছুই না খাইলে এই দিনটিও রোযার মতই মনে হইবে। অথচ মন ও মানসিকতা বা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও ইহা বাঞ্ছনীয় নয়।

ঈদের নামাযের জন্য ময়দানে যাতায়াত প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স)-এর আর একটি নিয়ম ছিল যাতায়াতের পথ পরিবর্তন। নিম্নোদ্ধৃত হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছেঃ

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ ۔ (بخارى)

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) ঈদের দিনে ময়দানে যাতায়াতের পথ পরিবর্তন করিতেন।

ব্যাখ্যা ঈদের দিনে রাসূলে করীম (স) ময়দানে যাওয়া-আসার পথ পরিবর্তন করিতেন অর্থাৎ যে পথে ময়দানে যাইতেন সেই পথে ফিরিয়া আসিতেন না। ফিরিয়া আসিতেন অন্য এক পথ দিয়া। ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, সন্দেহ নাই। ইহার দরুণ উভয় পথই এবং তাহাতে চলাচলকারী জনগণ সহজেই রাসূলে করীমের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিত। তাঁহার গমনাগমনের ফলে উভয় পথ ও উভয় পথের জনগণ সমান মর্যাদা, সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করিত। যাতায়াতকালে তাঁহার সঙ্গী-সাথী অসংখ্য মানুষের দলবদ্ধতা চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় ডংকা বাজাইত ও সমস্ত মানুষ ইসলামের প্রতাপ ও প্রাণচাঞ্চল্য স্বচোখে দেখিতে পারিত। এই যাতায়াতের পথে মুসলমানরা উচ্চস্বরে তাকবীর করিতেন, এক পথে যাওয়া ও অন্য পথে আসার ফলে উভয় পথের আকাশ বাতাস তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিত। বস্তুত এই সব কারণে ও উদ্দেশ্যে নবী করীম (স) ঈদের দিনে এক পথ ধরিয়া ময়দানে যাইতেন এবং অন্য পথ ধরিয়া ফিরিয়া আসিতেন। মুসলমানদের ইহাই আদর্শ। ঈদের দিনে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা রাসূলে করীম (স)-এর আমল হইতে প্রমাণিত। এই প্রসঙ্গে তাঁহার নির্দেশও উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

زَيِّنُوْا اَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيْرِ - (طبرانى ، الاوسط، الصغير)

তোমরা তোমাদের ঈদসমূহকে তাকবীর বলার সাহায্যে সুন্দর-আনন্দমুখর ও জাঁকজমকপূর্ণ করিয়া তোল।

ইমাম যুহরী বলিয়াছেনঃ

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهٖ حَتّٰى يَاْتِىَ الْمُصَلّٰى ، (ابن ابى شيبه)

নবী করীম (স) ঈদুল ফিতরের দিনে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার সময় হইতে নামাযের স্থানে পৌছা পর্যন্ত তাকবীর বলিতে থাকিতেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) ঈদের দিনে পথে চলাকালে উচ্চস্বরে তাকবীর বলিতেন। নাফে' হইতে বর্ণিতহইয়াছেঃ

كَانَ بْنُ عُمَرَ يَغْدُوْا اِلَى الْعِيْدِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهٗ بِالتَّكْبِيْرِ حَتّٰى يَاْتِىَ الْمُصَلّٰى وَيُكَبِّرُ حَتّٰى يَاْتِىَ الْاِمَامُ - (دارقطنى، بيهقى، شافعى)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ঈদের দিন সকালে মসজিদ হইতে নামাযে যাইতেন এবং উচ্চস্বরে তাকবীর বলিতে থাকিতেন—নামাযের স্থানে পৌছা ও ইমামের উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত।

কিন্তু ঈদুল-আযহার দিনে তিনি কি করিতেন? —— এই পর্যায়ে হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ وَلَا يَاْكُلُ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يَرْجِعَ ، (ترمذى ، ابن ماجه، مسند احمد)

রাসূলে করীম (স) ঈদুল ফিতরের দিন কিছুই না খাইয়া সকাল বেলা নামাযের জন্য যাইতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ময়দানে নামাযের পর ফিরিয়া আসার পূর্বে কিছুই খাইতেন না।

—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

বায়হাকীর উদ্ধৃতিতে অতিরিক্ত শব্দ হইলঃ

فَيَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَتِهِ - ফিরিয়া আসিয়া কুরবানী করা জন্তুর কলিজা আহার করিতেন।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ঈদুল আযহার দিন কুরবানী জন্তুর গোশতই হওয়া উচিত মুসলমানের প্রথম খাবার। অর্থাৎ নামাযের পূর্বে কিছুই খাইবে না। নামায পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়াই যাহা পাওয়া যায় তাহাই খাইবে না বরং অবিলম্বে কুরবানী করিয়া সেই কুরবানীর জন্তুর গোশত খাইবে। ইহাই হইবে সেদিনের প্রথম খাবার। —বুখারী

বস্তুত ইহাই ছিল বিশ্বনবীর আদর্শ। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন এবং তদানীন্তন মুসলিম সমাজকেও এই নীতি অনুসরণের জন্য আহবান জানাইতেন এবং অনুপ্রাণিত করিতেন।

ঈদের সূচনা

عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ - قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ - (ابو داؤد، مسند احمد)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) যখন মদীনায় উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন মদীনাবাসীরা (যাহাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন) দুইটি জাতীয় উৎসব পালন করিতেছে। আর এই ব্যাপদেশে তাহারা খেলা তামাসার আনন্দ অনুষ্ঠান করিতেছে। নবী করীম (স) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা এই যে দুইটি দিন জাতীয় উৎসব পালন কর, ইহার মৌলিকত্ব ও তাৎপর্য কি? তাহারা বলিলঃ ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এই উৎসব এমনি হাসি-খেলা ও আনন্দ উৎসবের মাধ্যমেই উদযাপন করিতাম, এখন পর্যন্ত তাহাই চলিয়া আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এই দুইটি উৎসব দিনের পরিবর্তে উহা হইতে অধিক উত্তম দুইটি দিন—ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযাহা দান করিয়াছেন। অতএব পূর্বের উৎসব বন্ধ করিয়া এই দুইটি দিনের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করিতে শুরুকর। —আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা জাতিসমূহের উৎসব ও আনন্দ-অনুষ্ঠানাদি সাধারণত তাহাদের আকীদা বিশ্বাস, ধারণা-মানসিকতা এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুযায়ী হইয়া থাকে। উহাতেই তাহার অভিব্যক্তি ঘটে বাস্তবভাবে এবং উহা জাতীয় মেজাজ ও প্রকৃতির সহিত পুরোপুরি সমঞ্জস্যশীল হইয়া থাকে। এই কারণে দেখা যায়, ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের জামানায় মদীনাবাসীরা যে দুইটি জাতীয় উৎসব পালন করিত তাহা তাহাদের তদানীন্তন জাতীয় ধারণা, মনোভাব, স্বভাব-প্রকৃতি ও জাহিলী ভাবধারা ও ঐতিহ্যানুযায়ী ছিল। ইহার একটি দিনের নাম ছিল 'নীরোজ' এবং আর একটির নাম

'মেহেরজান'। হাদীসের স্পষ্ট ভাষণ হইতে জানা গেল, ইসলামের তাওহীদী যুগে জাহিলী যুগের এই উৎসব সম্পূর্ণ অচল ও সামঞ্জস্যহীন বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা উহা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু উৎসব ও আনন্দানুষ্ঠান মানুষের প্রকৃতিগত। উহা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া দেওয়ার মতই মারাত্মক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা জাহিলী যুগের দুইটি উৎসব বন্ধ করিয়া দিয়া অনুরূপ দুইটি জাতীয় উৎসবের সূচনা করিয়া দিলেন। এই দুইটি উৎসব হইল দুই ঈদের উৎসব। একটি ঈদুল ফিতর আর অপরটি ঈদুল আযহা। ঈদুল ফিতর একাধারে একটি মাস কাল ধরিয়া একনিষ্ঠভাবে রোযা পালন ও কৃচ্ছ সাধনের পর উহা অবসানের আনন্দ উৎসব। আর ঈদুল আযহা হইল হজ্জ করার পর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পশু যবাই করার অনুষ্ঠান। আর এই দুইটি—রোযা ও হজ্জ—ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এতদুভয়ে রোযা ও হজ্জ পালনকারীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য বিশেষ মুনাজাত করা হয়। সেই সঙ্গে উৎসব আনন্দের মূল উৎস হইল সমবেতভাবে ইমামের পিছনে দুই রাক্'আত নামায পড়াও খুতবা শ্রবণ। পক্ষান্তরে জাহিলিয়াতের জামানায় দুইটি দিনে যে অনুষ্ঠান হইত তাহা খেলা-তামাসার অর্থহীন স্থূল ও অন্তঃসারশূন্য আনন্দ উল্লাস মাত্র। তাহাতে যেমন ছিল লালসার বহ্নি প্রজ্বলনের সমস্ত আয়োজন, তেমনি হইত প্রকৃতি পূজার পংকিল উৎকট অভিব্যক্তি। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করিবার পর কোন মুসলমানই এই ধরনের কোন উৎসবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

বস্তুত ইসলামের যুগে ইসলাম-পূর্ব জাহিলী যুগের তাহযীব-তমদ্দুন ও সাংস্কৃতিক উৎসব যেমন চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না, অনুরূপভাবে কোন লোকের বা জাতির ইসলাম কবুল করিবার পর ইসলাম-পূর্বকালের অনৈসলামিক বা ইসলাম বিরোধী আনন্দ-উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করা কোনক্রমেই বৈধ ও বিধেয় হইতে পারে না। হাদীসে ইহারই বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়।

পরন্তু ইসলাম মানুষের জীবনে কতগুলি বিধি-নিষেধের দূরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা চাপাইয়া দিতে আসে নাই, জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়াই উহার লক্ষ্য নয়। বরং উহা যেমন পাপ ও অন্যায়ের পথ বন্ধ করিয়া দেয়, তেমনি উন্মুক্ত করিয়া দেয় কল্যাণময় ও সার্বজনীন অপর বহু পথ ও পন্থা।

জাহিলিয়াতের দুইটি আনন্দোৎসব বন্ধ করিয়া তদস্থলে অপর দুইটি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করিয়া দেওয়ায় ইসলামের সত্যিকার রূপ ও প্রকৃতিই উদঘাটিত হইল।

বস্তুত নবী করীম (স)-এর নির্দেশ ও নীতি-আদর্শ অনুযায়ী এই দুইটি দিন ও তদসংক্রান্ত উৎসবাদি পালন করা হইলে ইহা হইতেই ইসলামের পবিত্র ও বিপ্লবী ভাবধারা জানিতে, বুঝিতে ও লাভ করিতে পারা যায়।

ঈদের সার্বজনীন উৎসব

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الْاَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتَ الْخُدُوْرِ وَ الْحُيَّضَ فِى الْعِيْدَيْنِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلّٰى وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُعِرْهَا اُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا۔ (ترمذى)

উম্মে আতীয়া (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) দুই ঈদের ময়দানে নাবালিকা, পূর্ণ বয়স্কা, সাংসারিক ও হায়েযসম্পন্না মহিলাদিগকেও উপস্থিত করিতেন। তবে হায়েযসম্পন্না মহিলারা নামায হইতে দূরে সরিয়া থাকিত; কিন্তু সর্বসাধারণ মুসলমানদের যখন দ্বীনী দাওয়াত (খুতবা) দেওয়া হইত, তখন তাহারা তাহাতে পুরাপুরি অংশ গ্রহণ করিত।

একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাদের বাহিরে যাওয়ার জন্য যে মুখাবরণের প্রয়োজন তাহা যদি কাহারো না থাকে, তখন কি করা যাইবে হে রাসূল? জওয়াবে তিনি বলিলেন, 'কাহারো তাহা না থাকিলে তাহার অপর এক বোন যেন তাহাকে নিজের মুখাবরণ ধারস্বরূপ দিয়া দেয়।

—তিরমিযী

ব্যাখ্যা উম্মে আতীয়া বর্ণিত এই হাদীসটি মুসনাদে আহমদেও উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু উপরোদ্ধৃত বর্ণনার শুরুতে যেখানে বলা হইয়াছে, كَانَ يُخْرِجُ নবী করীম (স) এ সব মহিলাদের বাহির করিয়া লইয়া যাইতেন, সেখানে মুসনাদে আহ্মদে বলা হইয়াছেঃ

قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ اَنْ نُّخْرِجَ -

উম্মে আতীয়া বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)—তাঁহার জন্য আমার মা ও বাপ উৎসর্গীত হউক—আমাদিগকে (এই সব মহিলাদের) ঈদের দিনে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। বর্ণনা ও ভাষায় এই পার্থক্যে মূল বক্তব্যে কোনই পার্থক্য হয় নাই বরং পার্থক্য হইতে একথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, নবী করীম (স) নিজে যেমন সব পর্যায়ের ও সব রকমের ও সব অবস্থায় মহিলাদিগকেও ঈদের দিনে ময়াদানে হাযির করিতেন, তেমনি নেতৃস্থানীয় মহিলাদিগকেও এই কাজের নির্দেশ দিতেন। ঈদের দিনে সব পুরুষ ও সব মহিলার ময়দানে হাযির হওয়া মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশরূপে গণ্য। কেননা ঈদের দিনের এই অনুষ্ঠান সার্বজনীন। ইহাতে সব শ্রেণীর, সব পর্যায়ের ও সব অবস্থার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের উপস্থিত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

তবে হায়েযসম্পন্না মহিলাদের জন্য নামায পড়া জায়েয নহে, এই কারণে তাহারা নামাযের সময় আলাদা সরিয়া বসিবে। কিন্তু ইহার পরই ইমাম যে ভাষণ দিবে, তাহা শুনিবার জন্য তাহারা পুণরায় মজলিসে আসিয়া শামিল হইবে।

মহিলাদের বাহিরে—ঈদের ময়দানেও যাইবার জন্য মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইসলামে ইহা স্থায়ী বিধান। কিন্তু যদি কাহারও বোরকা বা এমন কোন কাপড় না থাকে, যাহা দ্বারা মুখাবয়ব আবৃত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে কি করা যাইবে? তখন কি ময়দানে যাওয়া বন্ধ করিবে? ইহার জওয়াব স্বয়ং নবী করীম (স) দিয়াছেন। তাঁহার এই জওয়াবের সারকথা হইল, ঈদের মত জাতীয় ও সার্বজনীন উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান হইল ময়দানে জমায়েত হওয়া এবং জামা'আতের সহিত নামায পড়া, জাতীয় উৎসবের ক্ষেত্রে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই উপস্থিত থাকা কর্তব্য। আর যদি কোন মহিলার বোরকা নাই বলিয়া ময়দানে যাইতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তবুও যাওয়া বন্ধ করা চলিবে না। তখন অপর কোন মহিলার নিকট হইতে তাহার অতিরিক্ত কোন বোরকা বা কাপড় উপস্থিত ধার বাবদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা লইয়া ময়দানে বাহির হইতে হইবে।

ঈদের নামাযের জন্য ময়দানে বাহির হওয়ার ব্যাপারে মহিলাদের কর্তব্যের কথা খুব সামান্য ও নগণ্যভাবে দেখিলে চলিবে না। বরং ইহার গুরুত্ব অবর্ণনীয়। হাদীসে এ পর্যায়ে রাসূলে করীমের অসংখ্য বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُ بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ اَنْ يَّخْرُجْنَ فِى الْعِيْدَيْنِ - (مسند احمد)

রাসূলে করীম (স) দুই ঈদের নামাযে ময়দানে যাওয়ার জন্য তাঁহার কন্যা ও অন্যান্য মহিলাদের আদেশ করিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাতুল আনসারীর ভগিনী উমরাতা বিনতে রাওয়াহাতুল আনসারী বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

وَجَبَ الْخُرُوْجُ عَلٰى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ ـ (مسند احمد)

ঈদের দিন ময়দানে যাওয়া কর্তব্য প্রত্যেক বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষেরই।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সামাজিক অবস্থা ও নৈতিক পরিবেশ শৃঙ্খলাহীন ও বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে ইসলামী শরীয়াতের বিশেষজ্ঞগণ বিশেষভাবে যুবতী মেয়েলোকদের ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়া হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। কেননা উহার পরিণতিতে হারাম সংঘটিত হইতে পারে। আর যে কাজের পরিণতি হারাম স্বয়ং সেই কাজও অবশ্যই হারাম হইবে। (البدائع الصنائع للكسانى ج ١ ص ٢٧٥)

ঈদের খুতবা

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ شَهِدْتُ الصَّلٰوةَ مَعَ النَّبِىِّ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلَا اِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَامَ مُتَّكِئًا عَلٰى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَ ذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلٰى طَاعَتِهٖ وَمَضٰى اِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَاَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَ وَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ ـ (نسائى)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি এক ঈদে নবী করীম (স)-এর সাথে নামাযে শরীক ও উপস্থিত হইয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি কোনরূপ আযান ও ইকামত ছাড়াই এবং খুতবা দেওয়ার পূর্বে নামায শুরু করিয়া দিলেন। নামায যখন সম্পূর্ণরূপে আদায় হইয়া গেল, তখন তিনি হযরত বিলালের কাঁধে ভর করিয়া ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়াইলেন। শুরুতেই তিনি আল্লাহ্র হামদ করিলেন, তাঁহার প্রশংসা ও গুণাবলী বয়ান করিলেন, লোকদের দ্বীনী তত্ত্ব ও জরুরী কথাবার্তা বলিলেন। তাহাদিগকে দ্বীন ও পরকালের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। আল্লাহ্র হুকুম পালনের জন্য উৎসাহিত ও উদ্ধৃত করিলেন। অতঃপর তিনি মহিলাদের সমাবেশের দিকে চলিয়া গেলেন। হযরত বিলাল তখন তাঁহার সাথেই ছিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্র ভয় করিয়া চলিবার নির্দেশ দিলেন, তাহাদিগকেও অনেক জরুরী দ্বীনী কথা বলিলেন এবং অনেক উপদেশ দিলেন। —নাসায়ী

ব্যাখ্যা এই হাদীসে ঈদের দিনের ময়দানের কার্যসূচী স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এইদিন ময়দানে প্রথম কাজ হইল দুই রাক্'আত নামায জামা'আতের সহিত পড়া। ইহার পূর্বে আযান ও ইকামত বলা হইবে না। নামায শেষ হইয়া যাওয়ার পর ইমাম দাঁড়াইয়া খুতবা পেশ করিবে। খুতবার শুরুতে আল্লাহ্র হামদ ও রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করিতে হইব এবং লোকদিগকে দ্বীনী নসীহত ও সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে দ্বীনী হিদায়ত পেশ করিবে।

ঈদের নামায ও জামা'আতে মহিলারাও শরীক হইবে। তবে তাহাদের আসন পুরুষদের হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন হইতে হইবে। যেমন এই হাদীসটি হইতে স্পষ্ট জানা যায়।

ইমামের ভাষণ সকলেই শ্রুতিগোচর করিতে হইবে। মজলিসের কোন অংশ না শুনিতে পাইলে প্রয়োজন মত তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া নসীহতের কথা শোনানো বাঞ্ছনীয়—যেমন আলোচ্য হাদীসের বর্ণনানুযায়ী নবী করীম (স) বলিয়াছেন।

ঈদের নামাযে আযান-ইকামত নাই

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رض قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَّ لَا إِقَامَةٍ۔ (مسلم، مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی)

হযরত জাবির ইবনে সামুরাতা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে ঈদের নামায একবার-দুইবার নয় (বহুবার) আযান ও ইকামত ছাড়াই পড়িয়াছি।

—মুসলিম, মুসনাদে আহমদ আবূ দাউদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে স্পষ্ট হয় যে, ঈদের নামাযের জন্য না আযান দিতে হয় না ইকামত বলিতে হয়। হযরত জাবির ইবনে সামুরাতা (রা) আযান-ইকামত ছাড়াই ঈদের নামায পড়িয়াছেন বলিয়া উপরোদ্ধৃত হাদীসে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই পর্যায়ে একটি দুইটি নয়, বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত ও গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ব্যাপারে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেনঃ

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحٰى۔ (بخاری، مسلم)

না ঈদুল ফিতরের নামাযে আযান দেওয়া হইত, না ঈদুল আযহায়। —বুখারী, মুসলিম

এই পর্যায়ে হযরত সা'দ ইবনে আবূ আক্কাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস আরও স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। ইহার ভাষা হইলঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيْدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَّلَا إِقَامَةٍ وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ۔ (مسند بزار)

নবী করীম (স) ঈদের নামায আযান-ইকামত ছাড়াই পড়িয়াছেন। তিনি এই সময় দাঁড়াইয়া দুইটি খুতবা দিতেন এবং দুই খুতবার মাঝখানে আসন গ্রহণ করিয়া পার্থক্য সূচিত করিতেন।

—মুসনাদে বাযযার

আবূ দাউদ হযরত ইবনে আব্বাস হইতে ইবনে মাজহ হযরত সা'দ ইবনে আবূ আক্কাস হইতে, তাবারানী হযরত বরা ইবনে আযিব হইতে ও হযরত রাফে' হইতে, ইবনে আবূ শায়বা মুগীরা ইবনে শু'বা দহাক ও যিয়াদ হইতে এই একই কথার বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ ফিকাহবিদের মতে আযান-ইকামত না বলিয়াও اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ নামাযে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, বলিয়া উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ দেওয়া যাইতে পারে। আর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে, এইরূপ ধ্বনি দেওয়ার জন্য মুয়াযযিনকে নির্দেশ দেওয়া ইমামের কর্তব্য

বলিয়া ইমাম শাফেয়ী মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এতদূর বলিয়াছেনঃ هَلُمُّوا إِلَى الصَّلٰوةِ কিংবা حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ অথবা قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ 'নামাযের দিকে আস'—'নামাযের জন্য আস' অথবা 'নামায দাঁড়াইয়া গিয়াছে' বলিয়া ধ্বনি দিলেও কোনই দোষ নাই। কেননা এখনও নামাযের স্থানে আসিয়া পৌছাতে পারে নাই, কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছে এমন বহু লোক এই আওয়াজ শুনিয়া দ্রুত চলিয়া আসিতে পারে ও নামাযে শরীক হইতে পারে। বিশেষত এই নামায হইয়া গেলে আবার এই নামায পড়ার অবকাশ থাকে না বলিয়া যত বেশী লোককে ইহাতে শরীক হওয়ার সুযোগ দেওয়া যায় ততই মঙ্গল এবং সেইজন্য শরীয়াতের মধ্যে থাকিয়া যতটা চেষ্ট করা চলে তাহা অবশ্যই করা উচিত। (عمدة القارى)

দুই ঈদের নামাযের পূর্বে এইরূপ আওয়াজ দেওয়ার জন্য স্বয়ং নবী করীম (স) মুয়াযযিনকে নির্দেশ দিতেন। এই মর্মে একটি হাদীস ইমাম শাফেয়ী যুহরীর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী ও ইমাম শাফেয়ীর সূত্রে নিজ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। (نيل الاوطار)

ঈদের নামাযে তাকবীর

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رض عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِىْ عِيْدٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً سَبْعًا فِى الْاُوْلٰى وَخَمْسًا فِى الْاٰخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا - (مسند احمد، ابن ماجه)

আমর ইবনে শুআইব তাঁহার পিতা হইতে—তাঁহার দাদা হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ নবী করীম (স) ঈদের নামাযে বারোটি তাকবীর বলিয়াছেন। তন্মধ্যে সাতটি প্রথম রাক্'আতে ও পাঁচটি দ্বিতীয় রাক্'আতে দিয়াছেন। ~ইহার পূর্বেও নামায পড়েন নাই, ইহার পরও না।

—মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা ঈদের দুই রাক্'আত নামাযে অতিরিক্ত কতটি তাকবীর দিতে হইবে এবং তাহা কোন্ কোন সময় দিতে হইবে এই পর্যায়ে বহু সংখ্যাক হাদীস বর্ণিত ও গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার ফলে হাদীসবিদদের মধ্যেও এই উভয় পর্যায়ে—কতটি তাকবীর দিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ সময় দিতে হইবে—বিরাট মতভেদের উদ্ভব হইয়াছে এবং বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই মতসমূহের উল্লেখ করিতেছি।

১. প্রথম রাক্'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে পাঁচটি—এই মোট বারোটি তাকবীর দিতে হইবে। মুহাদ্দিস আল–ইরাকী বলিয়াছেন, সাহাবা, তাবেয়ী ও ফিকাহর ইমামদের অধিকাংশেরই এই মত। হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত সাঈদ, হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আবূ আইয়ূব, হযরত যাঈদ ইবনে সাবিত ও হযরত আয়েশা (রা) হইতেও এই মতই বর্ণিত হইয়াছে। মদীনার সাতজন ফিকাহবিদ এবং উমর ইবনে আবদুল আযীয, যুহ্‌রি, মকহুল, মালিক, আওযায়ী, ইশাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক প্রমুখ হাদীস ও ফিকাহ বিশারদ মনীষীও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

২. প্রথম রাক্'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ মোট সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে সাতটি তাকবীর বলিতে হইবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ এই মত দিয়াছেন।

৩. প্রথম রাক্'আতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক্'আতেও সাতটি তাকবীর দিতে হইবে। এই মত হযরত আনাস ইবনে মালিক, মুগীরা ইবনে শু'বা ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনুল মুসিয়্যিব ও নখয়ী হইতে বর্ণিত।

৪. প্রথম রাক্'আতে তাকবীরে তাহরীমার পরে তিনটি তাকবীর কুরআন পড়ার পূর্বে দিতে হইবে এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে কুরআন পাঠের পর তিনটি তাকবীর দিতে হইবে। সাহাবার একটি জামা'আত—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবূ মূসা আল-আশআরী, আবূ মাদউদ আল-আনসারী (রা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম সওরী, ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখ ইমাম এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

৫. প্রথম রাক্'আতে তাকবীরে তাহরীমার পর ও কুরআন পাঠের পূর্বে ছয়টি এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে কুরআন পাঠের পর পাঁচটি তাকবীর বলিতে হইবে।

৬. প্রথম রাক্'আতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আরও চারটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে চারিটি তাকবীর দিতে হইবে। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

৭. সপ্তম মতটি প্রথম মতের অনুরূপ। পার্থক্য এই যে, প্রথম রাক্'আতের তাকবীরের পর কুরআন পড়িবে এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে কুরআন পাঠের পর তাকবীর বলিবে।

৮. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে তাকবীরের ব্যাপারে পার্থক্য করা হইবে। ঈদুল ফিতরে মোট এগারোটি তাকবীর বলিবে। ছয়টি প্রথম রাক্'আতে ও পাঁচটি দ্বিতীয় রাক্'আতে। আর ঈদুল আযহার নামাযে প্রথম রাক্'আতে তিনটি ও দ্বিতীয় রাক্'আতে দুইটি তাকবীর বলিবে।

ইবনে আবূ শায়বা ইহাকে হযরত আলীর মত রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

৯. এই দুই নামাযে অন্য একভাবে পার্থক্য করিত হইবে। আর তাহা হইল, ঈদুর ফিতরে এগারোটি তাকবীর ও ঈদুল আযহায় ৯টি তাকবীর বলিবে।

১০. দশম মত প্রথম মতের অনুরূপ। তবে তাকবীর দেওয়া হইবে কুরআন পড়ার পর।

প্রথম মতটি উপরে উদ্ধৃত ও এই অর্থে বর্ণিত অপর কয়টি হাদীসের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। হযরত হাসসানের সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (স) দুই ঈদের নামাযেই প্রথম রাক্'আতে সাতটি ও দ্বিতীয় রাক্'আতে পাঁচটি তাকবীর বলিয়াছেন। মূলত এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ইবনে আমর, জাবির ও হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। দ্বিতীয় মতটি হাদীসসমূহের সাধারণ বর্ণনার ভিত্তিতে গৃহীত। তৃতীয় মতটির উৎস যে হাদীস, তাহা জানা নাই। চতুর্থ মতটির উৎস হযরত আবূ মুসা ও হুযায়ফা (রা) বর্ণিত হাদীস। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রথম এই মতের সমর্থনে ফতোয়া দিয়াছিলেন। এই মতের ব্যাখ্যা এই যে, হাদীসে মোট চারটি তাকবীরের উল্লেখ হইয়াছে, তাকবীরে তাহরীমাও উহার মধ্যে গণ্য। ফলে অতিরিক্ত তাকবীর হয় মাত্র তিনটি। অবশ্য দ্বিতীয় রাক্'আতের ব্যাপারে এই ব্যাখ্যা অচল। পঞ্চম মতের সমর্থনে কোন হাদীসের উল্লেখ হয় নাই। ষষ্ঠ মত হযরত আবূ মুসা ও হযরত হুযায়ফা বর্ণিত হাদীস হইতে গৃহীত। সপ্তম মতের উৎস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস। অষ্টম মতটি হযতর আলী (রা)-এর উক্তি হইতে সমর্থিত। নবম ও দশন মতের সমর্থনে কোন দলীল পেশ করা হয় নাই।

তাকবীরসমূহ একসঙ্গে ও পরপর মিলিতভাবে দেওয়া হইবে, না কোন হামদ বা তসবীহ পাঠ দ্বারা উহাদের মাঝে পার্থক্য করা হইবে এই পর্যায়ে ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আওযায়ী (র) বলিয়াছেনঃ তাকবীরসমূহ রুকূ, সিজদার তসবীহ পড়ার মতই মিলিত ও পরপর দিতে হইবে। কেননা হাদীসের বর্ণনাসমূহে তাকবীরগুলির মাঝে পার্থক্য করার ও পরপর না দেওয়ার কোন কথা বলা হয় নাই। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী তাকবীরসমূহের মাঝে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বা সুবহানা-আল্লাহ্ আলহামদুলিল্লাহ্ ইত্যাদি দোয়া তসবীহ পাঠ করিয়া পার্থক্য করার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। (نيل الاوطار)

সাহু সিজদা

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رض اَنَّهٗ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوٰتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهٗ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهٗ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهٗ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ ـ (بخارى، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) কোন এক নামাযের দুই রাক্'আত আমাদের লইয়া পড়িলেন। পরে তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন, বসিলেন না। মুক্তাদী লোকেরাও তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া গেল। পরে তিনি যখন নামায সমাপ্ত করিলেন এবং আমরা তাঁহার সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করিতে থাকিলাম, এই সময় তিনি তাকবীর বলিলেন। সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীর বলিলেন। বসা থাকা অবস্থায় দুইটি সিজদা দিলেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরাইলেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা এই হাদীসটি হইতে 'সিজদায়ে সাহ্' প্রমাণিত হয়। চার বা তিন রাক্'আত নামাযে দুই রাক্'আত পড়ার পর বসিতে হয় ও তাশাহ্হুদ পড়িতে হয়। কিন্তু আলোচ্য বিবরণে দেখা যায়, নবী করীম (স) দুই রাক্'আতের পর বসার পরিবর্তে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন—বসেন নাই। ইহা নামাযের বিধিবদ্ধ পদ্ধতির দৃষ্টিতে ভুল। এই ভুলকে হাদীসের পরিভাষায় বলা হইয়াছে سهو । এ শব্দটির অর্থ হইলঃ

اَلْغَفْلَةُ عَنِ الشَّيْءِ وَذِهَابُ الْقَلْبِ اِلٰى غَيْرِهٖ ـ

কোন বিষয়ে বেখেয়াল হইয়া যাওয়া ও সেদিক হইতে অন্য দিকে মন চলিয়া যাওয়া।

ইহা কোন নামাযে ঘটিয়াছিল? তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

قَامَ فِىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ ـ

নবী করীম (স) যুহরের নামাযে যেখানে বসিতে হইত সেখানে দাঁড়াইয়া গেলেন।

আর যুহরের ফরয নামায যে চার রাক্'আত তাহা সর্বজনজ্ঞাত। দুই রাক্'আত পড়ার পর বসিয়া তাশাহ্হুদ পড়িতে হইত; কিন্তু এই সময় নবী করীম (স)-এর মন বেখেয়াল হইয়া গিয়াছিল ও বসার কথা তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। আর এইরূপ হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কেননা তিনিও মানুষ ছিলেন, সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁহারও ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারিত। বিশেষত সাধারণ মানুষকে যখন সর্ব ব্যাপারে রাসূলে করীম (স)-কেই অনুসরণ করিতে হইবে—আর সাধারণ মানুষের এইভাবে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া তো খুবই সাধারণ ব্যাপার—তাই রাসূলে করীমেরও ভুল ঘটাইয়া তদবস্থায় কি করণীয় তাহা লোকজনকে শিখাইবার ব্যবস্থা করার একান্তই প্রয়োজন ছিল। রাসূলে করীমের আলোচ্য ভুল হইতে সেই প্রয়োজনই পূর্ণ হইল।

ইহা হইতে জানা গেল যে, এই ধরনের ভুল হইলে নামাযের শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে দুইটি সিজদা দিতে হইব। শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী ইহা সুন্নাত। মালিকী মাযহাব অনুযায়ী নামায কম পড়া হইলে সাহু সিজদা করা ওয়াজিব, বেশী হইলে নয়। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ইহা ওয়াজিব। তাঁহাদের দলীল হইল হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসের বাক্যঃ

ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ - অতঃপর যেন দুইটি সিজদা দেওয়া হয়।

বাক্যটি আদেশ সূচক। আর রাসূলে করীম (স)–এর আদেশ পালন ওয়াজিব পর্যায়ে গণ্য। উপরন্তু নবী করীম (স) নিজেই যখন এই ধরনের ভুলের জন্য সিজদা করিয়া বলিয়াছেন হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন ইহাকে ঘটনার বর্ণনা কর্তব্য পালনের বিবরণ—মনে করিতে হইবে। আর কর্তব্যের বর্ণনা অনুযায়ী কাজ করাও কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত। বিশেষত তিনি নিজেই বলিয়াছেনঃ

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي -

তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়িতে দেখিতে পাইতেছ, তোমরাও ঠিক সেইভাবেই নামায পড়িবে।

সাহু সিজদায় তাকবীর সহ দুইটি সিজদা করিতে হয়। যদি কেহ ভুলবশত একটি সিজদা করে, তাহা হাইলে তাহাতে দোষ হইবে না। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া মাত্র একটি সিজদা দিলে তাহার গোটা নামাযই বাতিল হইয়া যাইবে। ইবনে শিহাবের বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ প্রত্যেকটি সিজদা কালে 'আল্লাহু আকবর' বলিতে হইবে। কেননা এই সিজদা ঠিক নামাযের সিজদার মতই।

ইহা হইতে এই কথাও প্রমাণিত হয় যে, ইমাম ভুল করিলে যখন সাহু সিজদা দিবে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদিগণকেও এই সিজদা দিতে হইবে—যদিও মুক্তাদিগণের কোনই ভুল হয় নাই। ইহাই 'ইজমা'। নবী করীম (স) মৃত্যু পর্যন্ত এইরূপ আমলই করিয়াছেন।

এ পর্যায়ে আরও জানিবার বিষয় হইল, চার রাক্'আত নামাযে দুই রাক্'আতের পর বসিয়া তাশাহহুদ পড়িতে হয়। কিন্তু যদি কেহ এইখানে না বসিয়া সোজা উঠিয়া দাড়াইয়া যায়, তাহার পরই ভুল ধরা পড়িলেও তখন ফিরিয়া বসা যাইবে না। কেননা এই বসাটা ফরয নয়, ফরযের ক্ষেত্রও ইহা নয়। যদি কেহ সোজা দাঁড়াইয়া যাওয়ার পরও বসে, তাহা হইলে তাহার নামায নষ্ট হইয়া যাইবে—এমন কোন কথা নয়। কেননা এই বসাটা দ্বারা সেই কাজই করা হইয়াছে যাহা মূলতই করণীয় ছিল।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلّٰى ثَلٰثًا اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلٰى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهٗ صَلٰوتَهٗ وَاِنْ كَانَ صَلّٰى اِتْمَامًا لِّاَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِّلشَّيْطَانِ - (مسلم، ابو داؤد)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমাদের কেহ যদি এই সন্দেহে পড়িয়া যায় যে, সে কয় রাক্'আরত পড়িয়াছে—তিন রাক্'আত না চার রাক্'আত; তখন সে যেন সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলে এবং যে কয় রাক্'আত পড়িয়াছে বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় হয় তাহার উপর সে যেন ভিত্তি স্থাপন করে। অতঃপর সালাম ফিরাইবার পূর্বে সে যেন দুইটি সিজদা দেয়। সে যদি আসলে পাঁচ রাক্'আত পড়িয়া থাকে, তাহা হাইলে এই সিজদা দুইটি মিলাইয়া তাহার নামায জোড়যুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি সে চার রাক্'আত পূর্ণই পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে এই সিজদা দুইটি শয়দানের পক্ষে লাঞ্ছনাকারী ও উহার ক্রোধ উদ্রেককারী স্বরূপ হইবে। —মুসলিম, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা নামায পড়িতে থাকা অবস্থায় কয় রাক্'আত পড়া হইয়াছ তাহা ভুলিয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। নামাযীকে প্রায়শই এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। এইরূপ

অবস্থায় পড়িলে নামাযীকে কি করিতে হইবে। আলোচ্য হাদীসে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তাহাকে মুহূর্তে একটি বিশেষ সংখ্যার উপর মনকে দৃঢ় করিতে হইবে। সন্দেহের সব ধুম্রজাল দূর করিয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের আলো মনের লোকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দুইটি সিজদা দিতে হইবে। ইহা সাহু সিজদা। ইমাম নববী বলিয়াছেনঃ

فَهٰذَا الْحَدِيْثُ صَرِيْحٌ فِىْ وُجُوْبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِيْنِ -

সন্দেহ হইলে রাক্'আতের সংখ্যা সম্পর্কে একটা দৃঢ় প্রত্যয় জমানো ওয়াজিব। এই হাদিসটি এই সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিতেছে।

ইমাম শাফেয়ীর এই মত। ইমাম মালিক (রা) এই হাদীসটিকে 'মুরসাল'—তাবেয়ী কর্তৃক সরাসরি রাসূলে করীম (স) হইতে বর্ণনাকৃত—মনে করিয়া ইহাকে গ্রাহ্য করিতে রাযী নহেন। কিন্তু আসলে তাহা নয়। এই হাদীসটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত হাফেযে হাদীস কর্তৃক মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, সনদের দিক দিয়া হাদীসটি 'মুরসাল' হইলেও উহা যে গ্রহণ করা যাইবে না এমন কথা নয়।

নামাযে সাময়িক বিভ্রান্তির কারণে দুইটি অতিরিক্ত সিজদা দিতে হইবে। এই সিজদা দুইটির ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম (স)-ই বলিয়া দিয়াছেনঃ যদি সে পাঁচ রাক্'আত পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে এই সিজদা দুইটি তাহার নামাযের সহিত মিলিয়া জোড়যুক্ত হইয়া যাইবে। আর যদি সে চার রাক্'আত পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার নামায পূর্ণ হইয়া গেল। আর সিজদা দুইটি শয়তানের পক্ষে অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হইবে। কারণ এই দুইটি সিজদা দেওয়ায় শয়তান রাগে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিবে। কেননা, শয়তানই নামাযীকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলিয়াছে। তাহার নামায নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। কিন্তু সাহু সিজদা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নামাযের কমতি পূরণ করিয়া দিয়াছেন, বিভ্রান্তি দূর করার পন্থা বলিয়া দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে শয়তানের অধিক লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার কারণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

এই পর্যায়ে আর একটি হাদীস উল্লেখ্যঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلّٰى اَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلٰى وَاحِدَةٍ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلّٰى اَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثِنْتَيْنِ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلّٰى اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ - (ترمذى)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছিঃ তোমাদের কেহ যদি নামাযে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং ঠিক করিতে না পারে এক রাক্'আত পড়িল কি দুই রাক্'আত, তখন যেন এক রাক্'আত পড়িয়াছে বলিয়া মনে প্রত্যয় জাগায়। যদি সন্দেহ হয় যে, দুই রাক্'আত পড়িয়াছে, না তিন রাক্'আত তখন দুই রাক্'আত ঠিক করিবে, আর যদি তিন রাক্'আত পড়িয়াছে, না চার রাক্'আত তাহা ঠিক করিতে না পারে, তবে যেন তিন রাক্'আত পড়িয়াছে বলিয়া মনকে শক্ত করে এবং সালাম ফিরাইবার পূর্বে যেন দুইটি সিজদা দেয়।

ব্যাখ্যা সাহু সিজদা পর্যায়ে এই হাদীসটি অন্যান্য যাবতীয় হাদীসের তুলনায় অনেক বিস্তারিত।

কাজেই যে সব হাদীসে এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও এই হাদীসের আলোকেই বুঝিতে হইবে।

قاله ابو الطيب المدنى فى شرح الترمذى ـ تحفة الاحوذى شرح الترمذى ـ

উপরোদ্ধৃত হাদীস কয়টিতে সাহু সিজদা দেওয়ার পদ্ধতি বিস্তারিত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হাদীস কয়টি নবী করীম (স)-এর নির্দেশমূলক। দ্বিতীয়ত তিনি স্বয়ং এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) প্রয়োজন দেখা দিলেই সিজদায়ে সাহু দিয়াছেন। ইহাতে কোনই ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। বিনা ওযরে উহার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়।

'সিজদায়ে সাহু' সংক্রান্ত হাদীস ২৯ জন সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে বলিয়াছেনঃ 'সিজদায়েসাহু' ফরয।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে ভিন্নতর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ شَكَّ فِى صَلٰوتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلَاثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَاِنَّهٗ اَقْرَبُ ذٰلِكَ اِلَى الصَّوَابِ وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ـ (بخارى، مسلم، ابو داؤد، ترمذى)

যে লোক তাহার নামাযে সন্দেহে পড়িয়া যাইবে—তিন রাক্'আত পড়িয়াছে, না চার রাক্'আত, তখন যেন সে সঠিক সংখ্যাটি স্থির করিয়া লয়—কেননা ইহাই সঠিক অবস্থার নিকটবর্তী পদ্ধতি এবং উহার উপর ভিত্তি করে। অতঃপর সাহুর দুইটি সিজদা দিবে।

—বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ভুল ধরা পড়িলে সঠিক ও নির্ভুল কি তাহা নিমেষের মধ্যে নির্দিষ্ট করিয়া সেই হিসাবে পরবর্তী নামায পড়িতে ও সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে এবং এই ভুলের হিসাবে পরবর্তী নামায পড়িতে ও সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে এবং এই ভুলের নিমিত্ত আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদা দিতে হইবে। সাহু সিজদার এই ব্যবস্থার একটা প্রবল মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট। ইহা দ্বারা নামাযী আল্লাহ্র নিকট স্বীকার করে যে, হে আল্লাহ্! আমার ভুল হইয়াছে, আমি সে ভুল স্বীকার করিতেছি। স্বীকার করিতেছি এই ভুল হওয়া—নামাযে দাঁড়াইবার পরও মনের লক্ষ্য অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট হওয়া—আমার অপরাধ। সে অপরাধ তুমিই মার্জনা করিতে পার; কেননা এই ভুল তোমারই নিকটে হইয়াছে। কিন্তু আমি যেহেতু তোমারই বান্দা। সব ভুল অতিক্রম করিয়া আমি আবার তোমারই সমীপে অবনত হইতেছি।

কাযা নামায

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا اِلَّا ذٰلِكَ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ (بخارى، مسلم، ابو داؤد)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তনি বলিয়াছেনঃ যে লোক কোন নামায ভুলিয়া যাইব, সে যেন তাহা পড়ে যখনই উহা স্মরণ হইবে। সেইজন্য কোন কাফফারা দিতে হইবে না। শুধু উহাই পড়িতে হইবে। (কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে) 'নামায কায়েম কর আমার স্মরণের জন্য'। —বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা প্রত্যেক নামাযের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই নির্দিষ্ট সময়েই নির্দিষ্ট নামায আদায় করা পূর্ণ বয়স্ক মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য। কিন্তু মানুষ স্বাভাবতই দুর্বল। নানা কারণে অনেকের পক্ষেই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নামায পড়া কোন কোন সময় সম্ভব নাও হইতে পারে। নামায কাযা হইয়া যাইতে পারে। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার বিধান। ইবাদত-বন্দেগীর বিধান তিনি যে মানুষের জন্য দিয়াছেন, সেই মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা তিনি ভাল করিয়াই জানেন। সেই জন্য যথাসময়ে নির্দিষ্ট নামায কোন কারণে পড়া না হইলে কি করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—পরে নামায 'কাযা' করা—পড়া।

কোন মুসলমান ইচ্ছা করিয়া নামায পড়িবে না, ইহা ধারণাতীত ব্যাপার। তবে স্বাভাবিক কারণে বাদ পড়িয়াও যাইতে পারে। তন্মধ্যে একটি কারণ হইল নামাযের কথা ভুলিয়া যাওয়া। উপরিউক্ত হাদীসে এই ভুলিয়া যাওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইহার আর একটি কারণ হইল, নামাযের সময় ঘুমাইয়া থাকা এবং সেই কারণে যথাসময়ে নামায পড়িতে না পারা। হযরত কাতাদা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে সেই কথা বলা হইয়াছেঃ أَوْ نَامَ عَنْهَا কিংবা নামায না পড়িয়া ঘুমাইয়া থাকিলে—ঘুমাইয়া থাকার দরুন নামায না পড়িয়া থাকিলে ঘুম হইতে উঠিয়াই সেই নামায পড়িতে হইবে। মুসলিম শরীফেরই অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ -

তোমাদের কেহ যদি নামায না পড়িয়া ঘুমাইয়া থাকে, তবে যখন ঘুম হইতে জাগিবে, তখন কিংবা যদি বেখেয়াল হইয়া পড়ার দরুন নামায যথাসময়ে না পড়িয়া থাকে, তবে যখন উহার কথা স্মরণ হইবে, তখন তাহা পড়িবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ 'আমার কথা স্মরণ হইলেই নামায কায়েম কর।'

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা হইলঃ

أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا أَنْ يُّصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا -

কিংবা যদি নামায সম্পর্কে বেখেয়াল হইয়া থাকে, তাহা হাইলে উহার কাফফারা হইল-যখনই স্মরণ হইবে তখনই তাহা পড়িবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এইসব আয়াত ও হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, স্মরণ হওয়া মাত্রই কাযা নামায পড়িয়া ফেলিতে হইবে অথচ কাযা নামায পড়ার জন্য বিশাল সময় রহিয়াছে, যে কোন সময় পড়িলেই হয়। ইহার জওয়াব এই যে, উহার কথা যখন স্মরণ হইবে ও দীর্ঘ সময় এই স্মরণ জাগরূক থাকিবে, এই সময়ের মধ্যে যে কোন সময় উহা পড়িলেই আয়াত ও হাদীস অনুযায়ী কাজ হইবে। স্মরণ হইলে ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ও এক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়াই যে পড়িতে হইবে, শরীয়াত এমন কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নাই, একথা সত্য। তবে নামায 'কাযা' হইয়াছে—পড়া হয় নাই, একথা যদি স্মরণই না থাকে, তাহা হইলে উহা যে কখনই পড়া হইবে না ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কাজেই কুরআন ও হাদীসে যে এই স্মরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

'উহার জন্য কোন কাফফারা দিতে হইবে না—শুধু উহাই পড়িতে হইবে' কথাটির অর্থ হইল, নামায সময়মত পড়া হয় নাই কিংবা ঘুমাইয়া থাকার দরুন পড়া হয় নাই—এই অপরাধের জন্য কোন কাফফারা—কোন দান-খয়রাত দিতে হইবে না। বেশী নামাযও পড়িতে হইবে না। না-পড়া নামায পরে যে কোন সময় পড়িয়া ফেলিলেই এতদসংক্রান্ত যাবতীয় করণীয় সম্পন্ন হইয়া যাইবে। ইবরাহীম নখয়ী বলিয়াছেনঃ

مَنْ تَرَكَ صَلٰوةً وَاحِدَةً عِشْرِيْنَ سَنَةً لَمْ يَعُدْ اِلَّا تِلْكَ الصَّلٰوةَ الْوَاحِدَةَ ـ

যে লোক কোন এক নামায বিশ বছর পর্যন্ত পড়ে নাই, সেও সেই এক নামায ছাড়া আর কিছুই পড়িবে না।

এই হাদীস হইতে জানা যায়, ভুলিয়া যাওয়া কিংবা ঘুমের কারণে না পড়া নামায পড়িবার জন্য ইসলামে—কুরআন ও হাদীসে—বিশেষ তাকীদ রহিয়াছে। এইজন্য অবশ্য কোন গুনাহ হইবে না। সেই নামায সংখ্যায় বেশী হউক, কি কম হউক।

وَهٰذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً ـ

সমগ্র শরীয়াতবিদদের ইহাই মত এবং এই সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য বিদ্যমান।

আর যদি কেহ ইচ্ছা করিয়াও কোন নামায সময়মত না পড়ে, তবে তাহারও কাযা করা কর্তব্য। কোন বিষয়ে ওযরের কারণেও যদি নামায 'কাযা' হইয়া যায়, তবে সেই ওযর দূর হইয়া গেলে তাহা পড়িতে হইবে।

এই হাদীস হইতে এই কথাও স্পষ্ট হয় যে, নামাযে ক্ষতিটা কোন ধনমাল বা টাকা-পয়সা দ্বারা পূরণ হইতে পারে না—যেমন রোযার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। তবে যদি কাহারও অনেক নামায আদায় থাকিয়া যাওয়া অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়া যায় এবং উহার ফিদইয়া দেওয়ার জন্য সে অসীয়ত করিয়া গিয়া থাকে তবে তাহার কথা স্বতন্ত্র। এই ফিদইয়া দেওয়া না-জায়েয নয়। (عمدة القارى)

কাযা নামায পড়ার পরম্পরা

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ جَعَلَ عُمَرُ رض يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كِدْتُ اُصَلِّى الْعَصْرَ حَتّٰى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلّٰى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ (بخارى)

হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত উমর (রা) পড়িখা যুদ্ধের দিন কুরাইশ কাফিরদিগকে গালমন্দ বলিতে লাগিলেন এবং বলিলেনঃ হে রাসূলুল্লাহ! আমি আসরের নামায পড়িতে পারি নাই, ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়াছে। অতঃপর আমরা বুতহান উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। তখন হযরত উমর নামায পড়িলেন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর। তাহার পরই মাগরিব পড়িলেন। —বুখারী

ব্যাখ্যা এই হাদীসে হযরত উমর (রা)-এর আসরের নামায কাযা হইয়া যাওয়ার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা খন্দক বা পরিখা যুদ্ধকালীন ঘটনা। এই যুদ্ধ হিজরতের চতুর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন ঘোরতর যুদ্ধ চলে এবং মুসলিম বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া থাকে। এইভাবে আসরের নামায যথাসময়ে পড়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তখন হযরত উমর (রা) কুরাইশ কাফিরদের প্রতি গালমন্দ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেননা আসরের নামায সময়মত পড়িতে না পারা ও উহা কাযা হইয়া যাওয়ার একমাত্র কারণ তাহারাই। তখন নবী করীম (স)-কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন; ইয়া রাসূল! আমি আসরের নামায পড়িতে পারি নাই, ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়াছে। হযরত জাবির বর্ণিত ও বুখারী উদ্ধৃত অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ

وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا- আল্লাহ্‌র কসম! আমিও তো আসর পড়িতে পারি নাই।

অতঃপর মুজাহিদদের এই কাফেলা বুতহান নামক মদীনার এক উপত্যকায় উপনীত হয় এবং সেখানেই আসরের নামায হয়। এই দিন আসলে কত ওয়াক্ত নামায কাযা হইয়াছিল, এই বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। 'মুয়াত্তা' হাদীস গ্রন্থে বলা হইয়াছেঃ

إِنَّ الَّذِىْ فَاتَهُمُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ- এই দিন যুহর ও আসর—এই দুই নামাযই কাযা হইয়াছিল।

আর হযরত আবূ সাঈদ খুদরী বর্ণিত এই হাদীসে বলা হইয়াছে, যুহর, আসর ও মাগরিব—এই তিন ওয়াক্তের নামায কাযা হইয়াছিল। নাসায়ী উদ্ধৃত বর্ণনার ভাষা হইলঃ

حُبِسْنَا عَنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ -

আমরা এইদিন যুহর, আসর, মাগরিব ও এশা—এই চার ওয়াক্তের নামায হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

ইহারই সমর্থন পাওয়া যায় তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসে। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ

إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ -

পরিখা যুদ্ধের দিন মুশরিকরা নবী করীম (স) ও সাহাবীদিগকে চার ওয়াক্তের নামায পড়িতে দেয় নাই।

প্রথমোদ্ধৃত হাদীস হইতে জানা যায়, হযরত উমর (রা)-এর একার আসরের নামায কাযা হইয়া গিয়াছিল। সূর্যাস্তের পর তিনি প্রথমে আসর পড়িলেন ও পরে মাগরিব। আর অপর বর্ণনাটি হতে জানা যায়, রাসূলে করীম (স) সহ সব মুসলমানেরাই শুধু আসর কিংবা যুহর-আসর-মাগরিব-এশা এই কয় ওয়াক্তের নামায কাযা হইয়া গিয়াছিল এবং পরে বুতহান উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া সকলে জামা'আতের সহিত এই সব নামায একের পর এক আদায় করিলেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ

وَفِيْهِ مَا يَدُلُّ عَلٰى وُجُوْبِ التَّرْتِيْبِ بَيْنَ الصَّلٰوةِ الْوَقْتِيَّةِ وَالْفَائِتَةِ -

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, না-পড়া নামায ও উপস্থিত সময়ের নামায পরম্পরা সহকারে আদায় করা কর্তব্য।

অর্থাৎ প্রথমে না-পড়া নামায একের পর এক পড়িতে হইবে এবং তাহার পর পড়িবে উপস্থিত সময়ের নামায। হযরত উমর (রা) হইতে ইমাম বায়হাকী উদ্ধৃত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ যদি এমন হয় যে, কেহ কোন নামায ভুলবশত পড়ে নাই। পরবর্তী নামায ইমামের সঙ্গে পড়ার সময় সেই কথা তাহার স্মরণ হয়, তবে সে চলতি নামায সম্পূর্ণ করার পর সেই কাযা নমায পড়িবে। তাহার পর আবার সেই ওয়াক্তের নামায দুহ্‌রাইবে।

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلٰوةٌ -

যাহার কোন নামায না-পড়া রহিয়াছে উহা না পড়া পর্যন্ত পরবর্তী কোন নামায তাহার আদায় হইবে না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল অবশ্য এই হাদীসটির যথার্থতা অস্বীকার করিয়াছেন।

কসর নামায

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ اَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّتْ صَلٰوةُ الْحَضَرِ - (بخاری، مسلم، نسائی)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, সর্বপ্রথম ন্যামায দুই রাক্'আত করিয়া ফরয করা হইয়াছিল। পরে বিদেশ ভ্রমণকালীন নামায এই দুই রাক্'আত–ই বহাল রাখা হয় এবং ঘরে উপস্থিতকালীন নামায সম্পূর্ণ করা হয়। —বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী

ব্যাখ্যা নামাযের রাক্'আত নির্দিষ্ট হওয়ার ইহা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই হাদীস স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রত্যেক ওয়াক্তে প্রথমত দুই দুই রাক্'আত করিয়া ফরয করা হইয়াছিল। অবশ্য মাগরিবের নামায ইহার বাহিরে ছিল। উহা শুরুতেই তিন রাক্'আত নির্দিষ্ট হয়। পরে মাগরিব ও ফজর ছাড়া অবশিষ্ট তিন ওয়াক্তের নামায চার চার রাক্'আত করিয়া ফরয করিয়া দেওয়া হয়। এই হাদীস হইতে এই কথাও জানা যায় যে, অবস্থার পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ করা হইয়াছে। সফরকালে মাগরিব ছাড়া আর সব ফরয নামাযই দুই রাক্'আত করিয়া পড়িতে হয়। এই পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

كَانَ اَوَّلَ مَا افْتَرَضَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ اِلَّا الْمَغْرِبَ -

রাসূলে করীম (স)–এর প্রতি সর্বপ্রথম মাগরিব ছাড়া অন্যান্য নামায দুই–দুই রাক্'আত করিয়া ফরয করা হইয়াছিল।

রাক্'আত বৃদ্ধি করার ইতিহাস বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেনঃ

اِفْتَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ اِلَّا الْمَغْرِبَ فَلَمَّا هَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ زَادَ اِلٰى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ اِلَّا صَلٰوةَ الْغَدَاةِ - (بيهقى)

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে করীম (স)–এর প্রতি মক্কা শরীফে মাগরিব ছাড়া অন্যান্য সব নামায দুই–দুই রাক্'আত করিয়া ফরয করেন। পরে তিনি যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন ফজরের নামায ছাড়া অন্যান্য নামাযে দুই–দুই রাক্'আত করিয়া অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়া দেন।

দোলাবী বলিয়াছেন, হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছার এক মাস পরে রবীউসসানী মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিনগত রাত্রে যুহর নামাযের দুই রাক্'আতের সহিত আরও দুই রাক্'আত যোগ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। আর সফরকালীন নামায পূর্ব নির্ধারিত দুই রাক্'আতই বহাল রাখা হয়।

মহলব বলিয়াছেন, মাগরিবের নামায প্রথমেই এককভাবে তিন রাক্'আত ফরয করা হইয়াছিল।

এইসব হাদীসের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সফরকালে মূলত দুই রাক্'আত নামাযই ফরয। এই সময় দুই রাক্'আতের পরিবর্তে চার রাক্'আত পড়া কাহারও পক্ষে জায়েয হইতে পারে না—চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে অকাট্য ভঙ্গীতে

বলিয়াছেন, মুসাফিরের জন্য মাত্র দুই রাক্'আত নামাযই ফরয। আর যে কয় রাক্'আত ফরয তাহাই তো পড়া যাইতে পারে। উহার বেশীও নয় কমও নয়। নিজের ঘরেও নিজের দেশে উপস্থিত ব্যক্তির জন্য যেমন চার রাক্'আতের স্থানে পাঁচ রাক্'আত কিংবা তিন রাক্'আত পড়া জায়েয নয়—পড়িলে নামায হইবে না।; ঠিক তেমনি নিজের ঘরের বাহিরে বিদেশ গমনকারী ব্যক্তির জন্যও চার রাক্'আতের স্থানে দুই রাক্'আতের বেশী পড়া জায়েয হইতে পারে না।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলিয়াছেনঃ

اَلصَّلٰوةُ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَايَصِحُّ غَيْرُهُمَا ـ

সফরকালে চার রাক্'আতের নামাযে মাত্র দুই রাক্'আত নামায। ইহার অন্যথা কিছুতেই সহীহ হইতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় এবং ইমাম মালিক এই রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম মালিক (রা) বলিয়াছেনঃ

مَنْ اَتَمَّ فِى السَّفَرِ اَعَادَ فِى الْوَقْتِ ـ

সফরকালে যে লোক পূর্ণ নামায পড়িবে (কসর করিবে না, দুই রাক্'আতের পরিবর্তে চার রাক্'আত পড়িবে), সে যেন যথাসময় উহা আবার ঠিকমত পড়িয়া লয়।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এই বক্তব্যই রাখিয়াছেন নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

صَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (نسائى)

তোমাদের নবীর (স) কথা অনুযায়ী সফরকালে দুই রাক্'আত নামাযই সম্পূর্ণ নামায, অসম্পূর্ণ নয়।

ইহারই সমর্থন পাওয়া যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কথায়। তিনি বলিয়াছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰى نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ـ (مسلم)

আল্লাহ তা'আলা নিজ বাড়ীতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তোমাদের নবীর (স) প্রতি চার রাক্'আত আর সফলকালে দুই রাক্'আত নামায ফরয করিয়াছেন।

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

صَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ كَفَرَ ـ (عمدة القارى)

সফরকালীন নামায দুই রাক্'আত। যে লোক এই নিয়ম তরক করিবে সে কুফরী করিবে।

ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য কতিপয় ফকীহ মত ব্যক্ত করিয়াছেনঃ

اِنَّهُ رُخْصَةٌ وَالتَّمَامُ اَفْضَلُ ـ

ইহা রিয়াত দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু পূর্ণ রাক্'আতের নামায পড়াই উত্তম

ইহারা হাদীসের فَرِضَتْ শব্দের অর্থ করিয়াছেন قُدِّرَتْ অর্থাৎ তাঁহারা বলেন, দুই রাক্'আত 'ফরয করা হয় নাই, পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে মাত্র।' আর ইহা অবশ্যই পালনীয় নয়। পালন না করিলে গুনাহ হইবে এমন কথাও নয়।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম লিখিয়াছেনঃ নবী করীম (স) যখনই সফরে বাহির হইয়া গিয়াছেন, সেই সময় হইতে পুনরায় মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার সময় পর্যন্ত চার রাক্'আতের স্থানে চিরকাল দুই রাক্'আতই পড়িয়াছেন। তিনি এই সময় কখনও চার রাক্'আত পড়িয়াছেন, তাহা কোন বর্ণনাসূত্রে প্রমাণিত হয় নাই। (عمدة القارى)

عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ رض قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ

(مسلم)

ইয়া'লা ইবনে উমাইয়্যা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে কুরআন মজীদের আয়াতঃ 'নামায কসর' করিলে তোমাদের কোন দোষ হইবে না। 'যদি তোমরা ভয় পাও যে, কাফিররা তোমাদিগকে বিপদে ফেলিবে' সম্পর্কে বলিলামঃ এখন তো লোকেরা সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হইয়াছে (এখন ইহার ব্যবহারিকতা কি?) তখন তিনি বলিলেন, তুমি যেরূপ বিস্ময় বোধ করিতেছ, আমিও এই আয়াত সম্পর্কে বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম। পরে আমি রাসূলে করীম (স)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি বলিয়াছেলেনঃ ইহা এমন একটি বিশেষ দান, যাহা আল্লাহ তা'আলাই তোমাদিগকে দিয়াছেনঃ অতএব তোমরা আল্লাহ্র এই দান গ্রহণ কর। —মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে কুরআন মজীদের যে আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তাহা এইঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۔ (النساء ١٠١)

তোমরা যখন সফরে বাহির হইবে তখন নামায 'কসর' করিলে তোমাদের কোন দোষ হইবে না যদি তোমরা ভয় পাও যে, কাফিররা তোমাদিগকে বিপদে ফেলিবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট শত্রু।

এই আয়াতটি 'কসর' নামাযের মূল ভিত্তি। কিন্তু ইহাতে নামায 'কসর' করার অর্থ চার রাক্'আতের স্থলে দুই রাক্'আত পড়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে একটি সুস্পষ্ট শর্তের ভিত্তিতে। শর্তটি হইলঃ 'যদি তোমরা ভয় পাও যে কাফিররা তোমাদিগকে বিপদে ফেলিবে'। ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে, কাফিরদের পক্ষ হইতে বিপদের কোন ভয় না থাকিলে নামাযের 'কসর' করার অনুমতি নাই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাধারণ বিদেশ সফর ব্যাপদেশে কোনরূপ ভয় ভীতি বা বিপদ কষ্ট ব্যতিরেকেই 'কসর' নামায পড়া হইতেছে। ইহার দরুন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। ইয়া'লা ইবনে উমাইয়্যা তাবেয়ী'র মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি ইহা নিরসনের জন্য হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে এই

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই জিজ্ঞাসার জওয়াবে তিনি বলিয়াছিলেনঃ তোমার ন্যায় আমার মনেও এইরূপ প্রশ্ন বা বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছিল। ইহার মীমাংসার জন্য আমি স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর সম্মুখে বিষয়টি পেশ করি। রাসূলে করীম (স) জওয়াবে শুধু এতটুকুই বলিলেনঃ সফরকালে 'কসর' নামাযের অনুমতিটা আল্লাহ্র এক বিশেষ অনুগ্রহ। অতএব তোমাদের প্রতি দেওয়া আল্লাহ্র এই অনুগ্রহ তোমাদের সাদরে ও সাগ্রহে গ্রহণ করা উচিত।

রাসূলে করীম (স)-এর এই জওয়াব হইতে দুইটি কথা জানা যায়। একটি এই যে, নিরাপদকালীন সফরকালে 'কসর' নামায পড়ার অনুমতি উদ্ধৃত আয়াত হইতে প্রমাণিত নয়। কেননা আয়াতে তো এই অনুমতি শর্তহীন, শর্তভিত্তিক নয়। কাজেই ভয়-ভীতিহীন সময়ের সফরে নামায 'কসর' করা কুরআন হইতে প্রমাণিত, এই কথা কিছুতেই বলা যায় না।

বরং বলিতে হইবে যে উহা রাসূলে সুন্নাত—রাসূলের অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রম হইতে প্রমাণিত। এই কারণে ইমাম শাফেয়ী (র) বলিয়াছেনঃ

اَلْقَصْرُ فِىْ غَيْرِ الْخَوْفِ بِالسُّنَّةِ وَاَمَّا فِى الْخَوْفِ مَعَ السَّفَرِ فَبِالْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ ـ (تفسير القرطبى)

ভয়-ভীতিমুক্ত সফরকালে নামায 'কসর' করা রাসূলের সুন্নাত হইতে প্রমাণিত (কুরআন হইতে নয়); আর ভয়-ভীতি সংকুল সফরে 'কসর' নামায কুরআন ও সুন্নাত উভয় দলীলের দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলঃ আমরা কুরআনে ভয়কালীন নামাযের কথা ও নিজ বাড়ীতে উপস্থিত থাকাকালীন নামাযের কথা পাই। কিন্তু সফরকালীন নামাযের কথা পাই না। ইহার কারণ কি? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলিলেনঃ

يَا ابْنَ اَخِىْ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ اِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَاِنَّا نَفْعَلُ كَمَا رَاَيْنَاهُ يَفْعَلُ ـ (موطا امام مالك)

হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আমাদের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন—আমরা কিছুই জানিতাম না। কাজেই আমরা তাঁহাকে যেভাবে যাহা করিতে দেখি আমরা তাহাই সেইভাবে করি।

এই হাদীস অনুযায়ীও ভয়হীন সফরকালের কসর নামায রাসূলের 'সুন্নাত' হইতে প্রমাণিত, কুরআনে উহার উল্লেখ নাই।

হযরত উমরের বর্ণিত যে হাদীসটি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দ্বিতীয় কথাটি জানা যায়। কসর-সংক্রান্ত আয়াতটি সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ভয়মুক্ত সফরকালীন 'কসর' নামায সেই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত সে দাবি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেনঃ ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহের দান। ইহা হইতে বুঝা যায়ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ يُبِيْحُ الشَّئَ فِىْ كِتَابِهٖ بِشَرْطٍ ثُمَّ يُبِيْحُ ذٰلِكَ الشَّئَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ مِنْ غَيْرِ ذٰلِكَ الشَّرْطِ ـ (تفسير القرطبى)

আল্লাহ্ তা'আলা একটি কাজ কুরআনে মুবাহ বা জায়েয করেন শর্তাধীন। পরে তাঁহার নবীর মুখের কথার মাধ্যমে উহাকেই মুবাহ করেন সেই শর্ত ব্যাতিরেকেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এক প্রশ্নের জওয়াবে এই 'কসর' নামাযকে سنة ابى القاسم 'নবী করীমের সুন্নাত' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সফরকালে নামায 'কসর' করা সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন হইল, এই সফর কতটা দূরের হইতে হইবে? নিজের বাড়ী হইতে কতটা দূরে যাওয়ার জন্য বাহির হইলে নামায কসর করা জায়েয হইবে?

ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াযীদ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ اَمْيَالٍ اَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - (مسلم)

রাসূলে করীম (স) যখন তিন মাইল কিংবা তিন ফরসখ পথ চলিয়া যাইতেন, (শু'বা জনৈক বর্ণনাকারী; তাঁহার মনে এ বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে) তখন তিনি চার রাক্'আতের স্থলে দুই রাক্'আত পড়িতেন। —মুসলিম

এই হাদীসটিতে 'তিন মাইল' কি 'তিন ফরসখ'[১] বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে বিধায় ইহার ভিত্তিতে দূরত্বের বিশেষ কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করা যায় না। হযরত আনাস (রা) সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তিনি পনেরো মাইল পথের দূরত্বের জন্য সফরে বাহির হইলে 'কসর' করিতেন। হযরত আলী (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি 'নখলিস্তান' নামক স্থানে গমন করিয়াছেন এবং সেখানে তিনি যুহর নামায দুই রাক্'আত পড়াইয়াছেন। আবার সেই দিনই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেনঃ

আমি মক্কা হইতে আরফা' ময়দানে গেলেও 'কসর' নামায পড়ি। (معالم السنن)

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে উমর (রা) ৪৮ মাইল পথের সফরে 'কসর' নামায পড়িতেন ও রোযা ভাঙ্গিতেন। —বুখারী

দাউদ যাহেরী বলিয়াছেনঃ

تُقْصَرُ فِىْ كُلِّ سَفَرٍ طَوِيْلٍ اَوْقَصِيْرٍ -

সব রকমের সফরেই 'কসর' পড়া যাইবে, তাহা ছোট হউক কি দীর্ঘ হউক। —তফসীরে কুরতুবী

ইহা হইতে স্পষ্ট হয় যে, 'কসর' নামায পড়ার সফরের দূরত্ব সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের নিকট কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ বা পরিমাণ ছিল না। তাই মনে হয় দূরত্বটারও কথা নয়। যাহা সফর নামে অভিহিত হইতে পারে তাহাতেই 'কসর' করা যাইবে। ইমাম ইবনে কায়্যিম এবং বর্তমান কালের প্রখ্যাত ও বিশেষজ্ঞ আলিমদের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। (فقه السنة)

জানাযার নামায

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا - (بخارى، ترمذى، مسلم، نسائى، ابن ماجه، ابوداؤد)

---

১. 'ফরখস' অর্থ তিন মাইল কিংবা বারো হাজার গজ। ইহা প্রায় আট কিলোমিটার দীর্ঘ। (المنجد)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) নাজাশীর মৃত্যুসংবাদ পাইলেন ও লোকদিগকে জানাইলেন, যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। পরে নবী করীম (স) নামায পড়ার স্থানে বাহির হইয়া আসিলেন। অতঃপর লোকদের কাতারবন্দী করিলেন এবং চার তাকবীর বলিলেন। —বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা প্রখ্যাত সিহাহ্ সিত্তা—ছয়খানি প্রধান সহীহ্ হাদীসগ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে। বুখারী শরীফে ইহা দুইটি স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে হাদীসটির গুরুত্ব সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

নাজাশী আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার নাম আস্হামা কিংবা আস্মাখা অথবা সাহমা। আবিসিনীয় ভাষায় ইহার অর্থ 'দান'। সেই দেশের সর্বোচ্চ শাসককে 'নাজাশী' নামে অভিহিত করা হইত, যেমন বর্তমান কালে প্রেসিডেন্ট বা প্রধান মন্ত্রী বলা হয়। ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ লিখিয়াছেন, নবী করীম (স) ষষ্ঠ হিজরী সনে হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর সপ্তম হিজরীর মুহররম মাসে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া আজ-জামারী (রা)-কে চিঠিসহ নাজাশীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনি উহা হাতে লইয়া চোখের উপর রাখিলেন, সিংহাসন হইতে নামিয়া মটিতে বসিলেন এবং চিঠির উত্তর পাঠাইলেন। তিনি হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবম হিজরী সনের রজব মাসে তাবুক যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসার পর তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ আসে এবং নবী করীম (স) তখন সাহাবাদের সঙ্গে লইয়া তাঁহার জন্য গায়েবানা জানাযার নামায পড়েন।

এই হাদীস হইতে জানা গেল, নাজাশীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নবী করীম (স) ইহা সাধারণ্যে প্রচার করেন। অতএব কাহারও মৃত্যুসংবাদ সাধারণ্যে প্রচার করা নাজায়েয নয়! কেননা ইহার ফলেই আত্মীয় অনাত্মীয়, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী লোকদের পক্ষে জানাযার নামাযে শরীক হওয়া সম্ভবপর হয় এবং ইহার দরুন জানাযার নামাযে লোকসংখ্যার আধিক্য হইতে পারে। আর ইহা খুবই কল্যাণকর। হযরত যায়দ ও হযরত জা'ফরের শাহাদত প্রাপ্তির সংবাদ নবী করীম (স) নিজেই সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। অবশ্য জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত মৃত্যুসংবাদ প্রচার-পদ্ধতি সাধারণভাবেই নিষিদ্ধ। কেননা উহাতে যেমনি বিলাপ করা হইত তেমনি চীৎকার করিয়া বলা হইতঃ আমরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছি, কেননা আমাদের অমুক লোকটি মরিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, অনেকের ধারণা ছিল, নাজাশী ইসলাম কবুল করেন নাই। নবী করীম (স) তাঁহার মৃত্যুর খবর প্রচার করিয়া ও সকলকে সঙ্গে লইয়া গায়েবানা জানাযার নামায পড়িয়া এই ধারণার অপনোদন করিলেন।

নবী করীম (স) নাজাশীর মৃত্যুসংবাদ যখন পাইয়াছিলেন তখন তিনি মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া মসজিদের বাহিরে চলিয়া গেলেন ও বাহিরেই জানাযার নামায পড়িলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে জানাযার নামায জায়েয নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রা) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম মালিক ও ইবনে আবূ যিব'ও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ও আবূ সওর প্রমুখ ফিকাহবিদ বলিয়াছেন, মসজিদে লাশ লাইয়া আসিলে তাহাতে যদি কোনরূপ মালিন্য ও আবর্জনা সৃষ্টির কারণ না ঘটে তাহা হইলে মসজিদে জানাযার নামায পড়ার কোন দোষ নাই। ইহাদের দলীল হইল একটি বর্ণনা। তাহাতে বলা হইয়াছে, হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) ইন্তেকালে করিলে হযরত আয়েশা (রা) লাশ মসজিদে লইয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন এবং সেখানেই জানাযার নামায পড়া হইল। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মসজিদের ভিতরে জানাযার নামায পড়ায় লোকেরা কি কিছু আপত্তি জানাইয়াছেন? তাঁহাকে বলা হইল হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেনঃ

مَا اَسْرَعَ مَا نَسُوْا مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى جَنَازَةِ سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ اِلَّا فِى الْمَسْجِدِ

স্বয়ং নবী করীম (স) হযরত সুহাইল ইবনুল বাইদা'র জানাযার নামায মসজিদেই পড়িয়াছিলেন, এই কথা লোকেরা এত শীঘ্র ভুলিয়া গেল কি করিয়া ---?

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে জানাযার নামায স্বয়ং নবী করীম (স) পড়িয়াছেন এবং পরবর্তীকালে হযরত আয়েশা (রা)–ও তদনুসারে ও উহারই দলীলের ভিত্তিতে এই কাজ করিয়াছেন।

অন্য পক্ষ হইতে তাঁহাদের মতের সমর্থনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত আরও একটি হাদীস পেশ করা হয়। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ صَلّٰى عَلٰى مَيِّتٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا شَىْءَ لَهٗ ـ (ابوداؤد)

যে লোক মসজিদে জানাযার নামায পড়ে, তাঁহার জন্য কিছুই নাই।

ইবনে মাজাহ্র বর্ণনায় ইহার ভাষা ইহলঃ · فَلَيْسَ لَهٗ شَىْءٌ · অর্থ একই। আর ইবনে আবূ শায়বার বর্ণনার ভাষা হইল। · فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ · তাহার নামায নাই—হয়না।

জায়েয ও নাজায়েয প্রমাণকারী এই দলীলদ্বয়ের দ্বন্দ্ব চূড়ান্তভাবে মীমাংসার উদ্দেশ্যে ইমাম তাহাভী বলিয়াছেন, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে তাহা জানিতে হইবে। তাহাতে পরেরটি দ্বারা আগেরটি বাতিল হইয়া যাইবে। হযরত আয়েশা বিশুদ্ধ হাদীস নবী করীম (স)–এর একটা আমলের বর্ণনা দিয়াছেন এবং জানা গিয়াছে যে, উহা মুবাহ—নাজায়েয নয়। এ পর্যায়ে ইহার পূর্বে আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করে যে, নবী করীম (স) এই কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ এই নিষেধের পূর্বে ইহার অনুমতি ছিল। ফলে রাসূলের এই নিষেধে হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসের অনুমতি বাতিল হইয়া গেল। উপরন্তু হযরত আয়েশার কাজ সাহাবায়ে কিরাম সমর্থন করেন নাই বলিয়া এই নিষেধটি আরও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। আর একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টির ইসলামী নীতিসম্মত পন্থা ইহাই হইতে পারে।

এই হাদীস হইতে তৃতীয়ত জানা যায়, জানাযার নামাযেও অন্যান্য নামাযের ন্যায় নামাযীদের কাতার বাঁধিতে হইবে। ইহা সুন্নাত। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ اَوْجَبَ ـ (ترمذى عن ابى هريرة)

যে লোকের জানাযা নামায তিন কাতারের নামাযীরা পড়ে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়।

চতুর্থ, এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, গায়েবানা জানাযা পড়া জায়েয। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম নববী বলিয়াছেনঃ 'মাইয়্যেত যে শহরের বা যে গ্রামের, সেই শহর বা গ্রাম—অর্থাৎ কাছাকাছি এলাকার লোকদের জন্য গায়েবানা জানাযা জায়েয নয়। কিন্তু এই পর্যায়ে একটা বড় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তাহা এই যে, রাসূলে করীম (স) নিজেই যখন শরীয়াতের কোন আমল করিয়াছেন, তখন উহা নাজায়েয হইবে কেন? ইহাতে তো রাসূলের অনুসরণ করা এবং সেই কাজকে কোনরূপ খারাপ মনে না করাই কর্তব্য। আর সেই কাজটি কেবলমাত্র রাসূলের জন্য জায়েয ছিল, অন্য কাহারও জন্য জায়েয নয়, এইরূপ বলারও কোন দলীর নাই।

পঞ্চম, জানাযার নামাযে চারিটি তাকবীর। আলোচ্য হাদীস হইতে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। নবী করীম (স) শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। শিয়া মাযহাবে পাঁচটি তাকবীর স্বীকৃত। ইমাম আহমদ বলিয়াছেন, তাকবীর চারটির কম হওয়া উচিত নয়।

ইমাম বুখারী (র) 'জানাযা' পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা এইঃ (১) 'জানাযা'র নামায অন্যান্য নামাযের মতই নামায। কেননা নবী করীম (স) ইহাকে নামায বলিয়াছেন।

একটি হাদীসঃ

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ - যে লোক জানাযার উপর নামায পড়ে --।

দ্বিতীয় হাদীসঃ

صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ - তোমাদের মৃত সঙ্গীর উপর নামায পড়।

তৃতীয় হাদীসঃ

صَلُّوْا عَلَى النَّجَاشِىْ - নাজাশীর উপর নামায পড়।

এই সব কয়টি হাদীসেই জানাযার নামাযকে নবী করীম (স) 'নামায' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বুখারী মন্তব্য হইলঃ

سَمَّاهَا صَلٰوةً لَيْسَ فِيْهَا رُكُوْعٌ وَلَا سُجُوْدٌ -

নবী করীম (স) ইহাকে নামায বলিয়াছেন। অথচ ইহাতে রুকূ ও সিজদা নাই।

অতএব এই 'নামায' পড়াকালে কথাবার্তা বলা যাইবে না। ইহাতে তাকবীর আছে, সালাম ফিরাইয়া নামায শেষ করার ব্যবস্থাও আছে— যেমন সাধারণ নামাযে রহিয়াছে। পরন্তু জানাযার নামায বিনা অযূতে পাড় যায় না। এই ব্যাপারে প্রাচীনকালের ও পরবর্তীকালের সকল ফিকাহবিদই সম্পূর্ণ একমত। আর সাধারণ নামাযের ন্যায় সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তকালে জানাযার নামায পড়া যায় না। ইহাতে হাত তুলিয়া (رفع اليدين) তাহরীমা বাঁধিতে হয় সাধারণ নামাযের মতই। হযরত উক্‌বা ইবনে আমের (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهَا وَنَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ - (مسلم، ترمذى، ابوداؤد)

তিনটি সময়ে (জানাযার) নামায পড়িতে ও আমাদের মৃতদের দাফন করিতে নবী করীম (স) নিষেধ করিতেন। তাহা হইলঃ সূর্যোদয় কাল—যতক্ষণ না সূর্য উপরে উঠিয়া যায়, ঠিক দ্বিপ্রহর কাল—যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়ে এবং সূর্য যখন অস্ত যাইতে থাকে—যতক্ষণ না পূর্ণমাত্রায় অস্তে চলিয়া যায়। —মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ

অবশ্য ইমাম শাফেয়ী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নামায মাকরুহ হওয়ার এই তিনটি সময়ে জানাযার নামায পড়ায় কোন দোষ নাই।

জানাযার নামাযে হাত তুলিয়া তাকবীর বলা কেবলমাত্র শুরুতেই তাহরীমা বাঁধিবার সময় করিতে হয়। পরবর্তী তাকবীরসমূহ বলার সময় হাত তুলিতে হয় না। এই সময়ে হাত তুলিবার সমর্থনে কোন অকাট্য দলীল বা ইজমা'র উল্লেখ করা যায় না। (عمدة القارى)

জানাযার নামায ও দাফনে শরীক হওয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا وَكَانَ

مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ـ (بخاری، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্নিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক কোন মুসলমানের জানাযার সহিত ঈমান ও সচেতনতা সহকারে চলিবে এবং তাহার উপর জানাযার নামায পড়া ও তাহাকে দাফন করা পর্যন্ত তাহার সঙ্গে থাকিবে, সে দুই 'কীরাত' সওয়াব লাইয়া ফিরিয়া আসিবে। একটি 'কীরাত' ওহুদ পাহাড়ের মত বড়। আর যে জানাযার নামায পড়িয়া উহার দাফনের পূর্বেই চলিয়া আসিবে, সে এক 'কীরাত' পরিমাণ সওয়াব লইয়া ফিরিয়া আসিবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে মুসলমানের জানাযার নামায পড়া ও দাফন কার্যে শরীক হওয়ার বিরাট সওয়াবের কথা জানা যায়। একজন মুসলমানের মৃত্যু ঘটিলে অন্যান্য মুসলমান হয় ঘটনাস্থলে যাইবে,গোসল ও কাফন পরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে এবং জানাযার নামাযে শরীক হইয়াই চলিয়া যাইবে না; বরং কবরস্থান পর্যন্ত গমন করিবে ও দাফন কার্যে শরীক ও উপস্থিত থাকিবে। নতুবা জানাযার নামায পড়িয়াই ফিরিয়া আসিবে। এই দুইটি কাজই নিজ নিজ পরিসরে জায়েয। তবে দুইটির মধ্যে সওয়াবের তারতম্য রহিয়াছে। প্রথম ধরনের কাজে—হাদীস অনুযায়ী—দুই 'কীরাত' পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হইবে। আর দ্বিতীয় ধরনের কাজে পাইবে মাত্র এক 'কীরাত' পরিমিত সওয়াব। 'কিরাত' কি, তাহার ব্যাখ্যা মূল হাদীসেই রহিয়াছে। বলা হইয়াছেঃ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ প্রত্যেকটি কিরাত ওহুদ পর্বত সমান।

ইহা কীরাত-এর শব্দার্থ নয়। কীরাত বলা হয় তদানীন্তন মুদ্রা দীনার-এর একটি অংশ— সাধারণভাবে প্রচলিত এক দীনার—এর এক—দশমাংশের অর্ধেক। আবার কোথাও চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। এক কথায় কীরাত অর্থ 'একটি বিরাট অংশ।' সওয়াব জিনিসটি অবস্তু, আর ওহুদ পর্বত বস্তু। অবস্তু সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে একটা মোটামুটি ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই রূপকের ব্যবহার। আর ওহুদ পর্বতের উল্লেখ এইজন্য যে, মদীনার আশেপাশের পর্বতগুলির মধ্যে ওহুদ পর্বতই সর্বোচ্চ ও প্রকাণ্ড। হাদীসের শব্দে إيمانا واحتسابا -এর তরজমা করা হইয়াছে 'ঈমান ও সচেতনতা সহকারে'। অর্থাৎ বর্ধিত সওয়াব পাওয়া যাইবে এই শর্তে যে, প্রথম আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি যথাযথ ঈমান থাকিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত এই কাজটি সওয়াব পাওয়ার নিয়্যতে ও উদ্দেশ্যে হইতে হইবে—লোক দেখানোভাবে কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তির বা শক্তির মনস্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্য হইলে চলিবে না। পত্রিকায় ছবি প্রকাশ বা সহৃদয় ব্যক্তিরূপে খ্যাতি অর্জনের মতলবে হইলে কোন সওয়াব পাওয়া যাইবে না। (المرقات)

জানাযা নামাযে চার তাকবীর

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى رض قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا عَلٰى جَنَازَةٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا ـ (مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন; হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) জানাযা নামাযে চারটি তাকবীর বলিতেন। কিন্তু কোন একটি জানাযার নামাযে তিনি পাঁচটি

তাকবীর বলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম। জবাবে তিনি বলিলেন, রাসূলে করীম (স) এই কয়টি তাকবীর বলিতেন। —মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে, হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) সাধারণত জানাযার নামাযে চারটি তাকবীরই বলিতেন; কিন্তু একবার পাঁচটি তাকবীর বলায় আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম; জবাবে তিনি বলিলেন, নবী করীম (স) এই পাঁচটি তাকবীরই বলিতেন।

ইবনে আবদুল বার তাঁহার الاستذكار গ্রন্থে একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ اَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتّٰى جَاءَ مَوْتُ النَّجَاشِىِّ فَخَرَجَ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا ثُمَّ ثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَرْبَعٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى -

নবী করীম (স) জানাযার নামাযে চার, পাঁচ, সাত, আট তাকবার বলিতেন। পরে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ আসিলে নবী করীম (স) বাহির হইয়া জানাযার নামায পড়িলেন ও তাহাতে চার তাকবীর বলিলেন। অতঃপর এই নিয়মের উপরই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল থাকিয়াছেন।

ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রথম দিকে জানাযার নামাযে চারটির অধিক তাকবীর বলিলেও নবী করীম (স)-এর শেষ ও স্থায়ী নিয়ম হইল চারটি তাকবীর বলা। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

صَلُّوْا عَلٰى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالدَّنِىِّ وَالْاَمِيْرِ اَرْبَعًا - (اوسط للطبرانى)

তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর জানাযার নামায পড় রাত্রদিনে। সে ছোট–বড়, নাচ ও ধনী যে-ই হউক—চার তাকবীর সহকারে।

জানাযার নামায পড়ার জন্য ইহা নবী করীম (স)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ। এই নির্দেশ পালন করা মুসলিম জনগণের কর্তব্য। ইহা ফরযে কিফায়া। এই নামাযের জন্য সময় নির্দিষ্ট নাই। দিন-রাত্র যখনই জানাযা আসবে, তখনই জানাযার নামায পড়িতে হইবে। মৃত ব্যক্তি ছোট হউক, বড় হউক, হীন-নীচ বংশের লোক হউক, কি উচ্চ বংশীয় ও ধনী লোকই হউক, তাহাতে কোন পার্থক্য করা যাইবে না। নির্বিশেষে সকল মৃত মুসলমান ব্যক্তির উপরই জানাযার নামায পড়িতে হইবে।

জানাযার নামায চার তাকবীরে সম্পূর্ণ করিতে হয়। ইহাই নবী করীম (স)-এর শেষ হিদায়ত।

ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেনঃ

وَاِلٰى مَشْرُوْعِيَّةِ الْاَرْبَعِ التَّكْبِيْرَاتِ فِى الْجَنَازَةِ ذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ -

জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর বলার বিধিব্যবস্থা হওয়াই সর্বসাধারণ ফিকাহ্‌বিদের মত।

ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেনঃ

اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ التَّكْبِيْرَ عَلَى الْجَنَازَةِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ -

রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবী ও অন্যান্য অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে জানাযা নামাযের ইহাই সঠিক নিয়ম। তাঁহারা সকলেই জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর দেওয়ার মত পোষণ করিতেন।

কাযী ইয়ায লিখিয়াছেনঃ জানাযার নামাযে তিন হইতে নয়টি তাকবীর দেওয়ার বিভিন্ন মত সাহাবীদের মধ্যে বর্তমান ছিল।

ইবনে আবদুল বার বলিয়াছেনঃ

وَانْعَقَدَ الْاِجْمَاعُ بَعْدَ ذٰلِكَ عَلٰى اَرْبَعٍ -

শেষ পর্যন্ত চারটি তাকবীর বলার উপরই তাঁহাদের ইজমা হইয়াছে।

সমস্ত ফিকাহ্‌বিদেরও এই মত। ইবনে আবূ লায়লা ছাড়া আর কেহই চারটির স্থলে পাঁচটি তাকবীর বলার কথা বলেন নাই। (نيل الاوطار)

জানাযার নামায পড়ার নিয়ম

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ السُّنَّةَ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَنْ يُّكَبِّرَ الْاِمَامُ ثُمَّ يَقْرَاُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى سِرًّا فِىْ نَفْسِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِى التَّكْبِيْرَاتِ وَلَا يَقْرَاُ فِىْ شَىْءٍ مِّنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِىْ نَفْسِهٖ - (مسند شافعى)

আবূ আমামা ইবনে সহল হইতে বর্ণিত, তাঁহাকে রাসূলে করীম (স)-এর একজন সাহাবী সংবাদ দিয়াছেন যে, জানাযার নিয়ম হইল, ইমাম তাকবীর বলিবে ও প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়িবে নিঃশব্দে ও মনে মনে। ইহার পর নবী করীম (স)-এর উপর দরূদ পড়িবে ও পরবর্তী তাকবীরসমূহ বলার পর মৃতের জন্য খালিস দোয়া করিবে। এই তাকবীরসমূহে অন্য কিছু পড়িবে না। পরে নিঃশব্দে ও মনে মনে সালাম করিবে। —মুসনাদে শাফেয়ী

ব্যাখ্যা এই হাদীসে জানাযার নামায পড়ার বিস্তারিত নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়া, দ্বিতীয় তাকবীরে রাসূলের প্রতি দরূদ পড়ার এবং তৃতীয় তাকবীরের পরে মৃতের জন্য খালিস দোয়া করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাকবীর ও শেষ সালাম ছাড়া সবই নিঃশব্দে ও মনে মনে পড়িতে বলা হইয়াছে।

জানাযার নামাযে কি কি পড়া হইবে এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) হইতে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাতে বিভিন্ন দোয়ার উল্লেখ হইয়াছে। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اِنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلٰى مَيِّتٍ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا - (مسند احمد)

তিনি (হযরত কাতাদাহ) রাসূলে করীম (স)-কে একজন মৃতের জানাযা নামায পড়িতে দেখিলেন। তিনি বলিয়াছেনঃ তখন আমি তাঁহাকে এই দোয়া পড়িতে শুনিলামঃ (উহার অর্থ) হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমাদের জীবিত লোকদের, আমাদের মৃত লোকদের, উপস্থিত লোকদের, অনুপস্থিত লোকদের, ছোট বয়স্কদের, বড় বয়স্কদের, আমাদের পুরুষদের ও আমাদের স্ত্রী লোকদের। —মুসনাদে আহমদ

আবূ সালমা'র বর্ণনায় দোয়ার পরবর্তী অংশ এইরূপঃ

مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ -

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাহাকে বাঁচাইয়া রাখ, তাহাকে ইসলামের উপর বাঁচাও এবং যাহাকে মৃত্যুদান কর, তাহাকে ঈমান সহকারে মারো।

এই হাদীসটির সব বর্ণনাকারী বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জানাযা নামাযের আরও দোয়া হযরত ইবনে আব্বাস, আবূ হুরায়রা, ইয়াযীদ ইবনে রুকানা ও ওয়াসিলা ইবনে আস্‌কা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ মূসা (রা) বলিয়াছেনঃ

صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى جَنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ -

আমরা নবী করীম (স)-এর সহিত ও তাঁহার ইমামতিতে জানাযার নামায পড়িয়াছি। তিনি নামাযের শেষে ডানে ও বামে সালাম ফিরাইয়াছেন।

ইহা হইতে জানা গেল যে, জানাযার নামাযের শেষে সাধারণ নামাযের মতই সালাম ফিরাইতে হয়। কিন্তু এই নামাযে রুকূ ও সিজদা নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কবরের উপর জানাযা নামায

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا قَالَ مَتٰى دُفِنَ هٰذَا - قَالَ الْبَارِحَةَ قَالَ اَفَلَا اٰذَنْتُمُوْنِيْ قَالُوْا دَفَنَّاهُ فِيْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا اَنْ نُوْقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ - (بخاری، مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) এমন একটি কবরের নিকট গমন করিলেন, যাহাতে রাত্রিকালে মূর্দার দাফন করা হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এই মূর্দার কবে দাফন করা হইয়াছে? লোকেরা বলিল, গত রাত্রে। তখন নবী করীম (স) বলিলেন। তোমরা আমাকে জানাও নাই কেন? তাহারা বলিলঃ আমরা ইহাকে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দাফন করিয়াছি। সেই সময় আপনাকে নিদ্রা হইতে সজাগ করাটা আমরা অপছন্দ করিয়াছিলাম। অতঃপর তিনি দাঁড়াইলেন, আমরাও তাঁহার পিছনে কাতার বাঁধিলাম। তখন নবী করীম (স) তাহার উপর জানাযার নামায পড়িলেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে কয়েকটি বিষয়ে শরীয়াতের নীতি জানা যায়। প্রথমত, জানা গেল, রাত্রিকালে মুর্দার দাফন করা জায়েয—তাহাতে কোন দোষ নাই। কেননা নবী করীম (স)-কে যখন বলা হইল, 'এই মুর্দার রাত্রিকালে, দাফন করা হইয়াছে, তখন তিনি এজন্য কোন আপত্তি জানান নাই বা এমন কোন কথা বলেন নাই, যাহা হইতে বুঝা যাইতে পারে যে, রাত্রিকালে মুর্দার দাফন করা জায়েয নহে। অবশ্য তাঁহাকে না জানাইয়া দাফন করার কারণে তিনি ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেনঃ 'তোমরা আমাকে জানাইয়া দাফন করিলে না কেন? দ্বিতীয় নীতি এই যে, দাফন করার পর কবরের উপর জানাযার নামায পড়া যায় এবং তৃতীয় এই যে, জানাযার নামায জামা'আতের সহিত পড়া অতীব উত্তম কাজ। আর এই কয়টি বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কেবলমাত্র ইমাম হাসান বসরী এই ক্ষেত্রে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং কতিপয় শাফেয়ী আলিম তাঁহার মতকে সমর্থন জানাইয়াছেন।

এই হাদীসটির মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাত্রিকালেই কোনরূপ ওযর না থাকা সত্ত্বেও লোকটিকে জানাযার নামায না পড়িয়াই দাফন করা হইয়াছিল বলিয়াই নবী করীম (স) লোকদিগকে তীব্র ভাষায় ধমকাইয়াছেন। এই ধমকানো রাত্রিকালে দাফন করার কারণে নয়, বরং জানাযার নামায না পড়িয়াই যদি মুর্দার দাফন করা হয়, তাহা হইলে পরে কবরের উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয, আলোচ্য হাদীস হইতে একথা প্রমাণিত। (المرقات)

রোযা

রমযান মাসের আগমন

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رض قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَّقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُّزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ ـ مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهٗ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهٖ وَعِتْقَ رَقَبَتِهٖ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهٖ شَىْءٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِّنْ مَّاءٍ وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ شَرْبَةً لَا يَظْمَاُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ وَّاَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ وَّاٰخِرُهٗ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَّمْلُوْكِهٖ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَاَعْتَقَهٗ مِنَ النَّارِ ـ

(بيهقي، في شعب الايمان)

হযরত সালমান ফররসী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) শাবান মাসের শেষ দিন আমাদের—সাহাবাদের—সম্বোধন করিয়া ভাষণ দেন। তাহাতে তিনি বলিলেনঃ জনগণ! এক মহাপবিত্র ও বরকতের মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে। এই মাসের একটি রাত বরকত ও ফযীলত—মাহাত্ম্য ও মর্যাদার দিক দিয়া সহস্র মাস অপেক্ষাও উত্তম। এই মাসের রোযা আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করিয়াছেন এবং ইহার রাত্রগুলিতে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়ানোকে নফল ইবাদতরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। যে লোক এই রাত্রে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও তাঁহার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন অ-ফরয ইবাদত—সুন্নাত বা নফল—আদায় করিবে, তাহাকে ইহার জন্য অন্যান্য সময়ের ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব দেওয়া হইবে। আর যে লোক এই মাসে ফরয আদায় করিবে, সে অন্যান্য সময়ের সত্তরটি ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব পাইবে।

ইহা সবর, ধৈর্য ও তিতিক্ষার মাস। আর সবরের প্রতিফল আল্লাহ্র নিকট জান্নাত পাওয়া যাইবে। ইহা পরস্পর সহৃদয়তা ও সৌজন্য প্রদর্শনের মহিমা। এই মাসে মুমিনের রিয্ক প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাইবে, তাহার ফলস্বরূপ তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে ও জাহান্নাম হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দান করা হইবে। আর তাহাকে আসল রোযাদারের সমান সওয়াব দেওয়া হইবে; কিন্তু সেজন্য আসল রোযাদারের সওয়াব কিছুমাত্র কম করা হইবে না। আমরা নিবেদন করিলাম, হে রাসূল! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই রোযাদারকে ইফতার করাইবার সামর্থ রাখে না। (এই দরিদ্র লোকেরা এই সওয়াব কিভাবে পাইতে পারে? তখন রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ যে লোক রোযাদারকে একটি খেজুর, দুধ বা এক গণ্ডুষ সাদা পানি দ্বারাও ইফতার করাইবে, সে লোককেও আল্লাহ্ তা'আলা এই সওয়াবই দান করিবেন। আর যে লোক একজন রোযাদারকে পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্ত করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আমার 'হাওয' হইতে এমন পানীয় পান করাইবেন, যাহার ফলে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে কখনো পিপাসার্ত হইবে না।

ইহা এমন এক মাস যে, ইহার প্রথম দশদিন রহমতের বারিধারায় পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় দশদিন ক্ষমা ও মার্জনার জন্য এবং শেষ দশদিন জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট।

আর যে লোক এই মাসে নিজের অধীন লোকদের শ্রম-মেহনত হাল্কা বা হ্রাস করিয়া দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা দান করিবেন এবং তাহাকে দোযখ হইতে নিষ্কৃতি ও মুক্তিদান করিবেন। —বায়হাকী-শুআবিল ঈমান

ব্যাখ্যা উপরোদ্ধৃত হাদীসটি হযরত রাসূলে করীম (স)-এর একটি দীর্ঘ ভাষণ। ভাষণটিতে রমযান মাস আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাকে এই মাসটির সম্বর্ধনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রমযান মুসলিম জাহানের জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসের আগমনে মুসলিম জীবন ও সমাজে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই দৃষ্টিতেই রাসূলে করীম (স)-এর এই মূল্যবান ভাষণটি বিবেচ্য।

ভাষণটি প্রাঞ্জল। ইহার তাৎপর্যের তেমন কোন জটিলতা নাই। ইহা সত্ত্বেও কয়েকটি অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করা আবশ্যক।

এই ভাষণে সর্বপ্রথম রমযান মাসকে 'একটি বিরাট মর্যাদাপূর্ণ মাস' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বস্তুত রমযান মাসের অপরিসীম গুরুত্ব কুরআন মজীদেও স্বীকৃত। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ইরশাদ করিয়াছেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ـ (البقرة: ١٨٥)

রমযান মাস এমন একটি মাস যে, এই মাসেই কুরআন মজীদ নাযিল হইয়াছে।

কুরআনের এই বাক্য হইতেই রমযান মাসের বিরাট মাহাত্ম্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই মাসে কেবল যে কুরআন শরীফ নাযিল হইয়াছে তাহাই নয়, অন্যান্য বহু আসমানী কিতাবও এই মাসেই অবতীর্ণ হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

نَزَلَتْ صُحُفُ اِبْرَاهِيْمَ اَوَّلَ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَاُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ وَالْاِنْجِيْلُ لِثَلَاثَ عَشَرَةَ وَالْقُرْاٰنُ لِاَرْبَعٍ عِشْرِيْنَ ـ (مسند احمد، الطبرانى)

হযরত ইবরাহীমের সহীফাসমূহ রমযান মাসের প্রথম রাত্রিতে নাযিল হইয়াছে। তওরাত কিতাব রমযানের ছয় তারিখ দিবাগত রাত্রে, ইনজীল এই মাসের তের তারিখে এবং কুরআন শরীফ রমযান মাসের চব্বিশ তারিখে নাযিল করা হইয়াছে।

বস্তুত আল্লাহ্র কিতাবসমূহ নাযিল হওয়ার সহিত রমযান মাসের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই কারণে এই মাসের রোযা থাকাও ফরয করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের পূর্বোদ্ধৃত আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বলা হইয়াছেঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

যে লোক এই মাসটি পাইবে, সে যেন অবশ্যই এই মাসের রোযা পালন করে।

এই আয়াত ও অপর একটি আয়াতে মুসলমানদের প্রতি রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় হিজরী সনের কথা। মুসলমানগণ ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও আল্লাহ্র হুকুম–আহকাম পালনে দৃঢ় এবং আল্লাহ্র আনুগত্যে অপরিসীম নিষ্ঠাবান হইয়া গড়িয়া উঠার পরই রোযার মত একটি কষ্টসাধ্য ফরয পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহাতে আল্লাহ্র বিজ্ঞানসম্মত কর্মনীতির মাহাত্ম্য স্পষ্ট হইয়া উঠে।

আলোচ্য হাদীসে রমযান মাসের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রথম যে কথাটি বলা হইয়াছে, তাহা হইলঃ 'এই মাসে এমন একটি রাত আসে, যাহা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম।' এই রাত্রিটি হইল 'কদর'–এর রাত্রি। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

(القدر ٣) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - 'কদর' রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম।

এক হাজার মাসে প্রায় ত্রিশ হাজার রাত্রি আসে। কদর রাত্রিটি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্নুগত্য ও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভেচ্ছু লোকেরা এই একটি মাত্র রাত্রিতে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের দূরত্ব এত সহজে অতিক্রম করিতে পারে যাহা অন্যান্য হাজার হাজার রাত্রিতেও সম্ভবপর হয় না। আধুনিক কালের দ্রুতগামী যান–বাহনের সাহায্যে এক ঘন্টার সময়ে এতটা পথ অতিক্রম করা যায়, যাহা প্রাচীনকালে শত শত রাত্রিতে অতিক্রম করা সম্ভব হইত। ইহা সর্বজনজ্ঞাত। অনুরূপভাবে 'কদর' রাত্রিতে আল্লাহ্র সন্তোষ ও তাঁহার নৈকট্য লাভ এতটা সহজ ও দ্রুত সম্ভব হয় যাহা সত্যানুসন্ধিৎসুরা শতশত মাসেও লাভ করিতে পারে না।

এই দৃষ্টিতে রাসূলে করীম (স)–এর এই কথাটির তাৎপর্যও অনুধাবনীয় যে, তিনি বলিয়াছেনঃ 'এই পবিত্র মাসে যে লোক কোনরূপ নফল ইবাদত করিবে, সে এই নফল ইবাদতে অন্যান্য সময়ের ফরয আদায়ের সমান সওয়াব লাভ করিবে।' আর এই মাসের একটি ফরয আদায় করার সওয়াব অন্যান্য সময়ের সত্তরটি ফরয আদায়ের সমান হইয়া থাকে। বস্তুত কদর রাত্রির বিশেষত্ব রমযান মাসের মাত্র একটি বিশেষ রাত্রির বিশেষত্ব হইলেও নেকআমলের সওয়াব সত্তর গুণ বেশী হওয়া রমযান মাসের প্রত্যেকটি দিন ও প্রত্যেকটি রাত্রির বরকত ও মর্যাদার ব্যাপার। ইহা যে কত বড় কথা, তাহা অবশ্যই অনুধাবনীয়।

রমযান মাসে কোন আমলের অধিক সওয়াব হওয়ার কথাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই মাস শুরু হইতে শেষ হওয়া পর্যন্ত যে লোক যে নেক–আমলই করুণ–না কেন, তাহা কেবল এই সময়ের মধ্যে হওয়ার কারণেই বহু বেশী ও বড় সওয়াব লাভের অধিকারী হইয়া গেল—এই কথা এখানে বলা হয় নাই এবং যাহা বলা হইয়াছে তাহার মূল তাৎপর্যও ইহা নয়। আসল কথা হইল, একটি আমল—তাহা যে সময়ই করা হউক না কেন, উহার বাহ্যরূপ সর্বাবস্থায় একই থাকে। কিন্তু কোন্ মন ও কোন্ ধরনের ভাবধারা লইয়া সেই কাজটা করা হইয়াছে, এই দৃষ্টিতে উক্তকালের মূল্যমানে অনেক বেশী পার্থক্য হইয়া যায়। কোন আমল করার সময়

আমলকারীর অন্তরে যে ধরনের ভাবধারার সৃষ্টি হয় তাহাই উহার মূল্য হ্রাস করিয়া দেয়, আবার উর্ধ্ব হইতেও উর্ধ্বতর পর্যায়ে লইয়া যায়। অন্য কথায়, রোযার মাস মনের আর্দ্রতা লাভ, মন নরম, বিনয়ী ও আনুগত্যের ভাবধারায় পূর্ণ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মৌসুম। এই সময়ে যে আধ্যাত্মিক ভাবধারা জাগ্রত হয়, উহার ফলে লোকদের প্রত্যেকটি আমলে অধিকতর আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্নুগত্যের ভাবধারা জাগিয়া উঠে। ফলে এই মাসে কৃত আমলসমূহ গুণগত দিক দিয়া অনেক বৃদ্ধি পাইয়া যায় এবং অন্যান্য মাসে কৃত এই একইকালের তুলনায় এই মাসে অনেক বেশী সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হইয়া যায়।

এই ভাষণে রমযান মাস সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ 'এই মাস সবর-এর মাস'। অর্থাৎ এই মাসের করণীয়-রোযা পালন-'সবর' অর্থাৎ ধৈর্য, সহনশীলতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাস। বস্তুত 'সবর' না হইলে রোযা পালন কিছুতেই সম্ভব নয়। লোভ সংবরণ না করিলে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার হইতে নিজেকে বিরত রাখা অসম্ভব। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্য না থাকিলে ক্ষুৎ-পিপাসার জ্বালা-যন্ত্রণা কেহই সহিতে পারে না। অনুরূপভাবে এই মাসের একটানা দীর্ঘ সময়ের রোযা পালন মানুষকে ধৈর্য শিক্ষা দেয়, সহনশীলতার গুণ উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে। ক্ষুৎ-পিপাসা মানুষকে কতখানি কষ্ট দেয় তাহা রোযা পালনের মাধ্যমে হাড়ে হাড়ে অনুভব করা যায়। সমাজের সাধারণ দরিদ্র লোকদিগকে যে কি কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করিতে হয়, সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাওয়া যায় রোযা রাখার মাধ্যমে। ফলে দরিদ্র ও ক্ষুধা-কাতর মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সহৃদয়তা জাগ্রত হওয়া রোযা পালনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। রোযার সামাজিক কল্যাণের ইহা একটি দিক মাত্র।

'এই বরকতের মাসে ঈমানদার লোকদের রিযক বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়-রাসূলে করীম (স) একথা ঘোষণা করিয়াছেন। বস্তুত রিযক দান একা আল্লাহ্র নিজস্ব ক্ষমতা-ইখ্তিয়ারেরব্যাপার। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَاللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ - (الرعد ٢٦) আল্লাহ্ যাহার ইচ্ছা রিযক প্রশস্ত করিয়া দেন।

কাজেই তিনি যদি কাহারও রিযক প্রশস্ত করিয়া দেন, তবে তাহাতে বাধাদানের ক্ষমতা কাহারও থাকিতে পারে না। আর এটা যে একটা প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-পর্যায়ের তাহাও নিঃসন্দেহ। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এই কথার সত্যতা যাচাই করিতে পারেন। বস্তুত রোযার মাসে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যতটা প্রশস্ততা আসে, ততটা অন্যান্য সময় কল্পনাও করা যায় না। এই মাসে একে অন্যকে উদারভাবে খাদ্যদান করে এবং একজন অপরজনের জন্য অকুণ্ঠভাবে অর্থ ব্যয় করে। ইহার ফলে সাধারণ সচ্ছলতা সর্বত্র পরিলক্ষত হইতে থাকে। আর গোটা সমাজও এই প্রাচুর্যে বিশেষভাবে লাভবান হয়। ইহা দ্বারা জনগণকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ধন-সম্পদ আটক ও পুঞ্জীভূত করিয়া না রাখিয়া সমাজে যত ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া দেওয়া যাইবে, উহার সাধারণ কল্যাণ ততই ব্যাপক হইবে এবং প্রত্যেকের সচ্ছলতাও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইবে। আল্লাহ্রই সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে রোযা পালনকারীদের প্রতি ইহা যে তাহার একটা বিশেষ অনুগ্রহমূলক ব্যবস্থা, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

ভাষণটি শেষভাগে বলা হইয়াছেঃ রমযান মাসের প্রাথমিক অংশ রহমতে পরিপূর্ণ। মধ্যম অংশ মাগফিরাত লাভের বিরাট অবকাশ এবং তৃতীয় অংশ জাহান্নাম হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়। ইহা হইতে স্পষ্ট হয় যে, তিনটি অংশের প্রত্যেকটি-পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশ হইতে অনেক বৃদ্ধিপূর্ণ।

এই কথাটির মোটামুটি তাৎপর্য এই হইতে পারে যে, রমযান মাসের বরকত ও ফযীলত লাভেচ্ছু লোক তিন প্রকারের হইতে পারে। এক শ্রেণীর লোক, যাহারা স্বতঃই তাকওয়া-পরহেজগারী সম্পন্ন

এবং গুনাহ্-খাতা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রতি মুহূর্ত যত্নবান হইয়া থাকে। তাহারা কোন ভুলত্রুটি করিলে চেতনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তওবা ইস্তিগফার করিয়া নিজেদেরকে সংশোধন ও ত্রুটিমুক্ত করিয়া লয়। এই ধরনের লোকদের প্রতি রমযান মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রমযানের প্রথম রাত্রিতেই রহমতের বারিবর্ষন শুরু হইয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেইসব লোক, যাহারা প্রথম শ্রেণীর লোকদের মত উচ্চমানের তাকওয়া-পরহেজগারী সম্পন্ন না হইলেও একেবারে খারাপ লোক নয়, তাহারা রমযান মাসের প্রথম ভাগে রোযা পালন, তওবা-ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য নেক-আমলের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থা উন্নত এবং নিজদিগকে আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাত পাওয়ার যোগ্য করিয়া লয়। তখন এই মাসের মধ্যম অংশে ইহাদেরও ক্ষমা করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে সেইসব লোক, যাহারা সাধারণত গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকে এবং নিজেদের অব্যাহত পাপ কার্যের দরুন জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহারাও যখন রমযান মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে অন্যান্য মুসলমানের সঙ্গে রোযা রাখিয়া, তওবা ইস্তিগফার করিয়া নিজেদের পাপ মোচন করাইয়া লয়, তখন শেষ দশদিনে—আল্লাহ্র রহমত যখন সর্বাত্মক হইয়া বর্ষিত হয়—তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত করা হয়।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী রমযান মাসের প্রথমাংশের রহমত, দ্বিতীয়াংশের মাগফিরাত এবং শেষাংশের জাহান্নাম হইতে মুক্তিলাভ উপরোল্লিখিত লোকদের সহিতই সংশ্লিষ্ট জানিতে হইবে।

(تفسير القرطبى- معارف الحديث)

কিন্তু ইহার একটি ক্রমিক তাৎপর্যও রহিয়াছে। রোযার বরকত মাস শুরু হইতেই সূচিত হয়। কিন্তু মানুষ যখন এই ট্রেনিং কোর্সের প্রথম দশ দিন-রাত ক্রমাগত অতিবাহিত করিয়া পরবর্তী দশকে উপনীত হয়, তখন সে সেই লোক থাকে না যাহা মাস শুরু হওয়ার সময় ছিল। বরং তখন তাহার মধ্যে মুমিন সুলভ মহৎ গুণাবলী পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়া যায়। ইহার পর দ্বিতীয় দশ দিন-রাতের ট্রেনিং তাহার এই গুণাবলী অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়া তোলে এবং তৃতীয় দশকে সে এক অধিক উন্নত গুণাবলী ভূষিত মু'মিনরূপে অনুপ্রবেশ করে। ইহার পর সে যখন এই মহা বরকতের মাসের তৃতীয় দশকের ট্রেনিংও পূর্ণ করিয়া লয়, তখন তাহার নফস সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইয়া যায় একং সে ঈমানের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে, যেখানে পৌঁছার পর জাহান্নামের আগুন তাহার জন্য হারাম হইয়া যায়।

এই মাসের চারটি কাজ গুরুত্ব সহকারে করা আবশ্যক—আল্লাহ্র ইলাহ্, তৌহীদ ও মা'বুদ (দাস) হওয়ার কথা বারবার স্বীকার ও ঘোষণা করা, তাঁহার নিকট ক্ষমা ও মাগফিরাতের প্রার্থনা করা, জান্নাত পাওয়ার জন্য দোয়া করা এবং জাহান্নাম হইতে বেশী বেশী পানা চাওয়া। অন্য কথায়, আল্লাহ্র আল্লাহ্ হওয়া ও উহার মুকাবিলায় নিজের বান্দা হওয়ার অনুভূতি বেশী হওয়া এবং নিজের জীবনের সমস্যাবলী বারবার আল্লাহ্র সামনে পেশ করা আবশ্যক।

রমযান মাসের মাহাত্ম্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ ـ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ـ

(نسائى، مسند احمد، بيهقى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমাদের নিকট রমযান মাস সমুপস্থিত। ইহা এক অত্যন্ত বরকতময় মাস। আল্লাহ্ তা'আলা এই মাসে রোযা তোমাদের প্রতি ফরয করিয়াছেন। এই মাসে আকাশের দুয়ারসমূহ উম্মুক্ত হইয়া যায়, এই মাসে জাহান্নামের দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং এই মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলি আটক করিয়া রাখা হয়। আল্লাহ্রই জন্য এই মাসে একটি রাত আছে, যাহা হাজার মাসের অপেক্ষাও অনেক উত্তম। যে লোক এই রাত্রির মহাকল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি। —নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা এই হাদীস হযরত সালমান (রা) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের মতই রমযান মাসের অসীম মাহাত্ম্যের কথা জানাইতেছে। এ পর্যায়ে 'রমযান' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রথমে আলোচিতব্য।

'রমযান' (رَمَضَانٌ) رَمَضَ হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ 'দহন', 'জ্বলন।' রোযা রাখার দরুন ক্ষুৎ-পিপাসার তীব্রতায় রোযাদারের পেট জ্বলিতে থাকে। এই অবস্থা বুঝাইবার জন্য আরবী ভাষায় বলা হয় اَلصَّائِمُ يَرْمَضُ 'রোযাদার দগ্ধ হয়'। ইহা হইতে গঠিত হয়, اَلرَّمَضَاءُ 'উত্তাপের তীব্রতা।' এই অর্থই প্রকাশ করে নিম্নের হাদীসেঃ

صَلٰوةُ الْاَوَّابِيْنَ اِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ - (مسلم)

সূর্যোদয়ের পর সূর্যতাপে প্রাচীর যখন জ্বলিয়া উঠে, তখনি আওয়্যাবীন সুন্নাত নামায পড়ার সময়।

আর সূর্যতাপের তীব্রতা পায়ে জ্বলন ধরাইয়া দেয় এবং ক্রমে সূর্যতাপ তীব্র হইতেও তীব্রতর হইয়া উঠে। মোটকথা رَمَضَانَ অর্থ দহন, তীব্রতা। এই অর্থের দিক দিয়া 'রামাযান' মাসটি হইল অব্যাহত তীব্র দহনের সমষ্টি।

আরবী মাসের নাম নির্ধারণকালে যে সময়টি সূর্যাতাপ তীব্র হওয়ার দরুন দহন বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই সময়টিরই নামকরণ করা হইয়াছে 'রামাযান' মাস। তখনকার সময়ের তাপমাত্রার তীব্রতার সহিত এই নামকরণের পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্য রহিয়াছে।–ইহা এক শ্রেণীর ভাষাবিদের ব্যাখ্যা।

অন্য লোকদের মতে এই মাসটি 'রামাযান' নামকরণের কারণ হইলঃ

اِنَّهٗ يَرْمَضُ الذُّنُوْبَ اَىْ يَحْرِقُهَا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ -

এই মাসে যে সব নেক আমল করা হয়, তাহা সমস্ত গুনাহ খাতা জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেয়।

অপর লোকদের মতে এই নামকরণের কারণ॰

لِاَنَّ الْقُلُوْبَ تَاْخُذُ فِيْهِ مِنْ حَرَارَةِ الْمَوْعِظَةِ وَالْفِكْرَةِ فِىْ اَمْرِ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَاْخُذُ الرَّمَلُ وَ الْحِجَارَةُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ -

এইজন্য যে, এই মাসে লোকদের হৃদয়-মন ওয়ায-নসীহত ও পরকাল চিন্তার দরুণ বিশেষভাবে উত্তাপ গ্রহণ করিয়া থাকে— যেমন সূর্যতাপে বালুরাশি ও প্রস্তরসমূহ উত্তপ্ত হইয়া থাকে।

আর একটি মত হইল, আরব জাতির লোকেরা রমযান মাসে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিয়া লইত, যেন শাওয়াল মাসে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে। কেননা যেসব মাসে যুদ্ধ করা হারাম, তাহার পূর্ববর্তী মাস হইল শাওয়াল—আর ইহাই রমযান মাসের পরবর্তী মাস। আল্লামা মা-ওয়ার্দী লিখিয়াছেন, প্রাক-ইসলামী যুগে এই মাসটির নাম ছিলঃ ناتق (الجامع لاحكام القرآن للقرطبي)

এহেন অর্থ ও তাৎপর্যবহ মাসটি সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ شهر مبارك ইহা অত্যন্ত 'বরকতপূর্ণ' মাস। 'বরকত' শব্দের অর্থ আধিক্য, প্রচুর্য। আর রমযান মাসকে মুবারক মাস বলা হইয়াছে এইজন্য যে, এই মাসে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের প্রতি অশেষ কল্যাণ এবং অপরিমেয় সওয়াব ও রহমত নাযিল করেন। এইজন্য যে, বান্দা এই মাসেই আল্লাহ্‌র ইবাদতে সর্বাধিক কষ্ট ভোগ করে। ক্ষুধা ও পিপাসার মত জ্বালা ও কষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না। আর এই কষ্ট ও জ্বালা অকাতরে ভোগ করাই হইল রমযান মাসের বড় কাজ। রমযান মাসের রোযার ন্যায় আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট করা অন্য কোন ইবাদতে এত কষ্ট ও জ্বালা ভোগ করিতে হয় না। এইজন্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সওয়াবও এই ইবাদতে অনেক বেশী। আসমানের দুয়ার খুলিয়া যাওয়ার কথাটি দুই দিক দিয়াই তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে দুনিয়ার রোযাদার বান্দাদের প্রতি রহমত ও অনুগ্রহের অজস্র ধারা বর্ষণের দিক দিয়া এবং বান্দার দোয়া ও ইবাদত-বন্দেগীসমূহ উর্ধ্বলোকে আরোহণ ও আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হওয়ার দিক দিয়া তাৎপর্যপূর্ণ। আর যেসব বড় বড় শয়তান আল্লাহ্‌র উর্ধ্বলোকের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য নিরন্তর চেষ্টারত হইয়া থাকে, এই মাসে তাহারা বন্দী হইয়া থাকে। তাহাদের উর্ধ্বগমন রুদ্ধ হইয়া যায়। অথবা বলা যায়—প্রকৃত নিষ্ঠাবান সচেতন সতর্ক রোযাদারের উপর শয়তানের প্রতারণা—প্ররোচনা নিষ্ফল হইয়া যায়। তাহাদের এই রোযাই তাহা প্রতিরোধ করে।

এই মাসেই কদর-রাত্রি। যে রাত্রিটি একান্তভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য উৎসর্গীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই রাত্রিতে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এত অধিক কল্যাণ বর্ষিত হয়, যাহার সহিত হাজার মাসের রাত্রিগুলিরও কোন তুলনা হয় না এবং এই রাত্রির এই অফুরন্ত ও অপরিমেয় কল্যাণের কোন অংশই যে লোক লাভ করিতে পারিল না, তাহার মত বঞ্চিত ও হতভাগ্য আর কেহই হইতে পারে না। এই ধরনের লোক সকল প্রকার কল্যাণ ও আল্লাহ্‌র রহমত হইতে চিরকালই বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত হাদীসেও এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ

(ابن ماجه)

রমযান মাসের একটি রাত্রি আছে, যাহা হাজার মাসের তুলনায় উত্তম। যে লোক এই রাত্রির কল্যাণ হইবে বঞ্চিত হইবে, সে সমগ্র কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। আর ইহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হয় কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি, যে সবকিছু হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে।

—ইবনে মাজাহ্‌

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النِّيْرَانِ فَلَمْ يُفْتَحْ بَابٌ وَفُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ

فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَابَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ
مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ـ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ রমযান মাসের প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইলেই শয়তান ও দুষ্টতম জ্বিনগুলিকে রশি দিয়া বাঁধিয়া ফেলা হয় এবং জাহান্নামের দুয়ারগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর উহার একটি দুয়ারও খোলা হয় না এবং জান্নাতের দুয়ারগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর উহার একটি দুয়ারও বন্ধ করা হয় না। আর একজন ঘোষণাকারী ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে থাকে, 'হে কল্যাণের আকাঙ্খী! অগ্রসর হইয়া আস এবং হে অকল্যাণ পোষণকারী! বিরত হও—পশ্চাদপসরণ কর। আর আল্লাহ্‌র জন্য জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাওয়া বহুলোক রহিয়াছে। এইভাবে (রমযানের) প্রত্যেক রাত্রিতেই করা হয়। —তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী

ব্যাখ্যা এই হাদীসে রমযান মাসের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার দিক প্রকাশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, রমযান মাসের প্রথম রাত্রিতে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে বিশেষ কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম ব্যবস্থা হইল, শয়তান ও অধিক দুষ্ট প্রকৃতির জ্বিনদিগকে বাঁধিয়া ফেলা হয়। রমযানের পূর্ব পর্যন্ত তাহারা যথেচ্ছা বিচরণ করিয়াছে ও স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছাচারিতা চালাইয়াছে। কিন্তু রোযার মাসের প্রথম রাত্রিতেই তাহাদিগকে বন্দী ও রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, যেন তাহারা রোযাদারকে ধোকা ও প্রতারণা দিয়া বিভ্রান্ত ও অন্যায়ে প্ররোচিত করিবার সুযোগ না পায়। এই কথাটির বাস্তবতা নিজেদের চক্ষে দেখিতে না পারিলেও ইহার কার্যকারিতা ও অনিবার্য পরিণাম আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা দেখিতে পাই, রোযার মাসে বহু বড় বড় গুনাহগার ও পাপীষ্ঠ ব্যক্তিও পাপের কাজ হইতে বিরত থাকে এবং তওবা করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হইয়া যায়। ইহা যে শয়তানদিগকে বাঁধিয়া রাখার ও তাহাদের ওয়াস্‌ওয়াসা হইতে দূরে থাকার দরুন হয় নাই, তাহা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

অবশ্য ইহার বিপরীত অবস্থাও পরিলক্ষিত হয়। সেই সম্পর্কে প্রথমত বলা যাইতে পারে যে, রোযার মাসে রোযাদার কর্তৃক যে সব অন্যায় ও দুষ্টকৃতি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই প্রতারণা, প্ররোচনা ও প্রভাব-প্রলোভনের জের, যাহা এগার মাসকাল ধরিয়া তাহাদের মন-মগজ ও রক্তমাংসের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে এবং এই মূহূর্তে উহার প্রভাব নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। দ্বিতীয়ত বলা যাইতে পারে শয়তান ও জ্বিনদের বন্ধ করিয়া রাখার কথা রূপক অর্থে বলা হইয়াছে। এই কথার আসল তাৎপর্য হইল, এই মাসব্যাপী শয়তান ও দুষ্ট জ্বিনেরা রোযাদারকে খুব কমই প্রতারিত ও প্ররোচিত করিতে পারে। এই মাসে তাহাদের প্ররোচনা ও পথভ্রষ্টকরণ অভিযান খুবই দুর্বল হইয়া যায়। হাদীস ব্যাখ্যাতা ইবনে হাজার আল-আসকালানীর মতে, ইহা পুরাপুরি বাস্তব। প্রকৃতপক্ষেই এইরূপ হইয়া থাকে। ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে এই মাসের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার এবং মুমিন বান্দাগণকে কষ্টদান হইতে শয়তানগুলিকে বিরত রাখার ইহা বাস্তব নিদর্শন। বলা যাইতে পারে, এই মাসে সৎকাজের সওয়াব বিপুল হওয়ার, আল্লাহ্‌র ক্ষমা ব্যাপক হওয়ার এবং শয়তানের প্রতারণা-কার্য অনেকটা মুলতবী থাকার কথাই ইঙ্গিত-ইশারায় বলা হইয়াছে। ফলে শয়তানের ঠিক বন্দী থাকার মতই হইয়া যায়। মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হাদীস ইহার সমর্থক। তাহাতে বলা হইয়াছে فتحت ابواب الرحمة 'রহমতের দুয়ার উম্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।' জান্নাতের দুয়ারসমূহ খুলিয়া দেওয়ার অর্থ হইলঃ জান্নাতলাভ সহজতর করিয়া দেওয়া। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের জন্য এই মাসে ইবাদত-বন্দেগীর বিপুল সুযোগ করিয়া দেন। ইহা জান্নাতে প্রবেশ সহজতর হওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আর জাহান্নামের দ্বার বন্ধ হওয়ার অর্থ, জাহান্নামে লইয়া যাওয়ার মত গুনাহ-

খাতার প্রতি মানব মন এই মাসে বিমুখ হইয়া থাকে। নেক-আমলের দিকেই তাহাদের সব চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত হয়। আর শয়তানগুলিকে বন্দী করার তাৎপর্য হইল, তাহারা প্রতারণা প্ররোচনা ও লালসা-পংকিলতা ও পাপের আকর্ষণ সৃষ্টির ব্যাপারে অক্ষম ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

শয়তান ও জ্বিনদের বন্দী হওয়ার কথা যথার্থ ও বাস্তব বলিয়া মানিয়া লইলে প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে রমযান মাসে এত অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কি করিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে? শয়তানরা বন্দী হইয়া থাকিলে এইরূপ তো হওয়ার কথা নয়? ইহার উত্তরে বলা যায়, যেসব রোযাদার প্রকৃতই রোযার জরুরী শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করে ও উহার নিয়ম-নীতি ও আদব-কায়দা রক্ষা করিয়া চলে, উহার দরুন তাহাদের দ্বারা ইহা খুব কমই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, সব শয়তানই তো আর বন্দী হয় না, বন্দী হয় উহাদের শ্রেষ্ঠরা। চেলা-চামুণ্ডারা তো ওয়াসওয়াসার কাজ যথারীতি চালাইতেই থাকে কিংবা শয়তানের দুষ্টামী ও প্ররোচনার মাত্রা খুবই হ্রাস পাইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বলা যায় যে, রমযান মাসে শয়তান ও দুষ্ট জ্বিনেরা বন্দী হইলেও অন্যায়, অনাচার ও পাপানুষ্ঠান যে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইবে এমন কথাও নয়। কেননা উহার অন্য বহুবিদ কারণ থাকিতে পারে। বস্তুত আসল শয়তান ও প্রকৃত দুষ্ট জ্বিনদের ছাড়াও মানুষের নিজের সত্ত্বায় নিহিত দুষ্ট স্বভাব-প্রকৃতি ও মানবরূপী শয়তানদের দুষ্কৃতিও তো কোন অংশে কম হয় না।

হাদীসের শেষে ঘোষণাকারীর কথা বলা হইয়াছে, ঘোষণাকারী হয়তো ফেরেশতা হইবেন। মুসনাদে আহ্‌মদ-এ উদ্ধৃত একটি হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

ويـنـادى فـيـه مـلـك - রমযান মাসে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করিবেন।

এই ঘোষণা হয়ত বাস্তবভাবে শ্রুতিগোচর হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঈমানদার লোকদের যখন একথা জানা থাকে যে, রমযান মাসে এইরূপ ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন এই কথাটি স্মরণ করিয়াই তাহারা সচেতন ও সতর্ক হইতে ও উহার ফলে ডাকে সাড়া দিতে মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকিতে পারে। ইহাই এই ডাকের ফায়দা। কিংবা নেক-কাজের ইচ্ছুক লোকদের মনে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথা জাগাইয়া দেন— 'কল্যাণের আকাঙ্খী অগ্রসর হও' অর্থ, যাহারা সত্যই নেক আমল করিতে চাও, তাহারা আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হও। আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে খুব বেশী বেশী চেষ্টা কর। তাহা হইলে অল্প কাজের ফলে অশেষ সওয়াব লাভ করিতে পারিবে। কিংবা যাহারা নেক-আমলে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও এতদিন সেদিকে কার্যত পদক্ষেপ গ্রহণ কর নাই, তাহার আর নিস্ক্রীয় হইয়া থাকিও না। এবার সব অবসাদ-অকর্মন্যতা পরিহার করিয়া কর্মের জন্য প্রস্তুত হও। কেননা আসল কল্যাণ তো আমারই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীন। আমিই তোমাদিগকে কর্মের অবাধ সুযোগ দান করিব। 'হে অকল্যাণ পোষণকারী! পাপকার্য হইতে বিরত থাক। আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর।' কেননা তওবা কবুল হওয়ার ও মাগফিরাত লাভ করার স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্ত তোমার দ্বারদেশে সমুপস্থিত। সম্ভবত আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের রমযান মাসে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়া এবং অপরাধপ্রবণ ও পাপীষ্ঠ লোকদের পাপ হইতে বিরত থাকা এই ঘোষণারই পরিণাম। আর তাহাও হয় এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা এই রমযান মাসে তাঁহাকে পাইতে চায় এমন লোকদের জন্য অনুগ্রহের রুদ্ধদ্বার উম্মুক্ত করিয়া দেন। ঠিক এই জন্যই নামায-রোযা তরককারী অনেক মুসলমান—এমনকি ছোট ছোট শিশু ও বালকরা পর্যন্ত নামায রোযায় মগ্ন হইয়া থাকে। রোযা নামায হইতেও অধিক কষ্টসাধ্য। উহার ফলে দেহ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ফলে ইবাদতের কাজে অবসাদ দেখা দেয়, নিদ্রার চাপে, সমস্ত শরীর ভাঙ্গিয়া আসে। এতদ্‌সত্ত্বেও মসজিদগুলি দেখা যায় নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ, আর রাত্রিগুলি ইবাদত-বন্দেগী, কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র যিকরে মুখরিত হইয়া উঠে।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জাহান্নাম হইতে নিষ্কৃত পাওয়া লোকদের সংখ্যা বিপুল। ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে তুমিও তাহাদের মধ্যে নিজেকে শামিল করিতে পার।

বস্তুত রমযান মাসের ফযীলত পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে এই হাদীসটির গুরুত্ব ও মর্যাদা যে অনন্য তাহা বলাই বাহুল্য।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِاَمْرٍ يَنْفَعُنِىَ اللّٰهُ بِهٖ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهٗ لَا مِثْلَ لَهٗ ـ (نسائى)

হযরত আবূ আমামাহা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (স)! আমাকে এমন এক কাজের কথা বলিয়া দিন, যাহা দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে কল্যাণ দিবেন। জওয়াবে নবী করীম (স) বলিলেনঃ তোমার রোযা পালন করা কর্তব্য। কেননা রোযার কোন তুলনা নাই।

ব্যাখ্যা হাদীসের বক্তব্য হইল, রোযা এক অতুলনীয় ইবাদত। অতএব রীতিমত রোযা পালন এমন এক কাজ, যাহা বাস্তবিকই তোমাদের কল্যাণ দান করিবে। বস্তুত রোযা যে এক তুলনাহীন ইবাদত, কুরআন ও হাদীসের ঘোষণাসমূহ হইতে তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায়। তাহার কারণ এই যে, রোযার কোন বাহ্যিক ও দৃশ্যমান রূপ নাই। ইহা সঠিকরূপে পালন করা হইতেছে কিনা তাহা রোযাদার নিজে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই জানিতে পারে না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ 'উহা কেবলমাত্র আমারই জন্য' অতএব আমিই উহার প্রতিফল দিব।—ইমাম কুরতুবী লিখিয়াছেনঃ

اِنَّ الصَّوْمَ يَمْنَعُ مِنْ مَلَاذِّ النَّفْسِ وَشَهْوَاتِهَا مَالَا يَمْنَعُ مِنْهُ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ ـ (تفسير القرطبى)

রোযা নফসের লোভ-লালসা ও স্বাদ-আস্বাদন প্রবৃত্তি দমন করে, যাহা অন্য সব ইবাদত এইরূপ করে না।

চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখা—চাঁদ দেখিয়া রোযা ভাঙ্গা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ رض اَنَّهٗ خَطَبَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَالَ اَلَا اِنِّىْ قَدْ جَالَسْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاَلْتُهُمْ اَلَا وَاِنَّهُمْ حَدَّثُوْنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَانْسُكُوْا لَهَا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَتِمُّوْا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا وَاِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُوْمُوْا وَاَفْطِرُوْا ـ (مسند احمد، نسائى)

আবদুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনুল খাত্তাব হইতে বর্ণিত, তিনি সেই দিন ভাষণ দিলেন, যে দিন রোযা রাখা হইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছিল এবং বলিলেনঃ তোমরা জানিয়া রাখ, আমি রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবীদের মজলিসে বসিয়াছি এবং এই ধরনের বিষয়ে আমি তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি। এই ব্যাপারে তোমরা সতর্ক হও। তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন যে, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখিতে শুরু কর এবং চাঁদ দেখিয়া

রোযা ভঙ্গ কর। আর এইভাবে কুরবানী ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন কর। (ঊনত্রিশ তারিখ) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে (ও চাঁদ দেখা না গেলে) তোমরা সেই মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। আর যদি দুইজন মুসলমান—সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য দেয় তবে তোমরা তদানুযায়ী রোযা রাখ ও রোযা ভাঙ্গ।

ব্যাখ্যা চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখিতে শুরু করা ও চাঁদ দেখিয়া রোযা ভঙ্গ করা অসংখ্য হাদীসের মধ্যে ইহা একটি। এই সমস্ত হাদীসের মূল কথা হইল, রমযানের চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখিতে হইবে এবং রোযা ভাঙ্গিতে হইবে। শওয়ালের চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখা বন্ধ করিয়া ঈদুল-ফিতর পালন করিতে হইবে। তাহাতে শাবান মাস ও রমযান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হউক, কি উত্রিশ দিনের অপূর্ণ মাসই হউক-না কেন। রাসূলের বাণীঃ 'চন্দ্রোদয় দেখিয়া রোযা থাক, চন্দ্রোদয় দেখিয়া রোযা ভাঙ্গ' হইতে এই কথা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। ইহা হইল ইতিবাচক কথা। এই পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ (بخاری، مسلم)

তোমরা রোযা রাখিবে না যতক্ষণ চাঁদ দেখিতে পাইবে না। (২৯ তারিখ) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে সেই মাসের দিন পূর্ণ করিয়া লও।

হযর আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটির ভাষা এইঃ

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (بخاری، مسلم)

চাঁদ দেখিয়া রোযা থাক। চাঁদ দেখিয়া রোযা ভাঙ্গ। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে শাবান মাসের দিনের সংখ্যা ত্রিশ পূর্ণ কর।

ইহার স্পষ্ট অর্থ হইলঃ রোযা রাখিতে হইবে যখন চাঁদ দেখা যাইবে এবং রোযা ভাঙ্গিতে হইবে যখন শয়ালের চাঁদ দেখা যাইবে।

আলোচ্য হাদীসের শেষভাগে দুইজন মুসলমানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দানের কথা বলা হইয়াছে। চাঁদ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের চোখে দেখিতে হইবে এবং তাহা হইলেই রোযা রাখা বা ভাঙ্গা যাইবে, অন্যথায় নয়—এমন কথা শরীয়াতে নাই। নিজ চোখে না দেখিলেও অন্যদের নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাইলে তাহার ভিত্তিতে রোযা রাখিতেও হইবে এবং ভাঙ্গিতে হইবে। ইহাই শরীয়াতের বিধান। ইবনুল কায়্যিম লিখিয়াছেন, নবী করীম (স) একজন সাহাবী—হযরত ইবনে উমরের বর্ণনানুযায়ী একজন মরু বেদুইনের ঈদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাইলেও রোযা রাখিতেন। আর চাঁদ দেখিতে না পাইলে বা দেখার সাক্ষ্য না পাইলে তিনি চলতি মাসের—শাবান বা রমযানের ত্রিশটি দিন পূর্ণ করিয়া লইতেন।

ইমাম আবূ হানীফার মতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে একজন বিশ্বস্ত লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্যানুযায়ী রোযা থাকা যাইবে। ইমাম শাফেয়ীরও ইহা একটি মত। ইমাম আহমদের মতে সর্বাবস্থা একজন লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা থাকা যাইবে। আর ইমাম মালিকের মতে চাঁদ না দেখিলে রোযা রাখা যাইবে না।

চাঁদ দেখার সাক্ষ্য

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ

إِلَّا اللَّهُ - أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا (ترمذى)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, একজন বেদুঈন নবী করীম (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলঃ আমি চাঁদ দেখিয়াছি। তখন নবী করীম (স) লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া মা'বুদ নাই এবং তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল? লোকটি বলিলঃ হ্যাঁ। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ হে বিলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিয়া দাও যে, তাহারা যেন আগামীকাল হইতে রোযা থাকে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা উপরের হাদীসে নিশ্চয়ই এমন এক দিনের কথা বলা হইয়াছে, যে দিন নবী করীম (স) নিজে কিংবা তাঁহার নিকটস্থ লোকজন চাঁদ দেখিতে পান নাই। আর চাঁদ দখিতে না পাওয়ার দরুন পরবর্তী দিনের কোন কার্যসূচী ঠিক করা সম্ভবপর হয় নাই। চাঁদ দেখিতে না পাওয়ার কারণ সম্ভবত এটা ছিল যে, সে দিন চাঁদ দেখার সময় সেখানকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন চাঁদ দেখিতে না পাওয়া বিচিত্র কিছুই নয়। তখন একজন মরু অধিবাসী-বেদুঈন রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল যে,আমি চাঁদ দেখিতে পাইয়াছি। —এই চাঁদ রমযান মাসের চাঁদ, তাহা রাসূলে করীম (স)-এর পরবর্তী নির্দেশ হইত স্পষ্ট বুঝা যায়। বস্তুত এক স্থানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন চাঁদ দেখিতে না পাইলে অন্যত্রও তাহা দেখা যাইবে না, এইরূপ অবস্থা সব সময় হয় না। সে দিন অন্য যে কোন স্থানে চাঁদ দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই কারণে নবী করীম (স) এই কথাটি শুনিবামাত্র লোকটির ঈমান-আকীদার পরিচয় গ্রহণের প্রয়োজন মনে করিলেন, অন্য কোন বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন না। লোকটি মুসলমান কিনা তাহাই জানিতে চাহিলেন। লোকটি যখন স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিল যে, সে মুসলমান—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র বিশ্বাসী ও ঈমানদার, তখন নবী করীম (স) লোকটির চাঁদ দেখা সংক্রান্ত সংবাদ বিশ্বাস করিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রমযানের চাঁদ সত্যই দেখা গিয়াছে এবং পরের দিন হইতেই রোযা থাকিতে হইবে। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণকে অবিলম্বে জানাইয়া দিবার জন্য তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন।

এই হাদীস হইতে জানা গেল যে, চাঁদ দেখা সংক্রান্ত সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য সাক্ষ্যদাতার মুসলমান হওয়া জরুরী শর্ত। সনদের দিক দিয়া এই হাদীসটি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলেও এবং মতভেদ থাকিলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশেষ মতভেদ নাই। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মত হইলঃ

تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ -

রোযা রাখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে।

ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইসহাক রাহ্ওয়াই বলিয়াছেনঃ

لَا يُصَامُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ - দুই ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্য না পাইলে রোযা রাখা যাইবে না।

ইমাম মালিক, লাইস, আওযায়ী, সওরী ও ইমাম শাফেয়ীর অপর একটি উক্তি এই মতের সমর্থনে রহিয়াছে। তাঁহাদের দলিল হইল আবদুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনুল খাত্তাব বর্ণিত একটি হাদসি। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবিগণ হাদীস বর্ণনা করিয়া আমাকে শোনাইয়াছেনঃ

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا۔ (مسند احمد، نسائى)

তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোযা থাক, চাঁদ দেখিয়া রোযা ভাঙ্গ। চাঁদ দেখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও চাঁদ দেখা না যায়, তাহা হইলে চলতি শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। আর দুইজন মুসলমান যদি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেন, তবে সেই অনুযায়ী রোযা থাকিবে ও রোযা ভাঙ্গিবে।

মুসনাদে আহমদ ও নাসায়ী—উভয় গ্রন্থেই এই হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু নাসায়ীর বর্ণনায় مُسْلِمَانِ 'দুইজন মুসলমান' বলা হয় নাই।

মক্কার শাসনকর্তা হারিস ইবনে হাতিব বলিয়াছেনঃ

عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا۔ (ابو داؤد، دارقطنى)

রাসূলে করীম (স) চাঁদ দেখার জন্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। যতি চাঁদ আমরা দেখিতে না পাই এবং দুইজন বিশ্বস্ত সাক্ষী চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে তদানুযায়ী আমরা রোযা পালন করিব। —আবূ দাউদ, দারে কুতনী

দুইজন সাক্ষী শর্ত করার জওয়াবে বলা যায়, দুইজনে সাক্ষ্য পাওয়া চূড়ান্ত কথা। কিন্তু একজনের সাক্ষ্যে রোযা রাখা যাইবে না। এমন কোন নিষেধ উহাতে নাই। ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেনঃ

وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْإِفْطَارِ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ فِيهِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ۔

দুইজন লোকের সাক্ষ্য ছাড়া যে রোযা খোলা যাইবে না, এই ব্যাপারে শরীয়াতের আলিমদের মধ্যে কোন মতবৈষম্য দেখা যায় নাই।

ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ শওয়াল মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে মাত্র একজন বিশ্বস্ত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে না। ইহা সর্বজন সমর্থিত মত। তবে একমাত্র আবূ সওর বলিয়াছেন, সাক্ষ্য যদি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হয়, তাহা হইলে একজনের সাক্ষ্যও যথেষ্ট।

তাবেয়ী তাউস বলিয়াছেনঃ আমি মদীনায় হযরত ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁহাদের নিকট এক ব্যক্তি রমযান মাসের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়। তাঁহারা দুইজনই তাহা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেনঃ

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَكَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ۔ (دارقطنى، طبرانى فى الاوسط)

রাসূলে করীম (স) রমযান মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু রোযা খোলার ব্যাপারে দুইজনের সাক্ষ্য ছাড়া রোযা খোলার অনুমতি দিতেন না।

ইমাম দারে কুতনী বলিয়াছেনঃ এই হাদীসটির সনদে এক পর্যায়ে হাফস ইবনে উমর আল আয়েলী একক বর্ণনাকারী। আর তিনি যয়ীফ।

কিন্তু এই দিক দিয়া হাদীসটি যয়ীফ হইলেও পূর্বোদ্ধৃত হাদীস দুইটি, যাহাতে রোযা খোলার চাঁদ দেখার ব্যাপারে দুইজন সাক্ষীর শর্ত করা হইয়াছে, তাহা হইল এই মতের আসল ভিত্তি। অতএব গ্রহণযোগ্য। (تحفة الاحوذى-نبوى)

রোযার নিয়্যত

عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ -

(ترمذى، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه، مسند احمد)

হযরত হাফসা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ যে লোক ফজরের পূর্বেই রোযার সংকল্প করিল না,তাহার রোযা নাই।

—তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে রোযার নিয়্যত করার আবশ্যকতা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। হাদীসের ভাষা হইতে দুইটি কথা স্পষ্ট হয়। একটি হইল রোযার নিয়্যত অবশ্যই করিতে হইবে। নিয়্যত করা না হইলে রোযাই হইবে না। আর দ্বিতীয় কথা হইল ফজরের পূর্বে নিয়্যত করিতে হইবে। উভয় বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

উপরে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান হাদীস সংগ্রহকারীদ্বয় ইহা নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে নবী করীম (স)-এরই বাণীরূপে সহীহ সনদে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম দারে কুতনীও নিজ গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ইহাকে নবী করীম (স)-এর কথা মনে করা ঠিক নয়। আর ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটিকে হযরত ইবনে উমরের কথা মনে করাই যথার্থ। 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে সহীহ সনদে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

اِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَا يَصُوْمُ اِلَّا مَنْ اَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ -

তিনি বলিতেন, যে লোক ফজরের পূর্বে নিয়্যত করিয়াছে, সে ছাড়া অন্য কেহই (যেন) রোযা না রাখে।

মোটকথা, বহু সনদে হাদীসটি বর্ণিত হইলেও কেবলমাত্র একটি সনদ হইতেই উহাকে রাসূলে করীম (স)-এর কথা বলিয়া জানা যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মুহাদ্দিসগণ ইহাকে নবী করীম (স)-এর কথা ও অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও সকল মুহাদ্দিসীনের ইহাই মত। কেননা সাহাবীরা মনগড়া কথা বলেন না, রাসূলের নিকট হইতে শোনা কথাই বলেন, ইহা হাদীসশাস্ত্রের একটি মূলনীতি বিশেষ।

ইমাম যুহরী, আতা ও যুফার-এর মতে রমযান মাসের রোযার জন্য নিয়্যতের প্রয়োজন নাই। কেননা রমযানে রোযা না থাকার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অবশ্য রোগী ও মুসাফির যাহাদের জন্য রোযা ফরয নয়, তাহাদের জন্য নিয়্যত জরুরী। (بداية المجتهد - نيل الاوطار)

ইমাম আবূ হানীফার মতে,' যে রোযার দিন নির্দিষ্ট, উহার নিয়্যত সেই দিনের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত করিলেই চলে। কিন্তু যে রোযার দিন নির্দিষ্ট নয়, সেই দিনের রোযার নিয়্যত ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে হওয়া আবশ্যক। এই মূলনীতির দৃষ্টিতে রমযান মাসের রোযার ও নির্দিষ্ট দিনের জন্য মানত করা রোযার নিয়্যত সেই দিনের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত করিলেই কর্তব্য সম্পাদন হইবে। কিন্তু কাফ্ফারা, কাযা ও অনির্দিষ্ট মানতের রোযার নিয়্যত রাত্রিকালেই করিতে হইবে। তাঁহার দলীল হইল হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা। একজন বেদুঈন নবী করীম (স)-এর নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়। ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) ঘোষণা করাইয়া দিলেন যে, যে লোক কোন কিছু খাইয়াছেন, সে যেন দিনের অবশিষ্ট সময়ে কিছুই না খায়। আর যে লোক এখন পর্যন্ত কিছুই পানাহার করে নাই, সে যেন রোযা রাখে।

—আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী

হযরত হাফ্সা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের বক্তব্য হইল, প্রথমত উক্ত হাদীসটি রাসূলে করীম (স)-এর কথা, (مرفوع) না সাহাবীর কথা (موقوف) এই বিষয়েই মতভেদ রহিয়াছে। উহাকে যদি সহীহ্ হাদীস মানিয়াও লওয়া যায়, তবুও বলা যায়, উহাতে রোযা আদৌ না হওয়ার কথা বলা হয় নাই, বরং বলা হইয়াছে রোযার ফযীলত না হওয়ার কথা। অর্থাৎ কোন লোক যদি রমযানের রোযার নিয়্যত রাত্রে না করিয়া দিনের দ্বিপ্রহরের মধ্যে করে, তবে সে রোযার মাহাত্ম্য লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। রোযা তাহার হইয়া যাইবে। তবে উহার শুভ প্রতিফল পাইবে সে সময় হইতে, যখন সে নিয়্যত করিবে। (الكوكب الدرى - تحفة الاحوذى - للمعات)

অন্যান্য ফিকাহ্‌বিদদের মতে হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসটি অনুযায়ী আমল করা যাইবে কেবল তখন, যখন দিনের বেলাই রোযা শুরু হওয়ার কথা জানিতে পারিবে। কেননা তখন তো আর রাত্রিকাল ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না। ইমাম যাইলায়ী ও হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেন, হযরত হাফসা বর্ণিত হাদীসটি হইতে রাত্রিকালেই রোযার নিয়্যত করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। হযরত ইবনে উমর ও জাবির ইবনে ইয়াযীদ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। রোযা ফরজ কিংবা নফল এই ব্যাপারে তাঁহারা কোন পার্থক্য করেন নাই। আবূ তাল্হা, আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল বলিয়াছেনঃ

لَا يَجِبُ التَّبْيِيْتُ فِى التَّطَوُّعِ - নফল রোযার নিয়্যত রাত্রিকালে করা ওয়াজিব নয়।

হযরত আয়েশা (রা)-এর মত হইলঃ

تَصِحُّ النِّيَّةُ بَعْدَ الزَّوَالِ - দ্বিপ্রহরেরও পর নিয়্যত করিলে রোযা সহীহ্ হইবে।

রোযার মূল্য ও মর্যাদা

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضُعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِى وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُءٌ صَائِمٌ

(بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমলের সওয়াব দশগুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ রোযা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা উহা একান্তভাবে আমারই জন্য। অতএব আমিই (যেভাবে ইচ্ছা) উহার প্রতিফল দিব। রোযা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তোষ বিধানের জন্য স্বীয় ইচ্ছা-বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করিয়া থাকে। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ। একটি আনন্দ ইফতার করার সময় এবং দ্বিতীয়টি তাহার মালিক-মুনিব আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ লাভের সময়। আর নিশ্চয়ই জানিও, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশ্‌কের সুগন্ধি হইতেও অনেক উত্তম। আর রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের একজন যখন রোযা রাখিবে, তখন সে যেন বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং চীৎকার ও হট্টগোল না করে। অন্য কেহ যদি তাহাকে গালাগাল করে কিংবা তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিতে আসে, তখন সে যেন বলেঃ আমি রোযাদার।

ব্যাখ্যা মুমিন ব্যক্তির প্রত্যেকটি নেক আমলের সওয়াব দশ গুন হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, হাদীসটির প্রথম কথা ইহাই। এই কথাটি রাসূলে করীম (স)-এর নিজস্ব ও স্বকল্পিত নয়। ইহার ভিত্তি কুরআন মজীদেই পেশ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ـ (الانعام: ١٦١)

যে লোক একটি নেক আমল করে তাহার জন্য উহার অনুরূপ দশটি কাজের সওয়াব নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

কিন্তু ইহা হইল বৃদ্ধি লাভের নিম্নতম পরিমাণ। হাদীসে দশ গুন হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এই সংখ্যাটি বলা হয় নাই। বলা হইয়াছেঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ـ (البقرة: ٢٤٥)

যে লোকই আল্লাহ্কে উত্তম 'করয' দিবে, আল্লাহ্ তাহাকে উহা বহু গুণ বেশী করিয়া দিবেন।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বহুগুণ বেশী করিয়া দেন।

এই আয়াতদ্বয়ের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা কতগুণ বেশী করিয়া দিবেন, তাহা নির্দিষ্টও নয়, সীমাবদ্ধও নয়। আল্লাহ্ যত ইচ্ছা বেশী বেশী বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন। রোযার প্রসংগে আলোচ্য হাদীসে আল্লাহ্র কথাটির ইহাই তাৎপর্য। অতএব রোযার সওয়াব কত হইবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই উহার পরিমাণ পরিমাপ করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, রোযার এমন কতগুলি বিশেষত্ব রহিয়াছে যাহা অন্য কোন ইবাদতে পাওয়া যায় না। এই

কারণে ইহার সওয়াবদানের ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাধীন করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ উহার কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া ঘোষণা করেন নাই।

আল্লামা তায়্যিবী বলিয়াছেনঃ রোযার এই মর্যাদা ও বিশেষত্বের দুইটি কারণ হইতে পারে। একটি এই যে, রোযার বাস্তবতা আসলে একটা গোপন ব্যাপার। এই কারণে উহা একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্যই হইয়া থাকে। অন্যান্য ইবাদত সেরূপ নয়। আল্লাহ্র এই ব্যাক্যাংশ সেই দিকেই ইংগিত করে।

فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ -

উহা একান্তভাবে আমারই জন্য হইয়া থাকে। অতএব আমিই উহার প্রতিফল দিব।

কেননা রোযার কোন বাস্তব ও দৃশ্যমান অস্তিত্ব নাই। অন্যান্য ইবাদত—নামায-হজ্জ্ব-যাকাত ইত্যাদির একটা বাহ্যিক দৃশ্যমান অবয়ব রহিয়াছে। আর রোযা হইল পানাহার ইত্যাদি হইতে বিরত থাকা। উহার পশ্চাতে অন্তর্নিহিতত থাকে শুধু নিয়্যত। আর নিয়্যত হইল একটা মানসিক অবস্থা—একটা মানসিকতা মাত্র। উহা অন্য কেহ দেখিতে পায় না। কেহ যদি মুখে বলে যে আমি রোযাদার, তবুও সে প্রকৃতপক্ষে রোযাদার কিনা তাহা অকাট্য ও অনস্বীকার্যভাবে কেহই বুঝিতে ও ধরিয়া দেখিতে পারে না। তাহা নিঃসন্দেহে জানিতে ও দেখিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তাই আল্লাহ্র এই বাক্যটির তাৎপর্য হইলঃ কেহ প্রকৃতই রোযা রাখিয়াছে কিনা তাহা একমাত্র আমিই জানিতে পারি। একমাত্র আমার জন্যই রোযা রাখা হইয়াছে কিনা তাহাও আমি ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অতএব কাহার রোযার কি প্রতিফল হইতে পারে, তাহাও আমি ছাড়া আর কেহ জানিতেও পারে না। আর উহার যথাযথ প্রতিফল দেওয়া আমি ছাড়া আর কাহারো পক্ষেই সম্ভব নয়। উহার সাধ্যও কাহারও নাই।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোযায় আছে কৃচ্ছ্র সাধন, প্রবৃত্তি দমন ও দৈহিক অবক্ষয়তা। আর তাহার জন্য প্রয়োজন ক্ষুৎ-পিপাসায় অপরিসীম ধৈর্য ধারণ; কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ইবাদত—নামায-হজ্জ্ব-যাকাত—আদায়ে থাকে অর্থ ব্যয় ও দৈহিক ব্যস্ততা। ফলে এই দুই ধরনের ইবাদতে—রোযা এবংনামায-হজ্জ্ব-যাকাতআদায়ে—আকাশ পাতালের ব্যবধান। হাদীসে উক্ত আল্লাহ্র বাণীঃ

يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي -

রোযাদারআমারই কারণে—আমারই নির্দেশ পালনে ও আমারই সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে—তাহার প্রবৃত্তি দমন করে ও পানাহার পরিহার করে।

এই কথা হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, নিছক পানাহার ও স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করাকেই রোযা বলা যায় না। এই সবের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল নিয়্যত—আল্লাহ্র জন্য অকৃত্রিম একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা, কেবল আল্লাহ্র জন্যই এইসব পরিত্যাগ করা। সেই সঙ্গে ইহাও প্রতিভাত হইয়া উঠে যে, রোযার আদৌ কোন রিয়াকারী বা দেখানোপনার স্থান নাই। কেননা একজন প্রকৃত রোযাদার না হইয়াও যদি নিজেকে রোযাদার প্রকাশ করে, তাহা হইলেই সে আসলে রোযাদার হয় না।

এই বাক্যের আর একটি অর্থ এই হইতে পারে যে, এই রোযা একান্তভাবে আমারই জন্য রাখা হইয়াছে। ইহাতে অন্য কেহই আমার সঙ্গে শরীক নাই এবং রোযা রাখিয়া রোযাদার আমার ছাড়া আর কাহারও ইবাদত করে নাই। আর কাহারও সন্তুষ্টিলাভ তাহার লক্ষ্য নয়। আর কাহারও নিকট হইতে

সে ইহার প্রতিফল পাইতে চাহে নাই। কেননা অন্যান্য যেসব ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায়, তাহা মুশরিকরাও তাহাদের মা'বুদের জন্য করে এবং করিতে থাকে। কিন্তু রোযা সেরূপ নয়। বস্তুত কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই রোযা রাখা হইয়াছে কিনা, পাহানার-স্ত্রী সহবাস পরিহার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে ও তাঁহারই বিধানমত করা হইয়াছে কিনা, তাহা সেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই জানিতে পারে না। আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের মতে ইহাই রোযার হাকীকত—রোযার মর্মকথা। অধিকন্তু অন্যান্য সব ইবাদতে কৃতিমতা ও রিয়াকারী সম্ভব, কিন্তু রোযায় তাহার কোন অবকাশ নাই। (تفسير قرطبى - زاد المعاد)

রোযাদারের জন্য দুইটি সুখ-আনন্দ ও স্ফূর্তির মুহূর্ত রহিয়াছে। উহার একটি এই দুনিয়ার জীবনে—একটি মুহূর্ত ও ক্ষেত্র রোযা কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসে। আর দ্বিতীয়টি কেবলমাত্র পরকালে প্রাপ্তব্য। প্রথম সুখ ও স্ফূর্তিটি লাভ করা যায় ইফতার করার সময়। কেননা একে তো একটানা ১৩-১৪ ঘন্টা পর্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসার দুঃসহ জ্বালা সহ্য করার পর পানাহার করার অবাধ সুযোগ আসে ইফতারের মুহূর্তে। আর দ্বিতীয়ত একটি রোযা যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে পারার ও আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অসীম সওয়াবের অধিকারী হওয়ার সাফল্য ও সার্থকতার শোকর মিশ্রিত আনন্দ। এই মুহূর্ত সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ - ক্ষুৎ-পিপাসার অবসান হইল এবং প্রতিফলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল।

হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ اِفْطَارِهٖ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً -

ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া আল্লাহ্‌র নিকট অবশ্যই কবুল হয়।

আর দ্বিতীয় সুখ-স্ফূর্তি ও আনন্দ লাভ হইবে আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ লাভকালে। ইহা হইবে কিয়ামতের দিন, হাশরের ময়দানে। বস্তুত মুমিন বান্দার পক্ষে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ অপেক্ষা অধিক আনন্দ-সুখ ও স্ফূর্তির ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। কেননা সারাটি জীবন যাঁহার বন্দেগীতে অতিবাহিত করিয়াছে দুনিয়ায় সে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। না দেখিয়াই আনুগত্য আরাধনা করিয়াছে, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়ার বাসনা ও আকংক্ষা যে অসাধারণভাবে তীব্র হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু শত কামনা, শত ইচ্ছা সত্ত্বেও এই দুনিয়ায় তাঁহাকেও দেখা যাইবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সেই সাক্ষাৎ পিপাসুদের সামনে সমুদ্ভাসিত হইবেন।

রোযাদারের মুখে একটা তীব্র গন্ধ জাগে। এই গন্ধটি অন্য একজনের পক্ষে দুঃসহ ও ঘৃণ্য হইলেও আল্লাহ্‌র নিকট ইহার মূল্য অপরিসীম। কেননা কেবলমাত্র রোযা থাকার কারণেই এই গন্ধ। আর রোযা যেহেতু কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্ নিজেই উহার প্রতিফল দিবেন। এই কারণে আল্লাহ্‌র নিকট উহা অতটা সুগন্ধ, মানুষের নিকট যতটা সুগন্ধ মিশ্‌ক আতর। কিন্তু সে জন্য রোযার দিনে দাঁত মাজা ও মিস্ওয়াক করা বন্ধ করিতে হইবে— এমন কথা নয়। কেননা এখানে যে গন্ধের কথা বলা হইতেছে তাহা দাঁত মাজা ও মিসওয়াক করার পরও নিঃশেষ হইয়া যায় না।

হাদীসের ঘোষণাঃ রোযা ঢাল স্বরূপ। ঢাল শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করে। দুনিয়ার জীবনে রোযাদারকে গুনাহ খাতা হইতে রক্ষা করে। আর পাকালে ইহা বাঁচায় জাহান্নাম হইতে। অতএব রোযার মর্যাদা রক্ষার্থে গুনাহের কাজ হইতে বিরত থকিতে হইবে এবং অশ্লীল কথাবার্তা ও বাজে বকাবকি ও উচ্চস্বরে চিৎকার হট্টগোল সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে। তবেই রোযা নিখুঁত, ত্রুটিমুক্ত ও সম্পূর্ণ হইবে। তখনই রোযার ঢাল হওয়ার বাস্তবতা প্রমাণিত হইবে। বুখারীর বর্ণনায় এখানে ব্যবহৃত শব্দ হইল وَلَا يَجْهَلْ 'মুর্খতা করিবে না'; জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক বিরোধী কাজকেই মুর্খতা বলে। ইহা অত্যন্ত ব্যাপক কথা।

রোযা রোযাদারের জন্য বড় ঢাল হইয়া দেখা দেয় তখন, যখন কেহ তাহাকে গালমন্দ বলে কিংবা ঝগড়া-ঝাটি করিয়া মারিতে উদ্যত হয়, তখন সে বলিবেঃ 'আমি রোযাদার'। অর্থাৎ, আমি রোযাদার হওয়ার কারণে তোমার গালমন্দের জওয়াবে আমি তোমাকে গালমন্দ বলিব না এবং তোমার আঘাতের জওয়াবেও আমি তোমার উপর আঘাত হানিব না— তোমার সহিত মারামারিতে লিপ্ত হইব না। এই কথা শোনার পর প্রতিপক্ষ অবশ্যই শান্ত, হীনবীর্য ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িবে। রোযাদারের জন্য রোযা বাস্তবিকই অতিবড় ঢাল, তাহা এই সময়ে মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়।

(المرقات)

রোযাদারের সৌভাগ্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَتْ أُمَّتِيْ خَمْسَ خِصَالٍ فِيْ رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ . خُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يُفْطِرُوْا . وَيُزَيِّنُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ يُوْشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ أَنْ يُلْقُوْا عَنْهُمُ الْمُؤْنَةَ وَالْأَذٰى وَيَصِيْرُوْا إِلَيْكِ وَيُصَفَّدُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَا يَخْلُصُوْا إِلٰى مَا كَانُوْا يَخْلُصُوْنَ فِيْ غَيْرِهِ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِيْ آخِرِ لَيْلَةٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفّٰى أَجْرَهُ إِذَا قَضٰى عَمَلَهُ .

(مسند احمد، بيهقي، المنذري)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করা হয়, যাহা তাহাদের পূর্বের কোন উম্মতকে দেওয়া হয় নাই। সে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য হইলঃ রোযাদারের মুখের বিকৃত গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিশ্‌কের সুগন্ধি হইতেও উত্তম, যতক্ষণ না ইফতার করে ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিতে থাকে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক দিন তাঁহার জান্নাতকে সুসজ্জিত করিয়া রাখেন; অতঃপর (জান্নাতকে সম্বোধন করিয়া) বলিতে থাকেনঃ আমার নেক বান্দাদের বৈষয়িক শ্রম, দায়িত্ব ও কষ্ট-নির্যাতন শীঘ্রই দূর করা হইবে। তাহারা তোমার নিকট পরিণতি পাইবে। এই মাসে প্রধান দুষ্কৃতিকারী শয়তানদিগকে রশি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইবে। অতঃপর তাহারা মুক্ত হইবে না যেমন তাহারা মুক্ত থাকে রমযান ছাড়া অন্য সময়ে। আর নেক বান্দাদের জন্য শেষ রাত্রে মাগফিরাত দান করা হইবে। প্রশ্ন করা হইল, হে রাসূলুল্লাহ! ইহা কি কদর রাত্রির কথা? বলিলেনঃ 'না, কিন্তু আমলকারী যখন তার আমল সম্পূর্ণ করিবে, তখন তাহার প্রতিফল তাঁহাকে পুরাপুরি আদায় করিয়া দেওয়া হইবে। —মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, আল-মুন্‌যেরী

ব্যাখ্যা হাদীসটি রোযাদারদের জন্য বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক এবং পরম সৌভাগ্য সুসংবাদদাতা। রাসূলে করীম (স)-এর উম্মতকে রমযান মাসের রোযা রাখার ফলে পাঁচটি বিশেষ সৌভাগ্য দানের কথা বলা হইয়াছে। এই উম্মত কাহারা? — যাহারা রাসূলে করমী (স)-এর দ্বীনের দাওয়াত সর্বান্তঃকরণে কবুল করিয়াছে ও সেই অনুযায়ী জীবন-যাপন করিতেছে এবং দ্বীনের সব আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করিতেছে।

প্রথম সৌভাগ্য হইল, রোযাদারের মুখে বিকৃত গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মিশ্‌ক-এর গন্ধ হইতেও অধিক প্রিয়। রোযাদার সারাদিন কিছুই পানাহার করে নাই। এইজন্য মুখে এক প্রকার গন্ধ স্বাভাবিকভাবেই জন্মে; যাহাকে অনেকে বিদ্রূপ করে ও দুর্গন্ধ বলে। কিন্তু উহা যতই দুর্গন্ধ (?) হউক-না-কেন, উহা আল্লাহ্‌র নিকট সাধারণ সুগন্ধি হইতেও অধিক প্রিয়। কেননা মুখের এই গন্ধ বিকৃতি ঘটিয়াছে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করিতে গিয়া রোয পালনের ফলে সারাদিন কিছুই পানাহার না করার দরুন। আর এই কাজ যে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি।

দ্বিতীয় সৌভাগ্য হইল, তাহারা যতক্ষণ রোযাদার থাকিবে ইফতার করিবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত চাহিতে থাকিবে। রোযাদারদের জন্য ফেরেশতাদের এই মাগফিরাত চাওয়া যে তাহাদের বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার, তাহা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় সৌভাগ্যের বিষয় হইল, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দিন তাঁহার জান্নাতকে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিবেন, প্রত্যেক দিন উহাকে নূতন করিয়া সজ্জিত করিবেন এবং জান্নাতকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকিবেন, আমার নেক বান্দাদের সব বৈষয়িক কষ্ট-শ্রম ক্লেশ ও পীড়ন দূর হইয়া গেলে তাহারা এই জান্নাতে আসিয়া প্রবেশ করিবে। দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর এই জান্নাতই হইবে তাহাদের শেষ পরিণতি, শেষ আশ্রয়স্থল। এখানে 'নেক বান্দা' বলিয়া যে রোযাদার—রীতিমত রোযা পালনকারীমুসলমানদের—কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুত দুনিয়ায় সব মানুষকেই—আল্লাহ্‌র নেকবান্দাদেরকেও—সন্তান পালন ও পরিবার বহনের জন্য প্রাণান্তকর খাটা-খাটনি করিতে হয়। সেইজন্য অনেক কষ্ট ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় এবং দুনিয়ার জীবনে নানা প্রতিকূল অবস্থায় অনেক অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ইহা অশেষ নয়। ইহার চূড়ান্ত অবসান হয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। আর মৃত্যু অবধারিত। এই মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পরই রোযাদার নেক-বান্দারা জান্নাতবাসী হইবে। দুনিয়ার শত শত কষ্ট ও দুঃখের মাঝেও তাহারা যে রোযা পালনের কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, এই জান্নাত হইবে তাহাদের এই আমলের পরিণাম।

চতুর্থ এই যে, রোযার মাসে শয়তানের দলের প্রধান প্রধান দুষ্কৃতিকারীদিগকে বাঁধিয়া রাখা হয়—সব শয়তানকে নয়। তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখার ফলে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজ এই মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক কম হইয়া থাকে। ফলে সমগ্র পরিবেশ ঈমানদার লোকদের জন্য খুবই অনুকূল হইয়া পড়ে। নেক আমলের পথে প্রতিকূলতা অনেকখানি হ্রাস পাইয়া যায়।

পঞ্চম এই যে, সারা রোযার মাসের শেষরাত্রে তাহাদের জন্য গুনাহ মাফী দেওয়া হয়। রোযার মাসে তাহারা যেন নেক কাজ করে, এই মাফী তাহারই প্রতিফল। কিন্তু ইহা কদর রাত্রিতে প্রাপ্তব্য ক্ষমা হইতে ভিন্নতর। এই মাফী কেবল তাহারাই পাইবে, যাহারা রমযান মাস রোযা রাখিবে ও প্রতিমুহূর্ত আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমাসমূহ রক্ষা করিয়া চলিবে। কিন্তু যাহারা রোযা রাখিবে না, তাহারা এই মাফী পাইবে না। তাহারা পাইবে অপমান ও লাঞ্ছনা—দুনিয়া ও আখিরাত—উভয়ক্ষেত্রেই।

রোযার পরকালীন ফল

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ- (بخارى، مسلم، ترمذى، نسائى، ابوداؤد، ابن ماجه، مسند احمد)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইবে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স)

ঘোষণা করিয়াছেনঃ যে লোক রমযান মাসের রোযা রাখিবে ঈমান ও চেতনাসহকারে, তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

—বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা রমযানের রোযা ফরয রোযা। এই রোযা যথাযথভাবে রাখার জন্য এই হাদীসে বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক সুসংবাদ দান করা হইয়াছে। এই পর্যায়ে দুইটি শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। একটি إِيمَانًا আর দ্বিতীয়টি اِحْتِسَابًا এখানে প্রথম শব্দটির অর্থ, নিয়্যত এবং দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ দৃঢ়সংকল্প। অর্থাৎ রোযা রাখিতে হইবে ঈমান সহাকারে, এই বিশ্বাস সহকারে যে, রোযা আল্লাহ্ তা'আলাই ফরয করিয়াছেন এবং মুসলমান হিসাবে ইহা আমার অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত এই রোযা রাখিতে হইবে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে, লোক দেখানোর জন্য নয় এবং রাখিতে হইবে এই আশায় যে, এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে বিশেষ সওয়াব ও প্রতিফল পাওয়া যাইবে। উপরন্ত এইজন্য মনে দুরন্ত ইচ্ছা বাসনা ও কামনা থাকিতে হইবে। রোযা রাখার প্রতি একবিন্দু অনীহা ও বিরক্তিভাব থাকিতে পারিবে না, উহাকে একটা দুর্বহ বোঝা মনে করিতে পারা যাইবে না—রোযা রাখা যতই কষ্টকর হউক না কেন। বরং রোযার দিন দীর্ঘ হইলে ও রোযা থাকিতে কষ্ট অনুভূত হইলে উহাকে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আরো বেশী সওয়াব পাওয়ার কারণ মনে করিতে হইবে। বস্তুত এই ধরনের মন ও মানসিকতা সহকারে রোযা রাখা হইলে উহার ফলস্বরূপ অতীতের যাবতীয় গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

রোযার বিনিময়ে গুনাহ মাফ হইবে। হাদীসের শাব্দিক ঘোষণার আলোকে স্পষ্ট হয় যে, সগীরা-কবীরা সর্বপ্রকার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সীমা-শেষহীন। কিন্তু এ পর্যায়ে হাদীসবিদদের সিদ্ধান্ত এই যে, কেবলমাত্র সগীরা গুনাহই মাফ হইবে, কবীরা নয়। কেননা কবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ না হওয়া সম্পর্কে কোন দ্বিধা বা সন্দেহ নাই। ইমাম নববী অবশ্য হাদীসের সাধারণ ঘোষণার প্রেক্ষিতে কেবল সগীরা গুনাহ মাফ হইবে বলার আপত্তি জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ গুনাহ মাফীর কাজগুলি যদি সমস্ত গুনাহ মাফ করাইবার মত হয়, তবে উহা তাহাই করিবে। কবীরা গুনাহ্ মাফীর মত আমল হইলে তাহাও মাফ হইয়া যাইবে। আর কবীরা গুনাহ্ না থাকিলে ইহার দরুন জান্নাতে রোযাদারের মর্যাদা অনক বৃদ্ধি পাইবে। কোন কোন হাদীসবিদ মনে করেন, সগীরার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু কবীরা গুনাহও যে মাফ হইবে না—সেইরূপ ধারণা ঠিক নয়। বরং কবীরা গুনাহের মাফী পাওয়ারও আশা মনে মনে পোষণ করা আবশ্যক।

[উদ্ধৃত হাদীসটির শেষ শব্দটি وَمَا تَأَخَّرَ কেবলমাত্র মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় বড়তি শব্দ হিসাবে আসিয়াছে। অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই শেষ শব্দটি নাই।]

(معالم السنن - بلوغ الاماني - تحفة الاحوذى)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ فَاِذَا دَخَلَ اٰخِرُهُمْ اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ۔ (بخارى، مسلم)

হযরত সহল ইবনে সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ বেহেশতের একটি দুয়ার আছে, উহাকে 'রাইয়্যান' বলা হয়। এই দ্বারপথে কিয়ামতের দিন কেবলমাত্র রোযাদার লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। তাহাদের ছাড়া অন্য কেহ এই

পথে প্রবেশ করিবে না। সেদিন এই বলিয়া ডাক দেওয়া হইবেঃ রোযাদাররা কোথায়? তাহারা যেন এই পথে প্রবেশ করে; এইভাবে সকল রোযাদার ভিতরে প্রবেশ করার পর দুয়ারটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর এই পথে আর কেহই প্রবেশ করিবে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা রোযাদারের ত্যাগ ও তিতিক্ষা অনুপাতে যে তাহাকে রোযার প্রতিফল দেওয়া হইবে, উপরিউক্ত হাদীসটিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় তাহা বলা হইয়াছে। বস্তুত রোযাদারের পিপাসার্ত থাকাই তাহার সর্বাপেক্ষা বড় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার। এই কারণে তাহাকে উহার যে প্রতিফল দেওয়া হইবে, তাহাতে পিপাসার বিপরীত অধিক বেশী পানীয় পান করার ও পান করিয়া পিপাসার জ্বালা নিবৃত্ত করার ব্যবস্থা থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। হাদীসটিতে জান্নাতের যে দরজা দিয়া প্রবেশ করার কথা বলা হইয়াছে, পিপাসার্তের প্রতিফলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহার নামকরণ করা হইয়াছে 'রাইয়্যান' (رَيَّانَ) ইহার অর্থ 'সদা-প্রবহমান প্রস্রবণ'। ইহার বিপরীত শব্দ عَطْشَانَ খুব বেশী পিপাসার্ত, 'পিপাসা-জর্জরিত'। রোযাদার রোযা থাকিয়া দুনিয়ার জীবনে নিরতিশয় পিপাসা কষ্ট ভোগ করিয়াছে—করিয়াছে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য। এই কারণে তিনিই তাহাদিগকে পরকালে 'চিরনির্ঝর' দ্বারপথে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। যেন তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিলেই চির জীবনের পিপাসা নিবৃত্ত করার সার্থক সুযোগ লাভ করিতে পারে। নাসায়ী ও ইবনে খুযায়মা উদ্ধৃত হাদীসে তাই বলা হইয়াছেঃ

مَنْ دَخَلَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَا يَظْمَأُ اَبَدًا -

যে লোকই সেই দ্বারপথে প্রবেশ করিবে, সে-ই পান করিবে। আর যেই পান করিবে, সে আর কোন দিনই পিপাসার্ত হইবে না।

হাদীসের ভাষা হইল · اِنَّ فِى الْجَنَّةِ · জান্নাতের মধ্যে · اِنَّ لِلْجَنَّةِ · জান্নাতের জন্য বলা হয় নাই। এইভাবে বলিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, জান্নাতের এই বিশেষ দরজাটিতে এমন সব নিয়ামত ও সুখ-আনন্দ সমগ্রী রহিয়াছে, যাহা জান্নাতের ভিতরে নাই। সেই সঙ্গে উহার প্রতি অধিকতর উৎসাহী ও আগ্রহান্বিত হইয়া উহা লাভ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিতও করা হইয়াছে।

কিয়ামতের দিন এই দ্বারপথে কেবলমাত্র রোযাদাররাই প্রবেশ করিবে। হাশরের ময়দানে রোযাদার কে কোথায় রহিয়াছে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনা হইবে ও সেই দরজা দিয়া জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে। এইভাবে সব রোযাদারের প্রবেশ সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ার পর—প্রবেশ করার মত আর একজনও যখন বাহিরে পড়িয়া থাকিবে না, তখন সেই দরজাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সেই পথে আর কেহই প্রবেশ করিবে না। এই সম্পূর্ণ কথাটিই রোযাদারদের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ও নিয়ামতদানের ব্যবস্থা করার কথাই বুঝাইয়াছে। বস্তুত যে ধরনের উত্তম ও বিশেষ প্রতিফল রোযাদারগণকে দেওয়া হইবে তাহা আর কাহাকেও দেওয়া হইবে না। (فتح المبدى)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا -

(بخارى، مسلم، ترمذى، نسائى، ابن ماجه، مسند احمد،)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছিঃ যে লোক একটি দিন আল্লাহ্‌র পথে রোযা রাখিবে, আল্লাহ্‌ তাহার মুখমণ্ডলকে জাহান্নাম হইতে সত্তর বৎসর দূরে সরাইয়া রাখিবেন।

—বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে রোযার পরকালীন শুভফলের একটি দিক ঘোষিত হইয়াছে। যে লোক একটি দিন রোযা রাখিবে, আল্লাহ্‌ তাহাকে কখনো জাহান্নামে যাইতে দিবেন না। জাহান্নাম হইতে তাহাকে বহুদূরে সরাইয়া রাখিবেন। কিন্তু এই রোযা 'ফী-সাবিলিল্লাহ্‌-আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাইবার আশায়— রাখিতে হইবে। এই রোযা রাখার দরুন কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা চলিবে না, কোন 'হক' বা অধিকার নষ্ট করা চলিবে না। এমনকি রোযার মাসে কাফিরদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়া ইহার কারণে বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারিবে না।

এইরূপ রোযাদারকে 'আল্লাহ্‌ তা'আলা জাহান্নাম হইতে দূরে রাখিবেন' অর্থ তাহাকে জাহান্নাম হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। 'সত্তর খরীফ' অর্থ সত্তর বৎসর। 'আর সত্তর বৎসর' পরিমাণ পথের দূরত্ব হয় ২১০ মাইল। এখানে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বই আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য বহু-বহু দূরত্বে রাখার, তাহার গায়ে জাহান্নামের একবিন্দু আঁচও না-লাগানোর কথা বুঝানো হইয়াছে।

রোযা না রাখার অনুমতি

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض فِي قَوْلِهِ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيْرَةِ وَهُمَا يُطِيْقَانِ الصِّيَامَ اَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ اِذَا خَافَتَا يَعْنِيْ عَلَى اَوْلَادِهِمَا اَفْطَرَتَا وَاَطْعَمَتَا - (ابوداؤد)

কুরআন মজীদের আয়াতঃ যাহারা রোযা রাখিতে সমর্থ (বা সমর্থ নয়), এক দরিদ্র ব্যক্তির খাবার বিনিময় মূল্য হিসাবে দেওয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলিয়াছেনঃ থুরথুরে বৃদ্ধ ও খুব বেশী বয়সের বৃদ্ধার জন্য রোযা রাখিতে সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও এই সুবিধাদান করা হইয়াছে যে, তাহারা দুইজন রোযা ভাঙ্গিবে (রোযা রাখিবে না) আর প্রত্যেকটি দিনের রোযার পরিবর্তে একজন গরীব-ফকীর ব্যক্তিকে খাওয়াইবে। এবং গর্ভবতী ও যে স্ত্রীলোক শিশুকে দুগ্ধ সেবন করায়—এই দুইজন যদি তাহাদের সন্তানদের ব্যাপারে আশংকাবোধ করে, তবে তাহারা রোযা ভাঙ্গিবে ও মিসকীন খাওয়াইবে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা কুরআন মজীদের এই আয়াতটি সূরা আল-বাকারার ১৮৪ নম্বর আয়াত। এই আয়াতটি সম্পর্কে তফসীরকার ও হাদীসবিদদের মধ্যে বিশেষ মতভেদের উদ্ভব হইয়াছে। উপরিউক্ত হাদীসটিতে হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার মত হইল, এই আয়াতটি শাশ্বত। ইহার অর্থ ও তাৎপর্য চির কার্যকর। এই আয়াত অনুযায়ী গর্ভবতী বা যে মেয়েলোক নিজের গর্ভজাত সন্তানকে দুগ্ধ সেবন করায় তাহাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রহিয়াছে। যে বৃদ্ধ বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে, তাহাকে রোযা রাখিতে হইবে। সে বিনিময় মূল্য—ফিদইয়া—দিয়া রোযা রাখার দায়িত্ব এড়াইতে পারিবে না। কিন্তু গর্ভবতী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা—যে

দুগ্ধ সেবন করায়—রোযার মাসে রোযা ভাঙ্গিলে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন করিয়া ফকীর খাওয়াইতে হইবে এবং অসুবিধার সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর রোযা কাযা করিতে হইবে। তাহাদের উপর না-রাখা রোযা কাযা করিবার বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সঙ্গে মিসকীন খাওয়াইবার দায়িত্ব এইজন্য চাপানো হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের নয়, অন্যের কারণে রোযা ভাঙ্গিতেছে। 'রোযা রাখিলে গর্ভস্থ কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি হইবে' এই ভয় ও আশংকাই তাহাদের রোযা ভাঙ্গার মূল কারণ, পক্ষান্তরে থুরথুরে নড়বড়ে বৃদ্ধকে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও মিসকীন খাওয়ানোর দায়িত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কেননা সে রোযা ভাঙ্গিতেছে নিজের দৈহিক অক্ষমতার কারণে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুজাহিদ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু যে থুরথুরে নড়বড়ে বৃদ্ধ রোযা থাকিতে অক্ষম, সে শুধু মিসকীন খাওয়াইবে। তাহাকে রোযা কাযা করিতে হইবে না। হযরত আনাস (রা) হইতে এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যখন খুব বেশী বয়োবৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি নিজেই ইহা করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আওযায়ীর এই মত। ইমাম আওযায়ী, সওরী এবং হানাফী মাযহাবের লোকেরা বলিয়াছেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা না-রাখা রোযা শুধু কাযা করিবে, মিসকীন খাওয়াইতে হইবে না। এই দুইজনের অবস্থা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মত। হাসান বসরী, আতা, নখয়ী ও যুহ্‌রী হইতেও ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মালিক ইবনে আনাস বলিয়াছেন, গর্ভবতী নারী 'রোগীর' মতই শুধু রোযা করিবে, মিসকীন খাওয়াইবে না। আর শিশুকে দুগ্ধ সেবন করাইবার কারণে যে স্ত্রীলোক রোযা ভাঙ্গিবে, সে মিসকীনও খাওয়াইবে এবং রোযা কাযাও করিবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ اَنْ يُّفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَّلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ - (دارقطنى)

থুরথুরে নড়বড়ে বৃদ্ধকে রোযা ভাঙ্গার প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানোর সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে না-রাখা রোযা কাযা করিতে হইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, একজন গর্ভবতী কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর জননীকে তিনি বলিয়াছিলেনঃ

اَنْتِ مِنَ الَّذِيْنَ لَايُطِيْقُوْنَ الصِّيَامَ عَلَيْكِ الْجَزَاءُ وَلَاعَلَيْكِ الْقَضَاءُ -

যাহারা রোযা রাখিতে অসমর্থ, তুমিতো তাহাদের মধ্যে গণ্য। অতএব তোমার ফিদইয়া দেওয়াই যথেষ্ট। কাযা করিবার প্রয়োজন নাই।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর এক জননীকে তিনি বলিয়াছিলেনঃ তুমি রোযা ভাঙ্গ। তোমাকে কাযা করিতে হইবে না।

এই বর্ণনা কয়টির সনদ খুবই মজবুত এবং গ্রহণযোগ্য। (تفسير القرطبى - معالم السنن)

রোযা ও কুরআনের শাফা'আত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ

اَلصِّيَامُ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ ـ (بيهقى ، شعب الايمان)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ রোযা ও কুরআন রোযাদার বান্দার জন্য শাফা'আত করিবে। রোযা বলিবে, 'হে আল্লাহ্! আমিই এই লোকটিকে রোযার দিনগুলিতে পানাহার ও যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হইতে বিরত রাখিয়াছি। অতএব তুমি ইহার জন্য আমার শাফা'আত কবুল কর। আর কুরআন বলিবেঃ 'হে আল্লাহ্! আমিই তাহাকে রাত্রিকালে নিদ্রামগ্ন হইতে বাধাদান করিয়াছি। কাজেই তাহার জন্য আমার শাফা'আত গ্রহণ কর। [রাসূলে করীম (স) বলিলেন] অতঃপর এই দুইটি জিনিসের শাফা'আত কবুল করা হইবে। —বায়হাকীঃ শুআবিল ঈমান

ব্যাখ্যা যে লোক সত্যই রোযা পালন করিবে, তাহার জন্য স্বয়ং রোযাই কিয়ামতের দিন শাফা'আত করিবে। জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্র নিকট আবেদন জানাইবে। বস্তুত রোযা আল্লাহ্রই ফরয করা কর্মানুষ্ঠান। দুনিয়ায় ইহার কোন দৈহিক অস্তিত্ব পরিলক্ষিত না হইলেও কিয়ামতের দিন ইহা শরীরী হইয়া দাঁড়াইবে এবং কাহারও পক্ষে তাঁহার কোন আবেদন নিবেদন যে আল্লাহ্র নিকট গ্রাহ্য হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অনুরূপভাবে যে লোক রোযার রাত্রিগুলিতে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিবে বা অন্যের তিলাওয়াত মনোযোগ সহকারে শুনিবে এবং এই কুরআন তিলাওয়াতের জন্যই যে লোক রাত্রির মধু নিদ্রা পরিহার করিবে, কুরআন শরীফ নিজেই তাহার পরকালীন মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট বলিষ্ঠ সুপারিশ পেশ করিবে।

কুরআন শরীফ আল্লাহ্র নিজের কালাম। উহা যাহার মুক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ রাখিবে, তাহা যে তাঁহার নিকট সাদরে গৃহীত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

বস্তুত যে বান্দা কিয়ামতের দিন এই দুইটি মহান জিনিসের সুপারিশ ও শাফা'আত লাভ করিবে, সেই লোক যে কত বড়ই সৌভাগ্যবান, তাহা বর্তমান সময়ে অনুধাবন করিতে না পারিলেও কিয়ামতের দিন অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিবে। অতএব এই সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য এই দুনিয়ায় যেমন রোযা থাকা আবশ্যক, তেমনি রাত্রিকালে কুরআন তিলাওয়াত করাও বাঞ্ছনীয়।

ব্যর্থ রোযা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ـ (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক মিথ্যা কথা ও মিথ্যার আমল পরিত্যাগ করিল না, তাহার খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোনই প্রয়োজন নাই। —বুখারী

ব্যাখ্যা রোযার মোটামুটি ও সোজাসুজি ব্যবস্থা হইল পানাহার পরিত্যাগ করা। কিন্তু মূলত কেবলমাত্র পানাহার পরিত্যাগ করারই নাম রোযা নয়। এই পানাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের স্থির সংকল্প সহকারে। কেহ যদি এই ভাবধারার সহিত রোযা রাখে, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা আমল করা—উভয়ই তাহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সর্বোপরি, রোযা যে আল্লাহ্র জন্য, সেই আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ বিধান পালন করিয়া জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় সংহতি ও সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হইবে। রোযা রাখা ও সেই সঙ্গে মিথ্যা কথা বলা মিথ্যা ও অশ্লীল কাজ-কর্ম করা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী ব্যাপার। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধানের উদ্দেশ্যই হইল মানব জীবনের সবদিকের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন। কিন্তু যে লোক রোযা রাখিয়াও মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যা কাজ করে, সে কার্যত রোযার অপমান করে, লোকদের সামনে রোযাকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে।

আরবী ভাষায় زُوْرٌ শব্দটির শাব্দিক অর্থঃ কোন্ একদিকে ঝুঁকিয়া পড়া। এই হিসাবে উহার ব্যবহারিক অর্থঃ মিথ্যা, অসত্য বাতিল। ইহাকে زُوْرٌ বলা হয় এইজন্যই যে, এই কয়টিই সত্য বিরোধী, সত্য হইতে বিচ্যুত। ইমাম কুরতুবী লিখিয়াছেনঃ

كُلُّ مَا عَدَا الْحَقِّ فَهُوَ كَذِبٌ وَبَاطِلٌ وَزُوْرٌ ـ

যাহাই সত্যের পরিপন্থী, তাহাই মিথ্যা, বাতিল ও বিপরীত দিকে ঝুঁকিয়া পড়া।

নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ الشِّرْكَ بِاللّٰهِ ـ

মিথ্যা সাক্ষ্যদান আল্লাহ্র সাথে শিরক করার সমান অপরাধ।

অপর এক হাদীসে নবী করীম (স)-এর বাণী উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

اِنَّ اَكْبَرَ الْكَبَائِرِ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ ـ

(تفسير القرطبى)

আল্লাহ্র সহিত শিরক করা, পিতামাতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দান ও মিথ্যা কথা বলা—এইসব কয়টিই হইল সবচাইতে বড় কবীরা গুনাহ্।

এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আলোচ্য হাদীসটির মূল কথাঃ যে লোক রোযা থাকিয়া মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আমল পরিহার করিতে পারিল না, তাহার এই পানাহার ত্যাগ করার আল্লাহ্র কোনই প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট এই পানাহার পরিহার 'রোযা' রূপে গৃহীত হইবে না। আর আল্লাহ্র নিকটই যদি তাহা গৃহীত না হইল, তবে ক্ষুধা পিপাসায় কষ্ট পাওয়া নিতান্তই অর্থহীন। একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا وَالْكَذِبَ ـ

যে লোক অশ্লীল কথাবার্তা ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিল না, তাহার পানাহার পরিত্যাগ করা আল্লাহ্র কিছুমাত্র পছন্দনীয় নয়। (فتح الملهى)

এই হাদীসটির উদ্দেশ্য হইল রোযাদারের চরিত্র সংশোধন করা, রোযা রাখার ফলে রোযাদারকে পুরাপুরি ইসলামী আদর্শবাদী ও ইসলামী চরিত্রে মহীয়ান করিয়া তোলাই হইল রোযা রাখার উদ্দেশ্য। রোযাদার রোযা রাখিবে আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়াই সমস্ত মিথ্যা ইসলামের পরিপন্থি কাজকে—সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া চলিবে। রাসূলে করীম (স) ইহাই চাহিয়াছেন।

সফরে রোযা

عَنِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى رض قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلشَّمْسُ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلشَّمْسُ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهٗ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمٰى بِيَدِهٖ هٰهُنَا ثُمَّ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ ـ (بخارى، مسلم، ابوداؤد، نسائى)

হযরত ইবনে আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমরা কোন এক সফরে রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় রাসূলে করীম (স) এক ব্যক্তিকে বলিলেনঃ অবতরণ কর ও আমার জন্য ছাতু তৈরী কর। লোকটি বলিলঃ 'হে রাসূল। ঐ দেখুন সূর্য (এখনো অস্ত যায় নাই)।' (পরে আর এক সময়) বলিলেনঃ অবতরণ কর ও আমার জন্য ছাতু তৈরী কর। লোকটি বলিল, 'ইয়া রাসূল! সূর্যের দিকে তাকান।' (পড়ে আর এক সময়) বলিলেনঃ অবতরণ কর ও আমার জন্য ছাতু তৈরী কর। লোকটি অবতরণ করিয়া ছাতু তৈরী করিল। নবী করীম (স) তাহা পান করিলেন। পরে তাঁহার হাত দ্বারা ঈঙ্গিত করিয়া একদিকে দেখাইলেন ও বলিলেনঃ তোমরা যখন দেখিবে, এইদিক হইতে রাত্র অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তখন যেন রোযাদারের ইফতার করা হইয়া যায়। —বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা হাদীসে একটি সফরকালীন ঘটনার উল্লেখ হইয়াছে। এই সফর যে রমযান মাসে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা হাদীসের পরবর্তী কথা—রাসূলে করীম (স)-এর ইফতার করার—উল্লেখ হইতেই জানা যায়। বিশেষত মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এই কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হইয়াছে। তাহা হইলঃ

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ ـ

আমরা রমযান মাসে অনুষ্ঠিত এক সফরে রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গী ছিলাম।

কিন্তু রমযান মাসে অনুষ্ঠিত এই সফর কোনটি?- রমযান মাসে তো তিনি একটি সফর করেন নাই, দুইটি করিয়াছেন। একটি বদর যুদ্ধকালে আর একটি মক্কা বিজয়ের সময়ে। কিন্তু বদর যুদ্ধকালীন সফরে হযরত ইবনে আবূ আওফা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে ছিলেন না। তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই মক্কা বিজয় উপলক্ষে গৃহীত সফর সংক্রান্ত ঘটনা হইবে।

হাদীসে এক ব্যক্তিকে ছাতু তৈরী করার জন্য নির্দেশ দেওয়ার উল্লেখ হইয়াছে। এই ব্যক্তির নামরে উল্লেখ উপরোদ্ধৃত বর্ণনায় না থাকিলেও তিনি ছিলেন হযরত বিলাল (রা)। আবূ দাউদের বর্ণনার ভাষা হইলঃ

فَقَالَ يَا بِلَالُ اَنْزِلْ ـ বলিলেন, হে বিলাল, অবতরণ কর।

আর এই অবতরণ করিয়া ছাতু তৈরী করার নির্দেশ দিয়াছিলেন তখন, যখন তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সূর্য বুঝি অস্ত গিয়াছে এবং ইফতার করিবার সময় হইয়া গিয়াছে। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় ইহার উল্লেখ হইয়াছেঃ

فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ ـ সূর্য যখন অদৃশ্য হইয়া গেল—

কিন্তু সূর্য তখন পর্যন্ত অস্ত যায় নাই। এইজন্যই হযরত বিলাল (রা) প্রথম দুইবারে দৃশ্যমান সূর্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরে সূর্য যখন বাস্তবিকই অস্তমিত হইয়া গেল, তখন উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া 'ছাতু' তৈরী করিয়া দিলেন। দুগ্ধ বা সাদা পানির সাথে যবের গুড়া গুলিয়া ছাতু তৈরী করা হইত এবং উহা দ্বারাই নবী করীম (স) ইফতার করিয়াছেন বলিয়া এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীসের শেষাংশে নবী করীম (স)-এর যে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ইফতার করার সময় নির্দেশ করা হইয়াছে। পূর্বদিগন্তের দিকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিয়াছিলেনঃ 'তোমরা যখন এই দিক হইতে রাত্র অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখিবে-' আর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ وَاَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ ـ (ترمذى)

রাত্র যখন অগ্রসর হইয়া আসিবে, দিন যখন পশ্চাদপসরণ করিবে ও সূর্য যখন অস্তগমন করিবে, তখনই ইফতার করা সম্পন্ন করিয়া ফেলিবে।

বস্তুত 'রাত্রি অগ্রসর হওয়া' ও দিনের 'পশ্চাদপসরণ করা' এবং সূর্যের অস্তগমন এই তিনটি ব্যাপারই পরস্পর সংযুক্ত। একই সময় কালে একসঙ্গে সংঘটিত তিনটি ঘটনা। একটি অপরটির পরিপূরক। কেননা রাত্র অগ্রসর হইয়া আসে কেবল তখনই, যখন দিন অপসৃত হয়। আর দিন অপসৃত হয় না যতক্ষণ সূর্য অস্ত না যায়। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিন অপসৃত হয়। কাযী ইয়ায বলিয়াছেনঃ অনেক সময় সূর্যের মূল অস্তগমনটি পর্যাবেক্ষিত হয় না। শুধু দেখা যায় অন্ধকারের পূঞ্জীভূত হইয়া আসা। ইহাতেই প্রত্যয় হয় যে, সূর্য অস্ত গিয়াছে। তখনই ইফতার করা জায়েয হয়। আর এই তিনটি ব্যাপারে যে কোন একটির সংঘটিত হওয়া পর্যবেক্ষিত হইলেই সেই সঙ্গে অপর দুইটিও সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। এই কারণে হযরত ইবনে আবী আওফা বর্ণিত আলোচ্য হাদীসে এই তিনটি কাজের একটি কেবল রাত্রির অগ্রসর হইয়া আসার কথাই বলা হইয়াছে। অন্য দুইটির উল্লেখ উপরোদ্ধৃত হাদীসটিতে নাই।

আলোচ্য হাদীস হইতে জানা গেল, নবী করীম (স) সফরে থাকিয়াও রোযা রাখিয়াছেন। এইজন্যই তো ইফতারের ব্যবস্থা করার জন্য নবী করীম (স) বারবার নির্দেশ দিয়াছেন। অথচ সফলকালে রোযা না রাখার অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়াছেন। বলিয়াছেনঃ

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ـ (البقرة:١٨٥)

(রমযান মাসে) যে লোক রোগাক্রান্ত হইবে কিংবা বিদেশ সফরে থাকিবে, তাহার জন্য ভিন্ন দিনের রোযা রাখা বৈধ।

আর রোযা ভঙ্গের এই অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে জন্য, তাহাও আল্লাহ্ই বলিয়া দিয়াছেনঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজতর আচরণ করিতে চাহেন, কাঠিন্য ও কষ্টের আচরণ করিতে চাহেন না।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে বিদেশ সফরে ব্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে রোযা না রাখার অনুমতি সত্ত্বেও আলোচ্য হাদীস হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (স) মক্কা বিজয় সংক্রান্ত কষ্টসাধ্য সফরকালেও রোযা রাখিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রমযান মাসে সফরকালেও রোযা রাখা রোযা না-রাখা অপেক্ষা অনেক উত্তম। এই পর্যায়ে সাহাবী হইতে পরবর্তী কালের ফিকাহ্‌বিদদের পর্যন্ত ইসলামী বিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস, আবূ সাইদ, ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব, আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়র, হাসান বসরী, নখয়ী, মুজাহিদ, আওযায়ী ও লাইস প্রমুখ ফিকাহবিদের মত হইল, এ ব্যাপারে ব্যক্তির ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের উপরই সবকিছু নির্ভর করে। ইচ্ছা কারলে রোযা রাখিতেও পারে, আবার ইচ্ছা হইলে রোযা ভাঙ্গিতে এবং না রাখিতেও পারে। এই ব্যাপারে দলীলস্বরূপ অপর একটি হাদীসও উল্লেখ করা যায়। একটি লোক বলিলঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَصُوْمُ اَفَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ-

হে রাসূল! আমি তো রোযা রাখার লোক। জানিতে চাহি যে, আমি সফরেও কি রোযা রাখিব?

জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ

اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ- ইচ্ছা হইলে রোযা রাখ, ইচ্ছা হইলে রোযা ভাঙ্গ। —মুয়াত্তামালিক

অপর কিছু লোকের মতে রোযা রাখা না রাখার তুলনায় উত্তম। উমর ইবনে আবদুল আযীয, শা'বী, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ ইবনে আলী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক্ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইবনুল আরাবীর বর্ণনানুযায়ী শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা বলিয়াছেঃ

اَلْفِطْرُ اَفْضَلُ فِى السَّفَرِ- সফরকালে রোযা না রাখা উত্তম। কিন্তু কাযী ইয়ায বলিয়াছেনঃ

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ اَنَّ الصَّوْمَ اَفْضَلُ- শাফেয়ী মাযহাবে সফরেও রোযা রাখা উত্তম।

হযরত হুযায়ফা (রা) রোযার মাসের সফরে কখনো রোযা রাখিতেন না। আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ,ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সঙ্গিগণও এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।[১] হযরত আমর, আবূ হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ

اِنْ صَامَ فِى السَّفَرِ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِى الْحَضَرِ-

সফরে রোযা রাখিলে তাহা যথেষ্ট হইবে না। সফর শেষ করিবার পর উহা কাযা করিতে হইবে।

---

১. এ বিষয়ে ভিন্নতর মত হইলঃ

আইম্মা-ই-মুজতাহিদগণের সম্মিলিত মতামত এই যে,সফরকালে রোযা রাখা এবং না-রাখা—উভয়ই বৈধ। কিন্তু রোযা রাখা উত্তম, না রোযা না রাখা উত্তম এই বিষয়ে মতভেদ। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী বলেন, যাহার রোযা রাখিবার শক্তি আছে, তাহার রোযা রাখা উত্তম। কেহ কেহ বলেন, যাহার জন্য যাহা সহজ সে পদ্ধতি অবলম্বন করাই উত্তম।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলিয়াছেনঃ

اَلصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ۔

সফরকালে রোযা ব্যাক্ত অ-সফরকালে রোযা ভঙ্গকারী ব্যক্তির ন্যায়।

পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা (রা) কাইস ইবনে উব্বাদ, আবুল আসওয়াদ, ইবনে সিরীন, ইবনে উমর, সালেম, আমর ইবনে মায়মুন, আবূ ওয়ায়েল প্রমুখ সফরেও রোযা রাখিতেন; রোযা ভাঙ্গিতেন না। হযরত আলী (রা) বলিয়াছেনঃ

مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيْمٌ ثُمَّ سَافَرَ فَقَدْ لَزِمَهُ الصَّوْمُ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۔

যে লোক নিজের বাড়ীতে থাকিয়া রমযান মাস পায় এবং পরে সফর করে, তাহার পক্ষে রোযা থাকা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ যে লোক এই রমযান মাস পাইবে, সে যেন এই মাসকাল ব্যাপী রোযা রাখে। ইসবীজাবী বলিয়াছেনঃ সফরকালে যদি কষ্ট না হয়, তাহা হইল রোযা রাখাই উত্তম। অবশ্য কষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও সফরকালে রোযা না রাখিলে কোন গুনাহ হইবে না।

এই হাদীস হইতে অনতিবিলম্বে ও সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফ্‌তার করা উত্তম বলিয়া জানা যায়। (عمدة القارى)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ وَاِنْ صَامَهُ ۔ (ترمذى، مسند احمد، ابن ماجه)

لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ۔ (مسند احمد)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক রোগ-অসুখ ও শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া রমযান মাসের একটি রোযাও ত্যাগ করিবে, সে যদি উহার পরিবর্তে সারা জীবন রোযা রাখে, তাহা হইলেও সে যাহা হারাইয়াছে তাহা কখনও পরিপূরণ হইবে না। —তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা হাদীসটির বক্তব্য হইল, রোযা মুসলমানের জন্যই ফরয। এই ফরয শরীয়াত সম্মত কোন কারণ ছাড়া কিছুতেই ভাঙ্গা (বা না রাখা) যাইতে পারে না। উহা ভাঙ্গার জন্য শরীয়াতে কয়েকটি ওযরের উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান ওযর হইল দুইটি। একটি বিদেশ সফর। দ্বিতীয়টি রোগ-অসুখ। কুরআন মজীদেই এই ওযর দুইটির উল্লেখ হইয়াছে ও এই কারণে রোযা ভঙ্গের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই ওযর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করিলে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট নির্দেশ লংঘন ও তাঁহার

অমার্জনীয় অবাধ্যতা করা হইবে। কিন্তু ইহার আর একটি দিক হইল, বিনা কারণে রোযার মাসে রোযা ভঙ্গ করিলে সে আল্লাহ্‌র অপার রহমত হইতে এতখানি বঞ্চিত হইয়া যাইবে যে, অতঃপর সারাজীবন রোযা রাখিয়াও ইহার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হইবে না। কেননা রমযান মাসের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম-মুক্তির যে বিশেষ ঘোষণা রহিয়াছে, তাহা অন্য কোন সময়ের জন্য নাই। কেবলমাত্র রমযান মাসে রোযা রাখিলেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে। অন্য সময় তাহা পাওয়ার কোনই কারণ নাই।

ইফতার ও সেহ্‌রীর সময়

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُوْرَ۔

(مسند احمد)

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মত যতদিন পর্যন্ত ইফতার ত্বরান্বিত করিবে এবং সেহ্‌রী বিলম্বিত করিবে, ততদিন তাহারা কল্যাণময় হইয়া থাকবে। —মুসনাদে আহ্‌মদ

ব্যাখ্যা রোযা ইফতার করার নির্দিষ্ট সময় সূর্যাস্ত হওয়ার পর-মুহূর্ত। এই মুহূর্ত উপস্থিত হওয়া মাত্রই রোযা খুলিয়া ফেলা কর্তব্য। ইহাতে কোনরূপ বিলম্ব করা উচিত নয়। এক শ্রেণীর লোক সূর্যাস্ত হওয়ার পরও রোযা খুলিতে অকারণে বিলম্ব করে। তাহারা মনে করে, ইহাতেই বুঝি অধিক সওয়াব হইয়া থাকে কিংবা এইরূপ করিলে অধিক তাকওয়া দেখানো হয়। কিন্তু নবী করীম (স) রোযার যে বিধান পেশ করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ করিবার কোন সুযোগ নাই। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবী করীমের এই বাক্যাংশ উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ۔ (مسند احمد)

রোযাদাররা যতদিন পর্যন্ত ইফ্‌তার ত্বরান্বিত করিবে, ততদিন দ্বীন-ইসলাম স্পষ্ট, অম্লান ও বিজয়ী হইয়া থাকিবে।

ইহার কারণ এই যে, ইফতার ত্বরান্বিত করা রাসূলে করীম (স)-এর নিয়ম ও আদর্শ। মুসলমানরা ইহা করিলে তাঁহারই বাস্তব অনুসরণ করা হয় এবং কার্যত তাঁহার আদেশ পালন করা হয়। বস্তুত রাসূলের কথা ও কাজের বাস্তব অনুসরণই হইল ইসলাম। ইফতার ত্বরান্বিত করা কেবল রাসূলেরই পছন্দ নয়, আল্লাহ্‌র নিকটও ইহা অধিকতর প্রিয়। হাদীসে কুদসীরূপে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا۔

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ ইফতার ত্বরান্বিতকারী বান্দাগণই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

কেননা ইহাতে রাসূলের পূর্ণ অনুসরণ করা হয় এবং আল্লাহ্‌র ঘোষণা হইলঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ (ال عمران)

বল হে নবী, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস, তাহা হইলে তোমরা আমার বাস্তব অনুসরণ কর। তাহা হইলেই আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালোবাসিবে।

তিরমিযী শরীফে হযরত সহল ইবনে সা'দ বর্ণিত হাদীসটির ভাষা হইলঃ

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ـ

মানুষ যতদিন ইফতার ত্বরান্বিত করিবে ততদিন তাহারা কল্যাণ লাভ করিতে থাকিবে।

'সেহ্‌রী' খাওয়া বিলম্বিত করিবার জন্যও হাদীসে তাকীদ আসিয়াছে। বস্তুত রোযা রাখার জন্য শেষ রাত্রে কিছু পানাহার করা চাই। রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً ـ সেহ্‌রী খাওয়ায় নিশ্চয়ই বরকত রহিয়াছে। (مسند احمد)

অপর হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে, নবী করীম (স) তাকীদ করিয়া বলিয়াছেনঃ

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّصُوْمَ فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَيْءٍ ـ (مسند احمد)

যে লোক রোযা রাখিতে চাহে, তাহার কোন কিছু খাইয়া সেহ্‌রী পালন করা কর্তব্য।

অপর এক হাদীসে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ 'মুসলমানদের ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের রোযা রাখিবার মাঝে পার্থক্য হইল সেহরী খাওয়া। অর্থাৎ মুসলমানরা সেহ্‌রী খাইয়া রোযা থাকে। আর অমুসলিমরা সেহরী না খাইয়া রোযা থাকে। এই পার্থক্য সুস্পষ্ট।

সেহ্‌রী খাওয়ার শেষ সময় হইল সুবহে সাদিক উদয় হওয়া। এই শেষ সময় পর্যন্ত সেহ্‌রী খাওয়া বিলম্বিত করাই সুন্নাত—রাসূলের আদর্শ। তিনি সেহ্‌রী খাইবার জন্য যেমন তাকীদ করিয়াছেন, তেমনি উহা বিলম্বিত করার জন্য—শেষ মুহূর্তে খাওয়ার জন্যও—উৎসাহ দান করিয়াছেন। সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার বহু পূর্বে—প্রায় মধ্যরাত্রে সেহ্‌রী খাওয়া ইসলামে পছন্দনীয় কাজ নয়। ইহাতে আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তোষ নিহিত নাই। ইহাতে রাসূলের অনুসৃত ও আচরিত রীতি অনুসরণ হয় না। রাসূলে করীম (স) তাকীদ করিয়াছেনঃ

تَسَحَّرُوْا فِىْ اٰخِرِ اللَّيْلِ ـ তোমরা রাত্রির শেষদিকে সেহ্‌রী গ্রহণ কর। (طبرانى)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِىِّ رض قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ وَالصِّيَامَ قَالَ صَلِّ كَذَا وَكَذَا وَصُمْ فَاِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَكُلْ وَاشْرِبْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ وَصُمْ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا اِلَّا اَنْ تَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاَخَذْتُ خَيْطَيْنِ مِنْ شَعْرٍ اَسْوَدَ وَاَبْيَضَ فَكُنْتُ اَنْظُرُ فِيْهِمَا فَلَا يَتَبَيَّنُ لِىْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

فَضَحِكَ وَقَالَ يَا ابْنَ حَاتِمٍ اِنَّمَا ذٰلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ ۔ (مسند احمد)

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) আমাকে নামায ও রোযা (পালনের নিয়ম-কানুন) শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, নবী করীম (স) এইভাবে ও এই নিয়মে নামায পড়িয়াছেন। আর (তিনি বলিয়াছেনঃ) তোমরা রোযা রাখ। যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখনই তোমরা খাও, পান কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সামনে 'সাদা সূতা' 'কালো সূতা' হইতে স্পষ্টরূপে পৃথক হইয়া না যায়। আর রোযা থাক ত্রিশ দিন, তবে উহার পূর্বে যদি তুমি চাঁদ দেখিতে পাও, (তাহা হইলে তখনি রোযা ভাঙ্গ)।

এই কথা শুনিয়া আমি সাদা ও কালো দুইটি পশম সম্মুখে রাখিয়া উহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলাম। কিন্তু উহাতে আমার নিকট কিছুই স্পষ্ট হইল না। পরে এই কথা রাসূলে করীমের নিকট পেশ করিলাম। তিনি শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেনঃ হে হাতীমের পুত্র। (তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা নয়, আসলে) উহা রাত্রির অন্ধকার কালো হইতে দিনের শ্বেত-ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হওয়া মাত্র। —মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা নামায ও রোযা ইসলামের ইবাদত সমূহের প্রধান দুইটি স্তম্ভ। যাকাত ও হজ্জ তো ধনী লোকদের কর্তব্য, কিন্তু নামায ও রোযা মুসলমান মাত্রের উপরই চিরস্থায়ী ফরয। নবী করীম (স) অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় নামায-রোযার নিয়ম-কানুন বিস্তারিতভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষা দিয়াছেন মুখে বলিয়া এবং নিজে কাজ করিয়া। আলোচ্য হাদীসে রোযার কথাই প্রধান; রোযার পদ্ধতি শিক্ষাদান প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেনঃ সকাল হইতে রোযা রাখিতে শুরু কর। আর রোযা শেষ হইবে সূর্যাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। অতঃপর সারারাত্রি ধরিয়া খাওয়া-দাওয়া অবাধে চলিতে পারিবে। এই খাওয়া-দাওয়ার শেষ সময়ই হইল পরবর্তী দিনের রোযা শুরু করার প্রথম মূহূর্ত। উহাই সেহরী খাওয়ার শেষ সময়। সেহরী খাওয়ার শেষ সময় ও রোযা শুরু করার প্রথম সময় বুঝাইবার জন্য কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۔

ফজরকালের কালো সূতা হইতে সাদা সূতা যখন স্পষ্টরূপে পৃথক হইয়া দেখা দিবে—তখন পর্যন্ত।

হাদীসের বর্ণনাকারী আদী ইবনে হাতিম বলেন, কুরআনের এই কথাটিই রাসূলে করীম (স) আমাকে বলিলেন। আমি ইহাকে শাব্দিক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং কালো ও সাদা পশম রাখিয়া এই কথার যথার্থতা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আসলে ইহা আমার বুঝিবার ভুল। আসলে 'সাদা সূতা' 'কালো সূতার' কথা নয়। ইহা হইল প্রভাত-আলো ও রাত্রির অন্ধকার অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার কালো হইতে দিনের শ্বেতশুভ্র আলো যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে ততক্ষণ খাওয়া-দাওয়া চলিতে পারিবে। আর যখনই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখনই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করিতে হইবে এবং রোযা রাখা শুরু করিতে হইবে। আমার বোকামির কথা জানিতে পারিয়া নবী করীম (স) হাসিলেন ও আমাকে আসল কথাটি ভালোভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীস হইতে জানা যায়, তিনি রাসূলে করীম (স)-এর সহিত সেহরী খাইয়াই মসজিদে নামায পড়িতে গিয়াছেন। একজন শ্রোতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

أَبَعْدَ الصُّبْحِ - প্রভাত উদয় হওয়ার পরই কি এই কাজ করিয়াছেন?

জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ

نَعَمْ هُوَ الصُّبْحُ غَيْرَ أَنْ لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ -

হ্যাঁ, উহা প্রভাত উদয়কালেই ছিল, তবে তখনও সূর্য উদয় হইয়া যায় নাই। —মুসনাদে আহমদ

এই হাদীস হইতে জানা গেল, সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পরও সেহরী খাওয়া চলে এবং চলে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, যখন দিনের ঔজ্জ্বল্য চতুর্দিককে উদ্ভাসীত করিয়া তোলে এবং অন্ধকারের অস্পষ্টতা কিছুমাত্র বাকী থাকে না।[১] একটি হাদীসের শব্দ হইলঃ

هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ -

সেই সময়টা ছিল দিন, তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তখনও সূর্যটা উদিত হয় নাই।

একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, জুর ইবনে হুবাইশ হযরত হুযাইফা (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

أَيَّ وَقْتٍ تَسَحَّرْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

আপনারা রাসূলে করীম (স)–এর সঙ্গে ঠিক কোন সময়ে সেহ্‌রী খাইয়াছেন?

জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ

هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ -

সময়টা ছিল দিন। তবে তখনও সূর্য উদয় হয় নাই।

হযরত আবূ হুরাইয়া (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ - (ابوداؤد)

তোমাদের কেহ যদি এমন সময় ফজরের আযান শুনিতে পাও যখন তোমাদের কেহ পাত্র হাতে লইয়া খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, তাহা হইলে সে যেন সে পাত্র থেকে প্রয়োজন মত খাদ্য গ্রহণ সম্পূর্ণ না করিয়া উহা রাখিয়া না দেয়।

আম্মার বলিয়াছেনঃ وَكَانُوا يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ -

ফজর উদয় হওয়ার সময়ও খাদ্য গ্রহণের জন্য সাহাবীগণ অনুমতি দিতেন।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি দেখিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) ও জায়দ ইবনে সাবিত (রা) রোযার নিয়্যতে সেহরী খাইয়াছেন। অতঃপর দুই রাক্'আত নামায পড়িয়াছেন। তাহার পর মসজিদে গিয়াছেন। আর তখনই ইকামত বলা হইয়াছে।

---

১. কিন্তু ইহা উলামাদের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়।

হযরত আবূ বকর (রা) সালেম ইবনে উবাইদকে বলিতেনঃ

قُمْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْفَجْرِ حَتّٰى اَتَسَحَّرَ۔

তুমি আমার ও ফজর উদয় হওয়ার মাঝখানে আড়াল হইয়া দাঁড়াও যেন আমি সেহরী গ্রহণ করিতে পারি।

অপর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, হযরত আবূ বকর (রা) বলিতেনঃ

اَجِيْفُوا الْبَابَ حَتّٰى نَتَسَحَّرَ۔

তোমরা দরজা বন্ধ করিয়া রাখ যতক্ষণ আমার সেহরী খাওয়া শেষ না হয়।

(المحلى لابن حزم ج ٦، ص ٣٢٦ - ٣٢٧)

এই পর্যায়ের হাদীসসমূহ মোট ১১ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত। ইহাদের বিপরীত কোন বর্ণনা নাই।

অন্য কথায় হাদীস হইতে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইল যে, সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেহরী খাওয়া চলে। তবে ইহাই শেষ সময়, পানাহারের অনুমতি প্রাপ্ত সময়ের শেষ সীমান্ত কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সীমান্তকে এড়াইয়া চলা এবং ইহার পূর্বেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করাই উত্তম।[১]

এই হাদীস হইতে এই কথাও জানা গেল যে, রোযার মাস সাধারণত ত্রিশ দিনের হইবে। তবে উহার একদিন কমও হইতে পারে। উনত্রিশ দিনের সন্ধ্যায় যদি শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়, তাহা হইলে রোযা উনত্রিশটি হইবে এবং পরের দিন ঈদুল ফিতর হইবে। আর উনত্রিশ তারিখ চাঁদ দেখা না গেলে রোযা ত্রিশটা পূর্ণ করিতে হইবে। অতঃপর চাঁদ দেখা না গেলেও কোনই অসুবিধা থাকিবে না। কেননা আরবী মাস ত্রিশ দিনের বেশী হয় না।

ইফতার করাইবার সওয়াব

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيْ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ الصَّائِمِ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ۔ (مسند احمد، ترمذى، نسائى، ابن ماجه)

হযরত যায়দ ইবনে খালিদ আল-জুহানী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক একজন রোযাদারকে ইফতার করাইবে, তাহার জন্য সেই রোযাদারের মতই সওয়াব লিখা হইবে। কিন্তু তাহাতে মূল রোযাদারের শুভ প্রতিফল হইতে একবিন্দু কম হইবে না। —মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী,নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে রোযাদারকে ইফতার করাইবার সওয়াবের কথা বলা হইয়াছে। হাদীসের ঘোষণানুযায়ী যে লোক কোন রোযাদারকে ইফতার করায় সে সেই রোযাদারের সমান সওয়াব লাভ করিবে। কিন্তু তাহাতে মূল রোযাদারের জন্য নির্দিষ্ট সওয়াবের পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস পাইবে না।

---

১. 'শরহে বেকায়া' গ্রন্থে উল্লেখ হইয়াছে যে, সুবহে সাদিক না হওয়া পর্যন্ত সেহরী খাওয়া দুরস্ত আছে।

হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণিত হাদীসটিতে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি অধিকতর বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা হইলঃ

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى طَعَامٍ وَّشَرَابٍ مِنْ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فِىْ سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَلّٰى عَلَيْهِ جِبْرَائِيْلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ۔ (طبرانی، ابن ماجہ)

যে লোক কোন রোযাদারকে কিছু হালাল জিনিস খাওয়াইয়া ও পান করাইয়া ইফতার করায় ফেরেশতাগণ রমযান মাসের সমস্ত সময় ধরিয়া তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং জিবরাঈল (আ) কদর রাত্রিতে তাহার জন্য রহমতের দোয়া করেন। —তাবারানী ইবনে হাব্বান

ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় ইহার শেষাংশে অতিরিক্ত কথা হইলঃ

وَصَافَحَهُ جِبْرَائِيْلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَمَنْ صَافَحَهُ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرِقُّ قَلْبُهُ وَتَكْثُرُ دُمُوْعُهُ،

জিবরাঈল (আ) যাহার সহিত করমর্দন করেন, তাহার দিল নম্র হয় এবং তাহার অশ্রুধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়।

এই কথার পর নবী করীম (স)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়, ইফতার করাইবার মত যাহার কিছুই নাই, সে কি করিবে? তিনি বলিলেনঃ فَقَبْضَةٌ مِّنْ طَعَامٍ 'সে একমুঠি খাবার দিয়া ইফতার করাইবে'। এক লোকমা রুটি বা খাদ্য না থাকিলেও কি করা যাইবে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেনঃ فَمَذْقَةٌ مِّنْ لَبَنٍ দুগ্ধ দিয়া ইফতার করাইবে। আর ইহাও না থাকিলে فَشَرْبَةٌ مِّنْ مَاءٍ 'পানি দিয়াই রোযা খোলাইবে।'

মোটকথা, রোযাদারের রোযা যাহাই তওফীকে জোটে তাহা দিয়া খোলানোর বিরাট-বিপুল সওয়াব নিহিত রহিয়াছে।

রোযার দিনে ভুল করিয়া পানাহার করা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرْ فَاِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ۔ (بخاری، مسلم، ترمذی)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইবে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক ভুল করিয়া কিছু খাইল বা পান করিল, সে যেন রোযা না ভাঙ্গে। কেননা সে যাহা খাইয়াছে বা পান করিয়াছে, উহা এমন রিয্ক যাহা আল্লাহ্ তা'আলাই তাহাকে দিয়াছেন।
—বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী

ব্যাখ্যা হাদীসটির বক্তব্য স্পষ্ট। রোযাদার ভুল করিয়া কিছু খাইলে বা পান করিলে রোযা নষ্ট হইয়া যায় না। রোযা নষ্ট হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া রোযাটি ভাঙ্গিয়া ফেলা ঠিক নয়। কেননা সে ইচ্ছা করিয়া ও রোযার বিধান লংঘন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া পানাহার করে নাই। সে ভুল করিয়া পান বা আহার করিয়াছে। হাদীসে এইরূপ খাওয়া—পান করাকে আল্লাহ্‌র দেওয়া রিয্‌ক বলা হইয়াছে।

এইরূপ পানাহারকারী ব্যক্তির প্রতি নবী করীম (স)-এর নির্দেশ হইল, সে রোযা ভাঙ্গিবে না, রোযা পূর্ণ করিবে। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ তাহার রোযা যেন সে সম্পূর্ণ করে।

এই হাদীসে ভুলবশত পানাহারকারীকে ইহার পরও 'রোযাদার' বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং রোযাদার রোযা সম্পূর্ণ করিবে—ইহাই স্বাভাবিক।

রোযাদার ভুল করিয়া যাহা পান করে বা খায়, উহাকে আল্লাহ্‌র দেওয়া রিয্‌ক বলা হইয়াছে। বুখারী শরীফের বর্ণনায় ইহার ভাষা হইলঃ

فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ ـ

ইহা আর কিছু নয়। আল্লাহ্‌ই তাহাকে খাওয়াইয়াছেন ও পান করাইয়াছেন।

হযরত উম্মে ইসহাক (রা)-এর একটি ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট বসা ছিলেন। এই সময় এক পাত্র সরীদ (এক বিশেষ ধরনের খাবার) উপস্থিত করা হইল। তখন তিনিও তাঁহার সাথে উহা খাইলেন। পরে তাঁহার মনে পড়িল যে,তিনি রোযাদার। যুল্-ইয়াদাইন তখন তাঁহাকে বলিলেনঃ اَلْآنَ بَعْدَ مَا شَبِعْتِ খাইয়া পূর্ণ তৃপ্ত হওয়ার পর এখন মনে পড়িয়াছে যে, তুমি রোযাদার?

তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ

أَتِمِّي صَوْمَكِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللّٰهُ إِلَيْكِ ـ (مسند احمد)

তুমি তোমার রোযা পূর্ণ কর। কেননা তুমি যাহা খাইয়াছ, উহা তো একটা রিয্‌ক, আল্লাহ্‌ই উহা তোমার পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন।

ইবনে হাজার আল-আস্‌কালানী লিখিয়াছেনঃ যাহারা অল্প খাওয়া ও বেশী খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য করিয়া বলেন, অল্প খাইলে রোযা নষ্ট হয় না, বেশী খাইলে রোযা নষ্ট হয়, এই হাদীসটি উহারই প্রতিবাদ। আমর ইবনে দীনারের নিকট একটি লোক আসিয়া বলিলঃ আমি সকাল বেলা পর্যন্ত রোযাদার ছিলাম। অতঃপর ভুলিয়া গিয়া খাইয়াছি। এখন কি হইবে? বলিলেনঃ কোনই দোষ হয় নাই।

ইমাম সওরী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখ ফকীহ একবাক্যে বলিয়াছেনঃ

مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ـ

যে লোক ভুলবশত কিছু খায় বা পান করে সে যেন তাহার রোযা পূর্ণ করে। এই রোযা তাহাকে কাযা করিতে হইবে না এবং এইজন্য কোন কাফফারাও দিতে হইবে না।

অবশ্য ইমাম মালিক ইবনে আনাস বলিয়াছেনঃ ভুল করিয়া খাইলে রোযা কাযা করিতে হইবে। কিন্তু এই মত খোদ মালিকী মাযহাবের আলিমগণই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। (تحفة الاحوذى)

সূর্যাস্তের পূর্বেই ইফতার করা

اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض اَفْطَرَ فِيْ يَوْمِ رَمَضَانَ فِيْ يَوْمٍ غَيْمٍ وَظَنَّ اَنَّهُ قَدْ اَمْسٰى اَوْ غَابَتِ الشَّمْسُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ اَلْخَطْبُ يَسِيْرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا۔ (مؤطا امام محمد)

আমাকে যায়দ ইবনে আসলাম জানাইয়াছেন যে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রমযান মাসের এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইফতার করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; কিংবা সূর্য অস্ত গিয়াছে। এই সময় একটি লোক আসিয়া বলিলঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! সূর্য তো বাহির হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেনঃ ইহার প্রতিকার খুবই সহজ। অথচ আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। —মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ

ব্যাখ্যা যায়দ ইবনে আসলাম একজন তাবেয়ী। তিনি হযরত উমরের সূর্যাস্তের পূর্বেই ইফতার করিবার ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। এই দিনটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সূর্য অস্ত গিয়াছে কিনা, তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় ছিল না। ইহার ফলে সন্ধ্যা হইয়াছে বা সূর্য অস্ত গিয়াছে মনে করিয়া ইফতার করিয়া বসিলেন। সূর্য অস্ত গিয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু আসলে সূর্য অস্ত যায় নাই। পরে একটি লোক যখন বলিল যে, সূর্য অস্ত যায় নাই, মেঘের আড়াল হইতে উহা বাহির হইয়াছে, তখন তিনি নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলেন যে, ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বেই—দিন থাকিতেই তিনি ইফতার করিয়া বসিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার রোযাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব এই রোযাটি তাঁহাকে কাযা করিতে হইবে। তাই লোকটিকে তিনি বলিয়া দিলেন যে, সূর্যাস্ত হইয়াছে কিনা তাহা জানিতে চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। এখন কাযা করা কর্তব্য হইয়াছে। আর ইহা কঠিন কিছুই নয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (রা) বলিয়াছেনঃ সূর্যাস্ত হইয়াছে মনে করিয়া যদি কেহ ইফতার করে; কিন্তু পরে জানিতে পারে যে, সূর্যাস্ত হয় নাই, তাহা হইলে অতঃপর সে অবশিষ্ট সময়ে কিছুই পানাহার করিতে পারিবে না। রোযাদারের মতই তাহাকে ইফতারের সময় পর্যন্ত অতিবাহিত করিতে হইবে এবং পরে এই রোযাটি কাযা করিতে হইবে। ইমাম আবূ হানীফা (রা)-ও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনটি কাজে রোযা ভঙ্গ হয় না

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيْ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ اَلْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْاِحْتِلَامُ۔ (ترمذى، بيهقى، ابوداؤد)

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তিনটি কাজ রোযা ভাঙ্গিয়া দেয় নাঃ শিঙ্গা লাগানো, বমি হওয়া ও স্পপ্নদোষ হওয়া।

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে জানা যায় যে, শিঙ্গা লাগানো, বমি করা ও স্বপ্নযোগে শুক্র নিষ্ক্রমণে রোযা নষ্ট হয় না। কেননা শেষোক্ত দুইটি মানুষের ইচ্ছাধীন হয় না। আর প্রথমটিতে রোযা নষ্ট হয় না; কেননা স্বয়ং নবী করীম (স) রোযা অবস্থায় এই কাজ করাইয়াছেন বলিয়া সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। মুসনাদে আহমদ ও বুখারী উদ্ধৃত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ -

নবী করীম (স) ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিঙ্গা লাগাইয়াছেন এবং রোযাদার হওয়া অবস্থায় শিঙ্গা লাগাইয়াছেন।

হযরত আনাস (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছেঃ كَانَ اَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ হযরত আনাস (রা) রোযাদার হওয়া অবস্থায় শিঙ্গা লাগাইয়াছেন।

তবে বহু হাদীসে এই কথারও উল্লেখ আছে যে, প্রথমে নবী করীম (স) শিঙ্গা লাগাইলে রোযা নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইমাম শাওকানী এই দুই ধরনের হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ শিঙ্গা লাগানো মাকরূহ সেই রোযাদারের জন্য, যে উহার দরুন দুর্বল হইয়া পড়ে। আর ইহা যদি রোযা ভাঙ্গিবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে ইহার মাকরূহ হওয়ার মাত্রা অনেক বেশী তীব্র হইবে।

শরীরের বিশেষ অবস্থার কারণে বমি হইলে রোযা নষ্ট হইবে না। তবে যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া বমি করে, এই সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ - (ترمذى، ابوداؤد)

যে রোযাদার নিজের ইচ্ছায় বমি করিবে, তাহাকে রোযা কাযা করিতে হইবে। কেননা, এই বমির জন্য সে নিজে দায়ী।

ইবনুল মালিক বলিয়াছেনঃ

وَالْأَكْثَرُ عَلَى اَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ - (تحفة الاحوذى)

অধিকাংশ শরীয়াতবিদের মতে এইরূপ ব্যক্তিকে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। (শুধু রোযা কাযা করিতে হইবে)।

কিন্তু বমি যদি মুখ ভরিয়া বাহির হয়, তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে। আর বমি করিতে করিতে যদি কেহ ক্লান্ত–শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহার রোযা থাকিবে না। (فقه السنة)

রোযার অবস্থায় স্ত্রীর সহিত মাখামাখি ও চুম্বন করা সঙ্গত এবং উহাতে রোযা বিনষ্ট হয় কিনা সেই বিষয়ে এই প্রসঙ্গেই আলোচিতব্য। একটি হাদীসঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ - قَالَ لَا فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ - (مسند احمد، طبرانی فی الکبیر)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হইত বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমরা রাসূলে করীম (স)-এর মজলিসে বসিয়াছিলাম। এই সময় একজন যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলঃ ইয়া রাসূল, আমি কি রোযা থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করিতে পারি? নবী করীম (স) বলিলেনঃ না। অতঃপর একজন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি আসিয়া প্রশ্ন করিলঃ আমি কি রোযাদার অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করিতে পারি? নবী করীম (স) বলিলেনঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেনঃ এই কথা শুনিয়া আমরা পরস্পরের দিকে তাকাইলাম। ইহা দেখিয়া নবী করীম (স) বলিলেনঃ তোমরা পরস্পরের দিকে কেন তাকাইলে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি তা আত্মসংযম করিতে সক্ষম।

—মুসনাদে আহমদ, তাবারানী—কবীর

ব্যাখ্যা রোযা থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা জায়েয কিনা এবং তাহাতে রোযার কোন ক্ষতি হয় কিনা এই বিষয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে বহু সংখ্যক হাদীস রাসূলে করীম (স) হইতে বহু সংখ্যক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি হাদীস হইতে জানা যায়, মোটামুটিভাবে ইহা জায়েয। আর কতকগুলি হাদীসে এই বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধ উচ্চারিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি হাদীস হইতে জানা যায়, নবী করীম (স) একই বৈঠকে যুবককে ইহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বয়ঃবৃদ্ধকে অনুমতি দিয়াছেন। উপরোদ্ধৃত হাদীসটি তন্মধ্যে একটি। এই ধরনের বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণে এই বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। হাদীস ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলিয়াছেনঃ শুধু চুম্বনে যে রোযা নষ্ট হয় না, তাহা সর্বসম্মত। তবে ইহার দরুন শুক্র নির্গত হইলে রোযা নষ্ট হইবে। আবদুল্লাহ ইবেন শাবরামাতা কূ'ফার একজন ফিকাহ্‌বিদ। তিনি ফতওয়া দিয়াছেন, যে লোক রোযা অবস্থায় চুম্বন করিল, তাহার রোযা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইমাম ইবনে হাজম বলিয়াছেন, আলিঙ্গন ও চুম্বন উভয়ই মাকরূহ। হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে এই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছেঃ

إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ -

তিনি রোযা থাকা অবস্থায় আলিঙ্গন, মাখামাখি, ডলাডলি ও চুম্বন উভয় কাজকে মাকরূহ মনে করিতেন।

কিন্তু এই সবের বিপরীত দিকে রহিয়াছে নবী করীম (স)-এর নিজের আমল সম্পর্কিত বহু সংখ্যক বর্ণনা। তিনিই তো নিজের কথা ও কাজ উভয়ের দ্বারাই শরীয়াতের বিধান স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ -

নবী করীম (স) রোযা থাকা অবস্থায় চুম্বন করিতেন।

হযরত আশেয়া (রা) বলিয়াছেন, একদা নবী করীম (স) ঘরে আসিয়া বলিলেনঃ গোশতের টুকরা আছে কি? তিনি একটি টুকরা পেশ করিলেন। নবী করীম (স) উহা মুখের উপর রাখিলেন এবং বলিলেনঃ (তাবারণী, আল আওসাত)

يَا عَائِشَةُ هَلْ دَخَلَ بَطْنِي مِنْهُ شَيْءٌ كَذٰلِكَ قُبْلَةُ الصَّائِمِ۔

হে আয়েশা, ইহার কোন কিছু কি আমার পেটে প্রবেশ করিয়াছে? —রোযাদারের চুম্বনও এইরূপ।

(পেটে কিছু প্রবেশ করিলেই রোযা যায় নতুবা না) কতিপয় ফিকাহ্‌বিদ বলিয়াছেনঃ চুম্বন রোযার সওয়াব কম করিয়া দেয়, রোযা নষ্ট করে না। এতসদত্ত্বেও তাঁহারা বলিয়াছেনঃ নিজেকে সঙ্গম হইতে বাঁচাইতে পারিলে চুম্বন বৈধ। আর সঙ্গম পর্যন্ত যাওয়ার আশংকা হইলে চুম্বন হইতে বিরত থাকা কর্তব্য। (بلوغ الامانى - تحفة الاحوذى)

রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا - قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا - قَالَ اجْلِسْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهٖ فَقَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنَّا - قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ أَنْيَابُهٗ - قَالَ خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ۔ (ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)–এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলঃ 'ইয়া রাসূল' আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তিনি বলিলেনঃ তোমাকে কিসে ধ্বংস করিল? বলিলঃ আমি রমযানে (দিনের বেলায়) আমার স্ত্রীর উপর নিপতিত হইয়াছি। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তুমি কি একটি ক্রীতদাস মুক্ত করিবার সামর্থ রাখ? বলিলঃ না। বলিলেনঃ তাহা হইলে তুমি কি ক্রমাগত দুইমাস কাল রোযা করিতে পারিবে? বলিলঃ না। জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ষাটজন মিসকীন খাওয়াইবার মত সাধ্য কি তোমার আছে? বলিলঃ না। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ বস। লোকটি বসিয়া থাকিল। এই সময় রাসূলে করীম (স)–এর নিকট একটি পাত্র আনা হইল। পাত্রটি ছিল ওজনের (মোটা) যন্ত্র। তাহাতে খেজুর ভর্তি ছিল। নবী করীম (স) বলিলেনঃ এই পাত্রের খেজুরগুলি তুমি দান করিয়া দাও। তখন লোকটি বলিলঃ মদীনায় আমাদের অপেক্ষা অধিক গরীব ও এই পাত্র ভরা খেজুর পাইবার অধিক যোগ্য আর কেহই নাই। ইহা শুনিয়া নবী করীম (স) হাসিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার দন্তরাজি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেনঃ তুমি ইহা লইয়া যাও এবং তোমার ঘরের লোকদিগকে ইহা খাওয়াও। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা রমযান মাসের রোযার দিনে রোযা থাকা অবস্থায় ঘটনাচক্রে স্ত্রী সহবাস হইয়া গেলে একজন ঈমানদার মুসলমানের মানসিক অবস্থা কি দাঁড়ায় এবং সেই অবস্থায় কি করণীয়, উভয় কথাই উপরোদ্ধৃত হাদীসটি হইতে জানা যায়।

তিরমিযী উদ্ধৃত এই হাদীসটিতে বলা হইয়াছেঃ 'এক ব্যক্তি রাসূলের নিকট আসিয়া বলিল'। কিন্তু বুখারী উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা হইলঃ আমরা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট বসাছিলাম। এই সময় একজন লোক আসিল। এই লোকটি কে এবং তাহার নাম কি, তাহা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই। তবে হাদীসের ব্যাখ্যায় আবদুল গণী দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, এই লোকটির নাম সালমান কিংবা সালমাহ্ ইবনে সখর আল-বিয়াজী ছিল। এই লোকটির আগমনের অবস্থা সম্পর্কে অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

جَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَدُقُّ صَدْرَهُ -

একটি লোক আসিল। সে তাহার মাথার চুল ছিঁড়িতেছিল ও বুকের উপর থাপড়াইতে ছিল।

অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ يَلْطِمُ وَجْهَهُ 'নিজের মুখের উপর চপেটাঘাত করিতেছিল।' আর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

يَحْثِيْ عَلَى رَأْسِهِ التُّرَابَ - সে তাহার মাথার উপর মাটি ছড়াইতেছিল।

এই সব বিভিন্ন বর্ণনার উল্লেখ করিবার পর ইবনে হাজার আল-আসকালানী লিখিয়াছেনঃ যে লোক এই ধরনের বিপদে পড়ে তাহার পক্ষে এই ধরনের কাজ করা বিধেয়। ইহার দ্বারা দুনিয়ার সাধারণ বিপদাপদ এবং ধর্ম ও পরকালের দিক দিয়া আসা বিপদের মাঝে পার্থক্য হইয়া যায়। ধর্ম ও পরকালের দিক দিয়া যে লোক এই ধরনের বিপদের মধ্যে নিপতিত হয়, সে যদি এমন কাজ করে যাহার দ্বারা তাহার চরম লজ্জা ও অনুতাপ এবং অন্তরের তীব্র ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ পায় তবে তাহা অবৈধ বা অবাঞ্ছিত নয়। অবশ্য ইহা এই ধরনের কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনাও হইতে পারে।

লোকটি বলিলঃ هَلَكْتُ 'আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি।' হযরত আয়েশার এক বর্ণনার শব্দ হইলঃ اِحْتَرَقْتُ 'আমি ভস্ম হইয়া গিয়াছি।' এই সব শব্দ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, লোকটি সচেতনভাবেই এই কাজ করিয়াছিল ও এই সব কথা বলিতেছিল। কেননা সে যে পাপ করিয়াছে তাহার পরিণতি ধ্বংস ও ভস্ম হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আর এই কথা যদি স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে বলা যায়, নবী করীম (স) লোকটির পাপের কাফ্ফারা আদায়ের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তিতে ভুলবশত এই কাজ করিলেও কাফ্ফারা দিতে হইবে, এমন কথা বলা যায় না। ইমাম মালিক অবশ্য সেই দলীলই দিয়েছেন।

ইহার জওয়াবে বলা যায়, লোকটি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা বলিতেছিল—'ধ্বংস হইয়া গিয়াছি'; 'ভস্ম হইয়া গিয়াছি'—ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে,লোকটি ইচ্ছাপূর্বক ও সচেতনভাবেই স্ত্রী সহবাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহা ভুলবশত করা কাজ নয়। রমযান মাসে দিনের বেলা একজন রোযাদারের পক্ষে স্ত্রী সহবাস করা কল্পনাতীত।

লোকটি ঘটনার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলিলঃ

وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِيْ - আমি আমার স্ত্রীর উপর আপতিত হইয়াছি।

হযরত আশেয়া (রা)-এর বর্ণনার ভাষা হইলঃ

وَطِئْتُ اِمْرَأَتِيْ - আমি আমার স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিয়াছি।

অতঃপর নবী করীম (স) লোকটিকে কাফ্ফারা আদায়ের পরামর্শ দিলেন। ইহার অর্থ, রোযাদার দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করিলে তাহাকে কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। পরপর তিনি ধরনের

কাফ্ফারার প্রস্তাব করা হয়। ক্রীতদাস মুক্ত করিবার বা ক্রমাগত দুইমাস রোযা রাখিবার কিংবা ষাটজন মিসকীন খাওয়াইবার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটি প্রস্তাবেই সে নিজের অক্ষমতার কথা বলে। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই ধরনের অপরাধের ইহাই কাফ্ফারা—যেটা যাহার পক্ষে সম্ভব, সে সেটাই করিবে। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য অনেকেই এই মত দিয়াছেন। ইমাম মালিক বলিয়াছেনঃ এই ধরনের অপরাধী উপরোক্ত তিনটি কাজের যে কোন একটি কাফ্ফারা আদায় করিতে পারে। একটি বর্ণনার ভাষা এইরূপঃ

اَنْ يُّعْتِقَ رَقَبَةً اَوْ يَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ يُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا۔ (ابو داؤد)

হয় একটি গোলাম আযাদ করিবে কিংবা একাধারে দুইমাস রোযা থাকিবে, অথবা ষাটজন মিসকীন খাওয়াইবে।

অন্যান্য হাদীসবিদ বলিয়াছেন, কোন্‌টি কাহার পক্ষে সম্ভব তাহা এই ক্রমিকতা সহকারে যাচাই করিতে হইবে। ক্রমিকতা অনুযায়ী যেটা যাহার পক্ষে সম্ভব তাহাকে সেটাই করিতে হইবে। হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ۔

ষাটজন মিসকীন খাওয়াইবে। প্রত্যেক মিসকীনকে এক 'মদ্দ' পরিমাণ খাদ্য দিতে হইবে।

হানাফী মাযহাবের মতে ষাটজন মিসকীনের খাদ্য যদি ষাট দিনে একজন মিসকীনকে খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা জায়েয হইবে। কেননা আলোচ্য হাদীসের লোকটিকে নবী করীম (স) শেষ পর্যন্ত বলিয়াছেনঃ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ এই খাদ্য তোমার পরিবারবর্গকে খাওয়াইয়া দাও', ইহাই হানাফী মতের দলীল। (تحفة الاحوذى - نيل الاوطار)

নাপাক অবস্থায় রোযাদারের সকাল হওয়া

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُدْرِكُنِى الصَّلٰوةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَصُوْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلٰوةُ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَصُوْمُ فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّقِى۔ (مسلم، ابوداؤد، مسند احمد)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিলঃ ইয়া রাসূল, নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন আমি নাপাক থাকি। অতঃপর আমি রোযা রাখি। এই অবস্থায় কি বাঞ্ছনীয়? রাসূলে করীম (স) বলিলেন, এইরূপ অবস্থা আমারও হইয়া থাকে। আমারও নাপাক অবস্থায় নামাযের সময় হয়। অতঃপর রোযাও রাখি। লোকটি বলিলঃ হে রাসূল! আপনি তো আমাদের মত নহেন। আপনার তো সামনে ও পিছনের সব গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ আল্লাহ্‌র নামে শপথ, আমি নিশ্চয়ই আশা করি যে, আমি

তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি এবং যে বিষয়ে আমি ভয় করি, সে বিষয়ে তোমাদের তুলনায় অনেক বেশী জানি।

ব্যাখ্যা রোযার মাসে নাপাক অবস্থায় ফজর হইয়া গেলেও রোযা রাখায় কোন অসুবিধা নাই এবং এই রোযার কাযা করিতে হইবে না। সে নাপাকী স্ত্রী-সহবাসের হউক, কি অন্য কিছুর দরুন, ইহাই হাদীসটির প্রতিপাদ্য। সব ফিকাহ্‌বিদদেরও ইহাই মত। ইমাম নববী দৃঢ়তার সহিত দাবি করিয়াছেন যে, এই মতের উপর ইজমা—ঐক্যমত স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই মতের বিপরীত মতের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ ۔

যে লোক নাপাক অবস্থায় সকাল করিল—সকাল পর্যন্ত নাপাক থাকিল, তাহার জন্য রোযা নাই।

—বুখারী, মুসলিম

কিছু সংখ্যক তাবেয়ী এই মতের উপর আমল করিতেন। কিন্তু ইবনে হাজার আল-আস্‌কালানী বলিয়াছেন, হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত এই হাদীসটির সনদ দুর্বল। কেননা ইহার সনদে আবুল মাহজাম নামে একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। হাসান বসরী ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ হযরত ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

إِنَّهُ يُتِمُّ صَوْمَهُ ثُمَّ يَقْضِيهِ ۔

(এইরূপ অবস্থায়) 'তিনি [আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)] রোযা পূর্ণ করিতেন এবং পরে উহার কাযাও করিতেন।

ইবনে আবদুল বার ও নখয়ী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ফরয রোযায় এইরূপ হইলে উহা কাযা করা ওয়াজিব, নফল রোযার নয়। মাওয়ার্দী লিখিয়াছেন, স্ত্রী-সহবাসজনিত নাপাকীর ব্যাপারেই এই মতভেদ, স্বপ্নদোষজনিত নাপাকীর ক্ষেত্রে নয়। কেননা তাহা কাযা করিতে হইবে না বলিয়া সকলেই মত দিয়াছেনঃ কিন্তু এই ক্ষেত্রেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

إِنَّهُ أَفْتَى مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا مِنْ احْتِلَامٍ أَنْ يُفْطِرَ ۔

স্বপ্নদোষের দরুন নাপাক অবস্থায় সকাল হইয়া গেলে সে যেন রোযা ভাঙ্গে বলিয়া তিনি ফত্‌ওয়া দিয়াছেন।

কিন্তু মূল মতবিরোধের বিষয়ে দেখা যায়, স্বয়ং নবী করীম (স)-এরও এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। উপরিউক্ত হাদীসে যেমন এই কথা বলা হইয়াছে, তেমনি আরো স্পষ্ট ভাষায় এই কথা বর্ণিত হইয়াছে হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে। বর্ণনাটির ভাষা এইরূপঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ ۔

(بخاری، مسلم، ترمذی)

নবী করীম (স)-এর ফজর হইত অথচ তিনি স্ত্রী সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় থাকিতেন। তখন তিনি গোসল করিতেন ও রোযাও রাখিতেন।

এই সাক্ষ্য দিয়াছেন রাসূলে করীম (স)–এর দুইজন স্ত্রী। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেনঃ অধিকাংশ বিজ্ঞ লোকের সর্বসম্মত মত ইহাই এবং এই অনুযায়ী তাঁহাদের আমল। এইরূপ অবস্থায় রোযা রাখা রাসূলে করীম (স)–এর জন্য কোন বিশেষ অনুমতির ব্যাপার ছিল না। লোকটির জিজ্ঞাসার জওয়াবে তিনি নিজের অবস্থা বলিয়া এই বিষয়ে তাঁহার কোন বিশেষ সুযোগ থাকার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আমি তোমাদের তুলনায় প্রকৃত বিষয়ে বেশী জানি এবং আল্লাহ্কেও বেশী ভয় করি। তাহা সত্ত্বেও আমার এইরূপ অবস্থা হইলেও আমি সেই ফজর কালে গোসল করিয়া নামায পড়ি ও রোযা থাকি। ইহাতে শরীয়াতের বিধান লংঘন করা হয় না।

কতিপয় মুহাদ্দিস এই দুই ধরনের হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলিয়াছেনঃ 'হযরত আবূ হুরায়রার বর্ণনায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা উত্তম পন্থার নির্দেশ। অর্থাৎ ফজরের পূর্বে গোসল করিয়া পবিত্র হওয়া ভালো। কিন্তু উহার বিপরীত হইলেও যায়েয হইবে—হযরত আয়েশা বর্ণিত এই হাদীসটিতে সেই জায়েয হওয়ার কথাই বলা হইয়াছে। ইবনে দকীকুল–ঈদ বলিয়াছেনঃ প্রথম দিকে রোযার রাত্রে স্ত্রী সহবাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। পরে এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ-

রোযার রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য জায়েয করা হইয়াছে।

এই অনুমতি অনুসারে ফজর হওয়ার নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম জায়েয হইয়া গিয়াছে। ফলে নাপাক অবস্থায় ফজর হইয়া যাওয়া বিচিত্র কিছুই নয় এবং এইরূপ হইলে তাহার রোযা নষ্ট হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। (نيل الاوطار - تحفة الاحوذى)

তারাবীহর নামায

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- (بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসের রাত্রিতে ঈমান ও সতর্কতা সহকারে নামায আদায় করিবে, তাহার পূর্বের যাবতীয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা হাদীসে উল্লেখিত 'কিয়ামে রমযান' قِيَامِ رَمَضَانَ অর্থঃ তারাবীহর নামায পড়া। 'তারবীহা' 'তারবীহাতুন' تَرْوِيْحَةٌ এর বহুবচন। ইহার আসল অর্থঃ আরাম করা, বিশ্রাম করা। বিশেষ নামাযের নাম 'তারাবীহ্' রাখা হইয়াছে এইজন্য যে, ইহাতে প্রতি চার রাক্'আত নামায অন্তর কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়, ফলে প্রতি চার রাক্'আত নামাযেরই নাম করা হইয়াছে 'তারাবীহ।'

وَيُقَالُ التَّرْوِيحَةُ اِسْمٌ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ وَ إِنَّمَا فِي الْأَصْلِ إِيصَالُ الرَّاحَةِ وَهِيَ الْجِلْسَةُ (عمدة القارى)

'তারবীহা' প্রতি চার রাক্'আত নামাযের নাম। আর ইহার আসল অর্থ বসিয়া বিশ্রাম করা বা বিশ্রাম দেওয়া।

এই নামায রমযান মাসে 'এশার ফরয ও সুন্নাতের পর পড়িতে হয়।

لِاَنَّ التَّرَاوِيْحَ عُرِّفَتْ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ فَكَانَ وَقْتُهَا مَا صَلُّوْا فِيْهَا وَهُمْ صَلُّوْا بَعْدَ الْعِشَا قَبْلَ الْوِتْرِ۔ (حاشية الهداية)

কেননা তারাবীহ নামায পড়িবার নিয়ম সাহাবীদের কাজ দ্বারা জানা গিয়াছে। অতএব ঠিক যে সময়ে তাঁহারা উহা পড়িয়াছেন, তাহাই উহার জন্য সঠিক সময়। আর তাঁহারা উহা পড়িয়াছেন এশার ফরয নামাযের পর বিতরের নামাযের পূর্বে।

নবী করীম (স) এই নামায পড়িয়াছেন; কিন্তু তাহা রীতিমত প্রত্যেক রাত্রে পড়েন নাই। ইহার কারণস্বরূপ তিনি নিজেই বলিয়াছেনঃ

اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلٰوةُ اللَّيْلِ۔ (حديث عائشة)

রাত্রের এই (তারাবীহ) নামায তোমাদের প্রতি ফরয হইয়া যাওয়ার ভয় করিতেছি আমি।

তার এই ভয়েরও কারণ ছিল এই যেঃ

مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْبِ فُرِضَ عَلٰى اُمَّتِهٖ۔

যেসব অ–ফরয কাজ নবী করীম (স) আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ও কাছাকাছি সময়ে স্থায়ীভাবে করেন, তাহাই তাঁহার উম্মতের উপর ফরয হইয়া যায়।

কিন্তু নবী করীমের যুগে ইহা মুসলমানগণ নিজস্বভাবে ও নিজ নিজ ঘরে বসিয়া পড়িতেন। মুহাদ্দিসগণের সম্মিলিত মতে ইহা মুস্তাহাব অর্থাৎ ইহা ফরয বা ওয়াজিব নহে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ এবং মালিকী মাযহাবের কিছু ফিকাহ্বিদের মতে এই নামায জামা'আতের সহিত পড়া উত্তম। হযরত উমর ফারূক ও সাহাবিগণ এই নামায এইভাবেই পড়িয়াছেন এবং মুসলিম জাতি চিরদিনই এই নামায এই নিয়মেই পড়িয়া আসিয়াছে। ফলে ইহা ঈদের নামাযের মতই মুসলমানদের জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।[১]

আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) এই তারাবীহ নামাযের 'ফযীলত' বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঈমান ও 'ইহতিসাব' সহকারে যে লোক রমযান মাসের এই নামায পড়িবে, তাহার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। 'ঈমান' অর্থ উহাকে সত্য বলিয়া জানা এবং উহার মর্যাদা ও

---

১. কতক আলিমের মতে ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং কতকের মতে ইহা মুস্তাহাব। হিদায়ার মূল ইবারতে يستحب শব্দের উল্লেখ আছে। জামে সগীরেও অনুরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু হিদায়া প্রণেতা লিখিয়াছেন যাহার অর্থঃ সহীহ এই যে তারাবীহ সুন্নাত। ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে হাসান এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেননা খুলাফায়ে রাশেদীন ইহা সর্বদা পড়িতেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বদা পড়েন নাই! কেননা তিনি উহা আমাদের উপর ফরয হইয়া পড়িবার আশঙ্কা করিতেন।

ফযীলত সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাবান ও বিশ্বাসী হওয়া। আর 'ইহ্‌তিসাব' অর্থ উহার দ্বারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও বিপুল সওয়াব লাভের ইচ্ছা পোষণ করা, ইখলাসের বিপরীত—লোক দেখানো কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই কাজ না করা। (النووى شرح المسلم) 'পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে বলা হইয়াছে। বাহ্যত ইহাই মনে হয় যে, তারাবীহ নামায সঠিকভাবে পড়িলে সগীরা-কবীরা সব রকমের গুনাহই মাফ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইমামুল হারামাইনের সুচিন্তিত মতে কেবলমাত্র সগীরা গুনাহ্‌ই উহার দ্বারা মাফ হইবে, কবীরা গুনাহ্ নহে।

তারাবীহ নামাযে রাক্'আত সংখ্যা বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন রকম উদ্ধৃত হইয়াছে। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ হইতে বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেনঃ

كُنَّا نَقُوْمُ فِىْ زَمَنِ عُمَرَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ -

আমরা হযরত উমরের সময় বিতরের নামাযসহ বিশ রাক্'আত নামায পড়িতাম।

তাবারানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّىْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِىْ رَمَضَانَ سِوَا الْوِتْرِ -

নবী করীম (স) রমযান মাসে বিতর ছাড়া বিশ রাক্'আত নামায পড়িতেন। কিন্তু এই হাদীসদ্বয়ের সনদ দুর্বল।

তবে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস ইহার বিপরীত। তাহা হইতে তারাবীহ্‌র নামায মাত্র আট রাক্'আত-ই প্রমানিত হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ

مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَا فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً -

নবী করীম (স) রমযান মাসে ও অন্যান্য সময়ের ফরয ছাড়া মোট এগারো রাকআতের অধিক নামায (রাত্রি বেলা) পড়িতেন না।

এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম—উভয়ই নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুসনাদে আহমদে উদ্ধৃত হাদীসে বলা হইয়াছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ -

রাসূলে করীম (স) রাত্রি বেলা আট রাক্'আত নামায পড়িতেন, অতঃপর বিতর পড়িতেন। ইহার পর বসিয়া বসিয়া দুই রাক্'আত পড়িতেন।

এই হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (স) তারাবীহ্‌র নামায মাত্র আট রাক্'আত পড়িতেন, ইহার পর বিতরের নামায পড়িতেন। আর সর্বশেষ বসিয়া বসিয়া দুই রাক্'আত পড়িতেন। ইহা হইতেও তারাবীহ নামায আট রাক্'আতই প্রমাণিত হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলিয়াছেনঃ তারাবীহ নামাযের নির্দিষ্ট রাক্'আত সংখ্যা নবী করীম (স) হইতে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া মনে করাই

মূলগতভাবে ভুল। কেননা তিনি সত্যই রাক'আতের এমন কোন সংখ্যা বিশ বা আট নির্দিষ্ট করিয়া যান নাই। বরং তাঁহার ও সাহাবীদের হইতে বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। (المرقات)

তারাবীহ নামাযের মর্যাদা ও সওয়াব

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ - (مسند احمد، نسائى)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা রমযান মাসের রোযা থাকা তোমাদের প্রতি ফরয করিয়া দিয়াছেন। আর আমি তোমাদের জন্য সুন্নাতরূপে চালু করিয়াছি রমযান মাসব্যাপী আল্লাহ্র ইবাদতে দাঁড়ানো। কাজেই যে লোক এই মাসের রোযা পালন করিবে আর আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াইবে ঈমান ও চেতনাসহকারে, সে তাহার গুনাহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সেই দিনের মত নিষ্পাপ হইয়া যাইবে, যেদিন তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছিল।

—মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা হাদীসটির প্রথম কথা রমযান মাসের রোযা আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করিয়াছেন। কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা, রাসূলে করীম (স)–এর মৌখিক ঘোষণা ও সুনিয়মিতভাবে ও গুরুত্বসহকারে উহা আদায় করার দ্বারা এবং গোটা মুসলিম জাতির একবিন্দু মতবিরোধহীন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত ও অব্যাহত আমল দ্বারা ইহার ফরয অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

রমযান মাসের 'কিয়াম'—দাঁড়ানোকে রাসূলে করীম (স) চালু করিয়াছেন। হাদীসের ভাষা হইলঃ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ উহার (রমযানের) দাঁড়ানো আমি রীতিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি।

'কিয়ামে রমযান' হাদীস ও ফিকাহ্র একটা বিশেষ পরিভাষা। ইহার অর্থ, রমযান মাসের রাত্রগুলিতে আল্লাহ্র ইবাদতে দাঁড়ানো। আর রমযানের রাত্রিতে আল্লাহ্র ইবাদতে দাঁড়ানো, অর্থ রাত্রিতে এশার নামাযের পর তারাবীহ্ নামায পড়া।' 'তারাবীহ্' নামায শরীয়াতের ব্যবস্থা। ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন রাসূলে করীম (স), আল্লাহ্ তা'আলা করেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা 'রীতিবদ্ধ' করিলে উহা আদায় করা ফরয হইয়া যাইত। তিনি করেন নাই বিধায় ইহা ফরয নয়—'সুন্নাত'অর্থাৎ সুন্নাতে মুয়াক্কিদাহ।

এখানে প্রথম প্রশ্ন, রাসূলে করীম (স) ইহা কিভাবে 'রীতিবদ্ধ' করিলেন? তিনি কি ইহা নিজের ইচ্ছামত চালু করিয়াছেন, না ইহার পিছনে আল্লাহ্র অনুমতি রহিয়াছে? ইহা জওয়াবে বলা বাহুল্য, শরীয়াতের কোন কিছুই নবী করীম (স) নিজের ইচ্ছা ও মর্যীমত চালু করেন নাই। যাহা কিছুই করিয়াছেন, তাহা হয় কুরআনের আয়াত হইতে জানিতে পারিয়া করিয়াছেন, না হয় আল্লাহ্র কোন গোপন ইঙ্গিতে (وحی خفی) জানিতে পারিয়া করিয়াছেন। তিনি হয়ত ওহীর মাধ্যমে রমযান মাসের রাত্রিগুলিতে তারাবীহ নামায পড়ার অশেষ সওয়াব ও অতুলনীয় মর্যাদার কথা জানিতে পারিয়াছেন। অতঃপর উহা জনসমাজে চালু করিয়াছেন। অবশ্য নবী করীম (স) ইজতিহাদের সাহায্যেও শরীয়াতের ব্যবস্থা চালু করিতে পারেন। সেই অধিকার তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়াছেন যে আল্লাহ্ তাঁহাকে নবী ও রাসূল বানাইয়াছেন এবং কুরআন মজীদ তাঁহার নিকট নাযিল করিয়াছেন। ইজতিহাদ ভুল ও

নির্ভুল—উভয়ই হওয়ার সম্ভবনা থাকা সত্ত্বেও নবী করীম (স)–এর ইজতিহাদে যে এক বিন্দু ভুল হইতে পারে না—হইলেও মুহূর্তের জন্য, পর মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাহা সংশোধিত হইয়া গিয়াছে ও ভুলের উপর তাহাকে থাকিতে দেওয়া হয় নাই, তাহা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কাজেই তারাবীহ্ নামায যেভাবেই হউক, নবী করীম (স) কর্তৃক রীতিবদ্ধ ও চালু হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহা ফরয বা ওয়াজিব করেন নাই, তাহা চূড়ান্ত।

এই পর্যায়ে 'তারাবীহ্ নামায' চালু হওয়ার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিতব্য। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) এক রাত্রে মসজিদে নামায পড়িলেন। তখন অনেক লোক নামাযে তাঁহার সহিত শরীক হইয়া গেল। দ্বিতীয় রাত্রেও তিনি নামায পড়িলেন। এবারেও অনেক লোক তাঁহার সহিত শরীক হইল। পরে তৃতীয় রাত্রেও এই রকম হইল। মসজিদে নামাযে অনেক লোক একত্র হইয়া গেল। চতুর্থ রাত্রে মসজিদে এত লোকের সমাবেশ হইয়া গেল যে,

حَتّٰى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجِزُ عَنْ اَهْلِهٖ-

মসজিদে লোক সংকুলান না হওয়ার উপক্রম হইল।

কিন্তু সেই রাত্রে নবী করীম (স) ঘর হইতে বাহির হইলেন না। লোকেরা 'নামায' 'নামায' বলিয়া অনেক ডাকাডাকি করিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি বাহিরে আসিলেন না। রাত্র শেষ হইলে ফজরের নামাযের পর নবী রকীম (স) দাঁড়াইয়া সমবেত লোকদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন। বলিলেনঃ

اِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ شَاْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلٰكِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا-

গত রাত্রে তোমাদের যে অবস্থা হইয়াছিল, আমার নিকট উহা কিছুমাত্র গোপন থাকে নাই। কিন্তু আমি ভয় করিতেছি যে, উহা তোমাদের প্রতি ফরয করিয়া দেওয়া না হয়। কেননা ফরয করিয়া দেওয়া হইলে তোমরা উহা আদায় করিতে অক্ষম হইয়া পড়িবে।

এই হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ ও মুয়াত্তা মালিক গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আয়েশার এই বর্ণনার শেষ বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ এই ঘটনা রমযান মাসের (রাত্রিতে) সংঘটিত হইয়াছিল।

অপর এক বর্ণনায় রাসূলে করীম (স)–এর ভাষণের শেষ কথাটি উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

وَلٰكِنِّىْ تَخَوَّفْتُ اَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَاكْلَفُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا -

কিন্তু আমি ভয় করিতেছি, এই নামায তোমাদের উপর ফরয হইয়া না যায়। তাহা হইলে তোমরা এমন একটা কাজের চাপ নিজেদের উপর চাপাইয়া লইয়া বসিবে, যাহা করার সামর্থ তোমাদের হইবে না। কেননা তোমরা নিজেরা কোন কাজে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্লান্ত–শ্রান্ত না হইবে, আল্লাহ্ ততক্ষণ তোমাদের উপর কোন কষ্টের কাজ চাপাইয়া দিবেন না।

অর্থাৎ রমযানের দিনের বেলা একাধারে ১২–১৪ ঘন্টা পর্যন্ত ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত থাকিবার পর ইফতার করা ও পানাহার করা হইলে শরীর আপনি নিঃশক্তি হইয়া ঢলিয়া পড়িতে চায়। তখন তারাবীহ নামায পড়া খুই কষ্টকর। তোমরা এখন কোন আমল পছন্দ করিয়া নিয়মিত করিতে থাকিবে। তোমাদের অবস্থা দেখিয়া আল্লাহ্ তা'আলা যদি উহা তোমাদের প্রতি ফরয করিয়া দেন,

তখন কিন্তু উহা আদায় করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব বা অতিশয় কষ্টকর হইয়া পড়িবে। কাজেই এখন উহা নিয়মিত ও অব্যাহতভাবে করিতে থাকিও না।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি কেহ সচেতনভাবে, আল্লাহ্র নিকট হইতে অশেষ সওয়াব পাওয়ার আশায় তারাবীহ নামায পড়ে, তাহা হইলে সে গুনাহমুক্ত হইতে পারিবে যেমন গুনাহ্মুক্ত থাকে সদ্যজাত শিশু। (بلوغ الاماني)

রোযার ফিতরা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔ (مسند احمد، ابوداؤد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রাসূলে করীম (স) রমযান মাসের রোযার ফিতরা এক সা' পরিমাণ শুষ্ক খেজুর কিংবা এক সা' পরিমাণ যব মুসলমান সমাজের প্রত্যেক স্বাধীন, মুক্ত কিংবা দাস পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের উপর ফরয করিয়া দিয়াছেন।
—মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে রমযান মাসের রোযার ফিতরা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে 'ফিতরা' বলা হয় এমন পরিমাণ অর্থ বা সম্পদকে যাহারা যাকাত গ্রহণ করিতে পারে এমন গরীব ব্যক্তিকে বিশেষ পদ্ধতিতে দেওয়া হয়। হিজরতের দ্বিতীয় বৎসর ঈদুল ফিতরের দুই দিন পূর্বে ইসলামী সমাজে এই ফিতরা সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য ও প্রচলন করা হয়। কাইস ইবনে সা'দ বলিয়াছেনঃ

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكٰوةُ۔
(مسند احمد، نسائی، ابن ماجه، حاکم)

যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বেই রাসূলে করীম (স) আমাদিগকে সদকায়ে ফিতরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন।

ইহার পর যাকাত ফরয হয়, কিন্তু সদকায়ে ফিতর সম্পর্কে নূতন কিছু বলা হয় নাই। (فتح الباری)

কিন্তু তাহাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, যাকাত ফরয হওয়ার পর রোযার ফিতরা দিতে হইবে না। বরং ইহার বাধ্যবাধকতা পূর্বের মতই চালু থাকার কথা ইহা হইতে প্রামণিত হয়। অর্থাৎ সদকায়ে ফিত্ পূর্বে যেমন ওয়াজিব ছিল, তেমনি ওয়াজিব থাকিয়া গেল। হাদীসের ভাষা হইলঃ 'ফরয' করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ ধার্য করিয়াছেন, বাধ্যতামূলক করিয়াছেন ও ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে ফিতরা যাকাত সমতুল্য। এ দুইটি একই উৎস হইতে ধার্য হইয়াছে এবং উভয়ের অর্থনৈতিক ফায়দা অভিন্ন। কেননা উহা আল্লাহ্র ধার্য করা ফরয যাকাতের মতই। বস্তুত ফিতরা আদায় করার কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামী শরীয়াতে পূর্ণ ঐকমত্য বা ইজমা রহিয়াছে। ইহাতে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব অনুযায়ী ইহা সুন্নাত—সুন্নাতে মুয়াক্কিদা—ওয়াজিব বা ফরয নয়। তাঁহাদের মতে আলোচ্য হাদীসের শব্দ 'ফরয করিয়াছেন' কথাটির

অর্থ হইল 'পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন' কিংবা ধার্য করিয়া দিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাবে ইহা 'ফরয' নয়—'ফরয' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নয় বরং ইহা 'ওয়াজিব'। হানাফী মাযহাবে 'ফরয' ও 'ওয়াজিব' শব্দ দুইটির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

হাদীসের ভাষা হইল 'যাকাতুল ফিতর'–অর্থাৎ রোযা খোলার যাকাত। রোযা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা আদায় করা ওয়াজিব হইয়া যায়। ইহাকেই 'সদকায়ে ফিতর' বলা হয়। এই দুইটি শব্দের অর্থ একই।

ইহা স্বাধীন–মুক্ত পুরুষ, স্ত্রী ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানের উপর ওয়াজিব। 'ক্রীতদাস' কথাটি এখানে তদানীন্তন আরব সমাজের প্রেক্ষিতে বলা হইয়াছে। বর্তমান স্থায়ী গৃহভৃত্য ইহার স্থলে গণ্য হইবে এবং বাড়ীর কর্তাকে তাহার ফিতরাও আদায় করিতে হইবে। মুসলিম শরীফের হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

لَيْسَ فِى الْعَبْدِ صَدَقَةٌ اِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ-

ক্রীতদাসের জন্য মনিবকে সদকায়ে ফিতর ছাড়া অন্য কোন সদকা দিতে হয় না।

'সদকায়ে ফিতর' মুসলমান মাত্রেরই আদায় করা কর্তব্য। পুরুষদের ব্যাপারে তো কোন অস্পষ্টতা নাই। মেয়েলোক বিবাহিতা হইলে স্বামীই তাহার সদকায়ে ফিতর আদায় করিবে। অবিবাহিতা হইলেও তাহার নিজের সামর্থ্য থাকিলে সে নিজেই আদায় করিবে। অন্যথায় তাহার এবং অন্যান্য না-বালেগদের ফিতরা আদায় করিবে তাহাদের পিতা বা অলী বা অভিভাবক। অবশ্য যাহার পক্ষে যাকাত গ্রহণ জায়েয ও হালাল, তাহার পক্ষে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয় বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

وَاَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَكْثَرَ مَا اَعْطَاهُ-

ফকীর গরীবের পক্ষেও ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব। সে যাহা দিবে আল্লাহ্ তাহাকে তাহার দেওয়া পরিমাণের বেশী ফিরাইয়া দিবেন। (معالم السنن)

কিন্তু ইহা বাধ্যবাধকতামূলক নয়; বরং স্বেচ্ছামূলক ও অধিক সওয়াব পাওয়ার আশায় বান্দার আত্মোৎসর্গের ব্যাপার।

ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব এমন মুসলমানের পক্ষে, যে নিজে রোযা রাখিয়াছে। উহার পরিমাণ হাদীসে বলা হইয়াছে এক সা'—সা' একটা বিশেষ পরিমাণের ওজন। এক সা' ওজনে চার মুদ্দ হয়। সা' দুই ধরনের, একটি হিজাযী আর অপরটি ইরাকী। হিজাযী সা'র ওজন $৫\frac{১}{৩}$ রতল এবং এক ইরাকী সা' ৮ 'রতল'। এক 'রতল' আমাদের দেশী ওজনে প্রায় অর্ধসের। অতএব এক হিজাযী সা' আমাদের দেশে চলতি ওজনে প্রায় পৌনে তিনসের। আর ইরাকী সা'র ওজনে প্রায় ৪ সের। এই ওজনের খাদ্যশস্য কিংবা উহার বিক্রয় মূল্যই দেয়।

সা'র ওজন বিভিন্ন হওয়ায় ফিতরার পরিমাণ কিছুটা মতভেদ হইয়াছে। এই দেশের মুফতী সাহেবদের ফিতরা সংক্রান্ত একটি ঘোষণা ইহার দৃষ্টান্তঃ বায়তুল মুকাররম মসজিদের তরফ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছেঃ এইবারের (১৯৭৪ সনে) ফিতরা দুই টাকা ৫০ পয়সা। লালবাগ শাহী মসজিদের পক্ষ হইতে ঘোষিত হইয়াছেঃ পূর্ণ রেশনিং এলাকায় পৌনে দুই সের আটার মূল্যে মাথাপিছু আড়াই টাকা এবং যেখানে রেশনিং ব্যবস্থা নাই সেখানে স্থানীয় বাজারের গম বা আটার

মূল্যে ফিতরা দান করিতে হইব। বংশালের আহলি হাদীস মসজিদের পক্ষ হইতে প্রচার করা হইয়াছে যে, ২ সের ১১ ছটাক চাউল অথবা গমের মূল্যে ফিতরা দিতে হইবে। কন্ট্রোল দরে এই পরিমাণ চাউলের দাম ৪ টাকা ৩ পয়সা এবং গমের দাম টাকা ৩৪ পয়সা।(দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪-১০-৭৪)।

ফিতরার পরিমাণ সম্পর্কে বহু হাদীস গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পর্যায়ে আর একটি হাদীস এইঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرِ الْعُذْرِيِّ رض عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ اَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ

(ابو داؤد، عبد الرزاق، دار قطنى، طبرانى، حاكم۔)

আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবাতা ইবনে ছুগাইর আল-উযরী তাঁহার পিতা (ছুগাইর উল উযরী) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত নবী করীম (স) তাঁহার এক ভাষণে বলিয়াছেনঃ তোমরা প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস, ছোট কিংবা বড়'র তরফ হইতে অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' যব কিংবা এক সা' খেজুর ফিতরা বাবদ আদায় কর।—আবূ দাউদ, আবদুর রাজ্জাক, দারে কুতনী, তাবারানী, হাকেম

ইলমে হাদীসের দৃষ্টিতে এইসব হাদীস 'খবরে ওয়াহিদ'। ইহাতে রাসূলে করীম (স)-এর 'আদায় কর' স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ উদ্ধৃত হইলেও ইহা হইতে 'ফরয' প্রমাণিত হয় না; ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। কেননা ইহা (قطعى دليل) অকাট্য প্রমাণ নয়।

হাদীস হইতে এই কথা জানা যায় যে, সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন শর্ত নাই। কিন্তু হানাফী মাযহাবে حر বা স্বাধীন হওয়ার শর্ত করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল, স্বাধীন হইলে তাহার ইসলাম পালন ও মালিকানা গ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়, ক্রতিদাস হইলে তাহা হয় না। তাহার সদকা দান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের কারণ হয়। আর সচ্ছলতারও শর্ত করা হইয়াছে। একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

لَا صَدَقَةَ اِلَّا عَنْ ظَهْرِ الْغِنٰى۔ (بخارى، مسند احمد)

বাহ্যত সচ্ছলতা ও ঐশ্বর্যশীলতা ছাড়া সদকা ওয়াজিব হয় না।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এই মত সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মতেঃ

يَجِبُ عَلٰى مَنْ يَّمْلِكُ زِيَادَةً عَلٰى قُوْتِ يَوْمِهٖ لِنَفْسِهٖ وَعِيَالِهٖ۔ (الهداية)

যে লোক (ঈদের দিন) তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের সেই দিনের খাদ্য পরিমাণের অধিক সম্পদের মালিক হইবে তাহার উপরই ফিতরার সদকা ওয়াজিব।

ফিতরার লক্ষ্য

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رض فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنَ - مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ زَكٰوةٌ مَّقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ - (ابوداؤد، ابن ماجه)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স) ফিতরার 'যাকাত' রোযাদারকে বেহুদা অবাঞ্ছনীয় ও নির্লজ্জতামূলক কথাবার্তা বা কাজকর্মের মলিনতা হইতে পবিত্র করার এবং গরীব মিসকীনদের (অন্ততঃ ঈদের দিনের উত্তম) খাদ্যের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে অবশ্য আদায়যোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে লোক উহা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করিবে, তাহা ওয়াজিব যাকাত বা সদকা হিসাবে আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হইবে। আর যে লোক উহা ঈদের নামাযের পর আদায় করিবে, তাহা তাহার সাধারণ দান রূপে গণ্য হইবে।

—আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা এই হাদীসটিতে সদকায়ে ফিতর-এর আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের কথা বলা হইয়াছে। উহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ এই যে, প্রথমত ফিতরা আদায়কারী ব্যক্তি শরীয়াত লংঘনকারী কোন কাজে লিপ্ত হইবে না ও অর্থের অপচয় করিবে না। আর যদি অলক্ষ্যে ও অসতর্কতার কারণে কোন শরীয়াত বিরোধী কাজ হইয়া যায়, কোন অশ্লীল কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া যায় বা কোন পাপ কাজ করিয়া ফেলে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এই সদকার দৌলতে তাহা মাফ করিয়া দিবেন। আর সামাজিক অর্থনৈতিক কল্যাণ এই যে, ইহার দরুণ সমাজের গরীব-মিসকীন লোকেরা সাময়িকভাবে হইলেও এমন পরিমাণ অর্থ পাইতে পারে, যাহার দ্বারা তাহাদের ও পরিবারবর্গের ঈদের দিনের ভালো কিংবা সাধারণ মানের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতে পারে।

হাদীসটি হইতে ইহাও জানা গেল যে, সাদকায়ে ফিতর আদায় করার সঠিক সময় হইল ঈদের নামাযের পূর্বে। আর 'ঈদের নামাযের পূর্বে' বলিতে ঈদের দিনের সকাল বেলাও বুঝায়, একদিন দুইদিন আগের সময়ও বুঝায়। এই সময় আদায় করিলে তাহা সঠিকরূপে ও যথার্থভাবে আদায় করা হইল মনে করিতে হইবে। আর নামাযের পরে আদায় করিলে উহা সাধারণ দান পর্যায়ে গণ্য হইবে। হাদীসের শব্দ ব্যবহার ভঙ্গী হইতে মনে হয়, এই আদায়কে নিতান্তই 'দান' মনে করা যাইবে, সদকায়ে ফিতর যেভাবে আদায় হওয়া উচিত সেভাবে আদায় করা হইল বলিয়া মনে করা যাইবে না। হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের শেষাংশের ভাষা হইলঃ

وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ - (بخارى، مسلم)

নবী করীম (স) সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়াছেন লোকদের ঈদের নামাযের জন্য বাহির হওয়ার পূর্বে।

এই নির্দেশ যে অবশ্য পালনীয় পর্যায়ের তাহা নিঃসন্দেহ। এতদসত্ত্বেও আল্লামা তাইয়্যেবী বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স)-এর এই নির্দেশ ওয়াজিব নহে; বরং মুস্তাহাব—অতীব উত্তম ও পছন্দনীয় পর্যায়ের। কেননা জমহুর শরীয়াতবিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মতে ঈদের নামাযের পরও—সেই দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফিতরা দিয়া দিলে তাহা আদায় হইল বলিয়া মনে করা যায়। তবে ঈদের নামাযের পূর্বে যে কোন সময় আদায় করিয়া দেওয়াই উত্তম।

হযরত ইবনে উমর বর্ণিত অপর একটি হাদীসে সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

وَكَانُوا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ - (بخارى)

সাহাবায়ে কিরাম সদকায়ে ফিতর ঈদের একদিন বা দুই দিন পূর্বেই আদায় করিয়া দিতেন।

ইহা উত্তম এইজন্যও যে, একদিন পূর্বে এই অর্থ গরীব-মিসকীনদের হাতে আসিলে তাহারা উহার দ্বারা ঈদের দিনের খাওয়া-পরার ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে।

অবশ্য ইমাম মালিক বর্ণনা করিয়াছেনঃ

إِنَّهُ رَاءَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُّخْرِجُوْا زَكوةَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوْا إِلَى الْمُصَلّٰى - (مؤطا امام مالك)

ইমাম মালিক দেখিতে পাইয়াছেন যে, অভিজ্ঞ লোকেরা রোযার ফিতরা ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর নামাযে যাওয়ার পূর্বে আদায় করিয়া দেওয়াই পছন্দ করিতেন ও ভালোবাসিতেন।—মুয়াত্তা মালিক

ই'তিকাফ

عَنْ عَائِشَةَ رض أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ (ترمذى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, (তিনি বলিয়াছেন), হযরত নবী করীম (স) রমযান মাসের শেশ দশ দিন ই'তিকাফ করিতেন এবং ইহা চলিতেছিল যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জান কবজ করিলেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ই'তিকাফ সম্পর্কিত এই হাদীসটি মূলত তিনটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। একটি সূত্র বর্ণনাকারী হইতেছেন ওরওয়া-আয়েশা (রা)। দ্বিতীয় সূত্রে রহিয়াছেন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবর্-আবূ হুরায়রা (রা) এবং তৃতীয় সূত্র বর্ণনাকারী উবাই ইবনে কাব, আবূ লাইলা আবূ সাঈদ, আনাস ও ইবনে উমর (রা) প্রমুখ সাহাবী। এই সব কয়টি সূত্রেই হাদীসটি সংগ্রহ করিয়াছেন ইমাম যুহরী; ইহাতে হাদীসটির মর্যাদা সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা চলে।

'ই'তিকাফ' (اعتكاف) শব্দের আভিধানিক অর্থঃ কোন জিনিসকে বাধ্যতামূলকভাবে ধরিয়া রাখা। কোন জিনিসের উপর নিজেকে শক্তভাবে আটকাইয়া রাখা। আর শরীয়াতের পরিভাষায় ই'তিকাফ বলা হয়ঃ

اَلْمُقَامُ فِى الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَّخْصُوْصٍ عَلٰى صِفَةٍ مَّخْصُوْصَةٍ - (تحفة الاحوذى)

মসজিদে কোন বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ ধরনের অবস্থান-অবস্থিতি গ্রহণ।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ اعتكاف শব্দের আভিধানিক অর্থঃ اَللُّبْثُ مُطْلَقًا 'শুধু অবস্থান করা।' যে লোক মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে বলা হয় عَاكِفٌ বা مُعْتَكِفٌ অবস্থানকারী। আর শরীয়াতের পরিভাষায় ইহার অর্থঃ

اَلْاِقَامَةُ فِى الْمَسْجِدِ وَاللُّبْثُ فِيْهِ عَلٰى وَجْهِ التَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى - (عمدة القارى)

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে থাকা ও অবস্থান গ্রহণ করা।

কুরআন মজীদের দুইটি আয়াতে এই ই'তিকাফ শব্দটি উল্লেখিত হইয়াছেঃ

وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ -

তোমরা হইতেছ মসজিদসমূহে অবস্থানকারী।

اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ - (البقرة: ١٢٥)

তোমরা দুইজনে আমার ঘরকে তওয়াফকারী ও অবস্থানকারীদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখ।

'ই'তিকাফ' শব্দের মূল ভাবধারা হইলঃ কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিন্দুতে মন-মগজ দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ রাখিয়া অবস্থান করা এমনভাবে যে সেই দিক হইতে অন্য কোন দিকে দৃষ্টি আদৌ ফিরিবে না। (تاج العروس)

উপরিউক্ত হাদীস হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায়—নবী করীম (স) নিয়মিতভাবে রমযান মাসের শেষ দশদিন মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করিতেন। তাঁহার এই কাজ তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত চলিয়াছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই কাজ চালাইয়া গিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা হইলঃ

حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهٖ -

রাসূলে করীম (স) ই'তিকাফ করিতেন যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁহার ওফাত করিয়াছেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করিয়াছেন।

ইবনুল হুমাম বলিয়াছেন, নিরবচ্ছিন্ন ও ক্রমাগতভাবে রাসূলের এই কাজ করা এবং তাহা একবার (বিনা কারণে) পরিত্যাগ না করা এবং সাহাবীদের মধ্যে যাহারা এই কাজ করেন নাই তাঁহাদিগকে ইহা না করার জন্য অভিযুক্ত না করা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহা সুন্নাত। যদি অন্যথা হইত, তাহা হইলে ইহা হইতে ইহার ওয়াজিব প্রমাণিত হইত।

এই সম্পর্কে অন্যদের বক্তব্য ইহল, বাহ্যত মনে হয় নবী করীম (স) এই কাজ কখনো পরিহার করেন নাই। কিন্তু আসলে তাহা ঠিক নহে। কেননা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, নবী করীম (স) ইহা কখনো কখনো ত্যাগ করিয়াছেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসের শেষ শব্দ হইলঃ

فَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ ذٰلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ ـ

নবী করীম (স) অতঃপর সেই (রমযান) মাসের ই'তিকাফ পরিহার করেন এবং শওয়াল মাসের দশদিন ই'তিকাফ পালন করেন। —বুখারী

রাসূলে করীম (স) নিয়মিত ই'তিকাফ পালন করিলেও এবং ইহা অতীব সওয়াবের কাজ বলিয়া ঘোষিত হইলেও ইহা প্রমাণিত যে, অধিকাংশ সাহাবীই ই'তিকাফ করেন নাই। ইমাম মালিক (রা) বলিয়াছেনঃ

لَمْ يَبْلُغْنِىْ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَلَا اَحَدًا مِّنْ سَلَفِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِعْتَكَفَ اِلَّا اَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَنَّهُمْ تَرَكُوْهُ لِشِدَّتِهٖ لِاَنَّ لَيْلَهٗ وَنَهَارَهٗ سَوَاءٌ ـ

হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান (রা) ও ইবনুল মুসায়্যিব এবং মুসলিম জাতির পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিগণের কেহই ই'তিকাফ পালন করিয়াছেন বলিয়া আমার নিকট কোন সংবাদ পৌছায় নাই। একমাত্র আবদুর রহমানের পুত্র আবূ বকর ছাড়া। আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি, তাঁহারা সকলেই ই'তিকাফের তীব্রতা ও কঠোরতার কারণে উহা ত্যাগ করিয়াছেন। কেননা উহার রাত্র ও দিন অভিন্ন।

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهٗ ـ (ترمذى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করিতেন, তখন ফজরের নামায পড়িতেন ও পরে তাঁহার ই'তিকাফ স্থানে প্রবেশ করিতেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে বাহ্যত জানা যায়, নবী করীম (স) ফজরের নামায পড়িয়া ই'তিকাফ শুরু করিতেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইল, তিনি তো পূর্ণ দশ দিনের জন্য ই'তিকাফ করিতেন। আর সেই জন্য রমযান মাসের একুশ তারিখ ফজর পড়িয়া নয়—উহার পূর্বের রাত্রি সূচনায় —বিশ তারিখ মাগরিবের সময় হইতে—ই'তিকাফ স্থানে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় চান্দ্রমাসের হিসাবে দশ দিন পূর্ণ হইতে পারে না। এই কারণে মুহাদ্দিসদের মধ্যে দুইটি মতের উদ্ভব হইয়াছে। কয়েক জনের মত হইল বিশ তারিখ মাগরিবের সময়ই ই'তিকাফ কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইভাবে যে, আসলে তিনি আগের দিন মাগরিবের সময় হইতেই ই'তিকাফ শুরু করিয়াছেন। পরবর্তী ফজরের নামায পড়িয়া তিনি ই'তিকাফ কেন্দ্রে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট হুজরায় প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র।

এই পর্যায়ে আরো একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। তাহা হইল ই'তিফাক দশদিন না দশ রাত? হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত এক হাদীসের ভাষা হইলঃ

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ـ

নবী করীম (স) রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করিতেন।

আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

كَانَ .... يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ اَيَّامٍ -

রাসূলে করীম (স) প্রত্যেক রমযান মাসের দশ দিন ই'তিকাফ করিতেন।

প্রথমোক্ত হাদীস হইতে দশ রাত্র প্রমাণিত হয়। আর শেষোক্ত হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় দশদিন। এই কারণে মুহাদ্দিসগণ বিশ তারিখ দিনগত রাত্র শুরু—মাগরিবের সময়—হইতেই ই'তিকাফ ধরিয়াছেন। ইহাতে এই উভয় হাদীস অনুযায়ী আমল হওয়ার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

মহাদ্দিস ও ফকীহ আবূ সওর বলিয়াছেনঃ

اِنْ اَرَادَ الْاِعْتِكَافَ عَشَرَ لَيَالٍ دَخَلَ قَبْلَ الْغُرُوْبِ -

দশরাত্রি ই'তিকাফ করার ইচ্ছা হইলে আগেরদিন—বিশ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফ কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে হইবে।

এইখানে আর একটি প্রশ্ন হইল, দশ দিনের ই'তিকাফ শেষে—ঈদের রাত্রে ই'তিকাফ কেন্দ্রেই অবস্থান করিতে হইবে ও ঈদের নামাযের জন্য ময়দানে যাওয়ার পূর্বে মসজিদ হইতে বাহির হইবে না, না মাসের শেষ দিন ঈদের চাঁদ দেখার বা সূর্যস্তের পরই মসজিদ হইতে চলিয়া যাওয়া জায়েয? এই পর্যায়ে শরীয়াত বিশেষজ্ঞদের উক্ত দুই প্রকারের কথাও উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম মতটি ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ প্রমুখ প্রদান করিয়াছেন। আর ইমাম শাফেয়ী, লাইস ও আওযায়ী প্রমুখ ঈদের রাত্রিতে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া জায়েয বলিয়াছেন।

ই'তিকাফ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ হইতে একথাও জানা যায় যে, ই'তিকাফের জন্য মসজিদ জরুরী শর্ত—ই'তিকাফ মসজিদেই করিতে হইবে। (عمدة القارى)

কুরআন মজীদে 'ই'তিকাফ' শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে এই মসজিদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াই উদ্ধৃত হইয়াছে। এতএব ই'তিকাফ' মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়াই যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও পছন্দ,তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়ত নবী করীম (স) সাধারণত মসজিদেই ই'তিকাফ করিয়াছেন-- অন্যত্র নহে। সর্বব্যাপারের ন্যায় এ ব্যাপারেও তিনিই মুসলমানদের একমাত্র ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণীয় আদর্শ।

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِى اِلَىَّ رَأْسَهُ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ - (موطا امام محمد)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) যখন মসজিদে ই'তিকাফ করিতেন, তখন তিনি মসজিদে থাকিয়াই আমার দিকে তাঁহার মাথাটি নিকটবর্তী করিয়া দিতেন। তখন আমি তাঁহার মাথা আঁচড়াইয়া দিতাম এবং তিনি এই সময় নিতান্ত মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘরে আসিতেন না। —মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ

ব্যাখ্যা রাসূলে করীম (স) মসজিদেই ই'তিকাফ করিতেন। এই সময় প্রকৃতির ডাক ছাড়া তিনি কখনও ঘরে আসিতেন না। অবশ্য মসজিদে দাঁড়াইয়া থাকিয়া খিড়কির পথে মসজিদ সংলগ্ন ঘরে

মাথা লাগাইয়া দিতেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) তাহার মাথা আঁচড়াইয়া দিতেন। মাথা আঁচড়ানোর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট এবং অন্য কেহ—নিজের স্ত্রীও—তাহা করিয়া দিতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিয়াছেন, ই'তিকাফ থাকা অবস্থায় কেবলমাত্র পায়খানা পেশাব কিংবা অযূ গোসল ছাড়া অন্য কাজের জন্য মসজিদের বাহিরে যাইব না। খাওয়া দাওয়াও মসজিদের ভিতরে সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়।

লাইলাতুল কদর

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ـ (بخارى)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, তোমরা রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় তারিখে কদর রাত্রির সন্ধান কর। —বুখারী

ব্যাখ্যা কদর রাত্রি খুঁজিয়া বাহির করার জন্য এই হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। খুঁজিবার কাজ সহজ করার জন্য নবী করীম (স)-এর এই সংক্ষিপ্ত বাণীতে দুইটি স্পষ্ট নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। একটি এই যে, এই রাত্রিটি রমযান মাসের শেষ দশকের কোন একটি হইবে। আর দ্বিতীয় এই যে, এই রাত্রিটি বেজোড় তারিখের হইব, জোড় তারিখের নয়। শেষ দশকের বেজোড় রাত্রি বলিতে ২১-২৩-২৫-২৭-২৯—এই তারিখ সমূহ বুঝায়। উদ্ধৃত হাদীস অনুযায়ী ইহারই কোন এক দিনের রাত্রিটি কদর রাত্রি হইবে।

'লাইলাতুল কদর' বা 'কদর রাত্রি' অর্থ কি? ইহা বলিতে কি বুঝায়? আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ

وَمَعْنٰى لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ تَقْدِيْرِ الْاُمُوْرِ وَقَضَائِهَا وَالْحُكْمِ وَ الْفَصْلِ يَقْضِى اللّٰهُ فِيْهَا قَضَاءَ السَّنَةِ

'লাইলাতুল কদর' অর্থ এমন রাত্রি বুঝায়, যাহাতে যাবতীয় ব্যাপারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, উহার চূড়ান্ত রূপ দান করা হয় এবং একটি বৎসর কালের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এই রাত্রে সব বিধান ও মর্যাদার ফয়সালা করিয়া দেন।

এই রাত্রিটির নিজস্ব মাহাত্ম্যের জন্যই ইহার এই নামকরণ করা হইয়াছে। ইমাম যহরী বলিয়াছেনঃ

هِىَ لَيْلَةُ الْعَظِيْمَةِ وَالشَّرْفِ ـ

ইহা (অতীব) উচ্চমান, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের রাত্রি।

আবূবকর আল-আররাক বলিয়াছেনঃ

سُمِّيَتْ بِذٰلِكَ لِاَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَا قَدْرٍ وَخَطَرٍ يَصِيْرُ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ ذَا قَدْرٍ وَخَطَرٍ اِذَا اَدْرَكَهَا وَاَحْيَاهَا ـ

এই রাত্রিটির নাম 'কদর রাত্রি' রাখা হইয়াছে এইজন্য যে, যে লোক মূলত মান-মর্যাদা সম্পন্ন নয় সে যদি এই রাত্রিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করে ও রাত্র জাগরণ করিয়া আল্লাহ্র ইবাদত করে, তাহা হইলে সেও সম্মান ও মর্যাদাবান হইয়া যাইবে।

আবার কেহ বলিয়াছেনঃ

لِأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يُوجَدُ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِ يَكُونُ ذَا قَدْرٍ وَقِيمَةٍ عِنْدَ اللّٰهِ لِكَوْنِهِ مَقْبُولًا فِيهَا،

এই নামকরণের কারণ হইল, এই রাত্রিতে মু'মিন ব্যক্তি যে নেক আমল করে, তাহা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হওয়ার কারণে সমধিক মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী হইয়া থাকে।

আল্লাহ্র মর্যাদাবান কিতাব কুরআন মজীদ এই রাত্রিতে নাযিল হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম 'কদর রাত্রি' রাখা হইয়াছে এরূপ মতও অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। সহল ইবনে আবদুল্লাহ্র মতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মুমিন বান্দাদের প্রতি রহমত বর্ষণের পরিমাণ এই রাত্রিতে নির্ধারণ করেন বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে। আবার এই মতও ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, এই রাত্রিতেই আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলিয়াছেনঃ

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ (الدخان : ٤)

এই মহান রাত্রিতে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হয়।

ইমাম হাসান (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলঃ

أَرَأَيْتَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَفِي كُلِّ رَمَضَانَ هِيَ۔

কদর রাত্রি কি প্রত্যেক রমযান মাসেই হয়?— এই বিষয়ে আপনার মত কি?

জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ

وَاللّٰهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا فِي كُلِّ رَمَضَانَ إِنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ فِيهَا يَقْضِي اللّٰهُ كُلَّ خَلْقٍ وَأَجَلٍ وَرِزْقٍ وَعَمَلٍ۔ (تفسير القرطبي)

যে আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ কেহই নাই, তাঁহার নামে বলিতেছি, প্রত্যেক রমযান মাসেই এই রাত্র আসে। ইহা এমন একটি রাত্র, যাহাতে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টিকুলের হওয়া-মরা, রিযিক ও কাজ—সর্ববিষয়ে ফয়সালা করিয়া দেন এই রাত্রিতে।

বস্তুত সময় ও কাল—দিন ও রাত্রির ধারা অব্যাহত, একটানা। ইহার মধ্যে কোন এক অংশের—মাত্র একটি রাত্রিকাল সময়ের—মর্যাদা ভিন্নতর হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণত যেমন দুর্বোধ্য, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণও। কিন্তু কদর রাত্রির অসাধারণ অসামান্য মান মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের এত অধিক ও বলিষ্ঠ ঘোষণা রহিয়াছে, যাহা আয়ত্ত করা কঠিন। এই ব্যাপারে দুইটি কথা বলা যাইতে পারেঃ হয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই রাত্রিকালব্যাপী সময়টুকু একটা ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা রহিয়াছে। যে কারণে এই রাত্রে এতসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ দূর-অতীত কাল হইতে

সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে, এখনও হইতেছে ও অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত তাহা হইতে থাকিবে। অথবা অনাদি অনন্তকাল হইতে এই সময়টুকুতে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই ইহার এই মর্যাদা লাভ সম্ভব হইয়াছে। কিংবা বলা যায়, এই রাত্রি সম্পর্কে এই দুইটি কথাই একসঙ্গে সত্য।

উপরোদ্ধৃত হাদীসটিতে হযরত নবী করীম (স) রাত্রিটি খুঁজিয়া বাহির করার জন্য চেষ্টা করিতে মসুসলমানদের নির্দেশ দিয়াছেন। রাত্রিটি খুঁজিয়া বাহির করার প্রয়োজন এইজন্য দেখা দিয়াছে যে, কুরআন হাদীসে এই রাত্রির মর্যাদা ও সম্মানের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে রাত্রি যে কোন্‌টি, অখণ্ড অব্যাহত কালস্রোতের মধ্য হইতে কোন্ অংশটি 'কদর রাত্রি' নামে অভিহিত, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। তাহা দিলে তো কোন ঝামেলাই থাকিত না। কিন্তু খুঁজিয়া বাহির করার কাজ সহজতর হওয়ার পক্ষে কতগুলি কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমত কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ 'কদর রাত্রিতে কুরআন নাযিল হইয়াছে' দ্বিতীয়ত বলা হইয়াছেঃ 'কদর রাত্রি রমযান মাসে আসিয়া থাকে'। পরবর্তী জরুরী নির্দেশনা পাওয়া যায় হাদীসে। আলোচ্য হাদীসের প্রথম নির্দেশনা হইলঃ ইহা রমযান মাসের শেষ দশকে তালাশ করিতে হইবে। তাহার পর বলা হইয়াছে, শেষ দশকের যে কোন রাত্রিই কদর রাত্রি নয়। শেষ দশকের যে কোন বেজোড় তারিখের (২১-২৩-২৫-২৭-২৯ এর) যে কোন একটি রাত্রিই হইবে কদর রাত্রি। অতএব এই তারিখসমূহে এই রাত্রিটি খুঁজিতে হইবে। অবশ্য আরো স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় আর একটি হাদীসে, বুখারী ও নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এবং হযরত উমর ও হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের শব্দ হইলঃ

فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ - শেষ সাত দিনের কোন একটিতে ——।

আর আবূ বক্‌রতা বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন।

اِلْتَمِسُوْهَا فِىْ تِسْعٍ يَبْقَيْنَ اَوْ سَبْعٍ يَبْقَيْنَ اَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ اَوْ ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ اَوْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ -

(بخارى، ترمذى، نسائى، حاكم)

রমযান মাসের শেষ নয় দিন কিংবা পাঁচ দিন অথবা তিন দিন, অবশিষ্ট থাকিতে কিংবা সর্বশেষ রাত্রিতে কদর রাত্রি তালাশ কর।

ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকেম একবাক্যে বলিয়াছেন, হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই নির্দেশনা আরো স্পষ্ট ও মূল ব্যাপারে অতীব নিকটবর্তী। ইহার ফলে কদর রাত্রির খোঁজ পাওয়া কিছুমাত্র কঠিন বা অসুবিধাজনক থাকিল না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে—তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে লোক রমযান মাসের রোযা থাকিবে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও তাঁহার নিকট সওয়াব পাইবার বাসনা মনে রাখিয়া, তাহার অতীতের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। আর যে লোক কদর রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদতে অতিবাহিত করিবে তাহারও অতীত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। —বুখারী

ব্যাখ্যা কদর রাত্রির অধিকতর মর্যাদা ও সম্মানের কথা বলিবার পর এই রাত্রিতে ইবাদত-বন্দেগীর মর্যাদার কথা এই হাদীসে বলা হইয়াছে। রমযান মাসের রোযা রাখা সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা তো স্পষ্ট ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ নয় কেননা রমযান মাসের রোযা মুসলমানদের প্রতি ফরজ করা হইয়াছে। আর ফরজ পালনের প্রতিফল প্রশ্নের উর্ধ্বে। তিরমিযী শরীফে এই বর্ণনাটির ভাষায় খানিকটা অতিরিক্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইলঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ -

যে লোক রমযানের রোযা থাকিবে ও সারা রমযান ধরিয়া কিয়াম করিবে অর্থাৎ তারাবীহ নামায পড়িবে, তাহার অতীত গুনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

কদর রাত্রির ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কেও অনুরূপভাবে গুনাহ্ খাতা মাফ করিয়া দেওয়ার সওয়াবের কথা বলা হইয়াছে। এইসব ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল 'ঈমান' ও 'ইহ্তিসাব'। অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি—তাঁহার আদেশের প্রতি ও তাঁহার সওয়াব দানের প্রতি এবং তাঁহার নিকট হইতে গুনাহ্ মাফী ও বিপুল সওয়াব পাওয়ার সন্দেহ মুক্ত সুদৃঢ় আশাবাসনা মনে ধরিয়া তাহা রাখা থাকিলেই এই সব আমলের সঠিক কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। কাজেই নিছক আনুষ্ঠানিক ও লোক দেখানো নেক আমলের যে কোন-ই ফল পাওয়া যাইবে না, তাহা নিশ্চিত।

রমযানের শেষ দশকে রাসূলে করীম (স)-এর আমল

عَنْ عَائِشَةَ رَضِ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

(بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجه)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ রমযান মাসের শেষ দশক শুরু হইলেই নবী করীম (স) তাঁহার কোমর শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইতেন, এই সময়ের রাত্রিগুলিতে জাগ্রত থাকিতেন এবং তাঁহার ঘরের লোকদিগকে সজাগ করিতেন।

—বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা কুরআন মজীদে কদর রাত্রিতে যে মর্যাদার কথা বলা হইয়াছে এবং রাসূলে করীম (স) নিজে যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজেকে বাদ দিয়া অন্য সব লোকের জন্য নয়, বরং সেই সব অনুসারে রাসূলে করীম (স) নিজেই আমল করিয়াছেন সর্বাধিক। তাঁহার সহধর্মিণী হযরত আয়েশার এই হাদীসটিই উহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। হাদীস অনুযায়ী, রমযান মাসের শেষ দশক আসিলেই নবী করীম (স) চূড়ান্ত মাত্রার ইবাদতের জন্য কোমর বাঁধিতেন অর্থাৎ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেন। আর কেবল তিনি একাই ইবাদত করিতেন তাহাই নয়, ঘরের অন্যান্য লোকদেরও নিজের সঙ্গে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করার জন্য প্রস্তুত করিতেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, নবী করীম (স) রমযানের শেষ দশকে তো ই'তিকাফে থাকিতেন, আর ই'তিকাফকালে মসজিদেই অতিবাহিত করিতেন। তাহা হইলে তিনি কদর রাত্রি ইবাদত করার জন্য তাঁহার ঘরের লোকদিগকে কি করিয়া সজাগ করিতেন। তিনি তো আর মসজিদ হইতে বাহির হইয়া ঘরে আসিতেন না। ইহার জওয়াবে বলা যায়, হয়ত তিনি জাগ্রত করিতেন সেই লোকদিগকে যাহারা তাঁহার সঙ্গে ই'তিকাফে থাকিতেন। অথবা তাঁহার হুজরার যে খিড়কি মসজিদের দিকে খুলিত,

মসজিদে দাঁড়াইয়া সেই খিড়কি হইতে ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া সজাগ করিতেন। অথবা তিনি ই'তিকাফে যাওয়ার আগেই ঘরের লোকদিগকে এই রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করার জন্য গুরুত্ব সহকার উপদেশ দিয়া যাইতেন।

তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের ভাষা এইরূপঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْقِظُ اَهْلَهٗ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -

নবী করীম (স) রমযান মাসের শেষ দশকে তাঁহার ঘরের লোকজনকে ইবাদত ও নামাযের জন্য জাগ্রত করিয়া দিতেন।

হযরত আয়েশার অপর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَالَا يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهَا - (مسلم، ترمذى)

'রাসূলে করীম (স) রমযান মাসের শেষ দশকে ইবাদত বন্দেগীর কাজে এতই কষ্ট স্বীকার করিতেন, যাহা অন্যান্য সময়ে করিতেন না। —মুসলিম, তিরমিযী

আর যয়নব বিনতে সালমার বর্ণনায় এই কথাটি আরো বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছেঃ

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَقِىَ مِنْ رَمَضَانَ عَشَرَةُ اَيَّامٍ يَدَعُ اَحَدًا مِنْ اَهْلِهٖ يُطِيْقُ الْقِيَامَ اِلَّا اَقَامَهٗ - (عمدة القارى)

রমযানের শেষ দশকে তাঁহার ঘরের লোকদের মধ্যে রাত্র জাগরণ করিয়া ইবাদত করিতে পারে এমন কাহাকেও ঘুমাইতে দিতেন না বরং প্রত্যেককেই জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবার জন্য প্রস্তুত করিতেন।

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْقَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ - (بيهقى، شعب الايمان)

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, যখন কদর রাত্রি আসে, তখন হযরত জিবরাইল (আ) ফেরেশতাদের বাহিনী সমন্বয়ে অবতীর্ণ হন এবং দাঁড়াইয়া কিংবা বসিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র-এ মশগুল থাকা প্রত্যেক বান্দার জন্য রহমতের দোয়া করেন। —বায়হাকীঃ শুআবুল ঈমান

ব্যাখ্যা কদর রাত্রিতে জিবরাঈল (আ) ফেরেশতা পরিবেষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীর লোকদের মধ্যে অবতরণ করেন ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র কাজে দাঁড়াইয়া বসিয়া ব্যস্ত থাকা লোকদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। এই হাদীস হইতে কদর রাত্রির মর্যাদা এবং এই রাত্রিতে ইবাদত বন্দেগী, কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায ও ইসলামী আলাপ আলোচনা ও জ্ঞান-চর্চার মর্যাদা স্পষ্টভাবে জানিতে পারা যায়। নবী করীম (স) নিজেও তাঁহার ঘরের লোকদিগকে এই রাত্রিটি যথাযথভাবে পাইবার জন্য রমযানের শেষ দশকের সব কয়টি রাত্রিই আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হইতেন ও মশগুল রাখিতেন। এই রাত্রিটির বরকত যেন কোন প্রকারে হারাইয়া না যায় ও ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে না হয়, এই উদ্দেশ্যেই তাহার এই ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি, ইহা সকল মুসলমানের জন্য অনুসরণীয়।

যাকাত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضـ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ
اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ اِلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ
لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ
عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ ـ (بخارى، مسلم، مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী করীম (স) যখন হযরত মু'আয (রা)-কে ইয়েমেন পাঠাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেনঃ তুমি আহ্‌লি কিতাবদের এক জাতির নিকট পৌঁছিবে। তাঁহাদিগকে এই কথার সাক্ষ্য দিতে আহবান জানাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল। তাহারা যদি তোমার এই কথা মানিয়া লয়, তাহার পর তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি রাত দিনের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। তোমার এই কথাও যদি স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে জানাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি তাহাদের ধনসম্পত্তির উপর যাকাত ফরয করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাহাদের ধনী লোকদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে ও তাহাদেরই গরীব-ফকীর লোকদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। তোমার এই কথাও তাহারা মানিয়া লইলে তাহাদের উত্তম মালই যেন তুমি যাকাত বাবত আদায় করিয়া না লও। আর তুমি মজলুমের দোয়াকে সব সময় ভয় করিয়া চলিবে। কেননা মজলুমের দোয়া ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোন আবরণ অন্তরাল বর্তমান নাই। —বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহ্‌মদ

ব্যাখ্যা রাসূলে করীম (স) দশম হিজরী সনে বিদায় হজ্জে গমনের পূর্বে হযরত মু'আয (রা)-কে ইয়েমেন পাঠাইয়া ছিলেন (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)। অবশ্য কাহারো মতে নবম হিজরী সনে তাবুক

যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে হযরত মু'আযকে ইয়েমেন পাঠানো হইয়াছিল। আবার কেহ বলিয়াছেন যে, অষ্টম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের বৎসর তাঁহাকে পাঠানো হয়।

(بلوغ الاماني شرح المسند ج ٨ - ص ١٨٩)

অতঃপর হযরত মু'আয ইয়েমেনেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তথা হইতে হযরত আবূ বকরের খিলাফতকালে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাকে ইয়েমেনে শাসনকর্তা হিসাবে পাঠানো হইয়াছিল, কি বিচারপতি হিসাবে, এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইবনে আবদুল বা'র দ্বিতীয় মত পোষণ করেন, আর গাসানী প্রথম মত সমর্থন করেন।

তখন ইয়েমেনে প্রধানত আহলি কিতাব, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরাই বসবাস করিত। তাহাদের উপর কেবল আইনের শাসন কায়েম করাই নয়, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত তাহাদের সম্মুখে পেশ করাও হযরত মু'আযের কর্তব্য ছিল। এই জন্যই ইয়েমেন গমনের পূর্বে নবী করীম (স) তাঁহাকে বিশেষ নসীহতের মাধ্যমে দাওয়াতের বিষয় ও পদ্ধতি শিক্ষাদানের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। বিশেষত এই আহলি কিতাবগণ ছিল শিক্ষিত; তাহাদের সাথে জহেল-মুর্খ লোকদের ন্যায় কথা বলা সঙ্গত নয় বিধায় ইসলামী দাওয়াতের ক্রমিক নীতিও তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

হযরত মু'আযকে আহলি কিতাবদের সম্মুখে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনিবার দাওয়াত পেশ করিতে বলা হয়। কেননা ইসলামী ঈমানের মূল ভিত্তিই হইতেছে এই দুইটি। এই দুইটি বিষয়ে ঈমান সর্বপ্রথম আনা না হইলে ইসলামের অপর কোন কাজই শুদ্ধ হইতে পারে না। আর আহলি কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক তাওহীদ বিশ্বাসী থাকিলেও প্রথমত তাহাদের ঈমান সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভিত্তিক ছিল না এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহ্কে বিশ্বাস করিলেও হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ্র রাসূলরূপে মানিয়া না লইলে সে তাওহীদ বিশ্বাসের কোনই মূল্য হয় না। এই কারণে আল্লাহ্র ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনিবার দাওয়াত সর্বপ্রথম দেওয়ার কথা শিক্ষা দেওয়া হয়। বস্তুত যে কোন সময়ে, যে কোন যুগে যে কোন সমাজের লোকদের সম্মুখে ইসলামের ইহাই প্রথম দাওয়াত। তাহার পরই তদনুযায়ী আমল করার—শরীয়াতের হুকুম আহকাম মানিয়া লওয়া ও পালনে করার নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে, তাহার পূর্বে নহে। এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের পরই যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, তেমনি ঈমানদার ধনী লোকদের উপর নিয়মিত যাকাত আদায় করা ফরয হয় এবং ইসলামী গভর্নমেন্ট, হয় নিজস্ব ক্ষমতায় সরাসরিভাবে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির মাধ্যমে এই যাকাত আদায় করিবার অধিকারী হয়। এমতাবস্থায় কোন মুসলিম ধনী ব্যক্তি যদি যাকাত আদায় না করে কিংবা যাকাত আদায় করিতে রাযী না হয়, তবে ইসলামী গভর্নমেন্ট রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ইহা আদায় করিতে পারিবে।

এখানে মূল হাদীসে 'সাদকা' · صَدَقَةٌ · শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। এখান 'সাদকা' অর্থ যাকাত, যাহা আদায় করা ফরয, সাধারণ দান-খয়রাত নয়। কেননা কুরআন মজীদের 'সাদকা' এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আর দ্বিতীয়ত সাধারণ দান খয়রাত কখনো ফরয নহে এবং তাহার জোর প্রয়োগে আদায় করিবার নিয়ম নাই। অথচ এখানে বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি 'সাদকা' ফরয করিয়া দিয়াছেন।

কুরআন মজীদে 'সাদকা' অর্থাৎ যাকাত ব্যায়ের আটটি খাত ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু আলোচ্য হাদীসে তন্মধ্যে মাত্র একটি খাতেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে ইমাম মালিক এই মত গ্রহণ করিয়াছেন যে, আটটি খাতের যে কোন একটি খাতে যাকাত ব্যয় করিলে তাহা অবশ্যই জায়েয ও যথেষ্ট হইবে। তবে ইবনে দাকীকুল ঈদ এইখানে একটি মাত্র খাতের উল্লেখ করিবার কারণ দর্শাইয়া বলিয়াছেন যে, প্রধানত ও সাধারণত ফকীর-গরীব লোকদিগকেই যাকাত দেওয়া হয় বলিয়া এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে অথবা ধনীদের মুকাবিলায় যাকাত পাওয়ার যোগ্য ফকীরদের উলেখ

করা হইয়াছে। নতুবা ইহার অর্থ কখনো এই নয় যে, কেবল একটি খাতে যাকাত ব্যয় করিলেই উহা যথেষ্ট হইবে।

ইমাম খাত্তাবী এই হাদীসের ভিত্তিতেই বলিয়াছেন যে, ঋণগ্রস্ত লোকদের উপর যাকাত ফরয নহে। কেননা এই ঋণ পরিমাণ সম্পদ বাদ দিলে যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ সম্পদ তাহার নিকট অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে ধনী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তবে ঋণ আদায় করা বা ঋণ পরিমাণ সম্পদ বাদ দেওয়ার পর যে পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট্য থাকিবে, তাহা যদি যাকাত ফরয হওয়া পরিমাণ نصاب হয়,তবে উহার উপর অবশ্যই যাকাত ফরয এবং তাহা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে।

হাদীসে উল্লেখিত كرائم (কারায়েম) অর্থ, 'উত্তম ও উৎকৃষ্ট মাল'। এই হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর পক্ষে যাকাত দাতার উত্তম ও উৎকৃষ্ট মালই বাছাই করিয়া লওয়া জায়েয নহে। কেননা যাকাত হইতেছে গরীবদের সাহায্য ব্যবস্থা। কাজেই মূল সম্পদের মালিকের সন্তোষ ব্যতীত উহা গ্রহণ করা কখনো জায়েয হইতে পারে না। আর কোন সম্পদ মালিকই নিজের সম্পদ হইতে বাছিয়া বাছিয়া উত্তম মালসমূহ দিয়া দিতে সাধারণত রাযী হইতে পারে না।

হযরত মু'আযকে মজলুমের বদদোয়া হইতে দূরে থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হিসাবে তিনি যেন জনগণের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম না করেন। কেননা কাহারো উপর জুলুম করা হইলে তাহার নিপীড়িত অন্তর যে আর্তচীৎকার করিয়া উঠিবে, তাহা আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে। রাসূলে করীমের এই নির্দেশ একটি সাধারণ মূলনীতি নির্ধারণ পর্যায়ের। সকল প্রকার ক্ষমতাশীল ব্যক্তির প্রতিই ইহা প্রযোজ্য এবং মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সব জুলুমকেই ইহাতে সমানভাবে গণ্য করা হইয়াছে।

নবী করীম (স) অপর একটি ঘোষণায় বলিয়াছেনঃ

إِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ لَا تُرَدُّ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ۔

মজলুম কাফির হইলেও তাহার ফরিয়াদ প্রত্যাখ্যাত হয় না।

অপর এক হাদীসের ভাষা হইলঃ

دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُوْرُهُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۔ (مسند احمد)

মজলুম গুনাহগার ব্যক্তি হইলেও তাহার বদদোয়া কবুল হয়। তাহার গুনাহের জন্য সে দায়ী হইলেও বদদোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জুলুম সহ্য করেন না। তাহা মুমিনের উপর করা হউক, কি কাফিরের উপর।

আর উত্তম মাল গ্রহণ না করিতে বলার পরই জুলুম করিতে নিষেধ করায় ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বাছিয়া বাছিয়া কেবল উত্তম মাল যাকাত বাবদ—যাকাত দাতার মর্যীর বিপরীত—আদায় করিয়া লওয়া জুলুমেরই শামিল। আর যাকাত বাবদ যদি উত্তম মাল বাছিয়া লওয়া জুলুম হয় তবে কৃষিজমির উপর সাধ্যাতীত পরিমাণে কর ধার্য করাও কি জুলুম নয়?

এই হাদীসটি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তাহা এই যে, ইহাতে রোযা ও হজ্জের উল্লেখ করা হয় নাই অথচ হযরত মু'আযকে ইয়েমেনে প্রেরণের পূর্বেই ইসলামের এই দুইটি কাজ ফরয করা হইয়াছিল।

ইহার জওয়াবে ইবনু সালাহ্ বলিয়াছেন, রাসূলে করীমের মূল ফরমানে এই দুটি বিষয়েরও উল্লেখ ছিল; কিন্তু হাদীস বর্ণনাকারী এই দুইটি বাদ দিয়াই যাকাতের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে হাদীস সংক্ষেপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর কিরমানী বলিয়াছেনঃ মূল হাদীসে রোযা ও হজ্জের উল্লেখ না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। কেননা শরীয়াতে নামায ও যাকাতের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে বিধায় এখানে এই দুইটিরই উল্লেখ হইয়াছে। আর এই দুইটির উল্লেখ এখানে না থাকিলেও রোযা এবং হজ্জও উহার অন্তর্ভুক্ত মনে করিতে হইবে। কুরআন মজীদেরও বিভিন্ন স্থানে নামায ও যাকাতের এক সঙ্গেই উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু সেখানে রোযা ও হজ্জের উল্লেখ হয় নাই, যদিও এই দুইটিও ইসলামের রোকনের মধ্যে শামিল। যেমন কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

فَإِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ -

তাহারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে, ও যাকাত দান করে, তবেই তাহারা মুসলিমদের দ্বীনী ভাই বলিয়া গণ্য হইবে।

আয়াতটিতে রোযা ও হজ্জের উল্লেখ নাই অথচ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বেই রোযা ও হজ্জ ফরয করা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও শুধু নামায কায়েম করিলে ও যাকাত আদায় করিলেই একজন লোক মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হইল বলিয়া আয়াতটিতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

(عمدة القارى - بلوغ الامانى من اسرار الفتح الربانى -)

তায়্যিবী ও অন্যান্য হাদীসবিশারদগণ আলোচ্য হাদসিটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'উহা তাহাদের ধনীদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে।' বাক্যাংশ প্রমাণ করে যে, না–বালেগদের উপরও যাকাত ফরয। কেননা এর কথা সাধারণভাবে সর্ব শ্রেণীর ধনীদেরই শামিল করে। শাফেয়ী মাযহাবের মতে বালকদের উপর নয়, তাহাদের ধন মাল থাকিলে তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে। পাগল ও বুদ্ধিহীন লোকদের সম্পর্কেও এই কথা। দলীল হিসাবে একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اَلَا مَنْ وَلِىَ يَتِيْمًا لَهٗ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِىْ مَالِهٖ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ - (ترمذى)

তোমরা জানিয়া রাখ, যে লোক কোন ইয়াতিমের অভিভাবক হইয়া বসে, সে যেন সেই ইয়াতীমের ধন–মাল মানুফাজনক কাজে নিয়োগ করে এবং উহা যেন যাকাত দিয়া শেষ হইয়া যাওয়ার জন্য ফালাইয়া না রাখে।

বস্তুত ইয়াতীমের মাল–সম্পদ হইতে যে যাকাত দিতে হয়—তাহা কোন লাভজনক কাজে নিয়োজিত করা হউক বা না হউক, যাকাত দিতে দিতে মূল সম্পদ নিঃশেষ হউক বা না হউক এই কথা হাদীস হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে এই কথা স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ধন–সম্পদের মালিকের সুস্থ জ্ঞান–বুদ্ধি সম্পন্ন ও পূর্ণ বয়স্ক হওয়া অনিবার্য শর্ত। অতএব নাবালেগ ও অসুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির ধন–মালে যাকাত ফরয নয়। দলীল হিসাবে তাঁহারা হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করিয়াছেন। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يُفِيْقَ - (ابو داؤد، نسائى، ابن ماجه، حاكم)

তিন জনের উপর শরীয়াতের কোন দায়িত্ব অর্পিত হয় নাই। (১) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হইবে; (২) অপূর্ণ বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না পূর্ণ বয়স্ক হইবে এবং (৩) পাগল যতক্ষণ না সে সুস্থমস্তিষ্ক হইবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

لَيْسَ فِىْ مَالِ الْيَتِيْمِ زَكٰوةٌ - (كتاب الاثار لمحمد بن الحسن)

ইয়াতীমের মালে কোন যাকাত নাই।

তাঁহারা আরো বলেন যে, তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত উপরিউক্ত হাদীসটি—যাহাতে নাবালেগ ও পাগলের উপর যাকাত ফরয হয় বলিয়া মনে করা হইয়াছে—সনদের দিক দিয়া যয়ীফ। উহার সনদে আল-মুসান্না ইবনে সাবাহ একজন বর্ণনাকারী। সে ইমাম আহমদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম তিরমিযী—তিনজন মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে বর্ণনা গ্রহণে অযোগ্য ব্যক্তি। মান্দেল বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর বাণী হইলঃ

اِحْفَظُوْا الْيَتَامٰى فِىْ اَمْوَالِهِمْ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكٰوةُ - (دارقطنى)

ইয়াতীমের ধন-মাল সংরক্ষণ কর, যাকাত যেন তাহা নিঃশেষ করিয়া না ফেলে।

কিন্তু এই মান্দেল ইবনে আলীকেও ইমাম আহমদ ও ইবনে হাব্বান 'যয়ীফ' ও 'হাদীস গ্রহণ অযোগ্য' বলিয়াছেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব সূত্রে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اِبْتَغُوْا بِاَمْوَالِ الْيَتَامٰى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ -

ইয়াতীমের ধন-মালের ব্যাপারে সদিচ্ছাভাজন হও। যাকাত যেন উহা খাইয়া নিঃশেষ করিয়া না দেয়।

কিন্তু সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব সরাসরি হযরত উমর হইতে হাদীস শুনিতে পান নাই, তাহা সর্বজনস্বীকৃত। এই কারণে ইহা গ্রহণ অযোগ্য।

ইহা ছাড়া এই শেষোক্ত হাদীসদ্বয়ের উদ্দেশ্য উহার উপরও যাকাত ফরয হওয়ার পক্ষে হইতে পারে। কেননা এই কথা বলিয়া ইয়াতীম নাবালেগের ধন-মাল মুনাফামূলক কাজে নিয়োগ করিতে বলা হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়। এতদসত্ত্বেও ইয়াতীমের মালে যাকাত ফরয হওয়া পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। বহু সাহাবী মালে যাকাত ফরয বলিয়া বিশ্বাস করেন। হযরত উমর, আলী, আয়েশা, ইবনে উমর প্রমুখ এই পর্যায়ে বলিয়াছেন। ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বিপরীত ইয়াতীমের মাল-সম্পদে যাকাত ফরয না হওয়ার পক্ষে মত দিয়াছেন সুফিয়ান সওরী, আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক, ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁহার সঙ্গিগণ, আবূ ওয়ায়েল, সাঈদ ইবনে যুবায়র, নখয়ী, শাবী হাসান বসরী পমুখ ফিকাহবিদ। ইহারা তাঁহাদের এই মতে সাহাবীদের 'ইজমা' হইয়াছে বলিয়াও দাবি করিয়াছেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলিয়াছেনঃ

لَاتَجِبُ الزَّكٰوةُ اِلَّا عَلٰى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالصِّيَامُ -

যাহার উপর নামায রোযা ফরয, তাহাদের ছাড়া অন্যদের উপর যাকাত ফরয নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আলী ও জাফর ইবনে মুহাম্মাদও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও মূল কথা থাকিয়া যায়, তাহা হইল, নামায রোযা ফরয হয় ব্যক্তির উপর, আর যাকাত ফরয হয় ধন-মালের উপর। অতএব ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ মন-মগজ না হইবে, ততক্ষণ তাহার উপর নামায রোযা ফরয না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি ধন-মাল যাকাত ফরয হওয়া পরিমাণ হয়—উহার মালিক নাবালেগ হইলেও—সেই ধন-মালের উপর যাকাত ফরয হওয়ার পথে কোন বাধা থাকিতে পারে না। বিশেষত যাকাত একান্তভাবে গরীব লোকদের বা নির্দিষ্ট খাতসমূহের অনস্বীকার্য হক। মালিক নাবালেগ হইলেও উহা হইতে যাকাত আদায় করাই বাঞ্ছনীয় এবং যাকাত ফরয করার উদ্দেশ্যের সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল।

'তাহাদের ধনীদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইতে' বাক্য হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, যাকাত ব্যক্তিগতভাবে গরীবদের মধ্যে বন্টন করিবার মাধ্যমে আদায় করা যাইবে না, সরকারী ব্যবস্থাধীন আদায় করাই শরীয়াতের আসল বিধান। এই জন্য রাষ্ট্রের তরফ হইতে বিশেষ বিভাগ স্থাপন এবং আদায়, উসুল ও বিলি-বন্টনের দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা বিধেয়। রাসূলে করীমের ও পরবর্তী ইসলামী যুগে যাকাত সরকারী ব্যবস্থাধীনেই আদায় ও বন্টন করা হইত। সরকারী কর্মচারীদের হাতে তাহা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইত এবং যাকাতদাতারা তাহাই করিত। সা'দ ইবনে আবূ আব্বাস, উমর, আবূ সাইদ খুদ্‌রী, আবূ হুরায়রা, আয়েশা প্রমুখ সাহাবী এবং হাসান বসরী, শা'বী মুহাম্মাদ ইবনে আলী, সাঈদ ইবনে যুবায়র, আবূ রুজাইন আওযায়ী ও ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ ফিকাহ্ বিশারদ একবাক্যে বলিয়াছেনঃ

تُدْفَعُ الزَّكٰوةُ اِلَى الْاُمَرَاءِ -

যাকাত সরকার নিয়োজিত দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিকট সোপর্দ করা যাইবে (দিতে হইবে)।

ফিকাহবিদ আতা বলিয়াছেনঃ

يُعْطِيْهِمْ اِذَا وَضَعُوْهَا مَوَاضِعَهَا -

যদি তাহারা (সরকারী দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা) উহা যথাযথভাবে ব্যয় ও বন্টন করে, তবে তাহাদের হাতে যাকাত দেওয়া যাইবে।

আর ফিকাহবিদ তায়ুস বলিয়াছেনঃ

لَا يُدْفَعُ اِلَيْهِمْ اِذَا لَمْ يَضَعُوْهَا مَوَاضِعَهَا -

সরকারী দায়িত্বশীলরা যদি যাকাত যথাযথভাবে ব্যয় ও বন্টন না করে, তাহা হইলে যাকাত তাহাদের হাতে দেওয়া যাইবে না। (عمدة القارى)

যাকাতের গুরুত্ব

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْبَكْرٍ رض بَعْدَهٗ وَكَفَرَ
مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض لِاَبِىْ بَكْرٍ رض كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهٗ وَنَفْسَهٗ اِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ رض وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالًا كَانُوْا
يُؤَدُّوْنَهٗ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهٖ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رض فَوَاللّٰهِ
مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَأَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ رض لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ۔

(بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، مسند احمد)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) যখন ইন্তেকাল করিলেন ও তাঁহার পর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা (নির্বাচিত) হইলেন, আর আরব দেশের কিছু লোক 'কাফির' হইয়া গেল, তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হযরত আবূ বকর (রা)–কে বলিলেনঃ আপনি এই লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করিতে পারেন, অথচ নবী করীম (স) তো বলিয়াছেনঃ 'লোকেরা যতক্ষণ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ্ মা'বুদ নাই) মানিয়া না লইবে, ততক্ষণ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। যদি কেহ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ স্বীকার করে, তবে তাহার ধন–সম্পদ ও জানপ্রাণ আমার নিকট পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করিবে। অবশ্য ইহার উপর ইসলামের হক কখনো ধার্য হইলে অন্য কথা। আর উহার হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর ন্যাস্ত। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেনঃ আল্লাহ্র শপথ, যে লোকই নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করিবে, তাহারই বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করিব; কেননা যাকাত ইইতেছে মালের হক। আল্লাহ্র শপথ, তাহারা যদি রাসূলের সময় যাকাত বাবদ দিত—এমন এক গাছি রশিও দেওয়া বন্ধ করে, তবে অবশ্যই আমি উহা দেওয়া বন্ধ করার কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব।

তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলিলেনঃ আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা আর কিছু নয়, আমার মনে হইল, আল্লাহ্ যেন আবূ বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উম্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাই ঠিক (তিনি নির্ভুল সিদ্ধান্তই করিয়াছেন)।

—বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা এই হাদীসটি দ্বীন ইসলামের এক ভিত্তি বিশেষ। ইহাতে কয়েক প্রকারের জরুরী ইল্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফিকাহর কয়েকটি জরুরী মাসালাও ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথমত হাদীসটির ঐতিহাসিক পটভূমিক বিশ্লেষণীয়। রাসূলে করীম (স)-এর ইন্তেকালের পর আরবের কয়েকটি গোত্র মুর্তাদ হইয়া যায়। ইহারা প্রধানত দুই ধরনের লোক ছিল। এক ধরনের লোক, যাহারা মূলত দ্বীন-ইসলাম ত্যাগ করিয়া পুরাপুরি কাফির হইয়া গিয়াছিল এবং সম্পূর্ণ কাফিরী সমাজের সহিত মিলিত হইয়াছিল। আলোচ্য হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আরবের কিছু লোক কাফির হইয়া গেল বলিয়া ইহাদের কথাই বুঝাইয়াছেন। আর মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদিসের ভাষা হইলঃ وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ কিছু লোক মুর্তাদ হইয়া গেল। এই লোকগুলি আবার দুই দলে বিভক্ত ছিল। একটি দল মুসায়লামাতুল কাযযাব ও আসওয়াদুল আনাসীর মিথ্যা নবুয়্যত দাবিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। ইহারা সকলেই হযরত মুহাম্মাদের নবুয়্যত অমান্য করিয়াছিল এবং তাঁহার বিরোধী ব্যক্তিদের নবুয়্যত দাবি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইহাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে মুসায়লামা ও আসওয়াদ উভয়ই নিহত হয় এবং তাহাদের দলবল নির্মূল হইয়া যায়।

আর দ্বিতীয় দলে ছিল সেইসব লোক যাহারা দ্বীন-ইসলামের আইন বিধান পালন করিতে অস্বীকার করে। তাহারা নামায ও যাকাত ইত্যাদি শরীয়াতের যাবতীয় হুকুম-আহকাম অমান্য করে ও জাহিলিয়াতের যুগের মতই সম্পূর্ণ বে-দ্বীন হইয়া জীবন যাপন করিতে শুরু করে। ইহার দরুন তখনকার সময়ে পৃথিবীর বুকে মক্কার মসজিদ, মদীনার মসজিদ ও বাহরাইনের 'জাওয়াসাই' নামক গ্রামে অবস্থিত 'মসজিদে আবদুল কাইস'—এই তিনটিই একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদা করার জন্য অবশিষ্ট থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের লোক ছিল তাহারা, যাহারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করিত। তাহারা নামাযকে ফরয মানিত। কিন্তু যাকাত আদায় করা ও তাহা বায়তুলমালে জমা করানো ফরয মানিত না। আসলেই হারাই ছিল বিদ্রোহী দল। কিন্তু সেকালে তাহাদিগকে 'বিদ্রোহী' নামে আখ্যায়িত করা হয় নাই। কেননা তখন ইহারা সাধারণ মুর্তাদের মধ্যেই গণ্য হইত। ইহাদের মধ্যে এমন লোকও অবশ্য ছিল, যাহারা যাকাত দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাহাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এইজন্য তাহাদিগকে বাধা দান করিতেছিল।

যে বিদ্রোহী লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করিত, তাহাদের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা কুরআনের একটি আয়াতকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলঃ আয়াতটি এইঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ (التوبة: ١٠٣)

হে নবী! তাহাদের ধন-মাল হইতে যাকাত গ্রহণ কর। উহার সাহায্যে তুমি তাহাদিগকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ কর।

তাহারা ধরিয়া লইয়াছিল যে, এই আয়াত অনুযায়ী যাকাত আদায় করার অধিকার কেবলমাত্র রাসূলে করীম (স)-এর এবং তাঁহার ইন্তেকালের পর এই অধিকার ও ক্ষমতা অন্য কাহারো থাকিতে পারে না। অতএব এখন আর যাকাত দিতে হইবে না। কিন্তু আসলে ইহা ছিল তাহাদের একটা মারাত্মক ভুল। কেননা কুরআন মজীদে যাকাত আদায় করার এই নির্দেশ প্রত্যক্ষভাবে রাসূলে করীম (স)-কে সম্বোধন করা হইলেও ইহা ছিল এক সাধারণ হুকম। এই নির্দেশ পালনের দায়িত্ব কেবলমাত্র রাসূলে করীম (স) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার অন্তর্ধানের পর যাকাত আদায়ের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়ারও কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। রাসূলে করীম (স)-এর উপস্থাপিত দ্বীন পালনকারী প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিই এই নির্দেশ আরোপিত। কিন্তু সে কথা তাহাদের বোধগম্য ছিল না। এমন কি হযরত উমর ফারুকের ন্যায় বিচক্ষণ ও ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিও যাকাত দিতে

অস্বীকৃতি জানানোর সুদূর প্রসারী কুফল অনুধাবন করিতে প্রথমে সক্ষম হন নাই। এইজন্যই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন এই সকল মূর্তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিলেন, তখন হযরত উমর ফারূক (রা) আপত্তি উথাপন করিলেন। বলিলেনঃ 'আপনি এই লোকদের বিরুদ্ধে কি করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন? অথচ রাসূলে করীম (স) তো 'যে সব লোক লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে না' কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশিত ছিলেন এবং যে তাহা বলে তাহার জান–মাল পূর্ণ নিরাপত্তা পাইয়া যায় إِلَّا بِحَقِّهِ অবশ্য এই সময়ও যদি শরীয়াতের কোন অধিকার উহার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে অন্য কথা। মুসনাদে আহমদে এই কথাটির ভাষা এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

كَيْفَ تُقَاتِلُ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ وَهُمْ يُصَلُّونَ۔

আপনি এই লোকদের বিরুদ্ধে কি করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন, অথচ তাহারা নামায পড়ে?

এই ভাষা অনুযায়ী হযরত উমর (রা)–এর ধারণা ছিল যে, যেসব ঈমানদার লোক নামায পড়ে তাহাদের জান–মাল সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পাইবার অধিকারী।

উপরে উদ্ধৃত মূল হাদীসে হযরত উমর যে হাদীসটির উপর ভিত্তি করিয়া হযরত আবূ বকরের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়াছিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ। সম্ভবত এই অসম্পূর্ণ হাদীসই তাঁহার জানা বা স্মরণে ছিল। আর আপত্তি জানানোর মূল কারণও ইহাই। সম্পূর্ণ হাদীসটি তাঁহার সম্মুখে থাকিলে তিনি এই আপত্তি জানাইতে পারিতেন না। উহার প্রয়োজনও মনে করিতেন না। কেননা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের বর্ণনানুযায়ী এই হাদীসটির সম্পূর্ণ রূপ এইঃ রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ۔

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকরার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি যতক্ষণ না তাহারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই সাক্ষ্য দিবে, নামায কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে।

এই বর্ণনাটির অপর একটি রূপ (version) হইলঃ

حَتّٰى يَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوا بِمَا جِئْتُ بِهِ ۔

যতক্ষণ না 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সাক্ষ্য দিবে ও আমি যে দ্বীন লইয়া আসিয়াছি তাহার প্রতি ঈমান আনিবে।

এই দুই বর্ণনা–ভাষায়ই পূর্ণ দ্বীন ও পূর্ণ শরীয়াত শামিল রহিয়াছে এবং ইহাতে ঈমানের সঙ্গে নামায ও যাকাত উভয়ই অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে ব্যক্তি নবী করীম (স)–এর প্রচারিত পূর্ণ দ্বীন বা দ্বীনের কোন অংশ অমান্য বা অস্বীকার করিবে সে–ই দ্বীন অমান্যকারী সাব্যস্ত হইবে এবং জান–মালের নিরাপত্তা লাভের অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইবে। এই কারণে হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছিলেনঃ

وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الزَّكٰوةِ ۔

যে লোকই যাকাত দেওয়ার দায়িত্ব হইতে মুর্তাদ—অস্বীকৃত হইবে, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাহার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করিব।

বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবূ বকরের জওয়াবের ভাষা ছিল এইঃ

وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ -

যে লোক নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করিবে, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাহার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করিব।

ইহার কারণস্বরূপ তিনি নিজেই বলিয়াছেনঃ 'যাকাত ধন-মালের হক অর্থাৎ দৈহিক ইবাদত যেমন নামায, তেমনি ধন-মালের ইবাদত হইল যাকাত। এই হিসাবে হযরত উমরের নিজের দলীল স্বরূপ পেশ করা হাদীসটির শেষাংশেই এই যাকাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা শামিল রহিয়াছে। কেননা إِلَّا بِحَقِّهِ বাক্যাংশের অর্থ হইলঃ

إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ وَتَرْكِ الصَّلٰوةِ وَمَنْعِ الزَّكٰوةِ بِتَأْوِيلٍ بَاطِلٍ

ইসলামের বিধান অনুযায়ী নরহত্যা, নামায তরক করা ও যাকাত না দেওয়ার অপরাধে শাস্তি বিধান হিসাবে যদি জান ও মালের নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্য কথা।

ইহার জওয়াবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম হইল, রাসূলে করীম (স)-এর ঘোষণানুযায়ী জনগণের জান-মালের প্রতি দেওয়া নিরাপত্তা দুইটি শর্ত, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আর দ্বিতীয় শর্ত, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়া। এমতাবস্থায় কেহ যদি একটি শর্ত পালন করে, আর অন্যটি পালন করিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহা হইলে সে এই নিরাপত্তা লাভ হইতে অবশ্যই বঞ্চিত হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা অবৈধ হইবে না। বস্তুত হযরত আবূ বকরের এই বিশ্লেষণ শ্রবণের পরই হযরত উমরের বোধোদয় হয় এবং তিনি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার আপত্তি ভিত্তিহীন ও হযতর আবূ বকরের নীতিই যুক্তিসংগত ও দলীল ভিত্তিক। এই কারণে শেষ পর্যন্ত হযরত উমর (রা) বলিতে বাধ্য হইলেন—স্বতঃস্ফূর্তভাবেবলিয়াউঠিলেনঃ

فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ -

আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, হযরত আবূ বকরের অনুসৃত নীতিই যথার্থ ও নির্ভুল।

আলোচ্য হাদীসের ভাষা হইতে এই কথাও জানা যায় যে, রাসূলে করীম (স)-এর বর্ণিত কথায় নামায ও যাকাতও যে শামিল রহিয়াছে, তাহা যেমন হযরত উমরের জানা বা স্মরণে ছিল না কিংবা সেদিকে তিনি লক্ষ্য দেন নাই, তেমনি হযরত আবূ বকরেরও তাহা অগোচরে ছিল। নতুবা তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ইহা পেশ করিয়া হযরত উমরকে লা-জওয়াব করিয়া দিতে পারিতেন অথবা তিনি এই আয়াতটিও পেশ করিতে পারিতেনঃ

فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ -

নামায কায়েম করিলে ও যাকাত আদায় করিলেই দ্বীনী ভাই—তথা মুসলমান গণ্য হইতে পারে।

যে ইহার একটিও অস্বীকার করিবে সে মুসলমান ও দ্বীনী ভাইরূপে গণ্য হইবে না। সে মুর্তাদ হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব এই আয়াতের ভিত্তিতেও হযরত আবূ বকরের সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) এই সব দলীল পেশ না করিয়া তিনি যুক্তির আশ্রয় নিলেন ও হযরত উমরেরই পেশ করা হাদীসের শেষ শব্দ إِلَّا بِحَقِّهِ -র ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা হইতে একটা মূলনীতি নিঃসৃত হয়। তাহা হইলঃ

إِنَّهُ يُوْجَدُ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ الْعِلْمِ مَا يُوْجَدُ عِنْدَ خَوَاصِهِ وَبَطَانَتِهِ -

কোন কোন সাধারণ জ্ঞানশালী ব্যক্তির নিকট এমন সব তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে, যাহা বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ লোকদের নিকটও পাওয়া যায় না।

এই ব্যাপারের আরো একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। হযরত উমর (রা) হয়ত মনে করিয়াছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারী দিগকেও কাফির মনে করিয়াই বুঝি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, কেবলমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাইবার কারণে নয়। এই কারণেই তিনি রাসূলে করীম (স)-এর উপরিউক্ত বাণীকে দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক উহার জওয়াব দিলেন এই বলিয়া যে, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করিয়াছি। তাহাদিগকে কাফির মনে করিয়া নয়, তাহারা যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছে, কেবলমাত্র এই কারণেই। আর ইহাই ইসলামের নীতি। সম্ভবত হযরত আবূ বকর (রা) পূর্বোদ্দৃত আয়াতের আলোকেই এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন।

বস্তুত যাকাত দেওয়া যে কত বড় ফরয এবং তাহা না দিলে বা দিতে অস্বীকার করা হইল ইসলামী রাষ্ট্রকে যে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয়, এই হাদীস হইতে তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

মূল হাদীসে হযরত উমরের বর্ণিত হাদীসের শেষ শব্দ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ -এর অর্থ হইল তাহারা কুফর ও গুনাহ নাফরমানী যাহা গোপন করিতেছে; তাহা আল্লাহ্ই জানেন। আমরা তো মানুষের ঈমানের দৃষ্টিতে ফয়সালা করি এবং তাহাদের বাহ্যিক অবস্থার দৃষ্টিতে যাহা অনিবার্য সেই অনুপাতেই আমরা ইসলামের অধিকার দিয়া থাকি ও ইসলামের অধিকার তাহাদের নিকট হইতে দাবি করি। কিন্তু কোন্ লোকটির মনের অবস্থা কিরূপ, কে নিষ্ঠাবান, আর কে মুনাফিক, তাহা জানা ও সেই অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার দানের ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই রহিয়াছে। অন্য কাহারও নাই।

বস্তুত নবোদ্ভূত পরিস্থিতিতে কুরআন ও সুন্নাতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করিয়া কর্মনীতি নির্ধারণ ইসলামী রাষ্ট্রচালকদের পক্ষে সব জায়েয তাহাই নয়, ইহা তাহাদের কর্তব্যও। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রাধিনায়ক তাহার অনুসৃত কর্মনীতির জন্য জনগণের নিকট জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য, এই কথাও এই দীর্ঘ হাদীস হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

(عمدة القارى - معالم السنن - بذل المجهود - بلوغ الامانى)

যাকাত না দেওয়ার পরিণতি

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا ـ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ ـ الاية، (بخارى، نسائى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ধন–মাল দান করিয়াছেন, সে যদি উহার যাকাত আদায় না করে, তাহা হইল কিয়ামতের দিন তাহার ধন–মাল তাহার জন্য অধিক বিষধর সর্পের আকার ও রূপ ধারণ করিবে। উহার কপালের উপর দুইটি কালো চিহ্ন কিংবা দুইটি দাঁত বা দুইটি শৃঙ্গ থাকিবে। কিয়ামতের দিন উহা তাহার গলায় পেচাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর উহা তাহার মুখের দুই গাল কিংবা দুই কর্ণলগ্ন মাংসপিণ্ডের গোশত খাইবে ও বলিতে থাকিবেঃ আমিই তোমার মাল–সম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চিত বিত্ত–সম্পত্তি। অতঃপর নবী করীম (স) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেনঃ (উহার অর্থ) যাহারা কার্পণ্য করে তাহাদের সম্পর্কে ধারণা করিও না। —বুখারী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা হাদীসটির সর্বপ্রথম প্রতিপাদ্য হইল, দুনিয়ায় যাহার নিকট যতটুকু কম বা বেশী ধন–সম্পদ রহিয়াছে তাহা সবই আল্লাহ্র দান। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহা দিয়াছেন বলিয়াই সে তাহা পাইতে পারিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা না দিলে কাহারও পক্ষে কিছু পাওয়া সম্ভবপর হইত না। অতএব ধন–সম্পত্তির যে–কেহ মালিক হইবে তাহারই প্রথম কর্তব্য হইল উহাকে আল্লাহ্র দান মনে করা।

দ্বিতীয়ত যে আল্লাহ্ উহা দিয়াছেন, তিনিই উহার প্রকৃত মালিক। যাহার নিকট উহা এখন আছে সে উহার প্রকৃত মালিক নয়। কেননা সে উহা সৃষ্টি করে নাই। আর যে যাহা সৃষ্টি করে নাই, সে তাহার প্রকৃত মালিক হইতে পারে না। অতএব আল্লাহ্র এই মালিকানায় আল্লাহ্রই মর্যী চলিবে। আল্লাহ্র আইন–বিধান অনুযায়ীই উহার বন্টন ও ব্যয় নিয়োগ হইতে হইবে। উহার উপর অন্য কাহারও নিরংকুশ কর্তৃত্ব চলিতে পারে না।

আল্লাহ্ মানুষকে ধন–সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তিনি উহার উপর সর্বপ্রথম যাকাত ধার্য করিয়াছেন। زَكٰوة শব্দটির অভিধানিক অর্থ اَلنَّمَاءُ শ্রী–বৃদ্ধি। ক্ষেতের ফসল যখন সবুজ শ্যামল সতেজ হইয়া উঠে, তখন আরবী ভাষায় বলা হয়ঃ زَكَا الزَّرْعُ 'কৃষি ফসল শ্রী–বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার আর একটি অর্থঃ اَلطَّهَارَةُ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ـ (الاعلى:١٤)

যে লোক পবিত্রতা–পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, সে–ই সম্পূর্ণ কল্যাণ লাভ করিতে পারিয়াছে।

এই পবিত্রতা অর্জনকেই যাকাত বলা হয়। ইহার নাম 'যাকাত' রাখা হইয়াছে এইজন্যঃ

لِاَنَّ مُؤَدِّيْهَا يَتَزَكّٰى اِلَى اللّٰهِ اَىْ يَتَقَرَّبُ اِلَيْهِ بِصَالِحِ الْعَمَلِ ـ

কেননা যাকাত আদায়কারী আল্লাহ্র দিকে পরিশুদ্ধতা লাভ করে অর্থাৎ নেক ও কল্যাণকর কাজের সাহায্যে সে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করে।

আর যে লোক কল্যাণকর কাজের সাহায্যে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে, সে আসলে আল্লাহ্র দিকেই পরিশুদ্ধতা পায়। ধন-মালের যাকাত দেওয়ার ফলে উহাতে যে শ্রী-বৃদ্ধি ঘটে, যে বরকত পরিদৃষ্ট হয়, সেই দৃষ্টিতেই এই নামকরণ করা হইয়াছে।

শরীয়াতের পরিভাষায় 'যাকাত' বলিতে বুঝায়ঃ

إِيْتَاءُ جُزْءٍ مِّنَ النِّصَابِ الْحَوْلِىْ إِلَى فَقِيْرٍ -

বাৎসরিক যাকাত পরিমাণের একটা অংশ যাকাত গ্রহণ করিতে পারে এমন ব্যক্তিকে আদায় করিয়া দেওয়া।

এই দেওয়ার মূল কথা হইল ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য —আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে—আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দেওয়া।

যাকাত ফরয হয় এমন পরিমাণ ধন-মাল নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি বৎসরকাল যাহার মালিকানাধীন থাকিবে, তাহাকেই যাকাত আদায় করিতে হইবে।

যাকাত দানের চরম লক্ষ্য হইলঃ

سُقُوْطُ الْوَاجِبِ فِى الدُّنْيَا وَحُصُوْلُ الثَّوَابِ فِى الْاٰخِرَةِ -

দুনিয়ার বুকে অবশ্য কর্তব্য পালন এবং পরকালে প্রতিফল লাভ।

এই যাকাত নিয়মিত আদায় করা আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া ফরয—অবশ্য করণীয় কর্তব্য। কুরআন মজীদে বহুবার وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ 'যাকাত দাও' বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) যাকাত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ও অপরিহার্য কর্তব্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নানাভাবে, বহুবিধ ভাষায় করিয়াছেন।

উপরোদ্ধৃত হাদীসটিতে যাকাত না দেওয়ার পরকালীন কঠিন পরিণতির কথা বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ কিয়ামতের দিন তাহার ধন-মালকে একটি বিষধর সর্পের রূপ ও আকার-আকৃতি দিয়া তাহার গলায় পেচাইয়া দেওয়া হইবে। কথার ভঙ্গী হইতে স্পষ্ট মনে হয়, ইহা নিছক রূপক কথা নয়। প্রকৃতই এবং বাস্তবিক পক্ষেই যাকাত না দেওয়া ধন-মাল একটি বিষধর সর্পের রূপ ও আকৃতি লাভ করিবে ও গলায় পেচাইয়া মুখটা লোকটির মুখামুখি হইয়া থাকিবে। এই সাপের আকৃতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে لَهٗ زَبِيْبَتَانِ উহার দুইটি চোখের উপর দুইটি কালো চিহ্ন কিংবা মুখের ভিতর হইতে বাহির হওয়া দুইটি দাঁত অথবা উহার মস্তকের উপর শৃঙ্গের ন্যায় দুইটি ফনা থাকিবে। (ব্যবহৃত শব্দটির এই কয়টি অর্থই হইতে পারে।) ইহা অত্যন্ত মারাত্মক পুরুষ সর্পের লক্ষণ। এই সাপটি লোকটির গলায় পেচাইয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহ্ তা'আলাই পেচাইয়া দিবেন। তখন সাপটি লোকটির দুই গাল কিংবা দুই কর্ণসংলগ্ন মাংসপিণ্ড ঠুকরাইয়া খাইতে থাকিবে এবং লোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকিবেঃ 'আমি বাহ্য দৃষ্টিতে একটা সাধারণ সাপ হইলেও আসলে আমি তোমারই ধন-মাল। সেই ধন-মাল, যাহা তুমি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে অথচ উহার যাকাত আদায় কর নাই। এইরূপ বলিবার ফলে লোকটির মনে দুঃখ হতাশা এবং আযাবের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ তুমি এখন হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছ। এখন অনুতাপ করিলে কোন ফল হইবে না।

এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) যে আয়াতটি পাঠ করিয়াছেন তাহা হইলঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ (ال عمران، ١٨٠)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার অনুগ্রহের দান হিসাবে যাহা কিছু দেন, তাহা লইয়া যাহারা কার্পণ্য করে, তাহারা যেন ধারণা করে যে, উহা তাহাদের জন্য কল্যাণময়। বরং উহা তাহাদের জন্য অকল্যাণের কারণ। কিয়ামতের দিন তাহাদের এই কার্পণ্য সঞ্চিত ধন-মাল অবশ্যই তাহাদের গালর বেড়ি বানাইয়া দেওয়া হইবে।

এই আয়াতটি এবং আলোচ্য হাদীসটির মর্মার্থ প্রায় এক। আয়াতটি স্বয়ং আল্লাহ্র কালাম। আর হাদীসটি রাসূলে করীম (স)-এর নিজ ভাষায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা। কেননা আয়াতটিতে যে কার্পণ্যের পরিণতির কথা বলা হইয়াছে, উহার অর্থঃ

اَنْ يَّمْنَعَ الْاِنْسَانُ الْحَقَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ـ

ধন-মালের উপর যে হক ধার্য হয় তাহা না দেওয়া—দিতে অস্বীকার করাই কার্পণ্য।

এই দৃষ্টিতে যাকাত না দেওয়া বা দিতে অস্বীকার করা এমন অপরাধ, যাহার অনিবার্য পরিণতি তাহাই যাহা এই হাদীসটিতে ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে। এখানে স্বয়ং রাসূলের এই আয়াতটি পাঠ করায় এই কথা স্পষ্ট হয় যে, যাহারা যাকাত দেয় না, আয়াতটি তাহাদের সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছিল। এই মত অধিকাংশ তাফসীরকারের।

হযরত জাবির-ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত হাদীসে উপরিউক্ত কথাটি বলা হইয়াছে এই ভাষায়ঃ

وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيْهِ حَقَّهُ اِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ فَاِذَا اَتَاهُ فَرَّمِنْهُ فَيُنَادِيْهِ رَبُّهُ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِىْ خَبَاْتَهُ فَاَنَا عَنْهُ اَغْنٰى مِنْكَ فَاِذَا رَاٰى اَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِىْ فِيْهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ ـ (مسند احمد)

এবং কোন পূঁজি মালিক যদি উহার উপর ধার্য হক আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন তাহার এই পূঁজি এক শক্তিশালী বিষধর সাপের রূপ ধারণ করিয়া আসিবে ও গ্রাস ব্যাদান করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে। সে যখন সেইটি দেখিতে পাইবে, তখন সে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিবে। এই সময় তাহার আল্লাহ্ তাহাকে ডাকিয়া বলিবেনঃ দুনিয়ায় তুমি যে ধন-সম্পদ পূঁজিভূত করিয়া রাখিয়াছিলে তাহা আজ গ্রহণ কর। আমি আজ উহার কারণে তোমার ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত। শেষ পর্যন্ত সে যখন দেখিবে যে, উহা হইতে নিষ্কৃতি নাই, তখন সে তাহার হাত উহার মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবে। সাপটি সে হাত খানা খাইয়া ফেলিবে—বলদ যেমন ঘাস চর্বন করিয়া খাইয়া ফেলে। —মুসনাদে আহমদ

এই হাদীসে كَنْزٌ বা 'পূঞ্জিকৃত ধন-সম্পদ' বলিয়া সেই ধন-সম্পদের পরিণতিই দেখানো হইয়াছে, যাহার যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা হয় নাই। কেননা যে ধন-মালের যাকাত আদায় করা হইয়াছে, হাদীসের পরিভাষায় তাহা كَنْزٌ নয়। উহাকে পূঞ্জীকৃত বলা যাইবে না।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ لَا يُؤَدِّىْ زَكٰوةَ مَالِهٖ اِلَّا مُثِّلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ حَتّٰى يُطَوَّقَ بِهٖ فِىْ عُنُقِهٖ - (ابن ماجه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে, তিনি রাসূলে করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোকই তাহার ধন-মালের যাকাত আদায় করিবে না, তাহারই মাল-সম্পদ কিয়ামতের দিন বিষধর সর্পের রূপ পরিগ্রহ করিবে। শেষ পর্যন্ত সেই সর্পটি তাহার গলায় পেচাইয়া দেওয়া হইবে। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা উপরোদ্ধৃত কয়টি হাদীস হইতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত ফরয। উহা যথাযথভাবে আদায় না করার পরিণাম নামায আদায় না করার পরিণতি হইতেও অধিক ভয়াবহ ও সাংঘাতিক। কেননা যাকাত আদায় না করার যে কঠিন, কঠোর ও নির্মম পরিণতির কথা কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে, তাহা নামায আদায় না করা পর্যায়ে ঘোষিত হয় নাই। এই পর্যায়ে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি স্মরণীয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ، يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ - (التوبة: ٣٥)

যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য (ধন-মাল) সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না (যাকাত দেয় না) তাহাদিগকে এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যে দিন জাহান্নামের আগুনে উহা উত্তপ্ত করা হইবে, অতঃপর উহা দ্বারা তাহাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দিয়া দেওয়া হইবে। (তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে)ঃ ইহা তাহাই যাহা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে। অতএব তোমাদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।

যাকাত সম্পদ পবিত্রকরণের মাধ্যম

عَنْ خَالِدِ بْنِ اَسْلَمَ رض قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ اَخْبِرْنِىْ قَوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رض مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهَا فَوَيْلٌ لَّهٗ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكٰوةَ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِّلْاَمْوَالِ - (بخارى، نسائى)

খালিদ ইবনে আসলাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমরা একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর সঙ্গে বাহির হইলাম। তখন এক আরব বেদুঈন বলিলঃ আল্লাহ্র বাণী 'যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আল্লাহ্র পথে খরচ করে না' ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা আমাকে বলুন। তখন ইবনে উমর বলিলেনঃ যে লোক উহা সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং উহার যাকাত আদায় করে না, তাহার জন্য বড়ই দুঃখ। আসলে এই কথা প্রযোজ্য ছিল যাকাতের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে। পরে যখন যাকাত সম্পর্কিত বিধান নাযিল হইল, আল্লাহ্ তা'আলা উহা ধন-সম্পদকে পবিত্রকরণের মাধ্যম বানাইয়া দিলেন। —বুখারী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর নিকট জনৈক বেদুঈন মুসলমান কুরআনের উল্লেখিত আয়াতটির তাৎপর্য বুঝিতে চাহিয়াছেন। ইহার জওয়াবে তিনি তিনটি কথা বলিয়াছেন। একটি হইল, কুরআনের ব্যবহৃত كَنْز শব্দটির প্রয়োগ ও ব্যবহারিক অর্থ। দ্বিতীয়টি হইল, এই আয়াতটির প্রয়োগক্ষেত্র বা সময়সীমা এবং তৃতীয় হইল,যাকাতের ব্যবহারিক মূল্য। হযরত ইবনে উমর প্রথম যাকাত না-দেওয়া লোকদের জন্য وَيْلٌ 'অয়লুন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার অর্থঃ দুঃখ, ধ্বংস, আযাবের জ্বালা-যন্ত্রণা-কষ্ট। আর তাঁহার কথা অনুযায়ী আয়াতটির অর্থ হইলঃ 'যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাহাদের জন্য দুঃখ-ধ্বংস, আযাবের জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট রহিয়াছে অর্থাৎ যাকাত না-দেওয়া সঞ্চিত সম্পদকে পরিভাষায় كَنْز বলা হয়।

এই পর্যায়ে হযরত ইবনে উমরের স্পষ্ট উক্তি হইলঃ

كُلُّ مَا أُدِّيَتْ زَكٰوتُهٗ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ - (بيهقى)

যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তাহা সাত তবক জমির নীচে থাকিলেও তাহা كَنْز হইবে না। (যে كَنْز এর কথা কুরআনের আয়াতে বলা হইয়াছে।) —বায়হাকী

দ্বিতীয় বলিয়াছেনঃ এই আয়াতটির প্রয়োগকাল যাকাত সম্পর্কিত আয়াত ও বিধান নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়ে—যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে ধন-সম্পদ বা স্বর্ণ-রৌপ্যের যে কোন সঞ্চয় সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াতটিতে কঠিন আযাব নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু যখন যাকাতের বিধান নাযিল হইল, স্বর্ণ-রৌপ্য বা ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা শুরু হইল, সে ক্ষেত্রে এই আযাবের ভীতি কার্যকর নয়। যাকাত রীতিমত আদায় করা হইলে অতঃপর যে সঞ্চয় হইবে তাহাতে শরীয়াতের কোন আপত্তি নাই এবং সেইজন্য কোন আযাব হইবে না। বায়হাকী শরীফে এই বর্ণনার যে অতিরিক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় এই কথা বলা হইয়াছে। সেই অতিরিক্ত অংশটুকু এইঃ

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ مَا أُبَالِيْ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهٗ وَأُزَكِّيْهِ وَأَعْمَلُ فِيْهِ بِطَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

অতঃপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেনঃ ওহোদ পর্বত সমান স্বর্ণস্তূপও যদি আমার থাকে আর উহার পরিমাণ ও সংখ্যা যদি আমার জানা থাকে, এবং আমি যদি উহার যাকাত আদায় করি ও উহার দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কাজ করি তাহা হইলে (এই আয়াত সত্ত্বেও) আমি কোনই ভয় করি না।

আর তৃতীয় কথাটি হইলঃ যাকাত আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করিয়াছেন ধন-সম্পদ পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে। বস্তুত যাকাত যুগপতভাবে দাতা ও সম্পদ উভয়ের জন্যই পবিত্রকারী। সঞ্চিত ধন-সম্পদ মূলত অপবিত্র। কেননা উহাতে আল্লাহ্‌র 'হক' রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র এই 'হক' যথাযথভাবে আদায় না করা পর্যন্ত উহা মালিকের জন্য পবিত্র বা হালাল নয়। উহার সঠিক হিসাব করিয়া যখন রীতিমত যাকাত আদায় করিয়া দেওয়া হয়, ঠিক তখনই তাহা পবিত্র হয় এবং উহার মালিকের জন্যও তাহা হালাল হয়। যাকাত দিলে যাকাতদাতা বা ধন-সম্পদ মালিকের হৃদয় মন পবিত্র হইয়া যায়। পবিত্র হয় যাকাতদাতার চরিত্র। চূর্ণ হইয়া যায় তাহার কার্পণ্যের দূর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকার।

বস্তুত যাকাতের কল্যাণ ও উপকারিতার তিনটি দিক স্পষ্ট ও জাজ্জ্বল্যমান। একটি এই যে, মুমিন বান্দা নামাযে দাঁড়াইয়া ও রুকু সিজদা করিয়া আল্লাহ্‌র সম্পর্কে নিজের দাসত্ব বন্দেগী ও বিনয় অবনত ভাবের বাস্তব প্রকাশ ঘটায়, আল্লাহ্‌র সন্তোষ, রহমত ও নৈকট্য লাভের জন্য মন-মানসিকতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আকুল আকুতি জানায়, যাকাত আদায় করিয়া বান্দা ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে নিজের ধন-সম্পদের অর্ঘ্য পেশ করে। সেই সঙ্গে এই কথারও বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপিত করে যে, যেসব ধন-সম্পদ তাহার করায়ত্ত তাহার প্রকৃত মালিক সে নিজে নয়, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। যাকাত এই হিসাবেই ইসলামের মৌল ইবাদতের মধ্যে গণ্য।

যাকাতের দ্বিতীয় দিক হইল, ইহার সাহায্যে আল্লাহ্‌র অভাবগ্রস্ত দরিদ্র বান্দাদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা হয়। বস্তুত যাকাত একটা নিছক দান—অতএব ঘৃণ্য—মনে করা তত্ত্ব ও মন-মানসিকতার দিক দিয়া একটা মৌলিক ভুল। কেননা আসলে ইহা ধনীর ইচ্ছা বা মর্যীর উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তিগত দান-খয়রাতের ব্যাপার নয়। ধন-সম্পদ সঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে আল্লাহ্‌র হকও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। সম্পদের এই অংশ ধনীর হাতে থাকিলেও আসলে সে ইহার মালিক বা অধিকারী নয়। সে যখন এই অংশ মূল সম্পদ হইতে আলাদা করিয়া নির্দিষ্ট উপায়ে আদায় করিয়া দিবে তখনই সে সেই মূল সম্পদ হালালভাবে ব্যয়-ব্যবহার করার অধিকারী হইবে, তাহার পূর্বে নয়। এই দিক দিয়া যাকাত মানুষের নৈতিকতার একটা বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

তৃতীয় দিক হইল, যাকাতদাতার মন-মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তন ও সংশোধন। ধন-সম্পদের প্রেম একদিকে সম্পদ পূজার মানসিকতা সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তি ধন-সম্পদকেই উপাস্যের উচ্চ মর্যাদায় সংস্থাপন করে। অপরদিকে উহা মানুষকে বানায় হাড়-কৃপণ। আর এই দুইটি ব্যক্তির ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী—ঈমানের পবিত্র ভাবধারার পক্ষে ইহা অত্যন্ত মারাত্মক। ইহা ব্যক্তির মন-মানসিকতা ও চরিত্রকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করে। মানুষকে যেমন বানায় অর্থগৃধ্নু, তেমনি দয়া-মায়াহীন কৃপণ। তাহার চরিত্রকে চরমভাবে পংকিল ও কলুষিত করিয়া দেয়। নিয়মিত যাকাত আদায় একদিকে তাহার মনের এবম্বিধ যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করে। অপর দিকে উহার প্রুতি-গন্ধময় বিষাক্ত প্রভাব হইতে ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও মানসিকতাকে পরিচ্ছন্ন পবিত্র ও মহান করিয়া তোলে। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে সেই কথাই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ - (التوبة، ١٠٣)

তাহাদের নিকট হইতে তুমি যাকাত গ্রহণ কর। ইহার ফলে তাহাদের প্রবৃত্তি ও মন-মানসিকতার পবিত্র ও বিশুদ্ধিকরণ হইবে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى - (الليل)

আর সেই মুত্তাকী বান্দারা জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা পাইয়া যাইবে, যাহারা নিজেদের ধন-মাল আল্লাহ্‌র জন্য দিবে এই উদ্দেশ্যে যে, উহার দরুন তাহাদের আত্মাও পরিশুদ্ধি লাভ করিবে।

নবী করীম (স) নিজেই বলিয়াছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَمْوَالِ۔ (ابو داؤد)

আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকাত ফরয করিয়াছেন কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে,যাকাত দেওয়ার পর অবশিষ্ট ধন-মাল উহার মালিকের জন্য পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিয়া দিবেন।

হযরত ইবনে উমরের বক্তব্যে যাকাত ফরয হওয়ার সময়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু ঠিক কোন সময় ইহা ফরয হইয়াছে, উহাতে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ বা সময় নির্দেশ করা হয় নাই। যাকাত যে ঠিক কখন প্রথম ফরয হইয়াছে, সেই বিষয়ে বিশেষ মতবিরোধ দেখা যায়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে হিজরতের পর পরেই যাকাত ফরয হইয়াছে। কাহারও মতে ইহা হিজরী দ্বিতীয় সনের ঘটনা—রোযা ফরয হওয়ার পূর্বের। ঐতিহাসিক ইবনুল আসীর বলিয়াছেন, হিজরীর নবম বৎসরে। কিন্তু বহু সংখ্যক হাদীসের উল্লেখ মতে যাকাত নবম হিজরী সনের অনেক পূর্বেই ফরয হইয়াছে। কুরায়শ সরদার আবূ সুফিয়ান হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে কথোপকথন ব্যাপদেশে যাকাতের উল্লেখ করিয়াছিল এই ভাষায়ঃ

وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ۔

এবং তিনি [হযরত মুহাম্মাদ (স)] আমাদিগকে নামায ও যাকাত দেওয়ার আদেশ দিতেন।

আর এই কথোপকথন যে সপ্তম হিজরীর শুরুতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অকাট্য। কিন্তু মুহাদ্দিস ইবেন খুযায়মা দাবি করিয়া বলিয়াছেনঃ

إِنَّ فَرْضَ الزَّكٰوةِ كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ۔

হিজরতের পূর্বেই যাকাত ফরয হইয়াছিল।

তিনি দলীল হিসাবে হযরত উম্মে সালমা বর্ণিত সাহাবিদের আবিসিনীয়া হিজরতের কাহিনী' উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা) কর্তৃক নাজাশীর রাজদরবারে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলিয়াছেনঃ

وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ۔

রাসূলে করীম (স) আমাদিগকে নামায ও যাকাতের আদেশ করেন।

কিন্তু এই কথাও আপত্তির উর্ধ্বে নয়। (عمدة القارى - فتح البارى - معارف الحديث)

তবে ইহার সমন্বিত ব্যাখ্যা এই দেওয়া যাইতে পারে যে, যাকাত মূলত ইসলামের অন্যতম রুকন হিসাবে শামিল ছিল সেই মূল দাওয়াতের সঙ্গে, যাহা নবী করীম (স) প্রথম দিন হইতেই দিয়াছেন। কিন্তু ইহার বাস্তব কার্যকরতার জন্য নবী করীম (স)-কে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

কেননা ব্যক্তির মন-মানসিকতা ও তাহাদের সমন্বয়ে সমাজপরিবেশ গঠিত না হইলে কোন বিধানের কথা বলিয়া কোন লাভ পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, ইসলামী জনতা ও সমাজ যাকাতের বিধান পালনের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, ঠিক তখনই ইহার কার্যকরতা (Practical implementation) আমলে আনিলেন। আর ইহা নবী করীম (স)-এর পক্ষে অননুমিত ছিল না। এই ব্যাখ্যায় যাকাত ফরয হওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় মতবিরোধের স্থায়ী মীমাংসা হইয়া যায় (গ্রন্থকার)।[১]

যাকাত ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ رض اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّهُ كَبُرَ عَلٰى اَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَكَبَّرَ عُمَرُ رض ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ

---

১. এই কথাটি গ্রন্থকার নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির ফলশ্রুতি হিসাবেই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু মূলত ইহা গ্রন্থকারের স্বকল্পিত নয়। বরঞ্চ এই কথাটিই আল্লামা ইবনুল আরাবী এই আয়াতের ভিত্তিতে যাকাত ফরয হওয়ার সময় সংক্রান্ত মতবিরোধ মীমাংসার্থে লিখিয়াছেন। তাঁহার কথা এইঃ

اِنَّ اللّٰهَ اَوْجَبَ الزَّكٰوةَ بِهَا اِيْجَابًا مُجْمَلًا فَتَعَيَّنَ فَرْضُ اعْتِقَادِهَا وَوَقَفَ الْعَمَلُ عَلٰى بَيَانِ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالْوَقْتِ فَلَمْ تَكُنْ بِمَكَّةَ حَتّٰى تَمَهَّدَ الْاِسْلَامُ بِالْمَدِيْنَةِ فَوَقَعَ الْبَيَانُ فَتَعَيَّنَ الْاِمْتِثَالُ وَهٰذَا لَا يَفْقَهُهُ اِلَّا الْعُلَمَاءُ بِالْاُصُوْلِ ـ

(احكام القران القسم الثانى: ص ۸۵۲)

আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত ফরয করিয়াছেন মূলত মক্কা শরীফেই। কিন্তু তাহা ছিল মোটামুটিভাবে ফরয করার কাজ। ইহাতে যাকাত যে ফরয এই বিশ্বাসটা দৃঢ় সংস্থাপিত হইল। কিন্তু উহার কার্যকরতা স্থগিত থাকিল। উহার ধরণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে তখন মক্কী জীবনে কিছুই বলা হইল না। পরে মদীনায় ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং এখানেই যাকাত সংক্রান্ত যাবতীয় কথা প্রকাশ করিয়া বলা হইল তদানুযায়ী আমলও হইল। ইহা এমন একটা মীমাংসার কথা, যাহা কুরআনী বিধানের মূলনীতি জানা লোকেরা ছাড়া অন্যরা বুঝিতে পারে না।

আল্লামা ইবনে আসীরও তাঁহার তাফসীরে লিখিয়াছেনঃ

ان الزكوة نزل بمكة مقادير النصب والمخرج لم تبين الا بالمدينة ـ

যাকাত ফরয হওয়ার হুকুম মক্কা শরীফে নাযিল হইয়াছে। তবে নিয়ম ও বিধি— কোন্ জিনিসে যাকাত দিতে হইবে তাহার বিস্তারিত বিধান মদীনায় নাযিল হইয়াছে।

الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ -
(ابو داؤد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ কুরআনের আয়াতেঃ যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে ও উহা আল্লাহ্র পথে খরচ কর না—যখন নাযিল হইল, (—ইহাতে ধন-সম্পদ সঞ্চয়কারীদের পরকালে কঠিন শাস্তি হওয়ার কথা বলা হইয়াছে,) এই কারণে সাহাবায়ে কিরামের মনের উপর ভীষণ চাপ পড়িল এবং তাঁহারা চিন্তা-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। হযরত উমর (রা) তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেনঃ আমি তোমাদের এই চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করিতে চেষ্টা করিব। অতঃপর তিনি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ ইয়া রাসূল। এই আয়াতটির কারণে আপনার সাহাবিগণ বিশেষ চিন্তা-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত এই উদ্দেশ্যে ফরয করিয়াছেন যে, ইহা আদায় করার পর অবিশিষ্ট ধন-মাল যেন পবিত্র হইয়া যায়—অনুরূপভাবে উত্তরাধিকার আইন জারী করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে, উহার দরুন তোমাদের পরবর্তী লোকদের জন্য নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হইবে। হযরত উমর (রা) রাসূলে করীম (স)-এর এই ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দে 'আল্লাহ আকবার' বলিয়া উঠিলেন। ইহার পর রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ আমি কি তোমাদিগকে ইহাপেক্ষাও উত্তম সঞ্চয়ের কথা বলিব?—তাহা হইল পবিত্র স্বভাব-চরিত্রের স্ত্রী, যাহার দিকে সে যখন তাকাইবে, সে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিবে, যখন তাহাকে কোন কাজের আদেশ করিবে, যে তাহা পালন করিবে। আর যখন সে তাহার নিকট হইতে অনুপস্থিত থাকিবে তখন সে তাহার সংরক্ষণ করিবে।

ব্যাখ্যা মানুষ স্বভাবতই সঞ্চয়শীল। উপার্জন করিয়া তাহা সবই সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় না করিয়া নিজের ভবিষ্যতের জন্য এবং নীজ বংশধরদের জন্য বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। এই প্রবণতাও আল্লাহ্রই সৃষ্টি। মানুষের ইতিহাসে কোন কালের কোন দেশের বা কোন জাতীর মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। নবী করীম (স) যে আদর্শ সমাজ গঠন করিয়াছিলেন, সেই সমাজের লোকেরা পরার্থপরতা ও দানশীলতার দিক দিয়া বিশ্বমানবের পটভূমিতেও অতুলনীয়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন বহু লোক ছিলেন, যাঁহারা নিজেদের সকল প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন পূরণ ও সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালনের পরও কিছু কিছু না সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। কিন্তু এই সমাজের সম্মুখে কুরআন মজীদের উদ্ধৃত আয়াতটি যখন নাযিল হইল, তখন সমাজের বিশেষ করিয়া সঞ্চয়শীল লোকেরা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কেননা এই আয়াতের ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখাকে একটা ভয়ানক পরিণতির ভীষণ অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং পরকালে তাহার দরুন কঠিনতম শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ তাঁহারা ধন-সম্পদের কিছু না কিছু পরিমাণ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। আর ইহা প্রত্যেক মানুষের জন্যই অপরিহার্য ও স্বাভাবিক। তাঁহাদের এই মানসিক উদ্বেগ ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া হযরত উমর ফারূক (রা) উদ্যোগী হইয়া আসিলেন। তিনি স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর নিকট হইতে বিষয়টির বিশ্লেষণ চাহিলেন। তাঁহাকে সাহাবীদের চিন্তা ও ভয়-ভীতির কঠিন উদ্বেগের কথা বিস্তারিত জানাইলেন এই আয়াতের কারণে তাঁহারা কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিবেন না—না নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য, না ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারিবেন, তাঁহাদের এই আশংকার কথাও জানাইলেন। তখন নবী করীম (স) যাহা কিছু বলিয়াছেন, পরিপ্রেক্ষিতের দৃষ্টিতে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, 'এই আয়াতের কারণে লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে হতাশ হওয়ার কোনই কারণ নাই। কেননা এই আয়াতটি নাযিল

হইয়াছে সেই সব পূঁজি সঞ্চয়কারীদের সম্পর্কে, যাহারা উহা হইতে রীতিমত যাকাত আদায় করে না। যাহারা সঞ্চিত ধন-সম্পদ হইতে রীতিমত যাকাত দেয়, তাহাদের সঞ্চয় কাজে কোন বাধা নাই। আয়াতের ভীতিপ্রদ পরিণতির কথাও তাহাদের জন্য নয়।

বস্তুত পূর্ণ আয়াতটি বিবেচনা করিলে সেই আয়াতেই এই জওয়াব নিহিত পাওয়া যায়। কেননা আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য-ধন-সম্পদ পূঁজি ও সঞ্চয় করে এবং তাহাতে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না-।

আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করিয়া যাহারা ধন-সম্পদ বা স্বর্ণ-রৌপ্য পূঁজি করে, তাহাদের কথাই আয়াতটিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা সঞ্চয় করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র পথে ব্যয়ও করে তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াত প্রযোজ্য নয়। আর 'আল্লাহ্র পথে ব্যয়' করার অর্থ হইল প্রধানত যাকাত দেওয়া। সমস্ত ধন-সম্পদ বা স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করিয়া দেওয়া এই আয়াতের লক্ষ্য নয় কখনো।

এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) যাকাত ফরয করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ যাকাত আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করিয়াছেন কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেঃ

لِيُطَهِّرَ مَا بَقِىَ بَعْدَ اَدَاءِ الزَّكٰوةِ مِنْ اَمْوَالِهِمْ - (بذل المجهود)

যাকাত আদায়ের পর তোমাদের যে ধন-সম্পদ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা যেন পবিত্র ও হালাল হইয়া যায়।

ইহাতে জনগণের মনে সঞ্চারিত আশংকার একটি দিকের জওয়াব পাওয়া গেল। সে দিকটি হইল বর্তমানের আশংকা। আশংকার দ্বিতীয় দিকটি সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম হইলঃ তোমরা সঞ্চয় করিয়া তোমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারিবে না—এই আশংকাও অমূলক। কেননা যাকাত আদায় করিতে থাকিলে সঞ্চয়ও করিতে পারিবে, আর সঞ্চয় করিতে পারিলে তাহা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখিয়াও যাইতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যেই তো আল্লাহ্ তা'আলা মীরাসী বিধান কার্যকর করিয়া দিয়াছেন।

وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ مِنْ اَمْوَالٍ تَبْقِىْ بَعْدَكُمْ -

তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ-সম্পত্তির উপরই তো এই মীরাসী আইন কার্যকর হইবে।

বস্তুত যাকাত দেওয়ার পর সম্পদ-সম্পত্তি সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ হইলে মীরাসী আইনের কোন কার্যকরতা থাকিতে পারে না। কেননা সম্পদ ও সম্পত্তি একজনের হাতে সঞ্চিত হইলেই তো তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার প্রশ্ন উঠিতে পারে। আর একজনের ধন-সম্পত্তি তাহার বংশধরদের জন্য হালাল হইতে পারে যদি রীতিমত যাকাত আদায় করার পরই উহা সঞ্চয় করা হইয়া থাকে।। মোটকথা সঞ্চয় করিয়া রাখার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইলে আল্লাহ্ তা'আলা কখনো যাকাত ফরয করিতেন না এবং মীরাসী বিধান জারী করিতেন না।

হযরত উমর ফারূক (রা) রাসূলে করমি (স)–এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শুনিয়া এবং সমস্যার এমন প্রাঞ্জল সমাধান জানিতে পারিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ও আনন্দের আতিশয্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া উঠিলেন।

প্রসঙ্গকথা এইখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে। হযরত উমরের মিশন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু নবী করীম (স) জনগণের মনস্তাত্ত্বিক সংশোধনের এই সুযোগকে হাতছাড়া করিতে প্রস্তুত হইলেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উত্থাপন করিলেন।

মূল প্রশ্ন জাগিয়াছিল সঞ্চয় লইয়া। নবী করীম (স) বলিলেন, কেবলমাত্র ধন–সম্পদ সংগ্রহ ও করায়ত্ত করাই প্রকৃত সঞ্চয় নয়। মানুষ নিজের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য যাহা কিছু সঞ্চয় করে, তন্মধ্যে উত্তম স্থায়ী ও অধিক কল্যাণকর সঞ্চয় হইল এমন একজন স্ত্রী, যে দৈহিক ও আন্তরিক উভয় দিক দিয়াই সৌন্দর্যের অধিকারিণী ও মহত্তম গুণাবলীতে ভূষিতা হইবে। এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) স্ত্রীর তিনটি বড় ও মৌলিক গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) স্বামী যখন তাহার দিকে তাকাইবে, সে তাহাকে মুগ্ধ, বিমোহিত ও আনন্দিত করিয়া দিবে। (২) সে যখন তাহাকে কোন কিছু করিতে বলিবে সে তাহা যথাযথভাবে পালন করিবে। (৩) এবং সে যখন স্ত্রী ও ঘরবাড়ী হইতে দূরে চলিয়া যাইবে তখন সে স্বামীর অধিকার, ঘর–বাড়ী, ধন–মাল ও সন্তান–সন্তুতির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

সৌন্দর্যমণ্ডিত স্ত্রী সম্পর্কে রাসূলে করীমের বলা এই তিনটি মৌলিক গুণের কথা এখানে আলোচনার দিকদিয়া অপ্রাসংগিক। তাই আমরা এখানে এই কথা কয়টি ব্যাখ্যা করিব না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নবী করীম (স) এখানে বাহ্যত অপ্রাসংগিক এই কথাটি কেন বলিলেন?

আল্লামা কাযী ইয়ায ইহার জওয়াবদান প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) যখন বলিলেন যে, যাকাত আদায় করিতে থাকিলে ধন–সম্পদ সঞ্চয় ও পুঁজি করাতে কোনই দোষ নাই এবং বুঝিলেন যে, ইহাতে তাহাদের মনে সঞ্চারমান ভয় ও আশংকার মেঘপুঞ্জ দূরীভূত হইয়া গিয়াছে ও তাহারা আনন্দিত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, তখন এই সঞ্চয় অপেক্ষাও অধিক স্থায়ী সম্পদ ও সঞ্চয়ের জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই কথাটি এখানে বলিয়াছেন। কেননা স্বর্ণ ও রৌপ্য ধন–সম্পদ—যতই সঞ্চয় করা হউক, উহা হস্তান্তরিত না করা পর্যন্ত ব্যক্তির নিকট উহার ব্যবহারিক মূল্য কিছুই নাই। কিন্তু বর্ণিত গুণাবলী সম্পন্ন স্ত্রী–সঞ্চয় এমনই এক মহামূল্য সম্পদ, যাহা ব্যক্তির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যায় না, স্থায়ীভাবে তাহার সঙ্গী ও সাথী সহযাত্রী ও সহধর্মিনী হইয়া থাকে। অর্থ–সম্পদ ব্যয় করিলেই তুমি উহার কল্যাণ ও উপকারিতা পাইতে পার। কিন্তু গুণশীলা স্ত্রী প্রতিমুহূর্ত তোমার কল্যাণে নিরতা। তোমাকে আনন্দ দান করে, তোমার মনের ও দেহের প্রয়োজন পূরণ করে। তোমার সুবিধা–অসুবিধায় অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে তোমাকে শুভ পরামর্শ দেয়। তোমার গোপন কথা অন্যদের হইতে গোপন রাখে, সর্বক্ষেত্রে তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে। আর তুমি যখন তোমার বাড়ীতে অনুপস্থিত থাক, তখন একদিকে সে নিজের সংরক্ষণ করে যেন তোমার 'হক' একবিন্দুও ব্যাহত ও ক্ষুণ্ন হইতে না পারে। তোমার ঘর–বাড়ী, ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্তুতির হেফাযত করে। কার্যত সে হয় তোমার সহকারী, পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান উপদেষ্টা। তোমার জীবন ক্ষেত্রে এবং তোমার বড় প্রতিনিধি তোমার অনুপস্থিতিতে, তোমার মৃত্যুর পর।

ইহার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, নবী করীম (স) যখন বলিলেন যে, ধন সম্পদ সঞ্চয় করা যাকাত আদায় করার শর্তে সম্পূর্ণ জায়েয, তখন এই শেষের কথাটি বলিয়া লোকদের মনে এই ধারণা জন্মাইতে চাহিয়াছেন যে, সঞ্চিত ধন–সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখা নয়—উহা দ্বীন ও দুনিয়ার অধিকতর কল্যাণকর কাজে ব্যয় করাই অধিক উত্তম ও স্থায়ী ফলপ্রদ। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে ধন–সম্পদ সঞ্চয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করার চেষ্টা হইয়াছে। কেননা সেকালে সমাজে সাধারণত নারী সমাজের প্রতি বিশেষ উপেক্ষা ও অবহেলা প্রদর্শন করা হইত। স্ত্রীর কোন মর্যাদাই স্বামীর নিকট ছিল

না। তাহারা স্ত্রী-পুত্র পরিজনের প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখাইয়া কেবলমাত্র ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়ের দিকেই সমস্ত লক্ষ্য ও চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিল। নবী করীম (স) এতদসংক্রান্ত শেষ কথাটি বলিয়া লোকদের এই কঠিন মানসিক ও সামাজিক রোগের সংশোধন করিতে চাহিয়াছেন।

(بذل المجهود - المرقات معارف الحديث)

যাকাত ফরয হওয়ার ন্যূনতম পরিমাণ

عَنْ أَبِي سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذُوْدٍ مِّنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ـ (بخارى، ابوداؤد)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ পাঁচ অসক-এর কম পরিমাণ খেজুরে যাকাত নাই। পাঁচ 'আওকিয়া'র কম পরিমাণ রৌপ্যে যাকাত নাই এবং পাঁচটি উষ্ট্রের কম সংখ্যার যাকাত নাই। —বুখারী, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা নবী করীম (স)-এর সময়ে মদীনা ও আশেপাশের যে লোক সচ্ছল ও ধনশালী ছিল, তাহাদের নিকট সাধারণত তিন প্রকারের কোন এক প্রকারের সম্পদ থাকিতঃ (১) তাহাদের বাগানের খেজুর (২) রৌপ্য এবং (৩) উষ্ট্র। রাসূলে করীম (স) উপরিউক্ত হাদীসে এই তিন প্রকারের সম্পদের উপরই যাকাত ধার্য হওয়ার ন্যূনতম পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ হাদীসে প্রত্যেকটি জিনিসের যে পরিমাণ বা সংখ্যার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কাহারো নিকট থাকিলে তাহাতে যাকাত ফরয হইবে। সেই পরিমাণ বা সংখ্যার কম সম্পদ কাহারো নিকট থাকিলে তাহাতে যাকাত ফরয হইবে না।

খেজুর সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, উহার পাঁচ অসক-এর কম পরিমাণ হইলে যাকাত দিতে হইবে না। এক 'অসক' প্রায় ছয় মণ। এই হিসাবে পাঁচ 'অসক' ত্রিশ মণের কাছাকাছি। রৌপ্য সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেনঃ পাঁচ 'আওকিয়ার' কম পরিমাণে যাকাত নাই। এক 'আওকিয়া' পাঁচ 'দিরহাম' সমান। এই হিসাবে পাঁচ আওকিয়া দুইশত দিরহামের সমান। আমাদের দেশে চলতি ওজন হিসাবে ইহাতে সাড়ে বায়ান্ন (৫২ $\frac{১}{২}$) তোলা হয় অর্থাৎ কাহারো নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য থাকিলে এবং এই মালিকানায় এক বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইলে উহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত বাবদ দিতে হইবে, ইহাই ফরয।

আর উষ্ট্র সম্পর্কে নবী করীম (স) বলিয়াছেন, পাঁচটির কমে যাকাত হয় না। সেকালে ত্রিশ মণ খেজুর একটা ছোট-খাটো পরিবারের সম্বাৎসরিক খরচের জন্য যথেষ্ট হইত। অনুরূপভাবে দুইশত দিরহাম পরিমাণের নগদ অর্থে বছরের খরচ চলিয়া যাইত। এই মূল্যমানের দৃষ্টিতে পাঁচটি উষ্ট্রের মালিককেও সচ্ছল অবস্থার ও যাকাত দিতে সক্ষম ব্যক্তি মনে করা হইত।

যাকাত দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে যে লোক ৮৭.৫ গ্রাম স্বর্ণ কিংবা ৬১২.৫ গ্রাম রৌপ্যের কিংবা এই পরিমাণের মূল্য নগদ অর্থ থাকিবে, কিংবা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত পণ্য দ্রব্যের মালিক থাকিবে, তাহার উপরই যাকাত ফরয, সে নিসাব পরিমাণের মালিক। (গ্রন্থকার)

রৌপ্য ও স্বর্ণের যাকাত

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ لِيْ فِيْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ۔

(بخاری، ترمذی، مسند احمد، ابن ماجه، طبرانی، حاکم، بیهقی)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ আমি তোমাদিগকে ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত আদায় হইতে নিষ্কৃতি দিলাম; কিন্তু তোমরা রৌপ্যের যাকাত অবশ্যই আদায় করিবে। প্রত্যেক চল্লিশ 'দিরহামে' এক 'দিরহাম' যাকাত দাও। একশ নব্বই দিরহাম পর্যন্ত কোন যাকাত নাই। কিন্তু সম্পদ–পরিমাণ যখন দুইশত 'দিরহাম' পর্যন্ত পৌঁছিবে, তখন উহাতে পাঁচ 'দিরহাম' যাকাত ধার্য হইবে।

—তিরমিযী, বুখারী, মুসনাদে আহমদ, তাবারানী হাকেম, বায়হাকী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ক্রীতদাস রাসূলে করীম (স)–এর সময়ের সামাজিক অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। কিন্তু উহার উপর কোন যাকাত ধার্য হয় নাই। আর ঘোড়া সেকালে প্রধানত জিহাদের কাজে ব্যবহারের জন্য পালন ও রাখা হইত। বলিতে গেলে উহা ছিল প্রতিরক্ষা কার্যের একটা উপকরণ। এই হিসাবে উহার উপরও যাকাত ধার্য হয় নাই। তবে ব্যবসায় পণ্য হিসাবে ঘোড়া পালন করা ও রাখা হইলে উহাতে যাকাত ওয়াজিব হইবে।

নবী করীম (স)–এর ব্যবহৃত শব্দ عَفَوْتُ অর্থ 'ক্ষমা করিয়া দিলাম'—এইশব্দটির ব্যবহার হইতে বুঝা যায় ঘোড়া ও উহার যাকাত হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আর ইহা হইতে এই কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেঃ

اَلْاَصْلُ فِيْ كُلِّ مَالٍ اَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكٰوةُ۔

প্রত্যেক সম্পদ মূলতই এমন যে, উহা হইতে যাকাত আদায় করা বাঞ্ছনীয়।

(যদিও এই দুইটি মাল–সম্পদের উপর যাকাত ধার্য না করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।)

اَلرِّقَّةُ অর্থ اَلْفِضَّةُ রৌপ্য। মুল্লা আলী আল–কারীর মতে اَلرِّقَّةُ অর্থ اَلدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوْبَةُ শিলমোহর অংকিত রৌপ্যমুদ্রা।

আর ইবনে হাজার আল–আসকালানী বলিয়াছেনঃ

اَلرِّقَّةُ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْرُوْبَةً اَوْغَيْرَمَضْرُوْبَةٍ -

নিরেট রৌপ্য, উহার উপর মুদ্রা–চিহ্ন অংকিত হউক কি নাই হউক।

হাদীসটি হইতে রৌপ্যের উপর যাকাত ফরয হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। ইহা সর্বসম্মত। আর উহার হার হইল প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত। ইহার অর্থ, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এই ব্যাপারেও কোন মতভেদের কথা জানা যায় নাই। এই ব্যাপারেও ঐকমত্য রহিয়াছে যে, রৌপ্যের যাকাত নিসাব গণ্য করা হইবে। আর তাহা হইল দুইশত দিরহাম। আর একশত নব্বই দিরহাম পর্যন্ত যাকাত না হওয়ার কথা বলার কারণ, নব্বই হইল একশ'র পূর্ববর্তী দশম সংখ্যা। আর হিসাবের অংক এককের উপর গেলে দশক দ্বারাই গণনা কার্য চালানো হয়ঃ একক, দশক, শতক ইত্যাদি। একশ' নব্বই'র সংখ্যা দ্বারাই বুঝানো হইয়াছে যে, পূর্ণ দুইশ'র কমে ১৯৯ দিরহাম হইলেও— কোন যাকাত নাই। পরবর্তী কথা হইতে তাহা আরো স্পষ্ট হইয়াছে।

আল্লামা শাওকানী লিখিয়াছেন, দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রার উপর ওজন হিসাবে যাকাত ফরয হইবে, সংখ্যা হিসাবে নয়। অবশ্য ইবনে হুবাইব আল–আন্দালুসী বলিয়াছেনঃ মুদ্রামান বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন হইয়া থাকে। আর ইবনে আবদুল বার–এর মতে দিরহামের ওজনে পার্থক্য হইয়া থাকে। কোন কোন লোকের মতে যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ নিসাব সংখ্যা হিসাবে নির্দিষ্ট করিতে হইবে, ওজন হিসাবে নয়। কিন্তু এই সব কথাই ইজমা— ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।

(فتح البارى ، تحفة الاحوذى ، نيل الاوطار، المرقات)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ يَعْنِىْ فِى الذَّهَبِ حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ

(ابوداؤد)

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমার যখন দুইশত দিরহামের সম্পদ হইবে এবং উহার এই অবস্থায় একটি বৎসরকাল অতিবাহিত হইবে তখন উহার যাকাত হইবে পাঁচ দিরহাম। আর স্বর্ণের কোনই যাকাত হইবে না যতক্ষণ না উহার অর্থমূল্য বিশ দিনার হইবে। তাই তোমার সম্পদ যখন বিশ দীনার হইবে ও উহার এই অবস্থায় একটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইবে, তখন উহাতে অর্ধ দীনার (যাকাত ফরয) হইবে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা দুইশত দিরহামের মালিকানা এক বৎসর কাল পর্যন্ত থাকিলে তাহা হইতে পাঁচ দিরহাম যাকাত বাবদ দিতে হইবে। ইহা সর্ববাদীসম্মত আর অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মতে স্বর্ণের 'নিসাব'— যাকাত হওয়ার নিম্নতম পরিমাণ 'বিশ দীনার' অর্থ ২০ মিস্‌কাল। কেননা এক দীনারের স্বর্ণমুদ্রার ওজন এক মিসকাল। এই হিসাবে ২০ দীনারের ওজন বিশ মিসকাল হইবে। এক মিসকাল ৪ $\frac{১}{২}$ মাশা। আর মিসকালে ৭ $\frac{১}{২}$ তোলা ওজন হইবে। এই হিসাবে কোন দ্বিমত নাই। আর আড়াই ভাগ যাকাত ৪০

ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ কাহারো মালিকানায় ৭ $\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ণ একটি বছর কাল অতিবাহিত হইলে উহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত বাবদ আদায় করা ফরয।

আমর ইবনে শুআইব তাঁহার দাদার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَيْسَ فِى أَقَلِّ مِنْ مِائَتَى دِرْهَمٍ شَئٌ۔ (مصنف ابن ابى شيبة)

দুইশত দিরহামের কম পরিমাণে কোন যাকাত ফরয নয়।

মকহুল হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَئٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا۔ (ابن ابى شيبة)

দুইশতের উপরে আরো চল্লিশ দিরহাম পর্যন্ত না পৌঁছিলে উহার উপর যাকাত হইবে না।

হযরত আলী (রা) হইতে অপর এক বর্ণনায় রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি বর্ণিত হইয়াছেঃ

لَيْسَ فِى أَقَلِّ مِنْ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا شَئٌ وَفِى عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا نِصْفُ دِيْنَارٍ وَفِى أَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا دِيْنَارٌ۔

বিশ দীনার (৭$\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ণের)-এর কমে কোন যাকাত নাই। বিশ দীনার (৭ $\frac{১}{২}$ তোলা) হইলে অর্ধ দীনার (আধা মিসকাল) যাকাত দিতে হইবে। আর চল্লিশ দীনারে এক দীনার (পূর্ণ এক মিসকাল) যাকাত দিতে হইবে।

নবী করী (স) এই হিসাবে যাকাত আদায় করিতেন বলিয়া হযরত উমর ও হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। —ইবনে মাজাহ্

স্বর্ণের নিসাব বর্ণিত এই সব হাদীস সনদের বিচারে যয়ীফ! কিন্তু সব ফিকাহবিদ নীতি হিসাবে ইহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্ণের যাকাত আদায়ে উহার ওজন ভিত্তি হিসাবে গৃহীত, উহার মূল্য নয়। কিন্তু হাদীস সমূহের সনদ দুর্বল হওয়ায় প্রাচীনদের মধ্যে আতা, তায়ূস, যুহুরী, সালমান ইবনে হারব ও আইয়ূব সখতিয়ানী প্রমুখ ফিকাহবিদের মত হইল স্বর্ণের নিজস্ব কোন নিসাব (যাকাত ফরয হওয়ার ন্যূনতম পরিমাণ) নির্দিষ্ট নাই। যখনই স্বর্ণমূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য মূল্যের সমান হইবে, তখনই উহাতে যাকাত ফরয হইবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে পরিমাণ নির্দিষ্ট নিসাবের বেশী হইবে, তাহা হইতে ২ $\frac{১}{২}$% হিসাবে যাকাত আদায় করা হইবে। এই পরিমাণ কম হউক, আর বেশী হউক।

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

لَيْسَ فِى أَقَلِّ مِنْ مِائَتَى دِرْهَمٍ شَئٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ۔ (ابن ابى شيبه، دارقطنى)

দুইশত দিরহামের কম পরিমাণের উপর কোন যাকাত নাই। উহার বেশী যাহা কিছু হইবে, তাহা হইতে এই (২ $\frac{১}{২}$%) হিসাবেই যাকাত গ্রহণ করা হইবে।

এই কথাটি স্বয়ং নবী করীমের, না হযরত আলীর নিজের সেই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও অধিকাংশ আলিম নীতি হিসাবে ইহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা) হইতেও ইহাই বর্ণিত। কোন সাহাবী ইহার বিপরীত মত দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। অবশ্যই ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ফিকাহবিদদের মত এই যে, স্বর্ণ নিসাব পরিমাণ (২০ দীনার বা ৭ $\frac{১}{২}$) এর বেশী হইবে, তাহাতে তখন পর্যন্ত যাকাত হইবে না, যতক্ষণ উহা (এ অতিরিক্ত স্বর্ন) চার দীনার (১ $\frac{১}{২}$ তোলা) পরিমাণ না হইবে। আর যে রৌপ্য নিসাবের (২০০ দিরহাম—৫২ $\frac{১}{২}$ তোলার) অধিক হইবে, উহার পরিমাণ ৪০ দিরহাম (১০ $\frac{১}{৪}$ তোলা) না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে যাকাত হইবে না।
(بلوغ الأماني - معالم السنن - در المختار)

হাদীসে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের কথা আলাদা আলাদাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কাহারও নিকট স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় থাকিলে ও উহার কোন একটির পরিমাণ হিসাব-পরিমাণ না হইলে তখন যাকাত আদায় করা হইবে কিনা সে বিষয়ে হাদীসে কোন স্পষ্ট উদ্ধৃতি না থাকিবার কারণে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতবিরোধ হইতেছে। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে আবূ লাইলা ও আবূ উবাইদ প্রমুখ বলিয়াছেন, স্বর্ণ ও রৌপ্য দুই ভিন্ন জাতের ধাতু। এই জন্য উহাকে একত্রিত করিয়া যাকাত দেওয়া যাইবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক, আওযায়ী, সুফিয়ান সওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের মতে এরূপ অবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মিলাইয়া কোন একটির নিসাব পরিমাণ হইলে যকাত দিতে হইবে। তাঁহাদের কথা হইল,স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ই একই জাতের ধাতু। আর উভয় মিলিয়া নগদ অর্থ সম্পদ হইয়া যায়। (معالم السنن - بداية المجتهد)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবী করীম (স)-এর সময়ে স্বর্ণ রৌপ্য দীনার ও দিরহামরূপে নগদ মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হইত। সেকালে কাগজের নোটের প্রচলন ছিল না। বর্তমান সময়ের ধাতুর মুদ্রা ও কাগজের নোট থাকিলেও তাহা স্বর্ণ ও রোপ্যের স্থলাভিষিক্ত। এই জন্য কাহারও নিকট ধাতুর মুদ্রা ও কাগজের নোট থাকিলেও উহার মূল্যমান স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ হইলে এবং তাহাতে পূর্ণ একটি বৎসর অতিক্রান্ত হইলে উহার উপর যাকাত ফরয হইবে। তাহা নিজের হাতে থাকুক,তাহাতে কোন পার্থক্য নাই।

অলংকারে ব্যবহৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رض عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ أَيْدِيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا أَتُؤَدِّيَانِ زَكٰوتَهٗ فَقَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ - قَالَتَا لَا قَالَ فَأَدِّيَا زَكٰوتَهٗ

(ترمذی)

আমর ইবনে শুআইব তাঁহার পিতা হইতে— তাঁহার দাদা হইতে—বর্ণিত হইয়াছে, দুইজন স্ত্রীলোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিল। তাহাদের দুইজনের হাতে স্বর্ণের অলংকার কংকন ছিল। তখন রাসূলে করীম (স) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা দুইজন তোমাদের এই অলংকারের যাকাত দাও কি? তাহারা বলিলঃ না। তখন রাসূলে করীম (স) সেই দুইজনকে

বলিলেনঃ তোমরা দুইজন কি পছন্দ করিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দুইজনকে আগুনের দুইটি বালা পরাইয়া দিবেন? তাহারা দুইজন বলিল, না। রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তাহা হইলে তোমরা দুইজন এই স্বর্ণের যাকাত আদায় কর। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা স্ত্রীলোকদের অলংকারস্বরূপ ব্যবহৃত স্বর্ণ বা রৌপ্যের যাকাত সম্পর্কে এই হাদীস। ইমাম তিরমিযী তাঁহার সুনান গ্রন্থে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর লিখিয়াছেন, এই হাদীসটি আমর ইবনে শুআইব হইতে মুসান্না ইবনুস সাবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, আর মুসান্না ও ইবনে লাহিয়াতা উভয়ই যয়ীফ বর্ণনাকারী। অতঃপর লিখিয়াছেনঃ

وَلَا يَصِحُّ فِىْ هٰذَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ۔

এই পর্যায়ে নবী করীম (স) হইতে কোন কিছুই সহীহরূপে বর্ণিত হয় নাই।

কিন্তু ইমাম তিরমিযীর উক্তি যথার্থ নয়। আবূ দাউদে আমর ইবনে শুআইব হইতে এই কথাগুলিই নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছেঃ

اَنَّ اِمْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا وَفِىْ يَدِ اِبْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا اَتُعْطِيْنَ زَكٰوةَ هٰذَا قَالَتْ لَا قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُّسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ۔ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ۔

একটি স্ত্রীলোক রাসূলে করীমের নিকট আসিল। তাহার সঙ্গে ছিল তাহার কন্যা। তাহার কন্যার হাতে ছিল স্বর্ণ নির্মিত মোটা-পুরু বালা। যখন নবী করীম (স) তাহাকে বলিলেনঃ তুমি কি ইহার (অলংকারের) যাকাত আদায় কর? সে বলিলঃ না। নবী করীম (স) বলিলেনঃ তুমি কি আনন্দ পাইবে আল্লাহ্ তা'আলা যদি কিয়ামতের দিন এই দুইটির স্থলে দুইটি আগুণের কাঁকন তোমাকে পরাইয়া দেন? অতঃপর স্ত্রীলোকটি কাঁকন দুইটি খুলিয়া ফেলিল এবং নবী করীমের দিকে ফেলিয়া দিল ও বলিলঃ এই দুইটি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের জন্য (দান করিলাম)।

ইবনুল কাতান বলিয়াছেন, এই হাদীসটির সনদ সহীহ। মুনযেরী বলিয়াছেনঃ ইহার সনদে কোন আপত্তি উঠে নাই।

মুসনাদে আহমদে এই হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপঃ

اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَانِ فِىْ اَيْدِيْهِمَا اَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُحِبَّانِ اَنْ يُّسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا قَالَ فَاَدِّيَا حَقَّ هٰذَا الَّذِىْ فِىْ اَيْدِيْكُمَا۔

নবী করীম (স)–এর নিকট দুইজন স্ত্রীলোক আসিল। তাহাদের দুইজনের হাতে স্বর্ণের কাঁকন ছিল। তখন নবী করীম (স) তাহাদের দুইজনকেই বলিলেনঃ তোমরা দুইজন কি পছন্দ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের দুইজনকে আগুনের কাঁকন পরাইয়া দিবেন? সে দুইজন বলিলঃ না। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ তাহা হইলে তোমাদের হাতে পরা জিনিসের হক তোমরা আদায় কর।

ব্যাখ্যা স্ত্রীলোকদের ব্যবহৃত রৌপ্য ও স্বর্ণের অলংকারের যাকাত সম্পর্কে এই হাদীস। এই পর্যায়ে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আসমা ও হযরত আয়েশা (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

এই পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের সারকথা এই যে, স্ত্রীলোকদের স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত অলংকারের যাকাত আদায় করা ফরয। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) অলংকারের যাকাত দেওয়া ফরয বলিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফাও অন্যান্য হাদীস হইতে দলীল পেশ করেন। বিশেষত কুরআন মজীদের আয়াতঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ .... الخ

যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। এবং রাসূলের বাণী—

فِى الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ـ সোনা–চাঁদির চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দেয়।

হইতেও অলংকারের যাকাত আদায় করা ফরয প্রমাণিত হয়।

আর এক শ্রেণীর লোকের মতে অলংকারের যাকাত দেওয়া ওয়াজিব নহে। তাঁহারা হইতেছেনঃ ইবনে উমর, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আয়েশা (রা), কাসেম শা'বী কাতাদাহ, মুহাম্মাদ ইবনে আলী, উমরাতা এবং ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল। তাঁহাদের দলীল হইতেছে দারে কুতনী উদ্ধৃত ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণিত হাদীসঃ

لَيْسَ فِى الْحُلِىِّ زَكٰوةٌ ـ অলংকারের কোন যাকাত নাই।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শেষোক্ত (অলংকারের যাকাত না হওয়া সংক্রান্ত) হাদীসের কোন ভিত্তি নাই—ইহা বাতিল। ইমাম বায়হাকীর মতে এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আফীয়া ইবনে আয়ূব অজ্ঞাত ব্যক্তি (مجهول)। তিনি বলিয়াছেনঃ

مَنِ احْتَجَّ بِهٖ مَرْفُوْعًا كَانَ مُغَرَّرًا بِدِيْنِهٖ دَاخِلًا فِيْمَا يُعِيْبُ الْمُخَالِفِيْنَ مِنَ الْاِحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ الْكَذَّابِيْنَ ـ

এই হাদীসটিকে মরফূ মনে করিয়া যে উহাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করিবে, সে তাহার দ্বীনের ব্যাপারে প্রতারিত হইবে এবং বিরোধীরা যেমন বলে— মিথ্যাবাদীদের বর্ণনাকে দলীল মানিয়া লওয়া দোষে দোষী হইবে।

উপরে উদ্ধৃত হাদীসও এই পর্যায়ের। অন্যান্য হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য কথা এই যে, অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপরও হক রহিয়াছে—উহারও যাকাত দিতে হইবে। যাকাত না দিলে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য উহাই যথেষ্ট হইবে।

হযরত আসমা বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ নবী করীম (স) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত মেয়েলোক দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

اَتُعْطِيَانِ زَكٰوتَهٗ ـ তোমরা দুইজন কি এই অলংকারের যাকাত দাও?

তাঁহারা বলিলেনঃ না। তখন রাসূল (স) বলিলেনঃ

اَمَا تَخَافَانِ اَنْ يُّسَوِّرَكُمَا اللّٰهُ اَسْوِرَةً مِّنْ نَارٍ ـ اَدِّيَا زَكٰوتَهٗ ـ

আল্লাহ্ যে তোমাদের দুইজনকে আগুনের অলংকার পরাইয়া দিবেন, তাহা কি তোমরা ভয় কর না? ভয় করিলে উহার যাকাত দাও।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে, একদা রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশার হস্তে স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলংকার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ উহা কি? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ

صَنَعْتُهُنَّ اَتَزَيَّنَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

আমি এইগুলি তৈয়ার করাইয়াছি আপনার জন্য আমার সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ

اَتُؤَدِّيْنَ زَكٰوتَهُنَّ ـ তুমি কি এইগুলির যাকাত আদায় কর?

উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) 'না' বলিলে নবী করীম (স) বলিলেনঃ

هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ـ জাহান্নামে যাওয়ার জন্য ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রসঙ্গত হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত হাদীসের প্রতিও ইঙ্গিত করা আবশ্যক। তিনি স্বর্ণের নানা অলংকার পরিধান করিতেন। তিনি রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহাকে কি কুরআনে ধিকৃত (كنز) সঞ্চয় বলা যায়? উত্তরে নবী করীম (স) বলিলেনঃ

مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدِّىَ زَكٰوتَهٗ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ـ

উহার ওজন বা মূল্য যাকাত পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছিলে ও উহার যাকাত আদায় করা হইলে উহা আর 'সঞ্চয়' (كنز) থাকে না। (এবং উহার জন্য নির্দিষ্ট আযাবও ভোগ করিতে হয় না)।

অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যে যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে অতঃপর আর কোন সন্দেহই থাকিল না। (بلوغ الامانى ـ تحفة الاحوذى)

কৃষি ফসলে যাকাত

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ

وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سَقِيَ بِالسَّوَانِيْ اَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

(ابو داؤد، نسائی، ابن ماجه)

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ তাঁহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি (আবদুল্লাহ্) বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেনঃ বৃষ্টি, খাল বা ঝর্ণার পানি হইতে সিক্ত কিংবা নিজস্বভাবে সিক্ত জমির ফসলে ওশর ধার্য করা হইয়াছে। আর যে কোন সেচ ব্যবস্থার ফলে সিক্ত জমির ফসলের অর্ধেক ওশর দিতে হইবে। —আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে কেবল নগদ টাকা, স্বর্ণ-রৌপ্য বা পণ্যদ্রব্যের উপরই যাকাত ফরয নয়, কৃষিজাত ফসল ও শস্যের উপরও যাকাত ধার্য হইয়াছে। হাদীসের পরিভাষায় এই যাকাতকে 'ওশর' বা 'অর্ধ-ওশর' বলা হয়। ইহার অর্থ মোট উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ। এই ওশর বা অর্ধ ওশরও সাধারণ যাকাতের মতই ফরয। কুরআনে মজীদে বলা হইয়াছেঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ -

(البقرة: ٢٦٧)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের পবিত্র ও হালাল উপার্জন হইতে এবং তোমাদের জন্য জমি হইতে যে ফসল উৎপন্ন করি, তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর।

এই আয়াতে যে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, উহার অর্থ সর্বসম্মতভাবে যাকাত এবং ওশর দেওয়া। ইহা এই আয়াতের দৃষ্টিতেও সুস্পষ্টভাবে ফরয। দ্বিতীয়ত, জমির কেবল উৎপন্ন ফসলই নয়, জমির গভীরে লুক্কায়িত ধন-সম্পদ ও খনি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও যাকাত ফরয করার কথা বলা হইয়াছে। আল্লামা ইবনুল আরাবী লিখিয়াছেনঃ মানুষের উপার্জন দুই প্রকারের। এক প্রকার উপার্জন জমির উপরিভাগ বা উহার গর্ভ হইতে। সমস্ত প্রকার উদ্ভিদ, গাছপালা, গুল্ম-লতা ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয় প্রকার জমির উপর চলাচল করিয়া করা হয়। যেমন ব্যবসায়, যুদ্ধ, শিকার ইত্যাদি। এই প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতে ধনী ও সচ্ছল অবস্থার লোকদিগকে তাহাদের গরীব ভাইদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে! এই ব্যয়টা কি নিয়মে ও কি পরিমাণে করিতে হইবে, নবী করীম (স) তাঁহার উপরোদ্ধৃত হাদীসে তাহাই বলিয়াছেন। এইজন্য তিনি একটি মূলনীতি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

কুরআনে এই পর্যায়ের দ্বিতীয় আয়াত হইলঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ،

(الانعام: ١٤١)

তোমরা গাছ-গাছালির ফল ও ফসল খাও, যখন উহা ফল ও ফসল দিবে। আর উহার কাটাই-মাড়াইর দিনই উহার হক আদায় করিয়া দাও এবং এই ব্যাপারে সীমালংঘনমূলক[১] কাজ করিও না। কেননা আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না।

আয়াতটিতে প্রথমে ফল-ফসলের মালিককে আহার করিতে বলা হইয়াছে। পরে উহার হক আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নিয়ামতের ব্যাপারে এই দুইটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ। দ্বিতীয় নির্দেশটি পালনের পন্থা হইল যাকাত বা ওশর দেওয়া। ইহা ফরয যাকাত বা ওশর সংক্রান্ত নির্দেশ। প্রথম উদ্ধৃত আয়াতে জমির উৎপন্ন যাবতীয় সম্পদে যাকাতের কথা মোটামুটি বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় আয়াতে উহার বিশেষ নির্ধারণ হইয়াছে জমির ফসল-ফলাদি সম্পর্কে। কিন্তু পরিমাণ বলা হয় নাই। আর পরিমাণ ও যাকাত আদায়ের নিয়ম রাসূলে করীম (স) নিজে হাদীসের মাধ্যমে বলিয়া দিয়াছেন। তবে শেষোক্ত আয়াতে ফল-ফসলের যাকাত আদায়ের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে 'উহা কাটাই-মাড়াইর দিন' বলিয়া। এই সম্পর্কে তাফসীরে তিনটি মতের উল্লেখ হইয়াছে। একটি, ফল-ফসল কাটাই-মাড়াইর দিন সঙ্গে সঙ্গে আদায় করিতে হইবে। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমাতা এই মত দিয়াছেন। দ্বিতীয় মত, ফসল পাকার পর আদায় করিতে হইবে। কেননা ফসল পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উহা ঘাসের সমপর্যায়ের—খাওয়ার অনুপযুক্ত। নিয়ামত পূর্ণ হইলেই উহার হক আদায়ের প্রশ্ন উঠে, তাহার পূর্বে নয়।

তৃতীয় মত, কাটাই-মাড়াই সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ার পর উহার পরিমাণ করা হইলে তবে যাকাত বা ওশর দিতে হইবে। কেননা ইহা না হওয়া পর্যন্ত ওশর বাবত যে কত দিতে হইবে, তাহা জানিবার উপায় নাই। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ ইমাম ও জমহুর ফিকাহ্‌বিদের মত ইহাই। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়—ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মত হইল ফসল ও ফলাদি যখন ফলিতে শুরু করে, ওশর দেওয়ার ফরয সেই সময়ই ধার্য হইয়া যায়, কার্যত আদায় করা যখনই সম্ভব হউক না কেন। (احكام القران لابن العربى - المغنى لابن قدامه)[1]

জমিতে ফসল ফলাইবার জন্য পানি অপরিহার্য। এই কারণে জমির অবস্থা বিভিন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন জমি স্বতঃই সিক্ত ও চাষোপযোগী হইয়া থাকে। উহাতে পানি সেচের কোন প্রয়োজন হয় না। কোন কোন জমি বৃষ্টি কিংবা খাল-নালা-ঝর্ণা ইত্যাদির পানিতে সিক্ত হয়। উহাতে পানি সেচ করার জন্য উৎপাদককে কোন শ্রম করিতে বা অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। এই কারণে এই উভয় প্রকারের জমির মোট ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ—ওশর—যাকাত বাবত দিতে হইবে।

পক্ষান্তরে অনেক জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচ করিতে হয়। সেইজন্য বলদ কিংবা কোন যন্ত্র খাটাইতে হয় অথবা কায়িক শ্রমে নিজেকে কিংবা মজুরীর বিনিময়ে লোকের দ্বারা পানি সিঞ্চন করিতে হয়। এই কারণে উহার মোট ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ অর্ধ ওশর, نصف العشر যাকাত বাবত দিতে হইবে। এইরূপ পার্থক্যের কথা নবী করীম (স) নিজেই উপরিউক্ত হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন। আল্লামা খাত্তাবী এই পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেনঃ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الصَّدَقَةَ مَاخَفَّتْ مُؤُنَتُهُ وَكَثُرَتْ مَنْفَعَتُهُ عَلَى التَّضْعِيفِ تَوْسِعَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ وَجَعَلَ مَاكَثُرَتْ مُؤُنَتُهُ عَلَى التَّنْصِيفِ رِفْقًا بِاَرْبَابِ الْاَمْوَالِ - (معالم السنن: ج ٢، ص ٣٢)

---

১. স্মরণীয়, উপরিউক্ত আয়াতের শেষ অংশে সীমালংঘন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই নিষেধ ইহার পূর্ববর্তী দুইটি নির্দেশ সম্পর্কেই প্রযোজ্য অর্থাৎ নিজের খাওয়ার ব্যাপারে সীমালংঘন করা যেমন নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া নিয়ামত লাভের দরুন উহার সহিত গরীব জনগণের যে হক যুক্ত হইয়াছে, তাহা না দেওয়াও সীমালংঘন। আর এই দুইটিই নিষিদ্ধ।

যে জমিতে ফসল ফলাইবার জন্য অল্প পরিশ্রম করিতে হয় ও অল্প পরিশ্রমে অধিক পরিমাণে মুনাফা বা ফসল লাভ করা যায়, তাহাতে রাসূলে করীম (স) দ্বিগুণ যাকাত (ওশর) ধার্য করিয়াছেন। এইরূপ ধার্য করার মূলে গরীব-মিসকীনদের প্রাপ্য পরিমাণ বৃদ্ধি ও প্রশস্ত করাই উদ্দেশ্য। আর যে সব জমিতে অধিক শ্রম বা অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তাহাতে জমি মালিক(উৎপাদক)-দের প্রতি সহনযোগ্য করার জন্য উহার অর্ধেক পরিমাণ (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত (ওশর) ফরয করিয়া দিয়াছেন।

বস্তুত মুল হাদসিটিতেই জমির সেচ ব্যবস্থার পার্থক্যের কারণে যাকাত (ওশর) পরিমাণে পার্থক্য করা হইয়াছে। ইহা হইতে স্বতঃই জানা যায়, যে সব জমিতে উভয় পদ্ধতিতে (স্বাভাবিকভাবে ও কৃত্রিমভাবে) সেচ কার্য সমাধা হয়, সে সব জমির ফসলের দশ ভাগের এক ভাগের তিন চতুর্থাংশ যাকাত বাবত দিতে হইবে। ইহা সর্ববাদীসম্মত। (فتح البارى - تحفة الاحوذى - معالم السنن)

বলা বাহুল্য, ওশরের ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম (স)-ই যখন খরচ বাদ দিয়া পরিমাণ ধার্য করিয়া দিয়াছেন, তখন অন্য কোন দিক দিয়া খরচ বাদ দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

শস্য ও ফলের যাকাত

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض حِيْنَ بَعَثَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ اَمْرَ دِيْنِهِمْ لَا تَأْخُذُوْا الصَّدَقَةَ اِلَّا مِنْ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِ - (مستدرک حاکم)

হযরত আবূ মুসা ও হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) যখন তাঁহাদের দুইজনকে ইয়েমেনে সেখানকার লোকদিগকে দ্বীন-ইসলামের বিষয়াদি শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন, তখন এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, এই চার প্রকারের ফসল ছাড়া অন্য কিছু হইতে যাকাত গ্রহণ করিবে নাঃ যব, গম, কিশমিশ ও খেজুর। —মুস্তাদ্‌রাক হাকেম

ব্যাখ্যা প্রথমত হাদীসটি হইতে জানা যায়, নবী করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে সেখানকার জনগণকে দ্বীন ইসলামের জরুরী বিষয়াদি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত ও মনোনীত লোকদের পাঠাইতেন এবং বিভিন্ন অঞ্চল-রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে যেসব শাসনকর্তা প্রেরণ করিতেন, দ্বীন-ইসলামের ব্যাপক আইন বিধানের প্রচার ও উহা কার্যকর করণের দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পণ করিতেন। হাদীসটিতে উদ্ধৃত হযরত আবূ মুসা ও হযরত মু'আয ইবনে জাবাল এই পর্যায়েরই লোক ছিলেন।

দ্বিতীয়ত জানা যায়, জমি ও বাগানে উৎপন্ন শস্য, দানা, বীজ ও ফল-ফলাদির উপর যাকাত ধার্য হইয়াছে। উদ্ধৃত হাদীসে মাত্র চার প্রকারের ফসলের উল্লেখ হইয়াছেঃ যব, গম, কিশমিশ ও খেজুর। হাদীসের ভাষা হইতে মনে হয়, এই কয়টি ছাড়া অন্য কোন ফল বা ফসলে যাকাত নাই। কিন্তু হয় এই হাদীসটির বর্ণনাকারী পঞ্চম জিনিসটি ভুলিয়া গিয়াছেন, না হয় ইয়েমেনে তখনকার সময় এই কয়টিই প্রধান ফসলরূপে পরিজ্ঞাত ছিল। কেননা হযরত উরম (রা) বর্ণিত এবং দারে কুতনী ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থদ্বয়ে উদ্ধৃত হাদীসে একটি অতিরিক্ত জিনিস اَلذُّرَّةُ। এর উল্লেখ হইয়াছে। তাহার ভাষা হইলঃ

إِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكوٰةَ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالذُّرَّةِ ـ

নবী করীম (স) গম, যব, খেজুর, কিশমিশ ও দানা শস্যের উপর যাকাত চালু করিয়াছিলেন।

এই হাদীসসমূহ হইতে শস্য ও ফল–ফলাদিতে যাকাত ধার্য হওয়ার কথা—কোনরূপ পরিমাণ নির্ধারণব্যতীতই—জানা যায়। শস্য ফল–ফলাদির কত পরিমাণ হইলে যাকাত আদায় করিতে হইবে, ইহার উল্লেখ হয় নাই। এই ক্ষেত্রে দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ জমির সেচ ব্যবস্থার পার্থক্যের কারণে যাকাতের পরিমাণে পার্থক্য এই যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে এইসব ফসল ও ফল–ফলাদির 'নিসাব' উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার ভাষা এইঃ

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ ـ

(بخارى، مسلم، نسائى، مسند احمد، بيهقى، ابو داؤد، ترمذى)

পাঁচ অসক খেজুর বা বীজদানার কম পরিমাণে যাকাত নাই।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরীরই অপর এক বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اَلْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا ـ এক অসক–এ ষাট সা' হয়।[১]

ইহা সর্বসম্মত। কিন্তু এক সা'র হিজাযী পরিমাণ ৫ $\frac{১}{৩}$ রতল এবং ইরাকী পরিমাণ ৮ রতল। আর এক রতল–এ সর্বসম্মতভাবে ৭ $\frac{১}{২}$ ছটাক। ফলে পাঁচ অসকে হিজাযী ওজনে ১৮ মণ ৩০ সের এবং ইরাকী ওজনে ২৮ মণ ৫ সের। ইমাম আবূ হানীফা এবং কূফা'র অন্যান্য ফিকাহবিদগণ ইরাকী ওজন গ্রহণ করিয়াছেন। আর ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও অন্যান্য ইমামগণ হিজাযী ওজন অনুযায়ী হিসাব লাগাইয়াছেন। আলোচ্য হাদীসের আলোকে যাহার অন্ততঃ ১৮ মণ ৩০ সের ফসল উৎপন্ন হইবে, উহাতে ওশর দিতে হইবে। আর হানাফী ওজন মতে যাহার অন্ততঃ ২৮ মণ ৫ সের ফসল হাতে আসিবে তাহাকে ওশর দিতে হইবে। স্মরণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফা জমির ফসল ফলাদিতে কোন ন্যূনতম পরিমাণ মানেন না।

(الاسلام سعيد حوى)

আল্লামা কাসানী লিখিয়াছেনঃ

يَجِبُ الْعُشْرُ فِى كَثِيْرِ الْخَارِجِ وَقَلِيْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ النِّصَابُ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ وَعِنْدَ أَبِى يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا يَجِبُ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ـ (البدائع والصنائع ج ٢، ص ٥٩)

ইমাম আবূ হানীফার মতে জমির ফসল ফলাদি কম হউক বা বেশী হউক তাহা হইতে ওশর দিতে হইবে। তাঁহার মতে ইহা নিসাব—ন্যূনতম পরিমাণ কিছু নাই। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে পাঁচ অসক–এর কম পরিমাণ ফসল–ফলাদিতে ওশর দেওয়া ওয়াজিব নয়।

---

১. এক অসক = ১২০ কিলোগ্রাম।

হযরত ইবনে আব্বাস, যায়দ ইবনে আলী ও নখয়ীর নিকটও জমির উৎপন্ন ফসলে যাকাত হওয়ার কোন নিসাব নির্দিষ্ট নাই। এই পর্যায়ে ইহাদের প্রথম দলীল হইল কুরআনের দইটি আয়াত!

(عمدة القارى، نيل الاوطار، بلوغ الامانى، فقه السنة)

একটিঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ۔ (البقرة، ٢٦٧)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে পবিত্র সম্পদ উপার্জন কর এবং আমরা যে ফসল–ফলাদি তোমাদের জন্য জমি হইতে উৎপন্ন করিয়া দেই উহা হইতে ব্যয় কর।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ۔ (الانعام، ١٤١)

এবং ফসল–ফলাদি কাটাই–মাড়াইর দিনই উহার হক যাকাত অর্থাৎ ওশর আদায় করিয়া দাও।

দ্বিতীয় দলীল হাদীস। এমন বহু হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহাতে ওশর ফরয হওয়ার কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু কোন নিসাব বা ন্যূনতম পরিমাণের উল্লেখ নাই। যেমনঃ

مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ۔

বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির ফসলে ওশর এবং যাহা কোনরূপ সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে সিক্ত হয়, তাহাতেঅর্ধ–ওশর—বিশ ভাগ দিতে হইবে।

বস্তুত এইসব হাদীসে ওশর বা অর্ধ ওশর ফরয হওয়ার কথাই ঘোষিত হইয়াছে; কিন্তু নিসাবের কোন পরিমাণের উল্লেখ হয় নাই। কাজেই এই দলীল অনুযায়ী ফসল–ফলাদির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন ওশর দিতে হইবে।

যেসব হাদীসে নিসাবের উল্লেখ হইয়াছে, সে সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্য হইল, উহা ব্যবসায় পণ্যের যাকাতের নিসাবের পরিমাণ। কেননা সেকালে লোকেরা শস্য ও ফল–ফলাদির ব্যবসায় এই হিসাব অনুযায়ী করিত; আর এক অসক–এর মূল্য ৪০ দিরহাম ও পাঁচ অসক–এর মূল্য ২০০ দিরহাম ব্যবসায় পণ্যের নিসাব গণ্য হইত। এই কারণে সেসব হাদীস হইতে নিসাব নির্ধারিত হয় না। দ্বিতীয় এইসব গরীব বা খবরে ওয়াহিদ[১] পর্যায়ের। আর খবরে ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীস দ্বারা কুরআন ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের বিপরীত কিংবা অতিরিক্ত কথা প্রমাণ করা যায় না।

ইমাম আবূ হানীফার মতে জমিতে উৎপন্ন যে কোন জিনিস হউক—ফল–শস্য ও ঘাস বা শাক–সব্জি—সব কিছুতেই ওশর ফরয হয়। কেননা কুরআন ও হাদীসের উপরোদ্ধৃত দলীলসমূহে সাধারণভাবে জমিতে উৎপন্ন সব কিছুর উপর ওশর ফরয হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। কোন জিনিসকেই উহা হইতে বাদ দেওয়া (Exempted) হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ওশর ওয়াজিব হওয়ার মূল ভিত্তি হইল উৎপাদন সম্পন্ন উর্বর জমি।

---

১. غريب 'গরীব' ও خبر واحد 'খবরে ওয়াহিদ' এই দুইটি শব্দ ইলমে হাদীসের বিশেষ পরিভাষা। غريب 'গরীব' বলা হয় সেই হাদীসকে যাহার বর্ণনা পরম্পরা ধারায় কোন এক স্তরে কেবলমাত্র একজন বর্ণনাকারী, কিন্তু যে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা ধারার সকল পর্যায়ে একজন মাত্র বর্ণনাকারী এবং সেই হাদীসটি অন্য কোন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয় নাই, ইহা 'খবরে ওয়াহিদ'–এর এক প্রকার। আর 'খবরে ওয়াহিদ' সেই হাদীস যাহা একক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত। (ميزان الاخبار)

কিন্তু এখানে সর্বপ্রথম যে হাদীসটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ঘাস ও শাক-সবজি ইত্যাদির ওশর দিতে হইবে না। আতা ইবনে সাযেব বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগীরা ঘাস ও শাক-সবজির ওশর আদায় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মূসা ইবনে তাল্‌হা তাহাতে বাধা দান করিলেন। বলিলেনঃ আপনার এইরূপ করার অধিকার নাই। কেননা নবী করীম (স) বলিতেনঃ

لَيْسَ فِي ذٰلِكَ صَدَقَةٌ ـ এইগুলিতে ওশর ধার্য হয় না।

অবশ্য এই পর্যায়ে আরো বহু হাদীস বর্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত উমর (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।

لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ ـ শাক-সবজিতে ওশর নাই।

হযরত আলী (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।

لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ وَالْبُقُوْلِ صَدَقَةٌ ـ

ঘাস ও শাক-সবজিতে ওশর দিতে হয় না।

এই পর্যায়ের হাদীসসমূহের সনদ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। তবে উহার জওয়াবে বলা হইয়াছে যে, এই হাদীসসমূহ বহু সূত্র হইতে বর্ণিত হইয়াছে বিধায় ইহা গ্রহণযোগ্য।

ফল-ফলাদির যাকাত সম্পর্কে নবী করীম (স) হযরত আবূ বকর, হযরত উমর (রা) ও পরবর্তী খলীফাদের হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এইগুলির পরিমাণ বা সংখ্যা অনুমানের ভিত্তিতে ওশর আদায় করাই নিয়ম।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই কথাও স্মরণীয় যে, সব রকমের ফল-ফলাদিতে ওশর ফরয নয়। ইহা ফরয কেবল সেই সব ফল-ফলাদিতে যাহা লওয়ার পর অন্তত এক বৎসরকাল টিকিয়া থাকে, নষ্ট হয় না বা পঁচিয়া যায় না। যেসব ফল-ফলাদি এক বৎসরকাল টিকে না-যেমন আম, কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস ইত্যাদি, তাহাতে ওশর ফরয নয়। তবে এদেশের নারিকেল, সুপারী ইত্যাদিতে ওশর ধার্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী লিখিয়াছেনঃ

وَيَجِبُ فِي كُلِّ ثَمَرَةٍ تَبْقَى سَنَةً ـ

যেসব ফল-ফলাদি এক বৎসরকাল টিকিয়া থাকে—নষ্ট হয় না—পচে না, কেবল তাহাতেই ওশর ফরয হয়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলিয়াছেনঃ

يَجِبُ فِيْمَا لَهُ الْبَقَاءُ ـ

যেসব ফল-ফলাদির স্থিতি আছে—সহসা পচিয়া যায় না—কেবল তাহাতেই ওশর ফরয হয়।

ব্যবসায় পণ্যের যাকাত

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِىْ نَعُدُّ لِلْبَيْعِ -

হযর সামুরাতা ইবনে জুনদুব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ অতঃপর বক্তব্য এই যে, রাসূলে করীম (স) আমাদিগকে সেই সব জিনিস হইতে-যাহা আমরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তৈয়ার করি-যাকাত দিতে আদেশ করিয়াছেন। —আবু দাউদ, দারে কুতনী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ইমাম শাওকানী এই হাদীসের ভিত্তিতে লিখিয়াছেন, ব্যবসায় পণ্যের যাকাত দেওয়া ফরয। এই সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে 'ইজমা'—মতৈক্য রহিয়াছে। এই ব্যাপারে মতবিরোধ করিয়াছেন কেবলমাত্র যাহেরী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদগণ। তাঁহারা বলিয়াছেন।

لَا تَجِبُ الزَّكٰوةُ فِى الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ لَا لِلتِّجَارَةِ وَلَا لِغَيْرِهَا -

ঘোড়া ও ক্রীতদাসের যাকাত ফরয নয়। ব্যবসায় পণ্য হইলেও না, উহা ছাড়াও না।

কিন্তু এই মত গ্রহণীয় হয় নাই। দারে কুতনী ও তাবারানী ও হযরত সামুরাতা ইবনে জুনদু বর্ণিত এই হাদীসটি চিঠির ভাষায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা এইরূপঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض إِلٰى بَنِيْهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ مِنَ الرَّقِيْقِ الَّذِىْ يُعَدُّ لِلْبَيْعِ -

আল্লাহ্‌র নামে যিনি দয়াময় করুণশীল। সামুরাতা ইবনে জুনদুব হইতে তাহার পুত্রের প্রতি— তোমাদের প্রতি সালামঃ নিশ্চিত জানিও, নবী করীম (স) আমাদিগকে আদেশ করিতেন যে, — ব্যবসায় পণ্য হিসাবে রাখা ক্রীতদাসেরও যাকাত আদায় করিতে হইবে।

সাধারণতঃ ক্রীতদাসের কোন যাকাত নাই। এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু উহাই যদি ব্যবসায় পণ্য হয়, তাহা হইলে ব্যবসায় পণ্য হিসাবেই উহার যাকাত হইবে।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁহার খিলাফত আমলে এই হাদীসের ভিত্তিতে ব্যবসায় পণ্যের যাকাত আদায় করার নির্দেশ জারী করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছেঃ

إِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ مَالٍ يُدَارُ فِىْ عَبِيْدٍ أَوْ دَوَابٍّ أَوْ بَزٍّ لِلتِّجَارَةِ يُدَارُ الزَّكٰوةُ فِيْهِ فِىْ كُلِّ عَامٍ -

তিনি বলিতেন, প্রত্যেক পণ্যে তাহা ক্রীতদাস হউক, কিংবা জন্তু-জানোয়ার যাহা ব্যবসায়ের পণ্য হিসাবে গৃহীত, প্রত্যেক বৎসর উহার উপর যাকাত আবর্তিত হইবে।

ওরওয়া ইবনুয যুবাইর, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, কাসেম প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ বলিয়াছেনঃ

فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكٰوةُ كُلَّ عَامٍ لَايُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكٰوةُ حَتّٰى تَاْتِيْ ذٰلِكَ الشَّهْرَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ -

পণ্য দ্রব্যে প্রত্যেক বৎসর যাকাত অবর্তিত হইবে। এক বৎসর যে মাসে যাকাত আদায় করা হইল, পরবর্তী বৎসর সেই মাসে আবার যাকাত আদায় করা হইবে, তাহার পূর্বে নয়।

হযরত ইবনে উমরের আর একটি উক্তি হইলঃ

لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكٰوةٌ اِلَّا مَاكَانَ لِلتِّجَارَةِ -

যে সব জিনিসপত্র ব্যবসায় পণ্যরূপে তৈয়ার করা হইয়াছে তাহাতে যাকাত ধার্য হইয়াছে। যাহা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নয় উহাতে যাকাত নাই।

আমর ইবনে হিশাম তাঁহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'আমি চামড়া ও তীর বিক্রয় করিতাম'। একদিন হযরত উমর (রা) আমাকে বলিলেনঃ 'তোমার মালের যাকাত দাও। এই বর্ণনার ভিত্তিতে হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী যাকাত বাবদ মূল্য গ্রহণ করা হয় দ্রব্য নয়—হানাফী মাযহাবে উভয়ই গ্রহণ করা যাইতে পারে। (بذل المجهود - فقه السنة)

গরু—মহিষের যাকাত

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْتَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِيْ مُحْتَلِمًا دِيْنَارًا اَوْعَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ يَكُوْنُ بِالْيَمَنِ - (ابو داؤد، ترمذى، نسائى بيهقى)

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) যখন তাঁহাকে ইয়েমেনে পাঠাইলেন, তখন তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন যে, গরুর প্রত্যেক ত্রিশটি হইতে এক বৎসর বয়স্ক একটি দামড়া বা দামড়ি যাকাত বাবদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক চল্লিশটি হইতে দুই বৎসর বয়স্ক একটি দামড়ি লইতে হইবে। আর প্রত্যেক অমুসলিম পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির নিকট হইতে জিযিয়াস্বরূপ এক দীনার কিংবা উহার স্থলে ইয়েমেনে তৈরী মুআফিরী কাপড় গ্রহণ করিতে হইবে। —আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে গরুর যাকাত সম্পর্কে বিধান জানা গেল। ইয়েমেনের শাসনকর্তা ও যাকাত আদায়কারীরূপে হযরত মু'আযকে রাসূলে করীম (স) পাঠাইয়াছিলেন। এই সময় গরুর যাকাত

আদায় করার নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিসাবও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে জানা গেল যে, গরুর সংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিশ না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহার উপর যাকাত ধার্য হইবে না। আর যখনই উহার সংখ্যা ত্রিশটি হইবে, তখনই উহা হইতে এক বৎসর বয়সের একটি দামড়া বা দামড়ি যাকাত বাবদ গ্রহণ করিতে হইবে। ত্রিশটির পর চল্লিশ সংখ্যা পর্যন্ত না পৌঁছিলে ত্রিশের অতিরিক্ত গরুর উপর যাকাত হইবে না। যখনই সংখ্যা চল্লিশটি হইবে, তখনই উহার উপর যাকাত হইবে এবং উহা হইতে দুই বৎসর বয়স্ক একটি দামড়ি গ্রহণ করিতে হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعٌ اَوْ تَبِيْعَةٌ وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ -

(ترمذى، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه)

নবী করীম (স) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক ত্রিশটি গরুতে একটি এক বৎসর বয়স্ক দামড়া কিংবা দামড়ি এবং প্রত্যেক চল্লিশটি হইতে দুই বৎসর বয়স্ক দামড়ি গ্রহণ করিতে হইবে।

تَبِيْعٌ যে বাছুরের বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে ও দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। এই বয়স্ক বাছুরের এইরূপ নামকরণের কারণ হইল, উহা মা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না,মা'র সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আর مُسِنَّةٌ বলা হয় সেই বাছুরকে যাহার বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইয়াছে এবং তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। হযরত ইবেন আব্বাস (রা) হইতে তাবারানীতে এই হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

হাদীসটি হইতে নিঃসন্দেহে জানা গেল যে, গরুর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। আর উহার নিসাব তাহাই যাহা এই হাদীসে বলা হইয়াছে। আল্লামা ইবনে আবদুল বার লিখিয়াছেনঃ

لَاخِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ اَنَّ السُّنَّةَ فِىْ زَكٰوةِ الْبَقَرِ عَلٰى مَا فِىْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ (ن) -

হযরত মু'আয (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি অনুযায়ী গরুর যাকাত আদায় করা রাসূলে করীম (স)-এর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনই মতবিরোধ নাই।

উল্লেখ্য, চার ইমামের ঐকমত্য এই যে, গরুর মত মহিষেরও যাকাত হইবে এবং এই দুইটি জন্তুর নিসাব একই হিসাবে চলিবে।

(تحفة الاحوذى - نيل الاوطار - بذل المجهود - الفقه على المذاهب الاربع)

এখানে এই কথাও স্মরণীয় যে, শুধু চাষাবাদ বা বোঝা টানার উদ্দেশ্যে যে গরু-মহিষ রাখা হয়, তাহার সংখ্যা নিসাব মাত্রার সমান বা তদূর্ধ হইলেও তাহাতে যাকাত ফরয নয়, যাকাত ফরয কেবল সেই সব গরু-মহিষে যাহা বংশ বৃদ্ধি ও ব্যবসায় তথা মুনাফার উদ্দেশ্যে রাখা ও পালা হইবে। অবশ্য কোন কোন ফকীহর মতে প্রথমোক্ত গরু-মহিষের অন্ততঃ একবার যাকাত দেওয়া উচিত।

ছাগল ভেড়ার যাকাত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا اِلٰى

عُمَّالِهِ حَتّٰى تُوُفِّيَ قَالَ فَأَخْرَجَهَا أَبُوْ بَكْرٍ رض مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتّٰى تُوُفِّيَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ رض
مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا قَالَ فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ رض يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذٰلِكَ لَمَقْرُوْنٌ بِوَصِيَّتِهِ فَقَالَ
كَانَ فِيْهَا .... وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ إِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا شَاتَانِ
إِلٰى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا ثَلَاثٌ إِلٰى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتّٰى
تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَكَذٰلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ
بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ لَا تُؤْخَذُ
هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِّنَ الْغَنَمِ ۔ (ابو داؤد، مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) যাকাতের বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ইন্তেকালের পূর্বে তাঁহার কর্মচারীদের সম্মুখে পেশ করেন নাই। তাঁহার পর হযরত আবূ বকর (রা) উহা বাহির করিয়া তদানুযায়ী যাকাত আদায় করার কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর হযরত উমর (রা) উহা বাহির করিয়া তদানুযায়ী কাজ করেন। তিনি যখন শহীদ হন তখন উহা তাঁহার অসীয়তনামার সহিত নথি করা অবস্থায় পাওয়া যায়। উহাতে উটের যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার পর ছাগল সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ ছাগলের চল্লিশটির মধ্য হইতে একটি ছাগী যাকাত বাবদ গ্রহণ করা হইবে। একশ বিশটি ছাগল পর্যন্ত এই যাকাত। ইহার বেশী হইলে দুইটি ছাগল যাকাত বাবদ দিতে হইবে, ইহা দুইশতটি পর্যন্ত চলিবে। ইহার বেশী হইলে তিনটি দিতে হইবে। ইহা তিনশতটি পর্যন্ত চলিবে। ইহার বেশী হইলে চারশত না হওয়া পর্যন্ত কোন যাকাত নাই। ইহারও বেশী হইলে প্রতি একশত ছাগলে একটি করিয়া ছাগী দিতে হইবে। এইভাবে একত্রিত ছাগলগুলিকে যাকাত ফরয হওয়ার ভয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করা যাইবে না। দুই শরীকের মালিকানার ছাগলের উপর সমান প্রত্যাবর্তিত হইবে। যাকাত বাবদ অধিক বয়সের ছাগল গ্রহণ করা যাইবে না, দোষযুক্ত ছাগলেও নয়। —আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা উদ্ধৃত এই দীর্ঘ হাদীসটি রাসূলে করীম (স) কর্তৃক লিখিত যাকাতের বিরাট বিস্তারিত বিধানের একটা অংশ। উহা হইতে বিশেষ করিয়া উটের যাকাত সংক্রান্ত অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হয় নাই। কেননা উটের ব্যাপারটি এতদ্দেশীয় লোকদের জন্য কার্যত অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক। উহা এখানে উদ্ধৃত করিলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হইয়া যাইত।

উদ্ধৃত হাদীসাংশ হইতে ছাগলের যাকাত সংক্রান্ত কথা বিস্তারিত জানা গিয়াছে এবং উহা স্পষ্ট, ব্যাখ্যা অপ্রয়োজনীয়। তবে তিনশতটি ছাগল পর্যন্ত তিনটি ছাগী যাকাত বাবদ দেওয়ার কথা বলার পর চারশতটি না হওয়া পর্যন্ত কোনই যাকাত নাই, বলা হইয়াছে। ইহাই সর্বসাধারণ ফিকাহবিদের মত।

কিন্তু হাসান ইবনে সালেহ ও ইমাম আহমদের অপর একটি বর্ণনার বক্তব্য হইলঃ তিনশতটির উপর একটি হইলেই চারিটি ছাগী যাকাত দিতে হইবে।

হাদীসটির শেষাংশে যাকাত ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে লোকদের অনুসৃত একটি কৌশলের উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেরই মালিকানায় চল্লিশটি করিয়া ছাগল রহিয়াছে। তাহারা নিজ নিজ ছাগল একত্র করিয়া রাখিল এবং উহা সবই একজনার মালিকানায় দেখান হইল। তখন মোট সংখ্যা দাঁড়াইল ১২০টি। আর উহাতে মাত্র একটি ছাগী যাকাত দিতে হইবে। অথচ আলাদা থাকিলে প্রত্যেকটি ছাগল-সমষ্টি হইতে একটি করিয়া মোট তিনটি ছাগী দিতে হইত। অথবা দুই শরীকের মোট দুইশত একটি ছাগল রহিয়াছে। এই সংখ্যার দরুন দুইজনের উপর সামষ্টিকভাবে তিনটি ছাগী যাকাত বাবদ দেয়। তাহারা যদি উহা দুই ভাগে ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে মাত্র একটি করিয়া ছাগী যাকাত বাবদ দিতে বাধ্য হইবে। আর দুইজনার মিলিত সম্পদে একটি ছাগী বাঁচিয়া গেল। বস্তুত যাকাত ফাঁকি দেওয়ার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে ইহা একটি। তদানীন্তন আরব সমাজে যাকাত ফাঁকি দেওয়ার জন্য এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হইত। ইহা ঠিক সেইরূপ সামাজিক ব্যাধি, যেমন বর্তমানকালে বিভিন্ন দেশে সরকারকে দেয় আয়কর ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে চলিত আছে। -এই ক্ষেত্রেও অনুরূপ কৌশলই অবলম্বিত হইয়া থাকে। হাদীসটিতে এইরূপ করিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হইয়াছে।

ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন, মূল হাদীসের বাক্যাংশ 'যাকাত ফরয হওয়ার ভয়ে' কথাটি ছাগল-মালিক ও যাকাত আদায়কারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। ইহার অর্থ এই যে, যাকাত দেওয়া যাহার কর্তব্য, সে যেন যাকাতের পরিমাণ কম করা ও বেশী যাকাত দেওয়া হইতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে মূল পণ্য একত্রিত কিংবা বিচ্ছিন্ন না করে। অনুরূপভাবে যাকাত আদায়কারী (Collector) যেন যাকাতের পরিমাণ বাড়াইবার ও উহার পরিমাণ যাহাতে কম হইয়া না যায় সেই উদ্দেশ্যে না একত্রিত করিয়া হিসাব করিবে, না বিচ্ছিন্ন বিভক্ত করিয়া হিসাব করিবে। যাকাত আদায়কারীদের জন্যও রাসূলে করীম (স)-এর এইরূপ সাবধান বাণী উচ্চারিত হওয়ার একান্তই জরুরী ছিল।

এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ বলিয়াছেন, এক ব্যক্তির মালিকানার ছাগল যদি দুইট দূরবর্তী স্থানে থাকে, উভয় স্থানেই আলাদাভাবে যাকাত ফরয হওয়ার সংখ্যার কম ছাগল থাকে; কিন্তু এই দুই স্থানের ছাগল একত্রিত করিলে যাকাত ফরয হয়, এইরূপ অবস্থায় যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে এই দুই স্থানে ছাগল একত্র করিয়া গণনা করা যাইবে না। যদিও অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদের মত হইল, মূল মালিকের যাবতীয় সম্পদ-তাহা যেখানে যতটা থাকুক না কেন-একত্রিত করিয়াই যাকাতের হিসাব করিতে হইব। (بلوغ الاماني- فقه السنة)

যাকাত ফরয হওয়ার মেয়াদ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكٰوةَ عَلَيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهٖ - (ترمذى، بيهقى، دارقطنى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক কোন ধন-সম্পদ লাভ করিল, উহার মালিকের নিকট উহার পূর্ণ একটি বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে না।

—তিরমিযী, বায়হাকী, দারে কুতনী

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে জানা গেল যে, কোন ধন-সম্পদের মালিক হইলেই অনতিবিলম্বে যাকাত দিতে হইবে, এমন কথা শরীয়তে নাই। যাকাত ফরয হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হইল, ঠিক যে সময় সম্পদের মালিকানা লাভ হইল, সেই সময় হইতে পূর্ণ একটি বৎসরকাল উহার মালিকানা সেই মালিকের নিকটই থাকিতে হইবে। এইভাবে যদি একটি বৎসর অতিক্রান্ত হয়, তাহা হইলেই উহার যাকাত দিতে হইবে। কোন সম্পদের মালিকানার বয়স পূর্ণ এক বৎসর না হইলে উহার উপর যাকাত ফরয হইবে না।

'এক বৎসরকাল অতিবাহিত হওয়া' পর্যায়ে চারিটি মাযহাবের বক্তব্য এখানে উল্লেখ্য।

হানাফী মাযহাবে বৎসরের শুরু ও শেষে যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ কিংবা উহার বেশী মাল-সম্পদ বর্তমান থাকা আবশ্যক। বৎসরের মধ্যখানে নিসাব পরিমাণেরও কম হইয়া গেলে তাহা ধর্তব্য হইবে না। কোন মাল-সম্পদ যদি বৎসরের শুরুতে নিসাব পরিমাণ থাকে, পরে সারাটি বৎসরই তদ্রূপ থাকে, তবে উহাতে যাকাত অবশ্যই ধার্য হইবে। উহার পরিমাণ বৎসরের কোন এক সময় যদি কম হইয়া যায়, আর বৎসরের শেষে উহা পুনরায় নিসাব পরিমাণ হইয়া যায়, তবে তাহাতেও যাকাত দিতে হইবে। কিন্তু বৎসরের শেষ পর্যন্ত যদি উহার পরিমাণ নিসাব হইতে কম হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে উহাতে যাকাত ফরয হইবে না।

মালিকী মাযহাবেরও ইহাই মত। কোন মাল যদি বৎসরের শুরুতে কম পরিমাণ থাকে; কিন্তু বৎসরের মধ্যে মুনাফার দরুন পূর্ণ পরিমাণ হইয়া যায় এবং বৎসরের শেষ পর্যন্ত তাহাই থাকে, তাহা হইলে উহাতে যাকাত ফরয হইবে।

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে সারাটি বৎসর পূর্ণ নিসাব পরিমাণ সম্পদ সমানভাবে বর্তমান থাকা যাকাত ফরয হওয়ার জন্য জরুরী। কোন সম্পদ যদি বৎসরের শুরুতে হিসাবের কম পরিমাণ থাকে, আর বৎসরের শেষে উহা পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে যে দিন হইতে নিসাব পরিমাণ পূর্ণ হইল, সেই দিন হইতে পূর্ণ একটি বৎসর এই অবস্থায় অতিবাহিত হইতে হইবে।

(فقه السنة - الفقه على المذاهب الاربعة -)

বৎসরকালের মধ্যে অর্জিত হওয়া সম্পদের দুইটি অবস্থা হইতে পারে। একটি, পূর্বসঞ্চিত সম্পদের সমজাতীয় সম্পদ। দুই, পূর্ব সঞ্চিত সম্পদ হইতে ভিন্ন জাতীয়। দ্বিতীয় অবস্থায় উভয় সম্পদকে একত্রিত করিয়া যাকাতের হিসাব করা হইবে না। প্রথম অবস্থার সম্পদ দুই রকমের হইতে পারে। হয় উহা মূল সম্পদ বা ধন হইতেই লব্ধ হইয়াছে, যেমন ব্যবসায়ে মুনাফা বা পশুর বাচ্চা। বৎসরের শেষে উহাকে মূল সম্পদের সহিত একত্রিত করিয়াই হিসাব করিতে হইবে এবং যাকাত দিতে হইবে। এই দুইটি কথায় কোনই মতভেদ নাই। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, বৎসরের পূর্ণ সময়ের মধ্যে পাওয়া মাল-সম্পদ উত্তরাধিকার কিংবা হেবা বা ক্রয় ইত্যাদি উপায়ে লব্ধ হইবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে বৎসর শেষে এইসব সম্পদের একত্রে হিসাব করিয়া যাকাত দিতে হইবে।

কিন্তু ইমাম মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বল একত্র করিয়া যাকাতের হিসাবে না করার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(تحفة الاحوذى - فقه السنة)

যাকাত আদায় করার পরও আর্থিক দায়িত্ব

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكٰوةِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ . . . اَلْاٰيَة -

(ترمذى، ابن ماجه، دارمى، نسائى)

হযরত ফাতিমা বিনতে কাইস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও 'হক' রহিয়াছে। অতঃপর তিনি সূরা বাকারার আয়াত পাঠ করিলেনঃ তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিমে ফিরাইবে ইহাই কোন নেক কাজ নয় – –

—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ,দারেমী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা হাদীসটি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, যাকাত দেওয়াই ধনশালী ব্যক্তির একমাত্র অর্থনৈতিক দায়িত্ব নয়। এমন নয় যে, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া যাকাত দিয়া দেওয়ার পর অন্য কোন কিছুর জন্য আর এক পয়সাও ব্যয় করিতে হইবে না। বরং এই হাদীসটির দৃষ্টিতে যাকাত আদায় করার পরও ধনীকে অনেক অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করিতে হয়। এই কথায় সন্দেহ নাই যে, একটি দেশে সকল ধনশালী ব্যক্তি হিসাব করিয়া যাকাত দিলে এবং উহা দেশের দরিদ্র জনগণের মধ্যে সঠিকভাবে বন্টন করা হইলে অর্থনৈতিক অভাব অনটন অনেকাংশ দূর হইয়া যাইবে ও সর্বহারা লোকেরা আর্থিক নির্ভরতা পাইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে কিংবা জাতীয়—রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এমন হাজারো প্রয়োজন দেখা দিতে পারে যখন দেশের ধনী লোকদিগকে উম্মুক্ত হস্তে অর্থদান করিতে হইবে। তখন এই কথা বলার অধিকার কাহারো থাকিতে পারে না যে, 'আমি তো যাকাত দিয়াছি, আমি আর কিছুই দিতে পারিব না।'

নবী করীম (স) তাঁহার এই কথাটির সমর্থনে সূরা আল—বাকারার যে আয়াতটি পাঠ করিয়াছেন, তাহার পূর্ণ রূপ এইঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ - (البقرة: ١٧٧)

তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখমণ্ডল ফিরাইবে-ইহাই আসল পূণ্য কাজ নয়। বরং আসল পূর্ণবান হইল সেই লোক যে ঈমান আনিল আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং ধন-মালের মায়া থাকা সত্ত্বেও তাহা দিবে নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক, প্রার্থী ও ক্রীতদাসদিগকে। আর নামায কায়েম করিবে ও যাকাত আদায় করিবে। —

এই দীর্ঘ আয়াতের শেষদিকে একসঙ্গে নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করার কথা বলা হইয়াছে। আর ইহার পূর্বে আয়াতের শুরুতে—আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক, প্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য অর্থদানের কথা বলা হইয়াছে। এই অর্থ দান যে ফরয যাকাতের বাহিরের কর্তব্য এবং সেই কর্তব্য মূল ঈমানের সহিত সম্পৃক্ত, তাহা অতীব স্পষ্ট। আর ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ধন-সম্পদে যাকাত আদায় করার পরও অভাবগ্রস্ত জনগণের অধিকার রহিয়াছে এবং সেই অধিকার প্রত্যেক ঈমানদার ধনশালী ব্যক্তিকে অবশ্যই আদায় করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আল্লাহ্র বাণীঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ - এবং ধন-মাল দিল তাঁহার ভালোবাসায়।

ইহার একটি অর্থঃ ধন-মালের মায়া থাকা সত্ত্বেও তাহা দিবে। আর দ্বিতীয় অর্থঃ দিবে আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা পোষণ করিয়া। ইহা যাকাতের বাহিরের জিনিস। অতএব, উপরোদ্ধৃত হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা থাকিলেও ইহা যে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা এবং অকাট্য তাহাতে কোনই মতভেদ নাই। আল্লামা তায়্যিবী এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ হক ও অধিকার দুই প্রকারের। একটি, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা নিজে ধার্য করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি, ধনশালী ব্যক্তি স্বীয় আত্মার পবিত্রতা লাভ ও প্রকৃতিগত কার্পণ্যের আবর্জনা হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে নিজের উপর চাপাইয়া লয়। এই দান সেই পর্যায়ের। (تفسير القرطبي - تحفة الاحوذى)

ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰى اَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ بِقَدَرِ الَّذِىْ يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يَّجْهَدَ الْفُقَرَاءُ اِذَا جَاعُوْا اَوْعَرُوْا اِلَّا بِمَا يَصْنَعُ اَغْنِيَاؤُهُمْ اَلَا وَاِنَّ اللّٰهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا - (الطبرانى فى الصغير والاوسط)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান ধনী লোকদের ধন-মাল হইতে এমন পরিমাণ দিয়া দেওয়া ফরয করিয়া দিয়াছেন, যাহা তাহাদের গরীব-ফকীরদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হইতে পারে। ফলে ফকীর গরীবরা যে ক্ষুধার্ত কিংবা উলঙ্গ থাকিয়া কষ্ট পায় তাহার মূলে ধনী লোকদের আচরণ ছাড়া অন্য কোন কারণই থাকিতে পারে না। এই বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। নিশ্চয়ই জানিও, আল্লাহ্ তা'আলা এই লোকদের খুব শক্তভাবে হিসাবে গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদিগকে তীব্র পীড়াদায়ক আযাব দিবেন। —তাবারানী আস-সগীর ও আল্-আওসাত

ব্যাখ্যা হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত এই হাদীসটি সহীহ্ সনদে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মূল কথা, গরীব লোকদের অভুক্ত ও বস্ত্রহীন হইয়া থাকার জন্য ধনী লোকরাই দায়ী। কেননা ধনী

লোকরা যদি তাহাদের ধন–সম্পদে গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ দিয়া দিত, তাহা হইলে গরীবদিগকে খাওয়া–পরার অভাবে কোনরূপ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইত না।

ধনী লোকেরা সাধারণত মনে করে তাহাদের ধন–সম্পদ কেবলমাত্র তাহাদেরই ভোগ ব্যবহার ও যথেচ্ছ ব্যয় বিনিয়োগের জন্য। তাহাতে অন্য কাহারো কোন অধিকার নাই। এইরূপ মনোবৃত্তি ইসলামের সামাজিক অর্থনীতিক দর্শনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুল ও মারাত্মক। ইহা আগাগোড়া পূঁজিবাদী দৃষ্টিভংগী। আর ইসলামে ইহা সর্বাধিক ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত। ইসলামের ঘোষণা হইল—আল্লাহ্‌তা'আলা এই দুনিয়ায় যত মানুষ—যত জীব সৃষ্টি করেন, তাহার রিযুক—খাওয়া পরা ইত্যাদি পূরণের সুব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে তিনিই কার্যকর করেন। সাধারণভাবে এই দুনিয়ায় খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবজনিত কোন সমস্যা থাকিতে পারে, ইসলাম তাহা স্বীকার করে না। ইসলামের কথা হইল, একজনের কিছুই না থাকিতে পারে; কিন্তু অনেক বেশী পরিমাণে আছে এমন লোক তাহারই আশেপাশে রহিয়াছে অনেকজন। অতএব যাহার আছে, সে প্রয়োজন পরিমাণ যাহার নাই, তাহাকে দিবে। অনুরূপভাবে একটি ভূখণ্ডে কোনরূপ অভাব দেখা দিতে পারে—বণ্যা, প্রচণ্ড খরা, পোঁকায় কাটা ইত্যাদি কারণে। ইহা কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু উদার ব্যাপক দৃষ্টিতে তাকাইলে দেখা যাইবে, দুনিয়ার বহু কয়টি দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক বেশী পরিমাণ ফসল জন্মিয়াছে। তখন এই দেশগুলির কর্তব্য, অভাবগ্রস্ত দেশগুলির অভাব মিটে—এমন পরিমাণ শস্য সাহায্য বাবদ কিংবা মূল্যের বিনিময়ে দেওয়া। —যদি না দেয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সকল লোককে সেই জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কঠিন জওয়াবদিহির সম্মুখীন হইতে হইবে। কেননা আল্লাহ্‌ তো কোন না কোন ভাবে দুনিয়ার মানুষের প্রয়োজন পূরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন লোক, কোন পরিবার বা কোন দেশ খাওয়া–পরার অভাবে কষ্ট পায়, তবে সেইজন্য এই সম্পদশালী দেশ বা লোকেরাই দায়ী। এই লোকদের বা দেশগুলির কার্পণ্যের কারণেই লোকেরা এই কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই ধনী ও সচ্ছল অবস্থার লোকেরা যদি তাহাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিত, যদি বুঝিত যে, তাহাদের সম্পদে গরীব–ফকীরদের অংশ রহিয়াছে এবং সে অংশ আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্দিষ্ট, তাহা হইলে গরীব লোকেরা কস্মিনকালেও এই কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হইত না। (بلوغ الامانى)

যাকাত বায়তুলমালে দিতে হইবে

عن انس بن مالك رضـ انه قال اتى رجل من بنى تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى ذو مال كثير و ذو اهل وولد وحاضرة فاخبرنى كيف انفق وكيف اصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكوة من مالك فانها طهرة تطهرك وتصل اقرباءك و تعرف حق السائل والجار والمسكين فقال يا رسول الله اقلل لى قال فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا قال حسبى يا رسول الله اذا اديت الزكوة الى

رَسُوْلِكَ فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ اِذَا اَدَّيْتَهَا اِلٰى رَسُوْلِىْ فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا فَلَكَ اَجْرُهَا اِثْمُهَا عَلٰى مَنْ بَدَّلَهَا - (مسند احمد، الطبرانى فى الكبير)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, বনু তামীম গোত্রের একজন লোক রাসূলে করীম (স)-এর কিনট উপস্থিত হইল এবং বলিলঃ ইয়া রাসূল! আমি বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী লোক। আমার পরিবার-পরিজন রহিয়াছে। আর আমার বাড়ীতে যথেষ্ট মেহমান আসে। এরূপ অবস্থায় আমাকে বলুন আমি ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যয় করিব এবং কিভাবে কাজ করিব? জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তোমার ধন-মালের যাকাত অবশ্যই দিবে। কেননা এই যাকাত ধন-মালের পবিত্রতাকারী, ইহা তোমাকে রক্ষা ও পবিত্র করিবে। আর তোমার নিকট সম্পর্কের লোকদের সহিত 'ছিলায়ে রেহ্‌মী' করিবে। প্রার্থী, প্রতিবেশী ও মিস্‌কীনের অধিকার অবশ্যই চিনিবে। লোকটি বলিল; ইয়া রাসূল! আমার জন্য স্বল্প করুন। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ অতঃপর নিকটাত্মীয়ের, মিস্‌কীন ও পথিকের হক তাহাকে দিয়া দাও। আর বেহুদা খরচ করিও না। লোকটি বলিলঃ ইয়া রাসূল! আমি যদি আপনার প্রতিনিধির নিকট যাকাত আদায় করিয়া দেই, তাহা হইলে আমি এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের নিকট দায়িত্বমুক্ত হইতে পারিব কি? ইহাই কি আমার জন্য যথেষ্ট হইবে? জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ হ্যাঁ, তুমি যদি আমার প্রতিনিধির নিকট যাকাত আদায় করিয়া দাও, তাহা হইলে তুমি ইহা হইতে দায়িত্বমুক্ত হইয়া যাইবে। অতঃপর তুমি উহার শুভ প্রতিফল পাইবে। যে লোক উহার ক্ষেত্র পরিবর্তন করিবে, উহার গুনাহ তাহারই উপর বর্তিবে।

—মুসনাদে আহ্‌মদ, তাবারানী

ব্যাখ্যা বিপুল অর্থ-সম্পদশালী একজন মুসলমান কিভাবে আল্লাহ্‌র হক আদায় করিবে এবং পরিবারবর্গের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করিবে তাহা জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়। কেননা ইহা জানিয়া লওয়া তাহার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। ইহা কর্তব্য সর্বকালের এবং সব ধনী ব্যক্তিরই। কেননা মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করিতে হইলে এই সর্ববিধ দায়িত্ব পালন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিতে পারে না। জওয়াবে নবী করীম (স) তাহাকে একদিকে যাকাত আদায় করিতে বলিলেন এবং অপদিকে পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়দের সহিত 'ছিলায়ে রেহমী' রক্ষা করিতে ও সমাজের বিভিন্ন লোকদের, প্রতিবেশীর সাহায্য প্রার্থীর ও মিসকীনের হক জানিতে ও তাহা রীতিমত আদায় করিতে বলিলেন। 'ছিলায়ে রেহ্‌মী' ইসলামের একটা বিশেষ পরিভাষা। 'রিহম' অর্থ রক্ত সম্পর্ক। অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কের দিক দিয়া যে সব লোকের সহিত সম্পর্ক অর্পিত হয়, তাহা জন্মগত সম্পর্ক। এই সম্পর্ক আপনা আপনিই স্থাপিত হয়। ইহা কাহারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এই সম্পর্ককে একটা প্রাথমিক ও মৌল ভিত্তি হিসাবে গণ্য করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা অবশ্য কর্তব্য করিয়া দিয়াছেন। ইসলামী পরিষাভায় ইহাকেই বলা হয় 'ছিলায়ে রেহ্‌মী' রক্ষা করা।

লোকটি রাসূলে করীম (স)-এর জওয়াব শুনিয়া বলিলঃ ইয়া রাসূল, আমার জন্য 'স্বল্প' করুন। 'স্বল্প' করার কথা দ্বারা লোকটি কি বুঝাতে চাহিয়াছিল? দায়িত্ব ও উহার প্রসারতা কমাইয়া দিতে

তো বলিতে পারে না। কেননা রাসূলে করীম (স) তো প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বাড়াইয়া অতিরিক্ত বোঝা চাপাইয়া দেন নাই। এরূপ ধারণা করাও যায় না। কাজেই এই কথার অর্থ হইবে।

لَعَلَّهُ يُرِيدُ تَقْلِيلَ اللَّفْظِ -

সম্ভবত লোকটি রাসূলে করীম (স)-কে স্বল্প কথায় সমস্ত কিছু বুঝাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। রাসূলে করীম (স) ইহার জওয়াবে যাহা বলিয়াছেন তাহা মূলত কুরআন মজীদের একটি আয়াতের অংশ। আয়াতটি হইল সূরা বনী ইসরাঈলের ২৬ নম্বরের আয়াত। এই আয়াতে মূলত সেই কথাই বলা হইয়াছে, যাহা তিনি প্রথম বলিয়াছিলেন। এই জওয়াব শুনিয়া লোকটি এই বিষয়ে আর কোন কথা বলিল না। মনে হইতেছে, লোকটি রাসূলে করীম (স)-এর মুখে কুরআনের আয়াত শুনিয়া বুঝিল, ইহা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। আর তাহাতে কোন কিছু কম করার তো প্রশ্ন উঠে না। লোকটি সম্ভবত এই রকম স্বল্প কথায় বেশী তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যই শুনিতে চাহিয়াছিল।

বস্তুত কেবলমাত্র যাকাত আদায় করিলেই যে অর্থশালী ব্যক্তির আর্থিক দায়িত্ব আদায় হইয়া যায় না, ইহার পরও তাহার উপর একদিকে নিকট আত্মীয়দের প্রতি এবং অপরদিকে সমাজের অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রতি কঠিন দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা এই হাদীস হইতেও নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে।

পরবর্তী পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) ও লোকটির মাঝে যে কথোপকথন হইয়াছে, তাহা হইতে তিনটি কথা অকাট্যভাবে জানা যাইতেছে। একটি এই, রাষ্ট্র প্রধানকে দেশের ধনী ও অর্থশালী লোকদের নিকট হইতে রীতিমত যাকাত আদায় করার স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহারা যাকাত আদায়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে জনগণের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবে ও বায়তুল মালে জমা দিবে। দ্বিতীয় কথা, জনগণ এই রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের হস্তে যাকাত-সম্পদ ন্যস্ত করিবে। তাহা করিলেই বুঝিতে হইবে, যাকাত দেওয়া হইয়াছে, ফরয আদায় হইয়াছে। অতঃপর এই ব্যাপারে তাহাদের আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। রাসূলে করীম (স) ও খিলাফতে রাশেদার আমলে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। জনগণ এইভাবেই যাকাত আদায় করিত। বস্তুত যাকাত আদায়ের ইহাই ইসলামী নিয়ম।

তৃতীয় কথা এই যে, সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে যাকাত আদায়কারী লোকদের কর্তব্য হইল, যাকাত জনগণের নিকট হইতে আদায় করার পর উহা যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা করিয়া দেওয়া। যদি কোন সরকারী আদায়কারী তাহা না করে আত্মসাৎ করে কিংবা অন্য খাতে ব্যয় করে, তাহা হইলে এইরূপ করার জন্য সেই কর্মচারীই দায়ী হইবে। সেইজন্য তাহাকে পাপের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কেননা এইরূপ করার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না। যাকাতদাতা ব্যক্তিদের সেইজন্য কোন দায়িত্ব নাই। তাহাদের কোন ভাবনা চিন্তারও কারণ নাই। (بلوغ الامانى)

হজ্জ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ـ (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌রই জন্য হজ্জ করিল এবং এই সময়ের মধ্যে স্ত্রী সহবাস ও কোনরূপ ফাসিকী কাজ করিল না, সে তাহার মা কর্তৃক ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতই হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। 'হজ্জ' শব্দের অর্থ اَلْقَصْدُ। 'কোন বিষয়ের বা কাজের ইচ্ছা বা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ।' খলীল বলিয়াছেনঃ 'হজ্জ' অর্থ;

كَثْرَةُ الْقَصْدِ اِلٰى مُعَظَّمٍ ـ

কোন মহৎ বিরাট কাজের বারবার ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করা।

আযহারী বলিয়াছেনঃ হজ্জ অর্থ 'কোন স্থানে একবারের পর দ্বিতীয়বার আসা।' এই কারণে মক্কা গমনকে حَجُّ الْبَيْتِ আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ বলা হয়।

لِاَنَّ النَّاسَ يَأْتُوْنَهُ كُلَّ سَنَةٍ ـ

কেননা জনগণ প্রত্যেক বৎসর আল্লাহ্‌র ঘরে আসে।

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায়ঃ

اَلْحَجُّ قَصْدٌ اِلٰى زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ بِاَفْعَالٍ مَّخْصُوْصَةٍ ـ

আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ ও নির্দিষ্ট কাজ সহকারে মহান ঘরের যিয়ারতের সংকল্প করাই হইল হজ্জ।

বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ

اَلْحَجُّ قَصْدُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ عَلٰى وَجْهِ التَّعْظِيْمِ ـ

আল্লাহ্‌র ঘরের সম্মান ও মহানত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে উহার যিয়ারতের সংকল্প করাই 'হজ্জ'।

কিরমানী লিখিয়াছেনঃ

اَلْحَجُّ قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُّسُكِ بِمُلَابَسَةِ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ ـ

কা'বা ঘরের অনুষ্ঠানাদি পালন ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের উদ্দেশ্যে তথায় গমন করাই হজ্জ।

কুরআন মজীদের যে আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ (ال عمران:٩٧)

আল্লাহ্‌রই জন্য লোকদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করা— সেই লোকের, যাহার সেই পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ্য আছে।

এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত যাতায়াত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়, সুযোগ-সুবিধা ও শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপর হজ্জ করা ফরয। নবী করীম (স)-ও হজ্জ ফরয হওয়ার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে হজ্জ একটি। এই সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ১৬ জন সাহাবী কর্তৃক অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে ও বলিষ্ঠ ভাষায় বর্ণিত ও হাদীসের গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সব কয়টি হাদীসে ইসলামের পঞ্চম 'রুকন' বলা হইয়াছে এই ভাষায়ঃ

وَحِجُّ الْبَيْتِ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ـ

আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ—যদি তথায় যাতায়াতের সামর্থ্য তোমার থাকে।

এই 'আল্লাহ্‌র ঘরই' হজ্জ ফরয হওয়ার কারণ। আর আল্লাহ্‌র ঘর 'কা'বা শরীফ' মাত্র একটি। এইজন্য হজ্জ জীবনে মাত্র একবারই ফরয। জীবনে একাধিকবার হজ্জ করা ফরয নয়। যে লোক 'হজ্জ' করে তাহাকে বলা হয় اَلْحَاجُّ 'আলহাজ্জ'—'হাজী'। কিন্তু ইহা কোন পদবী বা উপাধি নয়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, হজ্জ হিজরতের পূর্বেই ফরয হইয়াছে কিন্তু ইহা সর্বজনগ্রাহ্য কথা নয়। ইমাম কুরতুবী বলিয়াছেন, হজ্জ ফরয হইয়াছে হিজরতের পঞ্চম বৎসর। অধিকাংশ লোকের মত হইল, হজ্জ ফরয হইয়াছে ষষ্ঠ হিজরী সনে। কেননা এই সনেই কুরআনের আয়াতঃ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ـ আল্লাহ্‌রই জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন কর। নাযিল হইয়াছে।

(عمدة القارى - تحفة الاحوذى)

কিন্তু নবম হিজরী সনে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা অধিক সত্য। আল্লামা মা-ওয়ার্দী বলিয়াছেন, অষ্টম হিজরী সনে হজ্জ ফরয হইয়াছে।

হাদীসে উদ্ধৃত শব্দ فَلَمْ يَرْفُثْ (স্ত্রী সঙ্গম করে নাই) এবং وَلَمْ يَفْسُقْ (ফাসিকী করে নাই) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'রফস' বলিতে স্ত্রী সহবাস বুঝায়। বলা হইয়াছেঃ

اَلرَّفَثُ اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يُرِيْدُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ ـ (فتح البارى ج ٣، ص ٣٠٢)

পুরুষ স্ত্রীর নিকট হইতে যাহা কিছু পাইতে চায়, তাহার সবকিছুকেই 'রফস' বলা হয়।

আল্লামা বায়যাভী লিখিয়াছেনঃ

هُوَ الْاِفْضَاحُ بِمَا يَجِبُ اَنْ يُّكَنِّىَ عَنْهُ ـ

যাহা ইশারায় বলা দরকার তাহা প্রকাশ্যে বলাকেই 'রফস' বলে।

আর ইবনে সাইয়েদাহ্ বলিয়াছেন الرفث الجماع 'রফস' শব্দের অর্থ স্ত্রী সঙ্গম। আর 'ফিসক' অর্থ العصيان নাফরমানী ও গুনাহের কাজ এবং

اَلتَّرْكُ لِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْخُرُوْجُ عَنْ طَرِيْقِ الْحَقِّ ـ

আল্লাহ্র আদেশ ছাড়িয়া দেওয়া ও সত্যের পথ পরিহার করা।

কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ـ (البقرة: ١٩٧)

হজ্জে স্ত্রী সহবাস, গুনাহের কাজ ও ঝগড়া-বিবাদের কোন অবকাশ নাই।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ ব্যাপদেশে স্ত্রী সহবাস করে নাই এবং কোন গুনাহের কাজও করে নাই, তাহার সম্পর্কেই রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন যে, সে সদ্যজাত শিশুর মতই নিষ্পাপ হইল। কথাটি দৃষ্টান্তমূলক। মা এই মাত্র যে সন্তান প্রসব করিল, সে একান্তই নিষ্পাপ ও নির্মল। আর যে ব্যক্তি স্ত্রী সঙ্গম পরিহার ও সকল প্রকার গুনাহ বিমুক্ত হইয়া হজ্জ করিতে পারিল, সেও সেই সদ্যজাত শিশুর মতই নিষ্পাপ ও নির্দোষ হইল। তাহার সগীরা-কবীরা সব রকমের গুনাহ্ই মাফ হইয়া গেল।

(عمدة القارى ـ تحفة الفقهاء)

একটি হজ্জ ফরয

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ رض فَقَالَ اَفِىْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ

لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيْعُوْا وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ -

(ترمذی، مسند احمد، نسائی، دارمی)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ হে লোকগণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরয করিয়াছেন। তখন আক্‌রা ইবনে হাবিস দাঁড়াইয়া বলিলেনঃ হে রাসূল। প্রত্যেক বৎসরই কি হজ্জ করা ফরয?— নবী করীম (স) বলিলেনঃ আমি যদি ইহার জওয়াবে 'হাঁ' বলি, তবে তাহাই ওয়াজিব হইয়া যাইবে, আর যদি তাহা ওয়াজিব হইয়া যাইত, তবে তোমরা তদানুযায়ী আমল করিতে না। আর তোমরা তাহা করিতে পারিতেও না। হজ্জ মূলত একবারই ফরয, যতি কেহ উহার অধিক করে, তবে তাহা নফল। —তিরমিযী, মুসনাদে আহ্‌মদ, নাসাযী, দারেমী

ব্যাখ্যা হাদীসে নবী করীম (স)-এর একটি ভাষণের উল্লেখ করা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীসে 'হে লোকগণ' —রাসূলের এই সম্বোধনই এই কথা প্রমাণ করে। অবশ্য হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এই বিষয়েরই অপর একটি হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছেঃ

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূলে করীম (স) ভাষণ দান করিলেন।

মুসনাদে আহমদ-এ উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত এই হাদীসের শরুতেও এই কথার উল্লেখ আছে।

হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীসে এই প্রসঙ্গে আরও তথ্য লাভ করা যায়। তাহা এই যে, যখন কুরআন মজীদের আয়াতঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا -

আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করা সেই লোকদের উপর কর্তব্য, যাহারা তথায় যাওয়া-আসার সামর্থ্য রাখে।

নাযিল হয়, তখন নবী করীম (স) এই ভাষণ প্রদান করেন। কুরআন হইতে মোটামুটিভাবে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করা—তথায় যাওয়া-আসার শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিই ফরয। কিন্তু ইহা জীবনের কয়বার আদায় করিতে হইবে, কিংবা জীবনে মাত্র একবার হজ্জ আদায় করিলেই দায়িত্ব পালন করা যাইবে কিনা, তাহা কুরআনের আয়াত হইতে জানা যায় না। আলোচ্য হাদীস হইতে এই সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে,হজ্জ জীবনে একবার আদায় করাই ফরয। একবার ফরয আদায় করার পরও যদি কেহ হজ্জ করে তবে তাহা নফল হইবে এবং তাহাতে নফল হজ্জ পালনেরই সওয়াব পাওয়া যাইবে। বস্তুত হাদীস যে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী, কুরআনের হুকুম বাস্তবায়নের পথ-নির্দেশ করে হাদীস, ইহা হইতে তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

হযরত আকরাম মনে এই সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিয়াছিল। সেইজন্যই তিনি রাসূলের কথা শোনার পরই প্রশ্নটি পেশ করিয়াছিলেন। অন্য হাদীসের বর্ণনা মতে নবী করীম (স) প্রশ্নটির জওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই দেন নাই। বরং তিনি চুপ করিয়াছিলেন। রাসূলের প্রথম চুপ থাকার তাৎপর্য ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে,

তিনি এইখানে এই প্রশ্ন করাকে মোটেই পছন্দ করিতে পারেন নাই বলিয়া এই ধরনের ক্ষেত্রে চুপ থাকাই শ্রেয়। অন্য কথায় অধিক শরীয়াতী দায়িত্ব চাপিয়া বসার আশংকা রহিয়াছে। পূর্বেও কয়েকবার এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে, নবী করীম (স) তহা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু নবী করীম (স) যেহেতু দুনিয়ায় শরীয়াতের জরুরী জ্ঞান বিস্তারের দায়িত্ব লইয়া আসিয়াছেন, এইজন্য তিনি বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রশ্নকারী যখন একবার দুইবার তিনবার প্রশ্নটি উথাপন করিল, তখন নবী করীম (স) বলিলেন, উহার উত্তরে আমি 'হ্যা' বলিলে প্রত্যেক বৎসরই হজ্জ করা ফরয হইয়া পড়িত। মনে হয়, প্রত্যেক বৎসরই হজ্জ করা হইবে, না এক বছর করিলেই একজনের সারা জীবনের কর্তব্য পালন হইয়া যাইবে, সে সম্পর্কে ফয়সালা করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র তরফ হইতে রাসূলে করীমের উপর অর্পিত হইয়াছিল। এইজন্য তিনি জওয়াবে বলিয়াছেন যে, 'আমি হ্যাঁ' বলিলেই তাহা ওয়াজিব হইয়া যাইত; কিন্তু তোমরা তাহা করিবে না; করিতে পারিবে না। তাই জীবনে একবার হজ্জ করাকেই ফরয করা হইয়াছে।

হজ্জ ও উমরার গুরুত্ব

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةَ - (ترمذى، ابوداؤد، مسند احمد، ابن خزيمة ، ابن حبان)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ তোমরা হজ্জ ও উমরা পর পর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর। কেননা এই দুইটি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ্-খাতা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়, যেমন রেত লৌহের মরিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের জঞ্জাল দূর করিয়া দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্জের সওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

ব্যাখ্যা নবী করীম (স)-এর এই বাণীতে হজ্জ এবং উমরা উভয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, উহার শাব্দিক অর্থ হইল 'হজ্জ ও উমরার' মধ্যে একটিকে অপরটির পরে পরে কর। অর্থাৎ এই দুইটি অনুষ্ঠান কাছাকাছি সময়ের মধ্যে পালন কর। ইহার দুইটি অবস্থা হয় 'হজ্জে কিরান' করিয়া এই আদেশ পালন কর, নয় একটির পর অন্যটি আদায় কর। তায়্যিবী বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটির অর্থ হইলঃ

اِذَا اعْتَمَرْتُمْ فَحُجُّوْا وَاِذَا حَجَجْتُمْ فَاعْتَمِرُوْا -

তোমরা যখন উমরা সমাপন করিলে তখন তোমরা হজ্জ করিও, আর যখন হজ্জ অনুষ্ঠান শেষ করিলে, তখন তোমরা অবশ্যই উমরা করিবে।

উমরা عمرة শব্দের অর্থ الزيارة 'সাক্ষাত বা দেখার জন্য উপস্থিত হওয়া'। আর শরীয়াতের পরিভাষায়ঃ

اَلْاِتْيَانُ بِالنُّسُكِ الْمَعْرُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ الثَّابِتَةِ -

পরিচিত সুনির্দিষ্ট কতকগুলি অনুষ্ঠান বিশেষ প্রমাণিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে পালন করা। — শওকানী

মুল্লা আল-কারী লিখিয়াছেনঃ শরীয়াতের পরিভাষায় والسعى قصدالطواف আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করা ও সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোর সংকল্প করিবার নাম উমরা।

হজ্জের জন্য সময় ও দিন তারিখ নির্দিষ্ট। সেই সময় ও দিন-তারিখ ছাড়া হজ্জ হয় না। কিন্তু উমরার জন্য কোন সময় বা দিন-তারিখ নির্দিষ্ট নাই। উহা সব সময় এবং যে কোন সময়ই হইতে পারে।

কেহ কেহ হজ্জের মাসে উমরা করা মাকরূহ মনে করেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কেননা স্বয়ং নবী করীম (স)-ও হজ্জের সময় ও মাসে উমরা করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রা) আরাফাতে অবস্থানের দিন উমরা করা মাকরূহ মনে করিয়াছেন মাত্র।

রাসূলে করীম (স)-এর উপরিউক্ত কথার কারণ তিনি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন। আর তাহা হইল, এই দুইটি (কাছাকাছি সময়ে সম্পাদন করা হইলে) দারিদ্র্য ও গুনাহ দূর করিয়া দেয়। দারিদ্র্য দুই প্রকারের। এক প্রকারের দারিদ্র্য বাহ্যিক অর্থে, অর্থাৎ ধন-সম্পদ না থাকা। আর দ্বিতীয় প্রকারের দারিদ্র্য প্রচ্ছন্ন। এই দারিদ্র্য মনের ও মানসিকতার। এই দারিদ্র্য দূর হওয়ার দুইটি অবস্থা। হয় অর্থ সম্পদ বা বিত্ত সম্পত্তি লাভ হইল, যাহার ফলে বাহ্যিক দারিদ্র্য দূরীভূত হইয়া গেল; কিংবা মন ও মানসিকতার দারিদ্র্য দূর হইয়া গেল। হৃদয় জ্ঞান ও চেতনায় সমৃদ্ধ হইল। আর গুনাহ-খাতা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার ব্যাপারটি 'সগীরা গুনাহ' পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

এই কথাটি বুঝাইবার জন্য নবী করীম (স) দৃষ্টান্তের ব্যবহার করিয়াছেন। লোহা বা স্বর্ণ-রৌপ্য অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে উহাতে ময়লা ধরিয়া যায়। 'রেত' দিয়া ঘষিলেই এই আবর্জনা দূর হইয়া ঝকঝকে তকতকে হইয়া উঠে। হজ্জ ও উমরা এক সময়ে করা হইলে মানুষের দারিদ্র্য ও গুনাহের জঞ্জাল মোচন করে ঠিক এইভাবেই। বস্তুত মানুষ মূলতই লৌহ বা স্বর্ণ রৌপ্যের ন্যায় স্বভাবজাত, নির্মল নিষ্কলুষ। বাহির হইতে উহার উপর আবর্জনা জন্মে এবং সে আবর্জনার তলে পড়িয়া উহার আসল সত্তা হারাইয়া যায়। আত্মপরিচয় বিস্মৃত হইয়া পড়ে। বস্তুজগতের প্রকৃত জিনিসের উপরে জমা আবর্জনা দূর করার জন্য যেমন ব্যবস্থা রহিয়াছে তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে পুঞ্জীভূত ময়লা আবর্জনা দূর করার জন্য হজ্জ ও উমরা যুক্তভাবে একটা অত্যন্ত শানিত হাতিয়ার।

'হজ্জে মাবরুর' বলিতে বুঝায়, যে হজ্জ আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হইয়াছে, কিংবা যে হজ্জ উদযাপন কালে এক বিন্দু গুনাহের স্পর্শও লাগে নাই, তাহাই 'হজ্জে মাবরুর'। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় এই শব্দটির বিভিন্ন অর্থ বা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু সব কথার সার একই। আর তাহা হইল যে হজ্জ পালনে যাবতীয় নিয়ম বিধান যথাযথভাবে পালন করা হইয়াছে। ফলে প্রত্যেকটি কাজ ঠিক সেই ভাবেই সম্পন্ন করা হইয়াছে যে ভাবে সম্পন্ন হওয়া আল্লাহ্‌র পছন্দ এবং তাঁহার সম্মতি ও সন্তোষের কারণ, তাহাই হজ্জে মাবরুর। ইমাম নববী বলিয়াছেনঃ

اَلَّذِىْ لَا يُخَالِطُهُ شَىْءٌ مِّنَ الْاِثْمِ -

হজ্জে মাবরুর তাহাই, যাহা করা কালে কোনরূপ গুনাহ করা হয় না।

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকন, ইহা ফরয। এই ব্যাপারে কোনই সন্দেহ বা মতবিরোধ নাই। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) হজ্জ ও উমরা পালনের নির্দেশ এক সঙ্গে দিয়াছেন। এই কারণে শরীয়াতে উমরার আসল মর্যাদা কি, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌র নির্দেশ উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ - (البقرة، ١٩٦)

তোমরা হজ্জ ও উমরা আল্লাহ্‌রই জন্য সম্পূর্ণরূপে পালন কর।

এই আয়াতের দৃষ্টিতে অনেকের মত হইল, উমরা হজ্জের মতই ওয়াজিব। কেননা এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন হজ্জ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে পালন করার নির্দেশ দিয়াছেন, তেমনি নির্দেশ দিয়াছেন উমরা পালন সম্পূর্ণ করার জন্য। ইমাম শাফেয়ী এই মত পোষণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলিতেনঃ

لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ اَحَدٌ اِلَّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا فَمَنْ زَادَ بَعْدَهَا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ - (دار قطنى)

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রত্যেক মানুষের—আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ্য যাহার আছে তাহার উপর হজ্জ ও উমরা করা ওয়াজিব, ইহা হইতে কেহই মুক্ত নয়। যদি কেহ উহা আদায় করার পর অতিরিক্ত কিছু করে, তবে তাহা তাহার নফল ইবাদত এবং অত্যন্ত কল্যাণময় কাজ।—দারে কুতনী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ

اَلْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ - (ترمذى) —উমরা করা ওয়াজিব।

হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيْضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِاَيِّهِمَا بَدَأْتَ -

হজ্জ ও উমরা উভয়ই ফরয। এই দুইটির যে কাজটিই তুমি প্রথমে কর করিতে পার তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি সাধিত হইবে না। —দারে কুতনী

অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, হযরত আব রুজাইন আল উকাইলী (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ আমার পিতা বয়োবৃদ্ধ, হজ্জ ও উমরা কিংবা বিদেশ সফর করিতে সক্ষম নহেন। তখন নবী করীম (স) বলিলেনঃ

حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ - তুমি তোমার পিতার তরফ হইতে হজ্জ ও উমরা কর।

ইহা ছিল নির্দেশ। তাই ইমাম আহমদ বলেনঃ

لَا اَعْلَمُ فِىْ اِيْجَابِ الْعُمْرَةِ حَدِيْثًا اَجْوَدَ مِنْ هٰذَا وَلَا اَصَحَّ مِنْهُ -

উমরা ওয়াজিব হওয়া পর্যায়ে ইহা হইতে উত্তম ও সহীহ সনদে বর্ণিত অন্য কোন হাদীস আমি জানি না।

ইমাম মালিক বলিতেনঃ

اَلْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَلَا نَعْلَمُ اَحَدًا اَرْخَصَ فِىْ تَرْكِهَا -

উমরাহ করা রাসূলে করীম (স)-এর নীতি। উহা তরক করিবার অনুমতি কেহ দিয়াছে, এমন কথা আমার জানা নাই।

ইমাম আবূ হানীফা (রা) উমরা করা হজ্জের মতই কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তবে তাঁহার মতে উমরা রাসূলে করীম (স)-এর প্রবর্তিত 'সুন্নাত' এবং প্রমাণিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই পর্যায়ে উল্লেখ্য হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্‌র একটি বর্ণনা। একটি লোক রাসূলে করিম (স)-কে নামায, যাকাত ও হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, واجب هو। এই কাজ কয়টি কি অবশ্য কর্তব্য? জওয়াবে নবী করীম (স) বলিলেনঃ 'হ্যাঁ'। পরে জিজ্ঞাসা করিল উম্‌রা সম্পর্কে, واجبة هى। উমরাহ করাও কি ওয়াজিব? জবাবে নবী করীম বলিলেনঃ

لَا وَاِنْ تَعْتَمِرْ خَيْرٌ لَّكَ -

উহা ঠিক ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য নয়। তবে তুমি যদি উমরা আদায় কর, তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য খুবই কল্যাণবহ হইবে।

যাহারা উমরা করাকে ওয়াজিব মনে করেন না, 'সুন্নাত' মনে করেন, উপরিউক্ত বর্ণনাটি তাঁহাদের দলীল। তাঁহাদের মতে কুরআনের উপরোদ্ধৃত আয়াত হইতে হজ্জের সঙ্গে সঙ্গে উমরা করাও ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কেননা উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'সম্পূর্ণ' করার নির্দেশ দিয়াছেন, উহা শুরু করিতে বলেন নাই। আর যে অ-ফরয ইবাদতে শুরু করা হইবে, তাহা 'সম্পূর্ণ' করাও যে শরীয়াত অনুযায়ীই ফরয, তাহা সর্ববাদীসম্মত কথা।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর একটি বর্ণনাঃ

اَلْحَجُّ فَرِيْضَةٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

হজ্জ ফরয এবং উমরা নফল।

ইমাম শাফেয়ীর মতে, হজ্জ জিহাদ পর্যায়ের কাজ এবং উমরা নফল মাত্র। —কিতাবুল উম্ম

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ তিনি বলিয়াছেনঃ

عَنْ عَلِىٍّ رض قَالَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ - (الشافعى)

প্রত্যেক মাসেই উমরা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ হজ্জের যেমন মাস ও সময় নির্দিষ্ট, উমরার জন্য তাহা নাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবী করীম (স)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী হজ্জ করার নিয়্যত করা ফরয, যেমন ইহ্‌রামের নিয়্যত করা ফরয। নবী করীম (স) কি ধরনের হজ্জ করিবেন, তাহার নিয়্যত যাত্রারম্ভ করার সময়ই করিয়া লইতেন ও লোকদিগকে তাহা করিতে নির্দেশ দিতেন। ইমাম শাফেয়ী

বলিয়াছেনঃ কেহ যদি 'তালবীয়া' পড়ে; কিন্তু হজ্জ বা উমরার নিয়্যত না করে, তাহা হইলে তাহার হজ্জও হইবে না, উমরাও হইবে না। আর যদি নিয়্যত করিয়া হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করে এবং তালবীয়া না করে, তবুও তাহার হজ্জ সম্পূর্ণ হইবে। রাসূলের মূলনীতি মূলক বাণী—'ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত'–ও ইহার একটি দলীল।

হজ্জ ও উমরা—রমযান মাসের উমরার সওয়াব

عَنْ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ ـ (مسند احمد)

হযরত আমের ইবনে রবায়াতা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ এক উমরা হইতে আর এক উমরা পর্যন্ত এই দুইটির মধ্যবর্তীকালের সমস্ত গুনাহ ও ভুলত্রুটির জন্য উহা কাফফারা। আর হজ্জে মাবরুর–এর একমাত্র প্রতিফল হইল জান্নাত।

—মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা এই হাদীসে হজ্জ ও উমরার সওয়াব স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। হাদীসের প্রথমাংশে উমরার সওয়াব ও কল্যাণ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সারকথা হইল, 'একটি উমরা হইতে আর একটি উমরা পর্যন্ত' যে সময়, এই সময়ে যত গুনাহ–খাতা হইবে, তাহা সবই ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। অবশ্য কেবলমাত্র সগীরা গুনাহই মাফ হইয়া যাইবে, কবীরা গুনাহ নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই অর্থের যে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে তাহা এইঃ

اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ يُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا ـ (ترمذى)

এক উমরা হইতে অপর উমরা পর্যন্ত মাঝখানে করা গুনাহ মাফ করাইয়া দেয়। (মাঝখানের সময় যত দীর্ঘই হউক না কোন এবং একটি উমরা করার পর যত দীর্ঘদিন বা কাল পরেই পরবর্তী উমরা করা হউক না কেন।)

হাদীসের প্রকাশ্য ভাষা হইতে বুঝা যায়, প্রথম উমরাটিই গুনাহ মাফ করায়। কেননা এই উমরা সম্পর্কেই হাদীসটিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় উমরা হইতে এই পর্যন্তকার সময়ে করা সব গুনাহ–খাতা মাফ করাইয়া দেয়। কেননা গুনাহ হওয়ার আগে উহার মাফ হওয়ার কথা অপ্রাসংগিক।

হজ্জ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ, হজ্জকালে যদি কোন গুনাহ করা না হয় এবং উহা যদি আল্লাহর নিকট কবুল হইয়া যায়, তাহা হইলে জান্নাতই উহার একমাত্র প্রতিফল। জান্নাত ছাড়া উহার সওয়াব স্বরূপ আর কিছু দেওয়া যাইতে পারে না। (এই বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে।)

সাধারণভাবে বৎসরের যে কোন সময়ে করা উমরা সম্পর্কে এই কথা। কিন্তু রমযান মাসে করা উমরা সম্পর্কে অশেষ সওয়াবের উল্লেখ হইয়াছে। কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা যাইতেছেঃ

আনসার কবীলার একজন মহিলা হজ্জ করিত (অবশ্য নফল হজ্জ, ফরয নয়) না পারায় নবী করীম (স) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

مَامَنَعَكِ اَنْ تَحُجِّيْ مَعَنَا الْعَامَ -

এই বৎসর আমার সহিত হজ্জে গমণ করিতে তোমাকে কোন জিনিস বাঁধা দিয়াছে?

মহিলাটি জিজ্ঞাসার জওয়াবে যানবাহন না পাওয়ার কথা বলিল। তখন নবী করীম (স) তাহাকে বলিলেনঃ

فَاِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِيْ فِيْهِ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً -

যখন রমযান মাস আসিবে, তখন তুমি উমরা করিও। কেননা রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমান মর্যাদাশীল হইয়া থাকে।

হযরত উম্মে মা'কাল আসিয়া রাসূলে করীম (স)–কে বলিলেনঃ আমরা উলটি দুর্বল হইয়া পড়ার কারণে আমি হজ্জে যাইতে পারি নাই। এখন আমি কি করিব? নবী করীম (স) বলিলেনঃ

اِعْتَمِرِيْ رَمَضَانَ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ -

আগামী রমযান মাসে তুমি উমরা করিবে। কেননা রমযান মাসের উমরা হজ্জের মতই।

অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, উম্মে মা'কাল বলিলেনঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِءُ عَنِّيْ مِنْ حَجَّتِيْ -

হে রাসূল! আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, রোগাক্রান্ত হইয়াছি। আমার জন্য এমন কোন আমল আছে কি, যাহা আমার হজ্জের বিকল্প হইতে পারে?

ইহার জওয়াবে রাসূলে করীম বলিলেনঃ

عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تُجْزِئُ لِحَجَّتِكِ -

রমযানের উমরা তোমার হজ্জের বিকল্প হইতে পারে।

ইহা অসম্ভব নয় যে, মহিলাটি স্বীয় বার্ধক্য ও রোগাক্রান্ততার কারণে আগামী বৎসরের হজ্জ করিতে না পারায় কিংবা আগামী হজ্জের পূর্বেই মৃত্যু হইয়া যাওয়ার আশংকা বোধ করিতেছিলেন। সেই কারণে পরবর্তী হজ্জ আসার পূর্বে ও উপস্থিত সময়ের মধ্যে উহার বিকল্প কাজ কি হইতে পারে তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। জওয়াবে নবী করীম (স) যাহা বলিয়াছেন, তাহা হয়ত এই আশংকার কথা বুঝিতে পারিয়াই বলিয়াছেন। অর্থাৎ বেচারী যদি হজ্জ না করিয়াই মারিয়া যায়, তাহা হইলে রমযান মাসে উমরাটা করিয়া যাইতে পারিলে অনেকটা দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে।

বস্তুত ইহা নবী করীম (স)–এর অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও আন্তরিক সহানুভূতিরই ফলশ্রুতি সন্দেহ নাই।

এইসব হাদীস হইতে রমযানে করা উমরার ফযীলত ও অসীম সওয়াবের কথা স্পষ্ট জানা যায়। ইহাতে হজ্জ ও উমরার মধ্যে তুলনামূলকভাবে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং 'রমযানের উমরা হজ্জের মতই' বলা হইয়াছে। এই পর্যায়ে প্রথম কথা এই হজ্জ নিশ্চয়ই ফরয হজ্জ নয়। কাহারও উপর হজ্জ

ফরয হইলে, সে হজ্জের পরিবর্তে উমরা করিলে তাহার ফরয আদায় হইবে না। ইহা 'দুইটি সাদৃশ্য সম্পন্ন জিনিসের একটির অপরটির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার' মত কথা মাত্র। কোন কোন দিক দিয়া সাদৃশ্য থাকিলেই এইরূপ কথা বলা চলে। সর্ববিষয়ে সাদৃশ্য থাকার প্রয়োজন করে না। বস্তুত হজ্জ ও উমরায় প্রায় একই প্রকারের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তবে উমরার তুলনায় হজ্জের কাজ ও ব্যস্ততা অনেক বেশী। অন্তত ইহ্রাম বাঁধা, আল্লাহ্র ঘরের তওয়াফ করা এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো—এই কয়টি কাজ একইভাবে উভয়ের ক্ষেত্রে করিতে হয়। ইহা মৌলিক সাদৃশ্য। রমযান মাসে উমরা পালন করা হইলে উহাতে হজ্জের সমান সওয়াব পাওয়া যাওয়া বিচিত্র কিছুই নয়। আল্লাহ্র দরবারে অভাবও নাই, সংকীর্ণতাও নাই। আর আল্লাহ্র রাসূল যখন বারবার ও বিভিন্ন লোককে এই কথাটি বলিয়াছেন, তখন ইহার তাৎপর্য ও যথার্থতা অবশ্যই অনস্বীকার্য। বিশেষত সময়ের মর্যাদার দরুন সেই সময়ে করা ইবাদতের মর্যাদা নির্ধারণ ইসলামের একটি বিশেষ নীতি। রমযান মাসে করা উমরা কিংবা নফল ইবাদতের সওয়াব যে অনেক বেশী পাওয়া যায়, তাহা হাদীস হইতেই প্রমাণিত। এতদ্ব্যতীত রমযান মাসে রোযা রাখা অবস্থায় উমরার অনুষ্ঠানাদি পালন করা অনেক কষ্টসাধ্য। রমযানে করা উমরার সওয়াবের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ইহাও একটা কারণ।

জিহাদ বনাম হজ্জ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ ـ (بخارى، مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলঃ 'কোন আমল অধিক উত্তম?' তিনি বলিলেনঃ 'আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান।' জিজ্ঞাসা করা হইলঃ 'অতঃপর কি?' বলিলেনঃ 'আল্লাহ্র পথে জিহাদ।' জিজ্ঞাসা করা হইলঃ 'তাহার পর কোন্ আমলটি সর্বোত্তম?' বলিলেনঃ 'কবুল হওয়া হজ্জ।'

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল—জিজ্ঞাসাকারী ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রা)। হাদীসটিতে মোট তিনটি বিষয়ে কথা বলা হইয়াছেঃ ঈমান, জিহাদ ও হজ্জ। কিন্তু ব্যবহৃত ভাষায় প্রথম ও তৃতীয়টির প্রথমে আলিফ ও লাম ব্যবহৃত হয় নাই। কেবলমাত্র 'জিহাদ' শব্দের উপর আলিফ ও লাম ব্যবহার করা হইয়াছে। 'অন্য দুইটির মত جِهَادٌ 'জিহাদুন' না বলিয়া আল-জিহাদ اَلْجِهَادُ বলা হইয়াছে। উহার কারণ হইল, ঈমান ও হজ্জ জীবনে বারবার হয় না। ঈমান তো জীবনের তরে একবার চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়ার ব্যাপার। একবার সিদ্ধান্ত করিয়া লইলে জীবনে উহার কোন নড়চড় হইতে পারে না। আর হজ্জও সামর্থবান ব্যক্তির জীবনে একবারই মাত্র ফরয। একবার ফরয আদায় করিয়া লওয়ার পর এই ফরয চিরতরে আদায় হইয়া যায়। কিন্তু জিহাদ উহা হইতে ব্যতিক্রম। ইহার প্রয়োজন জীবনে বারবার দেখা দেয়। বারবার জিহাদে আত্মনিয়োগ করার ও ঝাঁপাইয়া পড়ার প্রয়োজন হয়। জিহাদে স্থায়ীভাবে লাগিয়া থাকিতে হয়। এতদ্ব্যতিত ঈমান ও হজ্জ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দায়িত্বের কাজ। আর 'জিহাদ' শব্দের উপর আলিফ-লাম ব্যবহৃত হওয়ায় জিহাদের পূর্ণতা বুঝায়। একবার উহা করা হইলেও বারবার করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই হাদীসটি প্রথমত প্রমাণ করে যে, আকীদা-বিশ্বাসও আমল পর্যায়ে গণ্য। আবার ঈমান শব্দ শারীরিক আমল বুঝাইবার জন্য অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। কেননা এই আমল দ্বারাই তো ঈমানের

সত্যতা প্রমাণিত হয় ও ঈমানকে পূর্ণ পরিণত করে এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট ও মনোনীত আমলসমূহ করিয়াই তাঁহার দরবারে উচ্চতম মর্যাদা অর্জন করা যাইতে পারে। আর তৃতীয়ত ঈমানের পর নামায রোযা যাকাত বাদে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী কাজ হইল জিহাদ। তাহার পরই হজ্জের স্থান।

এই কথা স্মরণীয় যে, নবী করীম (স) এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্নকারীকে বিভিন্ন উত্তর দিয়াছেন। আর এই বিভিন্নতার কারণ হইল প্রশ্নকারীর অবস্থার পার্থক্য ও তারতম্য। যাহার প্রশ্নে যে রকমের জওয়াব দেওয়া দরকার বা ভালো মনে করিয়াছেন, তিনি তাহাকে সেই ধরনেরই জওয়াব দিয়াছেন। আলোচ্য হাদীসে উদ্ধৃত জওয়াবে এই কারণেই নামায, রোযা ও যাকাতের উল্লেখ নাই। কেননা নবী করীম (স) এই প্রশ্নকারীকে এই তিনটির কথা বলার প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাহা ছাড়া রাসূলে করীম (স) বিভিন্ন দিক দিয়া বিভিন্ন জিনিসকে 'সর্বোত্তম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কাজেই কোন বিশেষ কাজকে সর্বোত্তম বলার অর্থ এই নয় যে, উহা সব দিক ও সর্ববিষয়ের সমস্ত কাজের মধ্যে সর্বোত্তম হইবে। রাসূলে করীম (স)-এর একটি কথা হইতে ইহার প্রমাণ মেলে। তিনি ইরশাদ করিয়াছেনঃ

حَجَّةٌ لِمَنْ يَحُجَّ اَفْضَلُ مِنْ اَرْبَعِيْنَ غَزْوَةٍ وَغَزْوَةٌ لِمَنْ حَجَّ اَفْضَلُ مِنْ اَرْبَعِيْنَ حَجَّةٍ -
(عمدة القارى، فتح البارى)

যে লোক হজ্জ করে নাই, (হজ্জ ফরয হইয়া থাকিলে) তাহার হজ্জ চল্লিশটি ইসলামী যুদ্ধে যোগদান অপেক্ষা উত্তম। আর যে লোক হজ্জ করিয়াছে তাহার জন্য চল্লিশবার হজ্জ করার অপেক্ষা একটা ইসলামী যুদ্ধে যোগদান করা উত্তম।

আলোচ্য হাদীসে হজ্জের পূর্বে জিহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় হজ্জের তুলনায় জিহাদের গুরুত্ব অধিক। অথচ হজ্জ ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে একটি, আর জিহাদ সেরূপ নয়। এই পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগে জিহাদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। কেননা তখন ইসলামে শত্রুদের মুকাবিলা করা ইসলামের অন্যান্য আমল অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয় ছিল। ইসলামের শত্রুরা তখন সমগ্র ইসলামকেই উৎপাটিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তাহাদের প্রতিরোধ করা না হইলে শুধু হজ্জই নয়, নামায-রোযা করাও সম্ভবপর হইত না। দ্বিতীয়ত জিহাদ কোন এক সময় অন্যান্য 'ফরযে কিফায়ার' ন্যায় ফরযে কিফায়া থাকে না, 'ফরযে আইন' হইয়া যায়। যখন ফরযে আইন হয় না,তখনও ইহা 'ফরযে কিফায়া' থাকে। আর হজ্জ জীবনে মাত্র একবার আদায় করা ফরয—ফরযে আইন। একবার যখন হজ্জ করা হইয়া যায়, তখন উহা ফরযের স্তর হইতে নামিয়া নফল পর্যায়ে আসিয়া যায়। যে সময় জিহাদ ফরযে আইন হইয়া যায়, তখন হজ্জ জিহাদের তুলনা করা হইলে হজ্জের তুলনায় জিহাদ অধিক উত্তম হইয়া যাইবে। তৃতীয়ত ফরয হওয়ার ব্যাপারে জিহাদ হজ্জের সহিত শরীক ও সম মর্যাদাবান। কিন্তু জিহাদের কল্যাণ গোটা মুসলিম উম্মত লাভ করে। উহাই ইসলামের অস্তিত্ব, মান-মর্যাদা ও কার্যকরতা রক্ষা করে, অব্যাহত রাখে। হজ্জ একবার করা হইলে পরে উহা নফল পর্যায়ে গণ্য হইতে থাকে, কিন্তু জিহাদ ফরযে কিফায়া যে নফলের তুলনায় অধিক মর্যাদা সম্পন্ন তাহা বলাই বাহুল্য। ইমামুল হারামাইন বলিয়াছেনঃ আমার নিকট ফরযে কিফায়া ফরযে আইন অপেক্ষাও উত্তম। কেননা উহা মুসলিম জাতির ইসলামী জীবন যাপন পথের সব অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করিয়া দেয়, ইসলামকে মুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করে। জিহাদ করা না হইলে গোটা মুসলিম উম্মতই আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী ও দোষী হইয়া যায়। আর যে কাজের এতটা গুরুত্ব, তাহা যে অন্য যে কোন আমলের তুলনায় অধিক উত্তম, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে এই হাদীসটি ভিন্নতর ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এইঃ

اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ اِيْمَانٌ لَاشَكَّ فِيْهِ وَغَزْوَةٌ لَاغُلُوْلَ فِيْهِ وَحَجٌّ مَّبْرُوْرٌ ـ

আল্লাহ্‌র নিকট সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হইল এমন ঈমান যাহাতে সন্দেহ স্থান পায় নাই, এমন যুদ্ধ যাহাতে গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে চুরি করিয়া লওয়া হয় নাই এবং এমন হজ্জ যাহা আদায় করার সময় কোন পাপ করা হয় নাই এবং আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হইয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা এই হাদীসে ঈমানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সেই ঈমান যাহা গ্রহণ করিলে একজন ব্যক্তি ইসলামী মিল্লাতে প্রবেশ করিতে পারে। তাহা হইল, ঈমানের বিষয়গুলিকে আন্তরিকভাবে সত্য ও যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ্‌র একত্ব ও রাসূলে করীমের রিসালতের প্রতি ঈমান আনার কথা মুখে উচ্চারণ করা— কালিমা শাহাদাত বিশ্বাস সহকারে পাট করা। ইহার প্রথম অংশ দিল ও অন্তরের কাজ। আর দ্বিতীয়টি মুখ বা বাকশক্তির কাজ। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যেসব আমল করা হয়, তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এইসব আমল ছাড়া যেহেতু ঈমান সম্পূর্ণ হয় না, উহার সত্যতাও বাস্তবভাবে প্রমাণিত হয় না। এই কারণে এই ঈমানও এক হিসাবে আমলের মধ্যে গণ্য।

হাদীসের ভাষা অনুযায়ী এই ঈমান সন্দেহমুক্ত হইতে হইবে। কেহ যদি কেবলমাত্র মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করে কিন্তু দিল অবিশ্বাসী থাকিয়া যায় এবং ঈমান অনুযায়ী কাজ না করে, তাহা হইলে তাহার এই মৌখিক ঈমানকে ঈমান নামে অভিহিত করা যায় না।

হাদীসে যে যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সেই যুদ্ধ যাহা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বীন কায়েমের জন্য তাঁহারই বিধান ও রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয় এবং যাহাতে ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনকে প্রতিরোধ করা হয়। এইরূপ যুদ্ধ আত্মসাৎ মুক্ত হইতে হইবে। তাহাতে গনীমতের মাল সরকারীভাবে বন্টন করার পূর্বে চুরি করিয়া লওয়া হইবে না। যদি কেহ তাহা করে, তবে সে 'মুজাহিদ' গণ্য হইত পারে না এবং তাহার এই যুদ্ধকার্যের বিনিময়ে সে জিহাদের সওয়াব ও মর্যাদা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পাইবে না।

'হজ্জে মাবরুর' ইমাম নববীর মতে তাহাই, যাহাতে কোন গুনাহ মিশ্রিত হয় নাই। হজ্জ করা কালে শরীযাতের বিপরীত কোন কাজ করা হয় নাই। ইহার অপর অর্থ হইল مقبول 'যাহা আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হইয়াছে।' আর কাহার হজ্জ কবুল হইয়াছে, তাহা বুঝিবার চিহ্ন হইল, হাজী হজ্জ সমাপনান্তে ভালোয় ভালোয় নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে কোন গুনাহ করে নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে হজ্জে রিয়া নাই তাহাই হজ্জে মাবরুর।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেনঃ

حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ يُكَفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ ـ (مسند احمد)

হজ্জে মাবরুর সেই বৎসরের সমস্ত গুনাহ খতম করিয়া দেয়।

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) রসূলে করীম (স)-কে বলিতে শুনিয়াছেনঃ

اَلْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ ـ

হজ্জ জিহাদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন। আর উমরা নফল ইবাদত।

عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رض اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلَانُجَاهِدُ

قَالَ لَا لٰكِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ ـ

মুসলিম জাতির মা হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিলেনঃ ইয়া রাসূল। আমরা দেখিতেছি জিহাদই উত্তম আমল। তাহা হইলে আমরা কি জিহাদ করিব না? জবাবে নবী করীম (স) বলিলেন, না। বরং উত্তম জিহাদ হইতেছে কবুল হজ্জ।

—বুখারী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে জিহাদ ও হজ্জের মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে। হযরত আয়েশার প্রশ্নের জওয়াবে নবী করীম (স) বলিয়াছেন যে, কবুল হওয়া হজ্জই উত্তম জিহদ। এই কথাটি বিশেষভাবে মুসলিম মহিলাদের জন্য। কেননা তাহাদের পক্ষে রক্তপাতপূর্ণ যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ গ্রহণ করা স্বাভাবিক কাজ নয়। তাহাদের স্বভাব প্রকৃতি ও শক্তি ক্ষমাতার অনুকূলও নয়। রাসূলে করীমের জওয়াবটি সংক্ষিপ্ত। পূর্ণ বাক্য এইরূপ মনে করিতে হইবেঃ

لَكِنَّ الْجِهَادُ وَلَكِنَّ اَفْضَلَ الْجِهَادِ فِىْ حَقِّكُنَّ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ-

হ্যাঁ, জিহাদ তো উত্তম আমল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমাদের মহিলাদের পক্ষে উত্তম জিহাদ হইল কবুল হওয়া হজ্জ।

আর বস্তুতই স্ত্রীলোকদের পক্ষে জিহাদের মত কঠিন ও বিপদসংকুল কাজে অংশ গ্রহণের তুলনায় আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য কবুল হওয়া হজ্জই যে উত্তম, তাহাতে সন্দেহ নাই। নাসায়ীর গ্রন্থে আলোচ্য বর্ণনাটির ভাষা এইরূপ। হযরত আয়েশা (রা) বলিলেনঃ

اَلَّا نُخْرِجَ فَنُجَاهِدُ مَعَكَ فَاِنِّىْ لَا اَرَى عَمَلًا فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ اَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ فَقَالَ لَكِنَّ اَحْسَنَ الْجِهَادِ وَاَجْمَلَهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ-

আমরা কি বাহির হইব না ও আপনার সহিত জিহাদে শরীক হইব না? কেননা, আমি কুরআনের দৃষ্টিতে জিহাদের তুলনায় অধিক উত্তম অন্য কোন আমল দেখিতে পাই না? উত্তরে নবী করীম (স) বলিলেনঃ কিন্তু অধিক সুন্দর ও অধিক ভালো আমল হইল আল্লাহ্র ঘরের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া ও কবুল হওয়া হজ্জ করা।

আর 'ইবনে মাজাহ্' গ্রন্থে এই বর্ণনাটির ভাষা এইরূপঃ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিতঃ

قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ-

আমি বলিলাম, হে রাসূল। মেয়েলোকদের পক্ষে জিহাদ করা কি কর্তব্য? রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ স্ত্রীলোকদের জিহাদ অবশ্য কর্তব্য। তবে তাহা এমন জিহাদ যাহাতে মারামারি ও কাটাকাটি নাই। আর তাহা হইল হজ্জ ও উমরা।

হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে।

اَلْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيْفٍ- (ابن ماجه)

প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তির জন্য হজ্জই হইল জিহাদ

আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স)-এর কথাটি এই ভাষায় বলা হইয়াছেঃ

جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ -

বেশী বয়স্ক, অল্প বয়স্ক, দুর্বল ও মেয়েলোকদের জিহাদ হইল হজ্জ ও উমরা।

হাদীসের এইসব বর্ণনা হইতে দুইটি কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে। একটি এই যে, স্ত্রীলোকদের পক্ষে জিহাদের ঝামেলায় না পড়িয়া হজ্জ ও উমরা করিলে যেমন হজ্জের ফরয আদায় হইবে, তেমনি জিহাদের তুলনায় অধিক সওয়াবও পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয়, জিহাদ অতীব উত্তম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত বেশী সওয়াবের কাজ—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জিহদ শুধুমাত্র শক্তিসম্পন্ন পুরুষদের জন্য। তাহাও বেশী বয়স্ক বৃদ্ধ, অল্প বয়স্ক বালক এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের লোকদের জন্য নয়। কেননা এই অবস্থার লোক জিহাদে শরীক হইয়া কোন কাজ করিতে পারিবে না। তাহারা বরং মুসলিম মুজাহিদদের জন্য একটি দুর্বহ বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। এই কারণে সাধারণ অবস্থায় ভালো স্বাস্থ্যবান যুবকদেরই জিহাদে শরীক হওয়অ কর্তব্য। কিন্তু তখন এই স্বাস্থ্যবান যুবকদের বাহিরে যেসব বৃদ্ধ, স্বাস্থ্যহীন বালক ও নারী সমাজ থাকিবে, তাহাদের জন্য হজ্জ ও উমরার কাজে যোগদান করা অধিক উত্তম, এই কথার যৌক্তিকতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু যে সময় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের উপর শত্রুর আক্রমণ সংঘটিত হইবে ও রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে সকল নাগরিককে নিজ নিজ সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশ রক্ষার জিহাদে যোগদানের আহবান জানানো হইবে, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে প্রত্যেককেই জিহাদে যোগদান করিতে হইবে। এই মুহূর্তে জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকে না, 'ফরযে আইন' হইয়া যায়। এই কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলারাও জিহাদে যোগদান করিয়োছেন এবং অনুরূপ অবস্থায় ইহা করা শুধু বিধেয় নহে অবশ্য কর্তব্যও।

হাদীসসমূহে এই আলোচনায় একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাহা হইল, প্রত্যেকটি কথায় হজ্জ ও জিহাদের মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে। অন্য কোন আমলের সাথে তুলনা করা হয় নাই। ইহার কারণ হইল, হজ্জ পালনে ও জিহাদে নিজের নফসের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। উপরন্তু নিজের সর্বস্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করা ও একমাত্র আল্লাহ্রই সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করার গভীর ভাবধারা জিহাদ ও হজ্জ—উভয় কাজেই নিহিত রহিয়াছে। এক কথায় এই উদ্দেশ্যে হয় জিহাদ করিতে হইবে, আর জিহাদে যোগদান করা সম্ভব বা সমীচীন না হইলে হজ্জ ও উমরা'র কাজে সময় ও অর্থ ব্যয় করিবে এবং উহার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য ও পরম সন্তোষ লাভ করিবে। এই দৃষ্টিতে আলোচ্য আলোচনার গুরুত্ব অনুধাবনীয়।

মহিলাদের হজ্জ যাত্রা

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَوْ تَحُجَّ اِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا -

(دارقطنى)

হযরত আবূ আমামাতা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ মেয়েলোক তিনদিনের সফরে কিংবা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে না, যদি তাহার স্বামী তাহার সঙ্গী না হয়। —দারে কুত্নী

ব্যাখ্যা হাদীসটির বক্তব্য দুইটি। প্রথম, স্ত্রীলোককে স্বামী ছাড়া তিনদিনের বিদেশ যাত্রায় গমন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। স্বামী ছাড়া কোন নারী হজ্জ করিতেও যাইবে না।

এই দুইটি কথাই বিশদভাবে আলোচিতব্য।

স্ত্রীলোকদের বিদেশ যাত্রা পর্যায়ে বহু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার ভাষা বিভিন্ন। ফলে সেসব হাদীস হইতে এই প্রসঙ্গে অনেক কথাই জানা যায়। কোন কোন হাদীসে স্বামী নয়, মুহাররম পুরুষের উল্লেখ রহিয়াছে। অর্থাৎ মহিলারা কোন মুহাররম পুরুষ সঙ্গে না লইয়া বিদেশ যাত্রা করিবে না। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ اِلَّا مَعَ ذُوْ مَحْرَمٍ - (بخارى، مسلم)

কোন ভিন্ পুরুষ কোন ভিন্ মেয়েলোকের সহিত নিভৃত একাকীত্বে উপস্থিত হইবে না, যদি না মেয়ে লোকটির সহিত তাহার কোন মুহাররম পুরুষ উপস্থিত থাকে এবং কোন মেয়েলোক মুহাররম পুরুষ সঙ্গে না লাইয়া বিদেশ যাত্রা করিবে না।

এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলঃ ইয়া রাসূল, আমি তো এখানে যুদ্ধ ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে। ওদিকে আমার স্ত্রী একাকী হজ্জ করিতে বাহির হইয়াছে। এখন আমার কি কর্তব্য? নবী করীম (স) বলিলেনঃ

فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ -

তুমি চলিয়া যাও এবং তোমার স্ত্রীর সহিত একত্রিত হইয়া হজ্জ কর।

বস্তুত ভিন্ পুরুষ ও ভিন্ মেয়েলোকের নিভৃত একাতীত্বে কোন মুহাররম পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া একত্রিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। এই মতে ইজমা হইয়াছে। তবে কোন মুহররম পুরুষের উপস্থিতিতে ভিন্ পুরুষ মেয়েলোকের একত্রিত হওয়া এই হাদীসের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়।

'মেয়েলোক তিনদিনের বিদেশ যাত্রায় মুহাররম পুরুষ সঙ্গী না লইয়া যাত্রা করিবে না' এই কথাটি নির্বিশেষে। অর্থাৎ কোন রকম বিদেশ যাত্রা—তাহা যে ধরনেরই হউক না কেন—মুহাররম পুরুষ সঙ্গী ছড়া স্ত্রীলোকের জন্য জায়েয নয়।

উপরোদ্ধৃত হাদীসে তিনদিনের সফরের কথা বলা হইয়াছে। হযরত আবূ সাঈদ খূদরী (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে। হাদীসটি এইঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ اَوْ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ -

(بخارى، مسلم)

নবী করীম (স) স্ত্রীলোকদিগকে দুই দিন কিংবা দুই রাত্রির দূরত্বপথে তাহার স্বামী কিংবা কোন মুহাররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া সফর করিতে নিষেধ করিয়াছেন। —বুখারী, মুসলিম

এই হাদীসে দুই দিন বা দুই রাত্রির সফরের কথা বলা হইয়াছে।

আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে একদিন এক রাত্রির কথা বলা হইয়াছে। নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَّ لَيْلَةٍ اِلَّا مَعَ ذِىْ مُحْرَمٍ عَلَيْهَا-

কোন মুহাররম পুরুষ সঙ্গীছাড়া কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে একদিন এক রাত্রি পথ সফর করা হালাল নয়।

হযরত আবূ সাঈদ বর্ণিত অপর একটি বর্ণনায় পুরুষ সঙ্গীদের স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। হাদীসটি এইঃ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلَّا وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ اِبْنُهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ ذُوْ مُحْرَمٍ مِّنْهَا-

আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহার পিতা কিংবা স্বামী কিংবা পুত্র কিংবা ভাই অথবা অন্য কোন মুহাররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া তিনদিন কিংবা ততোধিক সময়ের জন্য সফরে যাওয়া হালাল নয়।

এই হাদীসটিতে সাধারণভাবে শুধু মুহররম পুরুষ, আর বিশেষভাবে পিতা, স্বামী, পুত্র ও ভাইর উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সফরকাল পর্যায়ে বলা হইয়াছে তিনদিন কিংবা ততোধিক সময়।

এইসব হাদীস হইতে কোন মুহাররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া বিদেশ সফর করা স্ত্রীলোকদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। আর সফরকাল সম্পর্কে উক্ত বিভিন্ন সময়ের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নাই। ইহা বর্ণনাকারীদের নিজস্ব সময়-হিসাবের পার্থক্যের পরিণাম মাত্র। ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ التَّحْدِيْدِ ظَاهِرَهُ بَلْ كُلُّ مَا يُسَمّٰى سَفَرًا فَالْمَرْاَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ اِلَّا بِالْمَحْرَمِ

সময় নির্ধারণ পর্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে উহার বাহ্যিক অর্থই আসল লক্ষ্য নয়। আসল কথা হইল, যে বিদেশ যাত্রাকে সফর বলা হয়, তাহার সময় যতটুকু হউক না কেন, কোন মুহররম পুরুষ সঙ্গ ছাড়া সফর করা কোন মুসলিম মহিলার পক্ষে হালাল নয়।

এমন কি হজ্জের জন্য সফর করাও নয়। সুফিয়ান সওরী বলিয়াছেন, কেবল দূরের সফরের ক্ষেত্রেই মুহাররম সঙ্গীর প্রয়োজন দেখা দেয়, নিকটবর্তী স্থানে যাওয়ার জন্য নয়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা) বলিয়াছেনঃ

لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمَرْاَةِ اِذَا لَمْ تَجِدْ مُحْرَمًا-

মুহাররম সঙ্গী না পাইলে স্ত্রীলোকের উপর হজ্জ করা ফরয হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা, নখয়ী,ইসহাক ও ইমাম শাফেয়ীও স্ত্রীলোকদের হজ্জ যাত্রার জন্য কোন মুহররম সঙ্গী থাকা জরুরী শর্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইমাম মালিক মত প্রকাশ করিয়াছেন,

ফরয হজ্জের সফরে যাওয়ার জন্য মুহাররম সঙ্গীর শর্ত জরুরী নয়। কিন্তু এই মত যথার্থ নয়। কেননা হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় হজ্জের সফরের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, উহা মুহাররম সঙ্গী ছাড়া হালাল নয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কেবল যুবতী মেয়েলোকদের জন্য মুহাররম পুরুষ সঙ্গীর উপস্থিত শর্ত—বৃদ্ধাদের জন্য নয়। কেননা বৃদ্ধাদের প্রতি ভিন্ পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই পর্যায়ে বর্ণিত সব কয়টি হাদীস একত্রিত করিলেও তাহা হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় না।

হাদীসসমূহে যে মুহাররম পুরুষ সঙ্গীর শর্ত করা হইয়াছে, তাহার অর্থ চিরকালের জন্য যাহাদের পরস্পর বিবাহ হারাম সেই পুরুষ ও স্ত্রীলোক। সাময়িক কারণেও বিবাহ হারাম হয়, যেমন শালী-ভগ্নীপতি, এইরূপ মুহাররমের কথা এখানে বলা হয় নাই এবং এইরূপ মুহাররম পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সফর যাত্রা যায়েয নয়।

স্মরণীয় যে, কুরআনের আয়াতে সামর্থ্যবান যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীর উপর হজ্জ করা ফরয করা হইয়াছে। আর হাদীসে মুহাররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া স্ত্রীলোকদের জন্য বিদেশ যাত্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই হাদীসের কারণে কুরআনের সাধারণ হুকুম পালন সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। বিশেষজ্ঞদের নিকট ইহা নীতিবিরুদ্ধ নয়।

দ্বিতীয়তঃ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا বলিয়া পথের যে সামর্থ্যের কথা হইয়াছে, এই সামর্থ্যের শর্তের মধ্যে মুহাররম পুরুষের উপস্থিতি স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে জরুরী অংশ। কাজেই কোন মহিলা যদি মুহাররম পুরুষ সঙ্গী না পাওয়ার কারণে ফরয হজ্জ আদায় করা হইতে বিরত থাকে, তবে তাহা কুরআনের ঘোষণার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, উহার বিরোধিতা নয় এবং সেইজন্য গুনাহ হইবে না। (نيل الاوطار)

হজ্জ ও পাথেয়

عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَّلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا اَوْنَصْرَانِيًّا وَذٰلِكَ اللّٰهُ يَقُوْلُ فِىْ كِتَابِهٖ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا - (ترمذى، مسند احمد)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ যে লোক পথের এমন সম্বল ও যানবাহনের অধিকারী হইল, যাহা তাহাকে আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারে আর তাহা সত্ত্বেও হজ্জ করিল না, সে ইয়াহুদী হইয়া মরুক কি খৃষ্টান হইয়া তাহাতে কোন পার্থক্য হইবে না। এই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিতাবে বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌রই জন্য (আল্লাহ্‌র) ঘরের হজ্জ করা সেই লোকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যাহারা সে পর্যন্ত পৌছার পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। —তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে হজ্জ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাকে একটি মহা অপরাধরূপে গণ্য করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র কঠিন আযাব হওয়ার সংবাদই ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি যখন হজ্জ না করিয়া মরিয়া যায়, তখন তাহার পরিণতি মুসলমানদের ন্যায় হয় না। তাহার মৃত্যুকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টানের মৃত্যুর সমান বলা হইয়াছে। কেননা এই দুই জাতি আহলি কিতাব, তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র নাযিল করা কিতাব রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তাহারা

তদানুযায়ী আমল করে না। হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্জ না করিয়াই মরিয়া গেল, তাহার অবস্থা এই আহলি কিতাবদের মতই। কেননা সেও তাহাদের মত আল্লাহ্‌র নাযিল করা কিতাব অনুযায়ী আমল করে নাই। আল্লাহ্‌র বিধান ও স্পষ্ট নির্দেশকে সে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। সে উহার প্রতি এমন আচরণ গ্রহণ করিয়াছে, যাহাতে মনে হয়, সে উহার কথা আদৌ জানে না কিংবা জানিলেও তাহা সে বিশ্বাস করে না বা মানিতে প্রস্তুত নয়।

তায়্যিবী রাসূলে করীম (স)–এর এই কথাটুকুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

إِنَّ وَفَاتَهُ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ وَوَفَاتَهُ عَلَى الْيَهُوْدِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ سَوَاءٌ ـ

এই ব্যক্তির এমতাবস্থায় মৃত্যু হওয়া এবং তাহার ইয়াহুদী বা খৃষ্টান অবস্থায় মৃত্যু হওয়া সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন।

বস্তুত ইহা যে অত্যন্ত কঠোর উক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই কঠোর উক্তি রাসূলে করীম (স)–এর নিজস্ব মন্তব্য কিছু নয়। ইহা খোদা কুরআনে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) কুরআনের আয়াত পাঠ করিয়া শোনাইয়াছেন এবং বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ্যবান প্রত্যেক ব্যক্তিরই হজ্জ করা এমন কর্তব্য যে, যে লোক তাহা করিবে না, তাহার জন্য আয়াতের পরবর্তী অংশই যথার্থ বলিয়া প্রতীত হইবে। আর তাহা হইলঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ (ال عمران ٩٧)

যে লোক কুফরী করিল–নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বলোকের কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন।

এই আয়াতাংশের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ

وَمَنْ كَفَرَ بِفَرْضِ الْحَجِّ وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا ـ

যে লোক হজ্জ ফরয হওয়াকে অস্বীকার করিল ও উহাকে অবশ্য কর্তব্য মনে করিল না, (সেই লোকের প্রতি আল্লাহ্ কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নহেন।)

উপরোদ্ধৃত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেনঃ 'এই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে আপত্তি আছে। হিলাল ইবনে আবদুল্লাহ্ উহার একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। আর হারিস অপর একজন বর্ণনাকারী যয়ীফ ব্যক্তি। কিন্তু এই হাদীসটিই হযরত আলী (রা) হইতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সূত্রটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। উহার ভাষা নিম্নরূপঃ

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمُتْ عَلَى أَىِّ حَالٍ شَاءَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوْسِيًّا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ بِهِ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ لَا نَصِيْبَ لَهُ فِىْ شَفَاعَتِىْ وَلَا وُرُوْدَ حَوْضِىْ (القرطبى)

রাসূলে করীম (স) তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেনঃ হে জনগণ। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরয করিয়া দিয়াছেন— যাহারা আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ্য রাখে। যে লোক ইহা সত্ত্বেও হজ্জ করিল না, সে ইয়াহূদী বা খৃস্টান কিংবা অগ্নিপূজক যাহা ইচ্ছা হইয়া মরিতে পারে। তবে যদি কেহ রোগ অসুখ কিংবা অত্যাচারী শাসকের বাধা প্রভৃতি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া হজ্জ করা হইতে বিরত থাকে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে লোক হজ্জ করিবে না, তাহার জন্য আমার শাফা'আতে কোন অংশ নাই এবং আমার 'হাওযে'ও তাহার উপস্থিতি হইবে না। (কুরতুবী) এই মর্মের হাদীস হযরত উমর, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আবূ আমামাতা হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। —কুরতুবী

কাতাদাহ হাসান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলিয়াছেনঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُونَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আমি সংকল্পবদ্ধ হইয়াছি, বিভিন্ন শহরে ও অঞ্চলে লোক পাঠাইয়া দিব, তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, কোন লোক ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও হজ্জ করে নাই, তাহার উপর তাহারা 'জিযিয়া' কর ধার্য করিয়া দিবে, আল্লাহ্‌র বাণীঃ যে লোক কুফরী করিল, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সারা জাহানের কাহারো প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন-এর প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই।

জিযিয়া কর কেবলমাত্র অমুসলিম নাগরিকদের উপর প্রবর্তন করাই ইসলামর বিধান। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করিলে তাহার উপর জিযিয়া কর ধার্য করার অর্থ তাহাকে অমুসলিমের ন্যায় গণ্য করা। ইমাম কুরতুবী লিখিয়াছেন, যে লোক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করিয়া মরিয়া যায়, এই 'অয়ীদ'—দুঃখপূর্ণ পরিণতির আগাম বাণী— কেবলমাত্র তাহার জন্যই প্রযুক্ত হইবে।

কিন্তু বায়হাকীর বর্ণনায় হযরত উমরের এই কথাটির শেষাংশে কুরআনের উক্ত আয়াতের উল্লেখ নাই, বরং তদস্থলে এই শব্দ দুইটি রহিয়াছে।

مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ ـ مَا هُمْ بِمُسْلِمِيْنَ ـ

উহারা মুসলমান নয়, উহারা মুসলমান নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ

تَعَجَّلُوْا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيْضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِيْ مَا يَعْرِضُ لَهُ ـ (ابن ماجه)

তোমরা ফরয হজ্জ অনতিবিলম্বে সম্পন্ন কর। কেননা পরে কি অবস্থা দেখা দিবে তাহা কেহ জানে না।

অপর একটি বর্ণনায় হযরত উমরের কথাটির ভাষা এইরূপঃ

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ـ

যে লোক হজ্জ করার ইচ্ছা করিল, সেই কাজে তাহার মোটেই বিলম্ব করা উচিত নয়। কেননা

লোক কখনো রোগাক্রান্ত হইতে পারে, কখনো যানবাহনের অসুবিধা দেখা দিতে পারে এবং কখনো কোন বিশেষ প্রয়োজন বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ وَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْحَجُّ قَالَ اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ ـ (دارقطنى، ابن ماجه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)–এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেল। বলিল, ইয়া রাসূল! কোন্ জিনিস হজ্জকে ফরয করিয়া দেয়া? বলিলেনঃ সম্বল ও যানবাহন। জিজ্ঞাসা করিলঃ ইয়া রাসূল! হাজীকে কি রকম বেশভূষা গ্রহণ করিতে হয়? বলিলেনঃ চুলে জুবুথবু ও সুগন্ধি পরিহারকারী। এই সময় অপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া গেল। বলিলঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জের তৎপরতা কি রকম? বলিলেনঃ উচ্চস্বরে 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা, উচ্চারণ করিতে হয় ও শেষে কুরবানী করিতে হয়।

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে রাসূলে করীম (স)–এর একটি মজলিসের চিত্র অংকন করা হইয়াছে, যেখানে সাহাবায়ে কিরাম হজ্জ সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)–এর নিকট বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন পেশ করিতেছিলেন এবং রাসূলে করীম (স) তাহার উত্তর দান করিতেছিলেন। এই হাদীসটিতে প্রথমত হজ্জ ফরয হওয়ার প্রাথমিক নিমিত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। রাসূলে করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেনঃ মক্কা শরীফে যাতায়াতের সম্বল এবং যাতায়াতের জন্য জরুরী যানবাহনের ব্যবস্থা হইলেই হজ্জ ফরয হইয়া যায়। কুরআনের আয়াতেও তাহাই বক্তব্য। অর্থাৎ

مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ـ (القرطبى)

যে লোকেই আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌছিবার সামর্থ্য লাভ করিল, তাহারই হজ্জ করা ফরয হইয়া যায়।

ইহার পরবর্তী অর্থ, সম্বল ও যাতায়াতের যানবাহন ইত্যাদির ব্যবস্থা না হইলে হজ্জ ফরয হয় না। হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য ইহা প্রথম শর্ত। আর এই শর্তে যাতায়াত ভাড়া, সফরকালীন প্রয়োজনীয় খরচ, নির্ভরশীল লোকদের এই সময়কার যাবতীয় খরচ, হজ্জ যাত্রীর নিজের স্বাস্থ্য ও শারীরিক সামর্থ্য ও বল–শক্তি এবং নিজের বাড়ী হইতে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাতায়াতের যানবাহন ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইবনুয যুবায়র, আতা, ইকরামা ও মালিক বলিয়াছেনঃ

اِنَّ الْاِسْتَطَاعَةَ الصِّحَّةُ لَاغَيْرُ ـ

সামর্থ্য বলিতে কেবল স্বাস্থ্যগত সামর্থ্যই হজ্জের জন্য শর্ত। অন্য কিছু নয়।

কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে এই কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেনঃ استطاعت 'শক্তি–সামর্থ্য' (কুরআনে যাহার শর্ত করা হইয়াছে) দুই ধরনের। একটি হইল, লোকটি নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া সামর্থ্যবান হইবে এবং হজ্জে

যাতায়াতের আর্থিক সম্পদ থাকিতে হইবে। আর দ্বিতীয়টি হইল, নিজের দৈহিক শক্তিতে অক্ষমতা থাকিলেও সে এমন একজন শক্তি-সামর্থ্যবান লোক সংগ্রহ করিতে পারে যে, তাহার আদেশক্রমে তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিতে পারে কিংবা পয়সা দিয়া কাহারো দ্বারা হজ্জ করাইতে সমর্থ এই উভয় ব্যক্তিরই যেভাবে সম্ভব হজ্জ করা কর্তব্য।

(القرطبى - خازن - نيل الاوطار)

হজ্জের সর্বোত্তম পাথেয়

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاِذَا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ سَاَلُوا النَّاسَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى -

(بخارى، ابوداؤد، نسائى)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, ইয়েমেন দেশের লোকেরা হজ্জ করিতে আসিত; কিন্তু সঙ্গে সম্বল গ্রহণ করিত না। তাহারা বলিত, আমরা তাওয়াক্কুলকারী লোক। তাহার যখন মদীনায় (মক্কায়) উপস্থিত হইত তখন লোকদের নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন। (উহার অর্থ)ঃ তোমরা অবশ্যই পাথেয় গ্রহণ করিবে। বস্তুত সর্বোত্তম পাথেয় হইল তাক্ওয়া। —বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা হজ্জ যাত্রার পাথেয় ও সম্বল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ইয়েমেন দেশের লোকেরা পাথেয় না লইয়াই হজ্জ করিতে রওয়ানা হইয়া যাইত। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বাবদ সম্পদের প্রয়োজন হইত। খাওয়া-দাওয়া না করিয়া যেমন কেহ থাকিতে ও বাঁচিতে পারে না, তেমনি সম্পদ ছাড়াও কাহারও খাওয়া-দাওয়া জুটিতে পারে না। তাই ইয়েমেন দেশের লোকেরা হজ্জে আসিয়া লোকদের নিকট খয়রাত চাহিতে বাধ্য হইত। ইহা কিছুমাত্র প্রশংসাযোগ্য কাজ নয়।

হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

فَاِذَا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ - তাহারা যখন মদীনায় উপস্থিত হইত।

ইহাই অধিক সংখ্যক বর্ণনার ভাষা। কিন্তু কাশ্মুহাইনীর বর্ণনায় ইহার পরিবর্তে বলা হইয়াছেঃ

فَاِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ - তাহারা যখন মক্কায় উপস্থিত হইত।

বিশিষ্ট হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ এই বর্ননাটিকেই সঠিক ও যথার্থ বলিয়াছেন। কেননা হজ্জ তো মক্কা শরীফে করিত হয়। মদীনায় যাইতে হয় শুধু রওযা পাকের যিয়ারতের জন্য, হজ্জের জন্য নয়। আবূ ন'য়ীমও ইহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইয়েমেনবাসীদের এই অবাঞ্ছনীয় আচরণের প্রতিবাদ করা হইলে ও পাথেয় না লইয়া হজ্জে কেন আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিত, 'আমরা তো আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলকারী। আমাদের আবার পাথেয়র প্রয়োজন কি? আল্লাহ্ই তো আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করিবেন। অন্য কথায় কোনরূপ পাথেয় না লইয়া আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করিয়া হজ্জ যাত্রা ছিল তাহাদের স্বভাব। কিন্তু এই স্বভাব সমর্থনীয় নয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্র বাণীঃ 'অবশ্যই পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইবে, কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হইল তাকওয়া' নাযিল হইয়াছে।

সম্বল ও পাথেয় লইয়া হজ্জ যাত্রা করা সম্পর্কে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশ। কেননা হজ্জ যাত্রীদের নিকট পাথেয় থাকিলে কাহারো নিকট ভিক্ষার হাত দরাজ করার প্রয়োজন দেখা দেয় না। লোকদের নিকট চাহিয়া নির্লজ্জতা ও চরম হীনমন্যতা প্রকাশ করিতে হয় না। হযরত ইবনে আব্বাসের এই বর্ণনাই কিছুটা পরিবর্তিত ভাষায় উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى تَزَوَّدُوْا مَا يَكُفُّ وُجُوْهَكُمْ عَنِ النَّاسِ -

আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ তোমরা সকলে অবশ্যই পাথেয় সংগ্রহ করিয়া রওয়ানা হইবে। উহার পরিমাণ এমন হইতে হইবে যাহা তোমাদিগকে লোকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়া হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, 'এই লোকেরা যখন ইহ্রাম বাঁধিত তখন তাহাদের নিকট যথেষ্ট পাথেয় মজুত থাকিত। কিন্তু তাহারা উহা ফেলাইয়া দিত ও অন্য এক ধরনে পাথেয় লইত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া বলিয়া দিলেন যে, তোমরা এইরূপ করিও না এবং সঙ্গে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস লইয়া হজ্জে গমন করিবার নির্দেশ দিলেন।

ইকরামা মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইবেন যায়দ প্রমুখ বলিয়াছেনঃ যে সব লোক কোনরূপ পাথেয় না লইয়াই হজ্জে গমন করিত, এই নির্দেশ তাহাদের প্রতি। তাহাদের অনেকে বলেঃ

كَيْفَ نَحُجُّ بَيْتَ اللّٰهِ وَلَا يُطْعِمُهَا -

আমরা আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ কিভাবে করিব, তিনি তো আমাদিগকে খাওয়াইবেন না?

ফলে তাহারা অন্যান্য হজ্জ যাত্রীদের উপর বোঝা হইয়া পড়িত। এই অবস্থা সৃষ্টি করা হইতে অত্র আয়াতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে কুরআনের আয়াতের শব্দ التقوى। অর্থঃ লোকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়া হইতে নিজেকে রক্ষা করা।

কিন্তু ইহার আরো একটি তাৎপর্য রহিয়াছে। তাহা হইল, বৈষয়িক বিষয়ে বিধান দান প্রসঙ্গেই পরকালের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা কুরআনের স্থায়ী নিয়ম। এখানেও তাহাই করা হইয়াছে। অর্থাৎ হজ্জের সফর পার্থিব ব্যাপার। এই সময়ে পাথেয় সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরকালীন মহাযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করার আবশ্যকতার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর সেই পাথেয় হইল তাক্ওয়া। সেই কারণে আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছেঃ

فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى -

পরকালীন মহাযাত্রার জন্য সর্বোত্তম পাথেয় হইল আল্লাহ্কে ভয় করা ও আল্লাহ্র নাফরমানী না করা।

অর্থাৎ বৈষয়িক সফরের পাথেয়র ব্যবস্থা তো করিতে হইবেই এবং তাহা না লইয়া হজ্জ যাত্রা করিবে না। অনুরূপভাবে পরকালীন মহাযাত্রার জন্যও অবশ্যই পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইবে। আর এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক উত্তম পাথেয় হইল তাকওয়া। হজ্জ যাত্রার পাথেয়র তুলনায় এই যাত্রার পাথেয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আতা খুরাসানী বলিয়াছেনঃ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى বলিয়া 'পরকালীন মহাযাত্রার পাথেয়'র কথাই বুঝানো হইয়াছে। জরীর ইবনে আবদুল্লাহ নবী করীম (স)–এর বাণী বর্ণনা করিয়াছেনঃ

مَنْ تَزَوَّدَ فِى الدُّنْيَا يَنْفَعُهُ فِى الْآخِرَةِ -

যে লোক এই পৃথিবীতে পাথেয় সংগ্রহ করিবে, পরকালে সে উপকৃত হইবে।

এই আয়াত ও হাদীসের মূল বক্তব্য হইল, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে তাওয়াক্কুল হইবে না। আল্লাহ্র উপর যদি তাওয়াক্কুলই করিবে ও সেইজন্য পাথেয় না লইয়া হজ্জে গমন করিবে, তাহা হইলে কোন লোকের সাহায্য পার্থনা করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে পাথেয় সংগ্রহ না করিয়া তাওয়াক্কুল করা অর্থহীন। পাথেয় সংগ্রহ করার পরই তাওয়াক্কুল করিতে হইবে। ইসলামে এইরূপ তাওয়াক্কুলই কাম্য ও সমর্থনীয়। এইজন্য উট না বাঁধিয়া আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করার প্রতিবাদ করিয়া নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

قَيِّدْهَا فَتَوَكَّلْ - প্রথমে উহাকে বাঁধ, তাহার পর তাওয়াক্কুল কর।

(عمدة القارى - تفسير القرطبى)

হজ্জ তিন প্রকারের

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدَ الْحَجَّ - (بخارى، مسلم، ترمذى، مسند احمد)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (স) ইফরাদ হজ্জ করিয়াছেন।

—বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে নবী করীম (স)-এর হজ্জ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি 'ইফরাদ' হজ্জ করিয়াছেন। এই পর্যায়ে কয়েকটি প্রশ্ন আলোচিতব্য। প্রথম, নবী করীম (স) কয়বার হজ্জ করিয়াছেন? দ্বিতীয়, তিনি যে হজ্জ করিয়াছেন তাহা কোন প্রকারের হজ্জ ছিল এবং তৃতীয় তিনি উমরা করিয়াছেন কিনা?

নবী করীম (স) কয়টি হজ্জ করিয়াছেন—এই বিষয়ে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণিত হাদীস উল্লেখ্য। তিনি বলিয়াছেনঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ مَعَهَا عُمْرَةٌ، (ترمذى)

নবী করীম (স) তিনবার হজ্জ করিয়াছেন। দুইবার হজ্জ করিয়াছেন হিজরতের পূর্বে এবং একবার হজ্জ করিয়াছেন হিজরতের পর। উহার সহিত উমরাও করিয়াছেন।

কাতাদাহ বলিয়াছেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলামঃ كَمْ حَجَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ নবী করীম (স) কয়টি হজ্জ করিয়াছেন?

জবাবে তিনি বলিলেনঃ حَجَّةً وَّاحِدَةً তিনি একটি মাত্র হজ্জ করিয়াছেন।

সম্ভবত হযরত আনাস (রা) হিজরতের পরে করা হজ্জের কথাই বলিয়াছেন। কেননা নবী করীম (স) একটি হজ্জ করিয়াছেন বলিলে তাহাই বুঝায়।

নবী করীম (স)-এর উমরা করা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আনাস ইবনে মালিক উভয়ই বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) চারটি উমরা করিয়াছেন। প্রথম হুদায়বিয়ার উমরা। নবী করীম (স) উমরার নিয়্যত করিয়া মক্কা যাত্রা করিয়াছিলেন। মক্কা হইতে নয় মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার কুয়শরা তাঁহাকে বাঁধা দান করে। ফলে উমরা না করিয়াই তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহাও তাঁহার করা উমরারূপে গণ্য। ইহারই পরবর্তী বৎসর তিনি দ্বিতীয় উমরা করেন। তৃতীয় উমরা করেন সেই বৎসর যখন তিনি হুনাইন যুদ্ধে লব্ধ গনীমতের মাল বন্টন করিয়াছিলেন। আর চতুর্থ উমরা বিদায় হজ্জের সময় সম্পন্ন করেন।

উপরে উদ্ধৃত হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী নবী করীম (স) বিদায় হজ্জ করিয়াছিলেন ইফরাদ হজ্জ। অর্থাৎ কেবলমাত্র হজ্জের নিয়্যত করিয়াই ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছিলেন।

নবী করীম (স) কি ধরনের হজ্জ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। বহু সংখ্যক সাহাবীর বর্ণনায় উহারই উল্লেখ হইয়াছে। বহু সংখ্যক সাহাবীর বর্ণনা হইল, তিনি 'ক্বিরান' হজ্জ করিয়াছিলেন। আবার কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি 'তামাত্তু' হজ্জ করিয়াছিলেন। ইমাম খাত্তাবীর পর্যালোচনায় এই কথা স্পষ্ট হইয়াছে যে, নবী করীম (স) ইফরাদ হজ্জ করিয়াছেন। এই কথাই গ্রহণযোগ্য।

এই আলোচনা হইতে এই কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, হজ্জ তিন প্রকারেরঃ ইফরাদ, তামাত্তু ও ক্বিরান।' শুধু হজ্জের নিয়্যত করিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিলে ইফরাদ হজ্জ হয়। ইহাতে হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন শেষ করার পর উম্‌রা করিতে হয়। সম্পূর্ণ নূতনভাবে নিয়্যত করিয়া ও ইহ্‌রাম বাঁধিয়া। হজ্জের মাসে প্রথমে উমরার নিয়্যত করিয়া হজ্জের নিয়্যতে ইহ্‌রাম বাঁধিলে ইহা 'তামাত্তু' হজ্জ হইবে। আর ক্বিরান হজ্জ হয় এক সঙ্গে হজ্জ ও উমরার নিয়্যত করিয়া ইহ্‌রাম বাঁধিলে।

রাসূলে করীম (স) ইফরাদ হজ্জ করিয়াছিলেন, এই কথার ভিত্তিতে অনেকেই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইফরাদ হজ্জই অন্য দুইটি হইতে উত্তম। ইমাম সওরী বলিয়াছেনঃ

إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ -

তুমি ইফরাদ হজ্জ করিলে ভালো, ক্বিরান করিলেও ভালো এবং তামাত্তু' করিলেও ভালো।

অর্থাৎ সওরীর মতে সব রকমের হজ্জই ভালো। ভালো হওয়ার ব্যাপারে সব সমান। ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেনঃ

أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْقِرَانُ -

আমি প্রথমে ভালো মনে করি ইফরাদ, তাহার পর তামাত্তু এবং সবশেষে ক্বিরান।

হানাফীদের দৃষ্টিতেঃ

اَلْقِرَانُ أَفْضَلُ مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادُ وَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ -

ক্বিরান হজ্জ তামাত্তু ও ইফরাদ হজ্জ হইতে উত্তম এবং তামাত্তু, ইফরাদ হইতে উত্তম।

সাহাবী ও তাবেয়ীনের বহু লোক তামাত্তু হজ্জকে অন্যান্য দুইটির তুলানায় উত্তম মনে করিয়াছেন। কেননা নবী করীম (স) ইহা না করিতে পারার কারণে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ও ইহা করার কামনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ বলিয়াছেনঃ

اَلْقِرَانُ وَالتَّمَتُّعُ فِى الْفَضْلِ سَوَاءٌ وَهُمَا اَفْضَلُ مِنَ الْاِفْرَادِ ـ

'ক্বিরান ও তামাত্তু' সমান মর্যাদাশীল। আর এই দুইটি ইফরাদ হইতে উত্তম।

(فتح البارى ـ تحفة الاحوذى)

নায়েবী হজ্জ

عَنْ اَبِىْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِىِّ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَايَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ ـ

(ترمذى، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه)

হযরত আবূ রাযীন আল-উকাইলী হইতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ হে রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা অধিক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি হজ্জ করিতে পারেন না, উমরা করাও তাঁহার সাধ্য নাই এবং বাহিরে গমন ও যানবাহনে আরোহণ করিতেও তিনি সমর্থ নহেন। (এমতাবস্থায় কি করা উচিত) নবী করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ হইতে হজ্জ ও উমরা আদায় কর।

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায়, যাহার উপর হজ্জ ফরয, সে যদি এমন বয়োবৃদ্ধ হয় যে, হজ্জ ও উমরা করিবার মত দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য তাহার নাই কিংবা ঘরের বাহিরে কিংবা বিদেশে গিয়া চলাফিরা বা যানবাহনে আরোহণ করিবার সামর্থ্যও তাহার নাই, তাহা হইলে অন্য কেহ তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ ও উমরা করিতে পারে। করিলে এই হাদীস অনুযায়ী তাহার পক্ষ হইত হজ্জ আদায় হইয়া যায়।[১] ইমাম আবূ হানীফা (রা) প্রমুখ ফিকাহবিদের মত হইলঃ

بِعُمُوْمَةٍ عَلٰى جَوَازِ صِحَّةِ حَجِّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ نِيَابَةً عَنْ غَيْرِهِ ـ

যে লোক হজ্জ করে নাই, সে লোকও অন্য কাহারো নায়েব হইয়া তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিতে পারে, ইহাতে সাধারণ অনুমতি দেওয়া আছে।

কিন্তু জমহুর ফিকাহ্‌বিদগণ ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন, যে লোক নিজে হজ্জ করে নাই, সে অন্য কাহারো নায়েব হইয়া হজ্জ করিতে পারে না, করিলে তাহা সহীহ হইবে না। তাঁহাদের দলীল হইল একটি হাদীস। হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ও সহীহ ইবনে

১. কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে, কুরআনের যে আয়াতের ভিত্তিতে হজ্জ ফরয হইয়াছে, তাহাতে কি এই ধরনের বয়োবৃদ্ধ ও যাতায়াতে শারীরিক দিক দিয়া অক্ষম ব্যক্তিদের উপর হজ্জ করা ফরয করা হইয়াছে। — তাহাতেই যদি ফরয না হইল তাহা হইলে নায়েবী হজ্জের তাৎপর্য কি।

খুযায়মা কর্তৃক উদ্ধৃত। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ নবী করীম (স) এক ব্যক্তিকে শিবরামা'র পক্ষ হইতে তালবিয়া পড়িতে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ - তুমি তোমার নিজের হজ্জ আদায় করিয়াছ কি?

সেই লোকটি বলিলঃ না। তখন নবী করীম (স) নির্দেশ দিলেনঃ

حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شِبْرَمَةَ -

তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ আদায় কর। তাহার পর শিব্‌রামা'র জন্য হজ্জ কর।

و منها صحة البدن فلا حج على المريض.... والشيخ الكبير الذى لا يثبت على الراحلة نفسه

(البدائع والصنائع ج ٢، ص ١٢١)

হজ্জ ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হইল শারীরিক স্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতা। অতএব রোগী ও বয়োবৃদ্ধ, যে নিজে যানবাহনে আরোহণ করিতে পারে না, তাহার উপর হজ্জ ফরয নয়।

প্রথমে উদ্ধৃত হাদীসের শেষভাগে রাসূলের কথাঃ তোমার পিতার পক্ষ হইতে হজ্জ কর ও উমরা কর। ইহার ভিত্তিতে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উমরা করা ওয়াজিব। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলিয়াছেনঃ

لَا أَعْلَمُ فِى إِيجَابِ الْعُمْرَةِ حَدِيثًا أَجْوَدُ مِنْ هٰذَا وَلَا أَصَحَّ مِنْهُ -

উমরা ওয়াজিব—এই কথা প্রমাণের জন্য এই হাদীসটি অপেক্ষা অধিক উত্তম ও অধিক সহীহ্ হাদীস আর একটিও আমার জানা নাই।

عَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا - قَالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا - (ترمذى، مسلم، حاكم)

বুরাইদাতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিল ও বলিলঃ আমার মা মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু হজ্জ করিতে পারে নাই। এখন আমি কি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিব। নবী করীম (স) বলিলেনঃ হ্যাঁ, তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ কর।
—তিরমিযী, মুসলিম, হাকেম

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হজ্জ না করিয়া মরিয়া গেলে তাহার পক্ষ হইতে অন্য কেহ তাহার হজ্জ করিতে পারে।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখিয়াছেনঃ

فِيهِ جَوَازُ الْحَجِّ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ مَعْضُوبًا -

যাহার উপর হজ্জ ফরয সে যদি কোন কারণে অক্ষম ও পঙ্গু হয়, তবে তাহার পক্ষ হইতে অন্য কাহারো হজ্জ করা জায়েয, ইহার দলীল এই হাদীসে রহিয়াছে।

ইমাম আবূ হানীফা, তাঁহার সঙ্গীদ্বয়, সওরী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাক রাহওয়াই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম মালিক, লাইস, হাসান ইবনে সালিহ বলিয়াছেনঃ

لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَحُجَّ -

কেহ অন্য কাহারো পক্ষ হইতে তাহার হজ্জ করিতে পারে না। তবে যে লোক হজ্জ না করিয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষ হইতে অন্য কেহ তাহার হজ্জ করিতে পারে।

ইবনে আবূ শায়বার হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ -

কেহ অন্য কাহারো পক্ষ হইতে হজ্জ করিবে না। কেহ অন্য কাহারো পক্ষ হইতে রোযা রাখিবে না।

ইবরাহীম নখয়ী এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

তবে ইমাম শাফেয়ী ও জমহুর ফিকাহবিদ বলিয়াছেনঃ

يَجُوْزُ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ سَوَاءٌ أَوْصٰى بِهِ أَوْ لَمْ يُوْصِ -

মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে অন্য কাহারো হজ্জ করা—তাহা মৃত ব্যক্তির ফরয হজ্জ হউক, কি মানতী হজ্জ—সম্পূর্ণ জায়েয। সেইজন্য সে অসিয়ত করিয়া গিয়া থাকুক, কি নাই করুক।

'হিদায়া' ফিকাহ্ গ্রন্থে বলা হইয়াছে, এই ব্যাপারে মূলনীতি হইল, মানুষের জন্য এই সুযোগ আছে যে, সে তাহার আমলের সওয়াব অন্য কাহারো জন্য উৎসর্গ করিয়া দিবে—তাহা নামায, দান-সাদকা, রোযা ইত্যদি যাহাই হউক না কেন। আহলি সুন্নাত অল্ জামা'আতের ইহাই মত।

হজ্জ ও উমরার প্রস্তুতি

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رض أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ -

(ترمذی، دارقطنی، بیہقی، طبرانی)

হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে,তিনি দেখিতে পাইলেন যে,নবী করীম (স) সেলাইযুক্ত পোশাক ছাড়িয়া দিয়া সেলাইবিহীন চাদর পরিধান করিয়া ইহ্রাম বাঁধিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং গোসল করিলেন।

ব্যাখ্যা এই হাদীস হইতে জানা যায়, হজ্জ বা উমরার জন্য প্রস্তুতি হিসাবে সর্বপ্রথম সেলাই করা জামা-কাপড় পরিহার করিতে হইবে এবং গোসল করিয়া ইহ্রাম বাঁধিতে হইবে আর রওয়ানা হওয়ার নিয়্যত করিতে হইবে।

ইহ্‌রাম বাঁধিবার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। ইহাই অধিকাংশ ফিকাহবিদের মত। ইহরামকারী পুরুষ হউক কি স্ত্রীলোক, হায়েযসম্পন্ন মহিলা হউক, কি নিফাসসম্পন্না—ইহারা সকলে ইহরামের নিয়্যতের গোসল করিবে। এই সময় গোসলের বিধান করার উদ্দেশ্য হইল পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ। কেননা মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতম স্থানে যাইতে হইবে। এই সময় মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও সর্বোত্তমভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্তই আবশ্যক। নাসের ফকীহ এই গোসলকে ওয়াজিব বলিয়াছেন। ইহা তাঁহার একার মত। অন্যান্য সকলের মতে ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কিদা। ইহা তরক করা—গোসল না করিয়া ইহরাম বাঁধা—মাকরূহ্। ইমাম শাফেয়ী এই বিষয়ে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ইবনুল মুনযির লিখিয়াছেন, শরীয়ত-অভিজ্ঞ সমস্ত লোক এই মত দিয়াছেন যে, গোসল না করিয়াও ইহরাম বাঁধা জায়েয। ইহরামের জন্য গোসল করা যে ওয়াজিব নয়, ইহা সর্বসম্মত। তবে ইমাম হাসান বসরী বলিয়াছেন, যদি কেহ ভুলবশত গোসল না করিয়া থাকে, তবে যখন স্মরণ হইবে, তখন গোসল করিয়া লইবে।

ইহরাম বাঁধিয়া কি ধরনের পোশাক পড়িতে হইবে, এই পর্যায়ে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانَ وَلَا الْخُفَّيْنِ اِلَّا اَنْ لَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ـ (رواه الجماعة)

রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহরামকারী কি পোশাক পড়িবে? জবাবে তিনি বলিলেনঃ ইহরামকারী সেলাই করা জমা কোর্তা পরিবে না, পাগড়ী বাঁধিবে না, মাথায় টুপি বা মাথা বন্ধ থাকে—এমন কোন চাদর ইত্যাদি পরিবে না। এমন কোন কাপড়ও পরিবে না, যাহাতে জাফরান ইত্যাদির রঙ লাগা আছে। পায়ে মোজা পড়িবে না। তবে যদি কাহারো জুতা না থাকে, তাহা হইলে 'মোজা' পরিতে পারে। সেই 'মোজা' কাটিয়া পায়ের গিড়ার নীচে পড়ে—এমন বানাইয়া লইতে হইবে।

'ইহরামকারী কি পোশাক পরিবে' এই প্রশ্নের জবাবে নবী করীম (স) কতগুলি পোশাকের নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, এইগুলি পরিবে না। ইহার অর্থ এইগুলি ছাড়া অন্যান্য সবই পরা যাইতে পারে। এই নেতিবাচক জওয়াব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'অরস' ও জাফরান প্রভৃতি রঙ লাগানো কাপড় পরিতে নবী করীম (স) নিষেধ করিয়াছেন। সেই রঙে সুগন্ধি থাকিলে তাহা ধুইয়া ও রঙ দূর করিয়া পরিতে পারা যায়।

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاِحْرَامِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَلِحِلِّهٖ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ (بخارى، مسلم)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীমের ইহ্‌রামের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিবার পূর্বে এবং আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করার পূর্বে ইহ্‌রাম খুলিবার সময় তাঁহাকে এমন সুগন্ধি লাগাইয়া দিতাম, যাহাতে মিশক নামক সুগন্ধি থাকিত। পরে আমি রাসূলে করীম (স)-এর সিঁথিতে সুগন্ধির সাদাটে রঙ তাকাইয়া দেখিতে পাইতাম। এই সময়ও তিনি ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় হইতেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা উপরোদ্ধৃত হাদীসটিতে বুখারীর দুইটি স্বতন্ত্র বর্ণনাকে একত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দুইটি বর্ণনাই হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। হযরত আয়েশা হইতে ইহার প্রথম অংশ বর্ণনা করিয়াছেন কাশেম এবং শেষ অংশ বর্ণনা করিয়াছেন আস্‌ওয়াদ। এই দুইজন তাবেয়ী বর্ণনাকারীই হযরত আয়েশার ছাত্র। এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম ছাড়া নাসায়ী ও তাহাভী গ্রন্থদ্বয়েও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই হাদীসটি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, নবী করীম (স) ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন। ইহ্‌রাম থাকা অবস্থায় এই সুগন্ধির সাদাটে চাকচিক্য স্পষ্ট দেখা যাইত। অতএব ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা মুহূর্তে সুগন্ধির ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং ইহ্‌রাম অবস্থায় উহার সুগন্ধি থাকাও জায়েয। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও যুফার এই হাদীসের ভিত্তিতে বলিয়াছেনঃ ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে বৈধ যে কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার পর ইহ্‌রাম অবস্থায় উহার চিহ্ন ও গন্ধ বর্তমান থাকিলেও কোন ক্ষতি বা অসুবিধা নাই। তাহাতে কোন গুনাহ হইবে না। পুরুষ ও মেয়ে সকলের জন্য এই কথা। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, সওরী ও আওযায়ীও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু আতা, যুহরী সাঈদ ইবনে যুবায়র, ইবনে সীরীন ও হাসান বসরী বলিয়াছেন, ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নয়, যাহার গন্ধ ইহ্‌রাম অবস্থাও বর্তমান থাকিবে। ইহ্‌রাম বাঁধার পর সুগন্ধি লাগানো হারাম—যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ শেষ করিবে। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, তাহাভী প্রমুখ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এই মতের দলীল হিসাবে ইয়ালা ইবনে উমাইয়া বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করা হইয়াছে। হাদীসটি এইঃ ইয়ালা বলেনঃ আমরা রাসূলে করীমের সামনে উপস্থিত ছিলাম। এই সময় একটি লোক উপস্থিত হইল। তাহার পরনে একটি 'জুব্বা' ছিল এবং উহাতে 'খালুক' নামক সুগন্ধির চিহ্ন ছিল। সেই ব্যক্তি বলিলঃ

كَيْفَ تَأْمُرُنِىْ اَنْ اَصْنَعَ فِىْ عُمْرَتِىْ -

হে রাসূল, আমি উমরা করিতে যাইতেছি। এই কাজ আমি কিভাবে করিব, তাহা আমাকে বলিয়া দিনঃ

রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ

اِخْلَعْ عَنْكَ هٰذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ اَثَرَ الْخَلُوْقِ وَاصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِىْ حَجِّكَ،

(بخارى، مسلم، مسند احمد)

তুমি তোমার পরিধানের এই জুব্বাটি খুলিয়া ফেল এবং তোমার হইতে খালুকের চিহ্ন ধুইয়া ফেল। অতঃপর তোমার উমরায় তা-ই কর, যাহা তোমরা হজ্জ পালনে করিয়া থাকে।

—বুখারী, মুসীলম, মুসনাদে আহমদ

এই নির্দেশ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে,ইহ্রাম অবস্থায় পোষাকে বা দেহে কোনরূপ সুগন্ধির চিহ্ন বর্তমান থাকা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহা হইতে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ইহ্রামের প্রাক্কালে সুগন্ধি লাগানো জায়েয মনে করা হাদীস বিচারের নিয়মে যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা লোকটির জুব্বায় 'খালুক' লাগানো ছিল, শরীরে নয়। আর 'খালুক' যেহেতু জাফরান ধরনের রঙ, আর জাফরান ব্যবহার পুরুষের জন্য সব সময়ই নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনা ঘটিয়াছিল 'জেয়ের রেনা' নামক স্থানে, অষ্টম হিজরী সনে মক্কা বিজয়ের পর। আর হযরত আয়েশা বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসে সুগন্ধি লাগানোর কথা বলা হইয়াছে দশম হিজরী সনে রাসূলে করীমের বিদায় হজ্জ উপলক্ষে ইহ্রাম বাঁধার সময়। ইহা উক্ত ঘটনার অনেক পরের ব্যাপার। ইহাই রাসূলে করীম (স)-এর শেষ হজ্জ যাত্রা ও শেষ ইহ্রাম বাঁধা। কেননা নবী করীম (স) হিজরতের পর এই বিদায় হজ্জ ছাড়া অন্য কোন হজ্জ করেন নাই, ইহা সর্বসম্মত।

তৃতীয়ত লোকটি হয়ত ইহ্রাম বাঁধার পর সুগন্ধি ব্যবহার করিয়াছিল। এই কারণে উহার চিহ্ন ধুইয়া ফেলিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। তবে কেহ কেহ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যা দিয়াছেন এই বলিয়া যে, নবী করীম (স) সুগন্ধি ব্যবহার করার পর গোসল করিয়াছেন। তাহাতে উক্ত সুগন্ধি ইহ্রাম বাঁধার পূর্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ইমাম তাহাভী ও কাযী ইয়ায প্রমুখ এই ব্যাখ্যার আলোকে ইহ্রাম বাঁধার প্রাক্কালে সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ মনে করিয়াছেন।

(عمدة القارى - بلوغ الامانى)

তালবিয়া পাঠ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ - لَا شَرِيْكَ لَكَ - (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) এই ভাষায় তালবিয়া পড়িতেনঃ (উহার তরজমা) উপস্থিত হইয়াছি তোমার সমীপে, হে আমাদের আল্লাহ্, উপস্থিত হইয়াছি। তোমার আহবানে সাড়া দিতেছি, কেহই তোমার শরীক নাই। আমরা তোমার আহবানক্রমে হাজির হইয়াছি। নিঃসন্দেহে সমস্ত তা'রীফ-প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, তোমার জন্যই। আর সব মালিকানা ও শাসন ক্ষমতা তোমাতেই নিবদ্ধ। কেহই তোমার শরীক নাই।
—তিরমিযী

ব্যাখ্যা হজ্জের বা উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া কা'বা শরীফের দিকে রওয়ানা হইতেই উচ্চস্বরে কতগুলি কালিমা পাঠ করিতে হয়। ইসলামী পরিভাষায় উহাকে 'তালবিয়া পাঠ' বলা হয়। হযরত

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ - لَا شَرِيْكَ لَكَ -

আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বর্ণনা মতে নবী করীম (স) এই সময় যে তালাবিয়া পাঠ করিতেন, তাহার ভাষায় এইঃ

এই কালিমার প্রথম ও বারবার ব্যবহৃত শব্দ হইতেছে لَبَّيْكَ লাব্বাইকা। 'লাববাইকা' শব্দটি اَلْبَابُ 'তালবিয়াতুন' হইতে গৃহীত।

ইহার অন্য অর্থঃ

اَلْبَيْتُ يَارَبِّ بِخِدْمَتِكَ اِلْبَابًا بَعْدَ اِلْبَابٍ -

আমি উপস্থিত হইয়াছি হে আল্লাহ! তোমারই সমীপে যথাযথভাবে একবারের পর আর একবার, বারবার।

اِلْبَابٌ অর্থ কোন স্থানে দণ্ডায়মান হওয়া।

ইহার অন্য অর্থঃ

اَقَمْتُ عَلٰى طَاعَتِكَ اِقَامَةً بَعْدَ اِقَامَةٍ -

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আনুগত্য ও হুকুম পালনের কাজে একবারের পর আর একবার—বারবার প্রস্তুত হইতেছি, দাঁড়াইয়াছি।

অন্য এক মতে ইহার অর্থঃ

اَجَبْتُ دَعْوَتَكَ اِجَابَةً بَعْدَ اِجَابَةٍ -

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আহবানে সাড়া দিয়াছি একবারের পর আর একবার, বারবার।

অপর এক মতে এই কালিমার অর্থঃ

اِتِّجَاهِىْ وَقَصْدِىْ اِلَيْكَ -

আমার সমস্ত সত্তা ও সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তোমার দিকেই নিবদ্ধ হে আল্লহ্।

এইরূপ কালিমা বলার কারণ হইল, ইহ্রাম বাঁধিয়া যখন একজন লোক কা'বা শরীফের দিকে রওয়ানা হয়, তখন সে কার্যত আল্লাহ্ তা'আলার আহবানে সাড়া দেয়,তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার ঘরের হজ্জ (বা উমরা) করার জন্য আহবান জানাইয়াছেন। সে এই আহবান কবুল করিয়া তাহার ঘরে উপস্থিত হইয়াছেঃ

مَعْنَى التَّلْبِيَةِ اِجَابَةُ دَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ حِيْنَ اَذَّنَ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ -

আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে হযরত ইবরাহীম (আ) জনগণকে আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করার জন্য যে আহবান জানাইয়াছিলেন, নেই আহবানেরই সাড়া দেওয়া হইতেছে তালবিরয়া পড়িয়া। তালবিয়ার ইহাই অর্থ।

বস্তুত হযরত ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ্র ঘরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে এই ঘরের হজ্জ করার জন্য জনতাকে আহবান জানাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। তখন তিনি বলিয়াছেনঃ رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِىْ

হে আল্লাহ্! আমার কণ্ঠস্বর তো লোকদের পর্যন্ত পৌছিবে না।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ أَذِّنْ وَعَلَيَّ الْبَلَاغُ

তুমি লোকদিগকে ডাক তো দাও। লোকদের পর্যন্ত সে ডাক পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমার।

তখন হযরত ইবরাহীম (আ) ঘোষণা দিলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔

হে জনগণ! আল্লাহ্র এই মহান পবিত্র ও প্রাচীনতম ঘরের হজ্জ করা তোমাদের জন্য কর্তব্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই আহবান আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিধ্বনিত ও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অতঃপর যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে এই আহবানের সাড়া ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। এখন পর্যন্ত পৃথিবীর দূরতম কোণ হইতে মানুষ এই তালবিয়া পড়িয়া আল্লাহ্র ঘরের দিকে রওয়ানা হইতেছে, তাহা কি তোমরা দেখিতে পাইতেছ না? এই সময় হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যে লোকই হজ্জ যাত্রা করিবে, সে-ই যাত্রারম্ভ হইতে হযরত ইবরাহীমের আহ্বানে সাড়া দিতে শুরু করিবে এই তালবিয়া পড়িয়া।

'তালবিয়া' শব্দগুলি কত প্রেরণাদায়ক, উদ্দীপনাপূর্ণ ও ঈমানের তেজবীর্য প্রকাশক, তাহা ইহার প্রত্যেকটি শব্দ লইয়া চিন্তা বিবেচনা করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং আল্লাহ্র ঘরের দিকে ইহ্রাম বাঁধিয়া রওয়ানা দেওয়ার কালে যে এই শব্দগুলি বলা যাইতে পারে—ইহা হইতে উত্তম কথা যে আর হইতে পারে না, তাহা অন্তর দিয়া বুঝিতে পারা যায়।

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ۔

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এবং সমস্ত নিয়ামত হে আল্লাহ্! কেবল তোমারই জন্য।

আর সব মালিকানা, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব সার্বভৌমত্বও তুমি ছাড়া আর কেহরই নয়। সর্বাবস্থায় প্রশংসা কেবল আল্লাহ্রই হইতে পারে, আল্লাহ্রই প্রশংসা করা যাইতে পারে। সর্বপ্রকার প্রশংসা সর্বাবস্থায় পাওয়ার অধিকার কেবলমাত্র তাঁহারই থাকিতে পারে। এই অধিকারের নিয়ামত দান ও বিতরণের অধিকারে হে আল্লাহ্ তোমার কেহই শরীক নাই। প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব সারেজাহানের উপর কেবলমাত্র তোমারই বিরাজ করিতেছে, বিরাজ করিতে থাকিবে।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র ঘরের পাদদেশে উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্যে দীনহীন বেশে যে লোক রওয়ানা হইয়াছে, যে লোক পিছনের সব বৈষয়িক আকর্ষণ পরিহার করিয়া সবকিছু একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য উৎসর্গ করিয়া আল্লাহ্র সন্নিকটে সমুপস্থিত হওয়ার জন্য যাত্রা করিয়াছে, তাহার কণ্ঠে এই ধরনের শব্দটি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে পারে। ইহাপেক্ষা এই সময়ের জন্য অধিক উপযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ ও কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়িতে পড়িতে রওয়ানা হইয়া যাইতেন। তিনি বলিতেনঃ

هٰذِهٖ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔

রাসূলে করীম (স)-এর তালবিয়া ইহাই। এই তালবিয়া পড়িতে পড়িতেই তিনি হজ্জ যাত্রা করিতেন।

সেই সঙ্গে তিনি নিজের তরফ হইতে কয়েকটি শব্দ অতিরিক্ত পড়িতেন। তাহা এইঃ

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبٰى اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا ۔

হাযির হইয়াছি হে আল্লাহ্। উপস্থিত হইয়াছি তোমার সমীপে। তোমারই ইবাদত ও বন্দেগীতে অধিক শক্তি অর্জনের জন্য, উহার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য। হে আল্লাহ্! সমস্ত কল্যাণ কেবলমাত্র তোমারই হস্তে নিবদ্ধ। সবই তোমার অনুগ্রহের দানমাত্র। সমস্ত লক্ষ্য—মনের ঝোঁক-প্রবণতা, আগ্রহ ও উৎসাহ কেবলমাত্র তোমার দিকেই নিবদ্ধ। তোমারই হস্তে সমস্ত কল্যাণ নিহিত, আমার কামনা ও প্রার্থনা কেবলমাত্র তোমারই নিকট। অন্য কোন দিকে নয়, অন্য কাহারো কাছে নয়। এমনিভাবে সমস্ত আমল তাঁহারই জন্য উৎসর্গীকৃত।

অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীর যে আমলই আমি করি, তাহা তোমারই জন্য করি, তোমারই সন্তোষ বিধানের জন্য করি। অথবা আমার যাহা কিছু আমল ইবাদত বন্দেগী তাহা সবই কেবলমাত্র তোমারই অনুগ্রহে, তোমারই দেওয়া সুযোগ সুবিধার কারণে। তুমি তওফীক না দিলে আমার দ্বারা কিছু হওয়া সম্ভবপর হইত না।

ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেনঃ ইহা একটি সহীহ্ হাদীস এবং এই পর্যায়ে হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত জাবির, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আয়েশা (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীস কয়টি যথাক্রমে ইমাম নাসায়ী, ইমমি আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ এবং ইমাম আহমদ ও ইমাম বুখারী নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম এইরূপই আমল করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্র অধিক তাজিম প্রকাশের উদ্দেশ্যে যদি কেহ রাসূলের তালবিয়ার বাক্যগুলি হইতেও অধিক ও অতিরিক্ত কিছু শব্দ বলে তবে তাহাতে কোন দোষ নাই। তবে রাসূলে করীম (স)-এর মূল তালবিয়াকে যথেষ্ট মনে করাই বাঞ্ছনীয়। এই সঙ্গে এই কথাও সত্য যে, হযরত ইবনে উমর 'নিজ হইতে অতিরিক্ত করিয়া বলিতেন' বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, আসলে তাহাও তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নয়; বরং তাহাও নবী করীম (স) হইতেই শুনিতে পাওয়া। তিনি নিজেই বলিয়াছেনঃ এই তালবিয়া আমি স্বয়ং নবী করীম (স) হইতেই মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছি।

(تحفة الاحوذى)

উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া

عَنِ السَّائِبِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِىْ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلَالِ اَوْ بِالتَّلْبِيَةِ ۔

(ترمذى، ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه، موطا امام مالك، حاكم، بيهقى)

হযরত সায়েব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ হযরত রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ হযরত জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে আদেশ করিলেন, আমি যেন আমার সঙ্গী-সাথিগণকে খুব উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়িতে আদেশ করি।

—তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাকেম, বায়হাকী

ব্যাখ্যা এখানে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে উহা তিরমিযী শরীফের ভাষা। ইহা হইতে জানা যায়, তালবিয়া উচ্চস্বরে পড়ার জন্য নবী করীম (স) তাঁহার সাহাবিগণকে আদেশ করিয়াছেন। কেননা হযরত জিবরাঈলই তাঁহাকে এইরূপ নির্দেশ দেওয়ার জন্য হুকুম দিয়াছেন। অতএব তালবিয়া উচ্চস্বরে পড়া কর্তব্য। কিন্তু কর্তব্য বলিতে কি বুঝায়? ইহাতে মতভেদ রহিয়াছে। বাহ্যত মনে হয়, ইহা ওয়াজিব। কিন্তু বেশী সংখ্যক ফিকাহবিদের মতে ইহা মুস্তাহাব। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُ هُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا۔ (بخارى)

নবী করীম (স) মদীনায় জুহরের নামায চার রাক'আত পড়িয়া (রওয়ানা হইলেন ও) যিল্ হুলাইফা পৌঁছিয়া দুই রাক'আত আসরের (কসর) নামায পড়িলেন। আর আমি তাঁহাদের সকলকে উচ্চস্বরে তালাবিয়া পড়িতে শুনিলাম। —বুখারী

এই হাদীসটির প্রথমাংশ হইতে সফরে কসর নামায পড়ার কথা জানা যায়। আর শেষাংশ হইতে মক্কাগামী কাফেলার লোকদের সকলকেই উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়িতে শোনার কথা বলা হইয়াছে। ইহাই এখানকার আলোচ্য। হাদীসের ভাষাঃ

تَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا অর্থ يَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য উচ্চস্বরে তাঁহারা তালবিয়া পড়িতেছিলেন।

যায়দ ইবনে খালেক বর্ণিত হাদীসের ভাষা হইলঃ

يَا مُحَمَّدُ مُرْ اَصْحَابَكَ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَاِنَّهَا شِعَائِرُ الْحَجِّ۔ (ابن ماجه)

হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার সঙ্গী-সাথীগণকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়ার জন্য আদেশ করুন। কেননা ইহা হজ্জের অন্যতম নিদর্শন। —ইবনে মাজাহ্

হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসের শেষ কথাটিও এইঃ উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া হজ্জের নিদর্শন বিশেষ।

আল-মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ

كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتّٰى تَبَحَّ اَصْوَاتُهُمْ۔

রাসূলে করীম (স)-এর সাহাবিগণ এমন উচ্চস্বরে তালবিয়া করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

আবূ যুবায়র বলিয়াছেনঃ

ثَلَاثَةُ اَصْوَاتٍ يُّبَاهِىْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ الْمَلَائِكَةَ اَلْاَذَانُ وَالتَّكْبِيْرُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ۔ (سنن سعيد بن منصور)

তিনটি ধ্বনি লইয়া আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের সম্মুখে গৌরব প্রকাশ করেন। সেই তিনটি হইলঃ আযান, আল্লাহ্‌র পথে তকবীর ধ্বনি এবং তালবিয়ার উচ্চ কণ্ঠস্বর।

হযরত সহল ইবনে সা'দ হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى مُنْقَطِعُ الْأَرْضِ مِنْ هُنَا وَهُنَا ـ (ترمذی، ابن ماجه، حاکم)

যে লোকই তালবিয়া পড়ে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ডান ও বামের সব গাছপালা ও পাথরও তালবিয়া পড়িতে থাকে। এমনকি, এখান হইতে সেখানে—পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে—চলিয়া যায় অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিলোক তাহার সহিত মিলিয়া তালবিয়া পড়িতে থাকে।

—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, হাকেম

এই হাদীস দুইটি হইতে উচ্চস্বরে তালবিয়া করার বরকত ও মাহাত্ম্য জানিতে পারা যায়। যাহেরী মাযহাবপন্থীদের মতে উচ্চস্বরে তালবিয়া করা ওয়াজিব। আর অন্ততঃ একবার হইলেও উচ্চস্বরে বলা ফরয। শুরুতে উদ্ধৃত হযরত সায়েব বর্ণিত হাদীসই তাঁহাদের দলীল। কেননা ইহাতে হযরত জিবরাঈলের তরফ হইতে পাওয়া নির্দেশের উল্লেখ হইয়াছে। আর أَمْر বা নির্দেশ যে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, তাহা সর্বজনমান্য।

বস্তুত তালবিয়া বলা শরীয়াতসম্মত, এই বিষয়ে পূর্ণ 'ইজমা' রহিয়াছে। তবে ইহাতে কয়েকটি মতের উল্লেখ হইয়াছে। একটি মত হইল, উহা সুন্নাত। ইমাম শাফেয়ী ও হাসান ইবনে হাই এই মত দিয়াছেন। দ্বিতীয় মত, ইহা ওয়াজিব। ইহা তরক হইয়া গেলে সেইজন্য কাফ্ফারা দিতে হইবে জন্তু যবাই করিয়া। ইমাম মালিক ও তাঁহার অনুসারীরা এইমত পোষণ করেন। তাঁহাদের যুক্তি হইল, তালবিয়া হজ্জ অনুষ্ঠানেরই একটা অংশ। আর যে লোক হজ্জের কোন অনুষ্ঠান তরক করিবে, তাহাকে অবশ্যই জন্তু জবাই করিয়া কাফ্ফারা দিতে হইবে, ইহা সর্ববাদীসম্মত। তৃতীয় মত হইল, তালবিয়া ইহ্‌রামের শর্তের মধ্যে গণ্য। এই তালবিয়া না করিলে ইহ্‌রামই সহীহ হইবে না। সওরী ও আবূ হানীফা (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা বলিয়াছেনঃ

لَا يَكُونُ مُحْرِمًا حَتَّى يُلَبِّيَ وَيَذْكُرَ وَيَسُوقَ هَدْيَةً ـ

তালবিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও কুরবানীর জন্তু যবাই-ক্ষেত্রে পাঠানো ব্যতীত একজন লোক ইহ্‌রামকারীই হইতে পারে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বলিয়াছেনঃ 'ইহ্‌রামের তালবিয়া নামাযের তাকবীর সমতুল্য। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস বলিয়াছেনঃ

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قَالَ الْإِهْلَالَ ـ

হজ্জের মাসসমূহে যে লোকই হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবে, সে-ই তালবিয়া বলিবে।

আতা, ইকরামা ও তাউস বলিয়াছেনঃ তালবিয়া বলা ছাড়া হজ্জই হয় না। ইবনুল হুমাম বলিয়াছেনঃ উচ্চস্বরে তালবিয়া বলা সুন্নাত। যদি কেহ উচ্চস্বরে না বলে তাহা হইলে সে ভুল করিবে। তবে সেজন্য কিছু কাফ্ফারা নাই। আর উচ্চস্বরে বলিতে গিয়া এমনভাবে যেন চীৎকার করা না হয়,

যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেন, দাউদ যাহেরীর মতে উচ্চস্বরে তালবিয়া বলা ওয়াজিব। মহিলাদের জন্য উচ্চস্বরে বলা নিয়ম নয়। বরং নিম্নস্বরে বলাই বাঞ্ছনীয়। (عمدة القارى - تحفة الاحوذى)

আল্লাহর ঘর দেখিয়া হাত তুলিয়া দোয়া করা

عَنْ مُهَاجِرِبْنِ عِكْرِمَةَ رَحـ قَالَ سُئِلَ جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضـ اَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ اِذَارَأَى الْبَيْتَ فَقَالَ حَجَجْنَامَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَكُنَّا نَفْعَلُهُ - (ترمذى، ابوداؤد، نسائى)

মুহাজির ইবনে ইকরামা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হইলঃ একজন লোক আল্লাহ্র ঘর দেখিতে পাইয়া তাহার হস্তদ্বয় উপরে উঠাইবে কি? তিনি উত্তরে বলিলেনঃ 'আমরা তো রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে হজ্জ করিয়াছি, তখন কি আমরা তাহা করিতাম'? —তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় একজন লোক যখন হেরেম শরীফে উপস্থিত হয় তখন সে পথমে আল্লাহ্র ঘর কা'বা শরীফ দেখিতে পায়। এই সময় হাত উপরে তোলা বাঞ্ছনীয় কিনা—এই প্রশ্নই হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞসা করা হইয়াছিল। জওয়াবে তিনি বলিলেনঃ আমরা তো রাসূলে করীমের সঙ্গে হজ্জ করিতে গিয়াছি। তখন কি আমরা ইহা করিতাম? ইহা অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন অর্থাৎ আমরা তাহা করিতাম না। যদি তাহা করা উচিত হইত, তাহা হইলে রাসূলে করীম (স) আমাদিগকে তাহা অবশ্যই বলিয়া দিতেন। আর তিনি ইহা বলেন নাই, আমরাও তাহা করি নাই। আবূ দাউদে এই বাক্যের ভাষা এইরূপঃ

فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ - তখন তিনি তাহা করেন নাই (হাত উপরে উঠান নাই)।

আর নাসায়ী শরীফে ইহার ভাষা হইলঃ

فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ - আমরা তখন ইহা করিতাম না।

এই দুইটি বাক্য স্পষ্ট নেতিবাচক উক্তি। তায়্যিবী বলিয়াছেনঃ ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফেয়ী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ আল্লাহ্র ঘর দেখিতে পাইয়া হাত উপরে তোলা জায়েয নয়। ইমাম আহমদ ও সুফিয়ান সওরী ইহার বিপরীত মত পোষণ করিতেন।

কিন্তু তায়্যিবীর এই কথা যথার্থ নয়। কেননা ইমামগণ হইতে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ্র ঘর দেখিতে পাইয়া কিংবা যে স্থান হইতে আল্লাহ্র ঘর দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে পৌঁছিয়া থামিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত উপরে তুলিয়া দোয়া করা সুন্নাত।

ইমাম শাফেয়ী ইবনে জুরাইজ হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَارَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا

وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا - (مسند الشافعى)

নবী করীম (স) যখন আল্লাহ্‌র ঘর দেখিতে পাইতেন, তখন দুই হাত উপরে তুলিয়া দোয়া করিতেন। বলিতেনঃ হে আল্লাহ্‌! এই ঘরের মর্যাদা, মাহাত্ম্য, সম্মান ও প্রতাপ বৃদ্ধি কর এবং উহার প্রতি সম্মান, মাহাত্ম্য, বিরাটত্ব ও মর্যাদা প্রকাশস্বরূপ যে লোক উহার হজ্জ করিবে বা উমরা করিবে তাহার সম্মান, মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও পূর্ণশীলতা বাড়াইয়া দাও। —মুসনাদে শাফেয়ী

ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌র ঘর দেখিয়া হাত উপরে তোলায় কোনই দোষ নাই। এই জন্য আমি উহা মাকরূহ মনে করি না, মুস্তাহাবও মনে করি না। ইবনে জুরাইজ বর্ণিত এই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আল-আস্‌কালানী আপত্তি তুলিয়াছেন। বায়হাকী বলিয়াছেন, সনদের দুর্বলতার কারণে আল-আসকালানী এই হাদীসটির প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। উপরন্তু আল্লাহ্‌র ঘর দেখামাত্র হাত তুলিবার ব্যাপারে কোন দলীলই পাওয়া যায় নাই। আর দলীল ছাড়া তো শরীয়াতের হুকুম প্রমাণিত হয় না। তবে আল্লাহ্‌র ঘর দেখামাত্র দোয়া করা সহীহ্‌ সনদে বর্ণিত হাদীস হইতে প্রমাণিত। হযরত উমর (রা) আল্লাহ্‌র ঘর দেখিয়া দোয়া করিতেন এই বলিয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ -

হে আল্লাহ্‌! তুমিই শান্তি দাতা। শান্তি তোমার নিকট হইতেই পাওয়া যায়। হে আমাদের আল্লাহ্‌, তুমি আমাদিগকে শান্তিতে জীবিত রাখ। —হাকেম, বায়হাকী

আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার দৌড়

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضٰى عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَّمَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ اَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهٗ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا اَظُنُّهٗ قَالَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ - (ترمذى، مسلم)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ নবী করীম (স) যখন মক্কা শরীফে উপস্থিত হইলেন, তখন 'মসজিদে হারাম'—হেরেম শরীফে প্রবেশ করিলেন। অগ্রসর হইয়া গিয়া 'হাজরে আসওয়াদ' স্পর্শ করিলেন, উহাকে ধরিলেন ও চুম্বন করিলেন। পরে তিনি তাঁহার ডান দিকে চলিয়া গেলেন ও তিনবার রমল করিলেন ও চারিবার হাঁটিলেন। পরে তিনি মকামে ইবরাহীমে আসিলেন। পড়িলেনঃ তোমরা মকামে ইবরাহীমে মুসাল্লা গ্রহণ কর। অতঃপর দুই রাক্‌'আত নামায পড়িলেন। তখন মকামে ইবরাহীম তাঁহার ও আল্লাহ্‌র ঘরের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। দুই রাক্‌'আত নামায পড়ার পর তিনি কালো পাথরের নিকট আসিলেন।

উহাকে স্পর্শ ও চুম্বন করিলেন। পরে তিনি সাফা পর্বতের দিকে বাহির হইয়া গেলেন। আমি মনে করি, এই সময় তিনি পড়িলেনঃ সাফা ও মারওয়ার পর্বতদ্বয় আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য।
—তিরমিযী, মুসলিম

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করার রীতি ও নিয়ম জানা যাইতেছে। স্বয়ং নবী করীম (স) কিভাবে তওয়াফ সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহাতে তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আর ইহাই মুসিলম উম্মতের জন্য আদর্শ। আল্লাহ্‌র ঘরের নিকটে উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র ঘরের এক কোণে প্রাচীরের সহিত গ্রথিত 'হাজরে আসওয়াদ' —কালো বর্ণের পাথরখানি খুব তাজিম ও আন্তরিকতা সহকারে স্পর্শ ও চুম্বন করিতে হয়। নবী করীম (স) তাহাই করিয়াছেন। ইহার পর ডান দিকে যাইয়া তওয়াফ শুধু করিতে হয়। এইভাবে মোট সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তন্মধ্যে তিনবার রমল করিতে হয় ও চারিবার সাধারণভাবে চলিতে হয়। 'রমল' শব্দের অর্থঃ

اَلسَّرْعُ فِى الْمَشْيِ وَهَزُّ مَنْكِبَيْهِ -

খুব দ্রুত চলা ও দুই কাঁধ নাড়ানো।

এই তওয়াফকে পরিভাষায় 'তওয়াফে কুদুম'—'উপস্থিত হওয়া মাত্র তওয়াফ' বলা হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ নবী করীম (স) তওয়াফ করা কালে এই দোয়া পড়িতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ - (البزار)

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি সন্দেহ, সংশয়, শির্‌ক, মুনাফিকী, হিংসা, বিভেদ ও খারাপ স্বভাব চরিত্র হইতে। —বাযার

এই তওয়াফ হজ্জের রুকন এবং ফরয। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ - (الحج: ٢٩)

এবং তাহারা যেন আল্লাহ্‌র মহান প্রাচীনতম ঘরের তওয়াফ করে।

তওয়াফ শেষ হইয়া যাওয়ার পর 'মকামে ইবরাহীমে' আসিতে হয়। হাদীসে বলা হইয়াছে,নবী করীম (স) এখানে উপস্থিত হইয়া পড়িলেনঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى -

ইহা কুরআন মজীদে সূরা আল-বাকারা'র ১২৫ আয়াতের অংশ। সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থ হইলঃ 'আমরা ঘরকে যখন জনগণের মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাপূর্ণ স্থান বানাইয়া দিলাম, তখন নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াইবার স্থানকে নামাযের জায়গা রূপে গ্রহণ কর।

'ইবরাহীমের দাঁড়াইবার স্থান' বলিতে সেই পাথরখানা বুঝানো হইয়াছে, যাহার উপর হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘর নির্মাণকালে দাঁড়াইয়াছিলেন। —বুখারী

হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেনঃ

رَاَيْتُ فِى الْمَقَامِ اَثَرَ اَصَابِعِهِ وَعَقِبِهِ وَاَخْمَصَ قَدَمَيْهِ غَيْرَ اَنَّهُ اَذْهَبَهُ مَسْحُ النَّاسِ بِاَيْدِيْهِمْ - (قشيرى)

আমি পাথরটিতে তাঁহার (হযরত ইবরাহীমের) অংগুলি ও গোড়ালীর চিহ্ন অংকিত দেখিয়াছি। উহাতে তাঁহার দুই পা বসিয়া গিয়াছিল। তবে লোকদের মর্দনে উহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

প্রথমে এই পাথরখানা কা'বা ঘরের প্রাচীরের সংলগ্ন রক্ষিত ছিল। বর্তমানে হযরত উমর ফারূক (রা)-ই উহা সরাইয়া রাখেন। তওয়াফের পর উহার উপর দাঁড়াইয়া দুই রাক্'আত নামায পড়িতে হয়। ইহাকে صَلٰوةُ الطَّوَافِ তওয়াফের নামায' বলে। রাসূলে করীম (স) এই নামাযের প্রথম রাক্'আতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ও দ্বিতীয় রাক্'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ পড়িয়াছেন। ইহার পর 'হাজরে আস্ওয়াদ'-এ আসিতে হয় ও উহাকে স্পর্শ ও চুম্বন করিতে হয়। ইহার পর 'সাফা' পর্বত হইতে 'মারওয়া' পর্বত পর্যন্ত সাতবার দৌড়ানোর কাজ করিতে হয়। নবী করীম (স) এইখানে আসিয়া কুরআনের আয়াত পাঠ করিয়াছিলেনঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ -

এই হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেনঃ এই হাদীসের বর্ণনানুযায়ীই তওয়াফ করা সর্বসম্মত নিয়ম।

হযরত জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ নবী করীম (স) সাফা পর্বতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেনঃ

نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ -

আল্লাহ্ যেখান হইতে শুরু করিয়াছেন, আমরাও সেখান হইতে শুরু করিতেছি।

অপর হাদীসে বলা হইয়াছে, সাফা-মারওয়ার 'সায়ী' (দৌড়) সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইলে সাহাবিগণ নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ

بِأَيِّهِمَا نَبْدَأُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

আমরা দুইটি পাহাড়ের কোনটি হইতে দৌড় শুরু করিব হে রাসূল?

জওয়াবে নবী করীম (স) বলিলেনঃ

اِبْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ -

আল্লাহ্ যে পাহাড়ের উল্লেখ প্রথমে করিয়াছেন, সেইটি হইতেই দৌড় শুরু কর।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের এই আয়াতে প্রথমে সাফা পর্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দুই পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানোর কাজ আমরাও শুরু করিব 'সাফা' পর্বত হইতে। কেননা কুরআনে উল্লেখের পরম্পরার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে শরীয়াতের বিধান রচনায়। অনেক ক্ষেত্রে এই পরম্পরা অনুসরণ করা ওয়াজিব; অনেক ক্ষেত্রে মুস্তাহাব। আয়াতে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতদ্বয়কে আল্লাহ্র شعار বলা হইয়াছে। شَعَائِرِ اللّٰهِ অর্থ أَعْلَامُ دِيْنِهٖ আল্লাহ্র দ্বীনের নিদর্শন।

ইহার মূল إِشْعَارٌ। যে জিনিসই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম, উহার যাহাই নিদর্শন বা চিহ্ন হইবে—যেমন নামায, দোয়া, কুরবাণী তাহাইঃ

شَعِيْرَةٌ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্র অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন বিশেষ।

আর হজ্জের নিদর্শন হইল, উহার বাহ্যিক অনুভবযোগ্য অনুষ্ঠানসমূহ। তওয়াফের স্থান, আরাফাতের ময়দান, যবাই করার জায়গা, সবই হজ্জের নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত। এখানে شَعَائِرُ বলিতে বুঝানো হইয়াছেঃ

اَلْمَنَاسِكُ الَّتِىْ جَعَلَهَا اللّٰهُ اَعْلَامًا لِطَاعَتِهٖ -

যেসব অনুষ্ঠানকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ইবাদত ও আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন তাহা।

অন্য কথায় যেসব কাজ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ইহা কেবলমাত্র আল্লাহ্রই জন্য করা হইতেছে, অন্য কাহারো জন্য নয়, তাহাই আল্লাহ্র شَعَائِرُ নিদর্শন।

আর 'সাফা' ও 'মারওয়া' পর্বতদ্বয় ইহার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এই দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহের অন্যতম। জমহুর ফিকাহবিদদের মত হইল, এই দৌড়ানো হজ্জের রুকন। ইহা না করিলে হজ্জ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা বলিয়াছেন, ইহা ওয়াজিব। ইহা না করিলে জন্তু যবাই করিয়া কাফ্ফারা দিতে হইবে। আতা বলিয়াছেন, ইহা সুন্নত। ইহা না করিলে কিছুই করিতে হইবে না। হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেনঃ

قَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَّتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا -

(بخارى، مسلم)

রাসূলে করীম (স) এই পর্বতদ্বয়ের মাঝে দৌড়ানোর নিয়ম স্থায়ীভাবে চালু করিয়া দিয়াছেন। কাজেই এই 'তওয়াফ'—দৌড়ানো তরক করিবার কাহারও অধিকার নাই। —বুখারী, মুসলিম

ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেন, যদি কেহ না দৌড়াইয়া ধীরগতিতে হাটে, তবে তাহা জায়েয হইবে। ইহাই ফিকাহবিদদের মত। ইমাম মালিক বলিয়াছেন, দৌড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে না দৌড়াইলে উহার 'কাযা' করা ওয়াজিব হইবে। (عمدة القارى - تحفة الاحوذى - بدائع الصنائع)

'কালো পাথর' চুম্বন

عَنْ عُمَرَ رضـ اَنَّهُ جَاءَ اِلَى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا اَنِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ - (بخارى، مسلم، ابوداؤد، ترمذى، نسائى)

হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি কালো পাথরের নিকট আসিলেন ও উহাকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর পাথরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ 'আমি নিশ্চিত জানি' তুমি একখানা পাথর মাত্র। তুমি কোন ক্ষতিও কর না, কোন উপকারও কর না। আমি যদি নবী করীম (স)-কে তোমাকে চুম্বন করিতে না দেখিতাম, তাহা হইলে আমি কখনই তোমাকে চুম্বন করিতাম না।

—বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর একটি আমলের বর্ণনা ও তাঁহার সেই সময় বলা একটি কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। কথাটি তিনি 'হাজরে আস্ওয়াদ' চুম্বন করার পর উহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। কথাটি হইল, আমি নিজে রাসূলে করীম (স)-কে তোমাকে চুম্বন করিতে না দেখিয়া থাকিলে আমি কখনই তোমাকে চুম্বন করিতাম না। কেননা তুমি একটা পাথর ছাড়া আর কিছুই নও। আর ক্ষতি বা উপকার কোন কিছুই করিবার তোমার কোন সাধ্য নাই (কিংবা কর না)।

হাদীস ব্যাখ্যাকারকগণ হযরত উমর (রা)-এর এই কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ইবনে জরীর তাবারী লিখিয়াছেনঃ হযরত উমর (রা) এই কথাটি বলিয়াছেন এই কারণে যে, তখনকার সময় বহু লোক নও মুসলিম ছিল। তাহারা মূর্তিপূজা ও শিরকী কাজকর্ম ত্যাগ করিয়াছিল তখনও খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয় নাই। হযরত উমর (রা) আশংকাবোধ করিয়াছিলেন যে, কালো পাথর স্পর্শ ও চুম্বন করা দেখিয়া অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা ইহাকে প্রাগ ইসলাম কালের আরবদের মূর্তিপূজার মতই মনে করিয়া বসিতে পারে। এই কারণে তিনি পাথর চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে জানাইয়া দেওয়া জরুরী মনে করিলেন যে, এই ইস্তিলাম—এই স্পর্শকরণ ও চুম্বন—আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন এবং রাসূলে করীম (স)-এর আদেশ পালন ছাড়া কোন উদ্দেশ্যেই করা হইতেছে না। ইহা হজ্জের অন্যতম নিদর্শন আর আল্লাহ্ তা'আলাই হজ্জের নিদর্শসমূহের তাজিম করার নির্দেশ দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শুধু স্পর্শ ও চুম্বন করাও জাহিলিয়াতের আরবদের মূর্তিপূজা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কাজ। কেননা তাহাদের বিশ্বাস ছিল, এই মূর্তিগুলি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করিয়া দিবে। হযরত উমর (রা) এই বিশ্বাসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন এই কথা বলিয়া যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি ক্ষতিও করিতে পার না, উপকারও করিতে পার না। আর যাহার ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা নাই, তাহার আরাধনা ও পূজা উপাসনা করার কোন কারণ বা যৌক্তিকতা নাই—কেহই তাহা করে না। এই ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই আছে। এইজন্য আরাধনা ও পূজা উপাসনা কেবল তাঁহারই করা যাইতে পারে, করা বাঞ্ছনীয় ও কর্তব্য। অন্য কাহারো বা কোন কিছুরই আরাধনা উপাসনা করা যাইতে পারে না।

মুহিব্ব তাবারী বলিয়াছেন, হযরত উমরের এই কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যখন দেখা গেল, কালো পাথর স্পর্শ করা হইতেছে, চুম্বনও করা হইতেছে, কিন্তু ইহার বোধগম্য বা অনুভবযোগ্য কোন কারণ পরিদৃষ্ট নয়, সাধারণ বিবেক বুদ্ধিতেও ইহা আসে না, তখন তিনি এই ব্যাপারে নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি পরিহার করিয়া সম্পূর্ণরূপে নবী অনুসরণের পন্থা গ্রহণ করিয়াছে।

ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেন, হযরত উমরের এই কথার তাৎপর্য হইল, সর্বক্ষেত্রে নবী করীমের পুরাপুরি অনুসরণ ওয়াজিব, যদিও কোন কোন কাজের অন্তর্নিহিত কারণ ও যৌক্তিকতা বোধগম্য হইবে না। যে লোকই ইহা জানিতে পারিবে, তাহারই উচিত উহা অনুসরণ করা। আর কালো পাথর চুম্বন উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও উহার অধিকার মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি মাত্র। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন পাথরকে অন্য পাথরের তুলনায় বেশী সম্মানিত করিয়াছেন, যেমন বিশেষ বিশেষ স্থানের মর্যাদা অধিক বিধান করিয়াছেন অন্যান্য স্থানের উপর এবং বিশেষ রাত্রের অধিক মর্যাদার কথা ঘোষণা করিয়াছেন অন্যান্য রাত্রের তুলনায়। ইহা তো জানা কথা। ইমাম নববী লিখিয়াছেন, 'হাজরে আসওয়াদ' স্পর্শও করিতে হয়, চুম্বনও করিতে হয়। আর রুকনে ইয়ামানীকে

শুধু স্পর্শ করিতে হয়, চুম্বন করিতে হয় না। যদিও হযরত ইবরাহীমের কায়েম করা খুটি হিসাবে দুইটিই সমান। আর পশ্চিম দিকের অবশিষ্ট দুইটি কোণ স্পর্শও করিতে হয় না, চুম্বনও নয়। কেননা উক্ত বৈশিষ্ট্য এই দুইটি 'কোণের' নাই।

'হাজরে আস্ওয়াদ' স্পর্শ ও চুম্বনের যৌক্তিকতা এই দিক দিয়াও যে, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ উহা জান্নাতের পাথরসমূহের অন্যতম। আর তাহাই যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা স্পর্শ ও চুম্বনের অর্থ জান্নাতের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন। দ্বিতীয়ত, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

اِنَّهُ يَمِيْنُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ - উহা পৃথিবীতে আল্লাহ্র দক্ষিণ হস্ত

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اِنَّ هٰذَا الرُّكْنَ الْاَسْوَدَ هُوَ يَمِيْنُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ يُصَافِحُ بِهٖ عِبَادَهٗ مُصَافَحَةَ الرَّجُلِ اَخَاهُ -

(فضائل مكة)

এই কালো পাথর পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র দক্ষিণ হস্ত। বান্দারা উহাকে স্পর্শ করিয়া কার্যত সেই হস্তের সহিতই কারমর্দন করে, যেমন একজন লোক তাহার ভাই'র সহিত করমর্দন করে।

অপর একটি বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হইয়াছেঃ

فَمَنْ لَّمْ يُدْرِكْ بَيْعَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فَقَدْ بَايَعَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ -

যে লোক রাসূলে করীমের হাত ধরিয়া 'বায়'আত' করিবার সুযোগ পায় নাই, সে যদি এই পাথর স্পর্শ ও চুম্বন করে, তবে সে যেন ঠিক আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকটই 'বায়'আত' করিল।

হযরত আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ

مَنْ فَاوَضَ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ فَكَاَنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمٰنِ - (ابن ماجه)

যে লোক 'কালো পাথর' ধরিল, সে যেন আল্লাহ্র 'হস্ত' ধারণ করিল।

মুহিবব্ তাবারী লিখিয়াছেন, সম্রাট বা শাহানশাহ্র সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহার হাত চুম্বন করা হয়, ইহাই নিয়ম। অনুরূপভাবে হাজী বা উমরাকারী সর্বপ্রথম যখন মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়, তখন যে 'জিনিস' আল্লাহ্র হস্তের স্থলাভিষিক্ত তাহা চুম্বন করাই বাঞ্ছনীয়, ইহাই সুন্নাত, রাসূলের আদর্শ।—বস্তুত ইহা একটা রূপক দৃষ্টান্ত মাত্র। আর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ্র মর্যাদা ও অধিকার বুঝানোতে কোন দোষ নাই। আর এই কারণেইঃ

مَنْ صَافَحَهٗ كَانَ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ كَمَا اَنَّ الْمَلِكَ يُعْطِى الْعَهْدَ بِالْمُصَافَحَةِ -

যে লোক 'কালো পাথরের' সহিত 'করমর্দন করিল' তাহার জন্য আল্লাহ্র নিকট একটা বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে, যেমন সম্রাট বা শাহানশাহ করমর্দনের মর্যাদা ও প্রতিশ্রুতি দেন।

এই হাদীস হইত জানা গেল, 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করা সুন্নাত। ইমাম তিরমিযী এই হাদীস উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, মুহাদ্দিসগণ এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। তাঁহারা 'কালো পাথর' চুম্বন করা খুবই পছন্দ করেন। তাঁহাদের কেহ যদি উহা করিতে সক্ষম না হয় কিংবা সেই পর্যন্ত

পৌছিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে নিজের হাত 'ইস্তিলাম' করেন ও চুম্বন করেন। অত্যন্ত ভীড়ের কারণে সেই পর্যন্ত পৌছিতে না পারিলে উহার দিকে মুখকরিয়া দাঁড়াইতে হয় এবং উহার মুখামুখী দাঁড়াইয়া তাকবীর উচ্চারণ করিতে হয়। ইহা ইমাম শাফেয়ীর মত। ইমাম মালিক ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, 'কালো পাথর' স্পর্শ করিবে; কিন্তু তাহা করিতে না পারিলে নিজের হাত চুম্বন করিবে না। 'জমহুর' ফিকাহ্‌বিদগণের মত হইল, উহা 'ইস্তিলাম' করিবে—স্পর্শ করিবে, পরে নিজের হাত চুম্বন করিবে। হযরত ইবনে উমর, আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ খুদরী, জাবির, আতা ইবনে আবূ রিবাহ্, ইবনে আবূ মুলাইকা, ইকরামা ইবনে খালিদ, সাঈদ ইবেন যুবায়র, মুজাহিদ ও আমর ইবনে দীনার প্রমুখ মনীষীরও এই মত। ইমাম আবূ হানীফা, আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমাদও এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন।

হযরত জাবির সম্পর্কে বর্নিত হইয়াছেঃ

بَدَأَ بِالْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ وَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ - (حاكم)

তিনি প্রথমেই হাজার আস্ওয়াদের নিকট উপস্থিত হইয়া উহাকে স্পর্শ করিলেন—জড়াইয়া ধরিলেন। তখন কান্নার ভাবের তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অজস্র ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি উহাকে চুম্বন করিলেন। উহার উপর তাঁহার হাত রাখিলেন এবং দুই হাত দ্বারা তাঁহার নিজের মুখমণ্ডল মর্দন করিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছেঃ اِنَّهُ قَبَّلَهُ ثَلَاثًا তিনি উহাকে তিনবার চুম্বন করিলেন। (নাসায়ী) আর একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছেঃ وَسَجَدَ عَلَيْهِ এবং উহার উপর সিজদাকরিয়াছেন। —হাকেম

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলে কমীম (স)-এর এই কথাটি বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اِنَّ لِهٰذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ يَشْهَدُ اِنْ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ (ابن خزيمة)

এই কালো পাথরখানির একটি জিহবা ও দুইট ওষ্ঠ রহিয়াছে। যে লোক উহার 'ইস্তিলাম' করিবে তাহার পক্ষে উহা কিয়ামতের দিন সত্যতার সাক্ষ্য দিবে।

মূল হাদীসে হযরত উমর ফারূকের উক্তির ফলশ্রুতি হইলঃ

اَلتَّسْلِيْمُ لِلشَّارِعِ فِىْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ وَحُسْنُ الْاِتِّبَاعِ فِيْمَا لَمْ يَكْشِفْ عَنْ مَعَانِيْهَا -

দ্বীন ও শরীয়াতের যেসব বিষয় ও ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা সহ উদ্‌ঘাটিত ও প্রকাশিত নয়, সেসব ক্ষেত্রে বিধানদাতার নিকট আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ অনুসরণ করা মহৎ শিক্ষা। ইহা ইসমলামী বিধানের মূল দর্শন।

আর ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেনঃ

فِيْهِ تَسْلِيْمُ الْحِكْمَةِ وَتَرْكُ طَلَبِ الْعِلَلِ وَحُسْنُ الْاِتِّبَاعِ فِيْمَا لَمْ يَكْشِفْ لَنَا عَنْهُ مِنَ الْمَعْنٰى -

শরীয়াতের যেসব বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ নয় তাহাতে যৌক্তিকতা ও কার্যকারণ অনুসন্ধান পরিহার ও পূর্ণমাত্রায় রাসূলে করীমের অনুসরণই হযরত উমরের উক্ত কথার বড় শিক্ষা।

ইহা হইতে আরো জানা গেল, 'জন-নেতা' যখন তাঁহার নিজের কোন কাজের প্রতিক্রিয়ায় সাধারণ লোকের আকীদা নষ্ট হওয়ার আশংকা বোধ করিবেন, তখন তাহার নিজের পক্ষ হইতেই বিষয়টির সব কিছু পুরাপুরি যৌক্তিকতা ও উহার যথার্থ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়া উহাকে সুস্পষ্ট করিয়া ও সকল সন্দেহ সংশয় দূরীভূত করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

(تحفة الاحوذى - عمدة القارى - معالم السنن - نبوى)

মিনায় উপস্থিতি ও অবস্থান

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا اِلٰى عَرَفَاتٍ - (ترمذى، ابن ماجه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) মিনায় আমাদের লইয়া যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর-এর নামায পড়িলেন। অতঃপর সকাল বেলায়ই আরাফাতের ময়দানের দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন।

—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা মিনা স্থানটি মক্কা ও মুযদালিফার মাঝখানে—মক্কা হইতে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। নবী করীম (স) মিনায় পূর্ণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার সময় পর্যন্ত অবস্থান করিলেন। ইহা যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ। এই দিনটিকে ইয়াওমুত তারভিয়া يَوْمُ التَّرْوِيَةِ বলা হয়। পরের দিন ফজরের নামাযের পর ও সূর্যোদয় হওয়ার পর এখান হইতে আরাফাত ময়দানের দিকে রওয়ানা হইয়া যাইতে হয়। এই দিন যে কোন সময় মিনায় উপস্থিত হওয়া চলে। তবে সুন্নাত হইল যুহরের নামায মিনায় উপস্থিত হইয়া পড়া। এখানে পূর্ণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িতে হয়। আর একটি রাত্র যাপন করিয়া পরের দিন সকালে সূর্যোদয় হইলে পর আরাফার দিকে যাইতে হয়। এই আট তারিখের পূর্বে মিনায় উপস্থিত না হওয়া সুন্নাত। ইমাম মালিক একদিন পূর্ণ উপস্থিত হওয়া মাকরূহ বলিয়াছেন। ইমাম নববী বলিয়াছেনঃ আট-ই যিলহজ্জের পূর্বে মিনায় উপস্থিত হওয়া সুন্নাতের পরিপন্থী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছেঃ

اِنَّهٗ كَانَ يُحِبُّ اِذَا اسْتَطَاعَ اَنْ يُّصَلِّىَ الظُّهْرَ بِمِنًى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ ذٰلِكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى - (مسند احمد)

সমর্থ হইলে 'তারভিয়া' দিবসে জুহরের নামায মিনায় পড়া তিনি পছন্দ করিতেন। তাহা এইজন্য যে, স্বয়ং নবী করীম (স) জুহরের নামায মিনায় পড়িয়াছেন।

আর হযরত ইবেন উমর (রা) সবচাইতে বেশী নবী করমি (স)-এর অনুসরণ করিতেন। তাঁহার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের জন্যই তাঁহার এইরূপ নীতি ছিল।

অতএব মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ও যুহর হইতে শুরু করা মুস্তাহাব। ইহাই জমহুর ফিকাহবিদদের মত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ

إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَلْيَخْرُجْ إِلَى مِنًى - (ابن منذر)

সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলিবে,তখন মিনার দিকে রওয়ানা হইয়া যাইবে।

আর মিনা হইতে আরাফায় যাওয়ার জন্য ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করা ও সর্যোদয়ের পর রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব। কেননা হযরত জাবির (রা) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ - (بخارى، مسلم)

অতঃপর নবী করীম (স) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন যতক্ষণ না সূর্যোদয় হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেনঃ

مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى (حاكم)

মিনায় জুহর হইতে পরের দিন ফজর পর্যন্ত এই মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইমামের (মুসলিম রাষ্ট্র নেতার) পড়ানো হজ্জের সুন্নাতের মধ্যে গণ্য। (تحفة الاحوذى - فقه السنة - بلوغ الامانى)

মিনায় কসর নামায

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رض قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ - (بخارى، مسلم، ترمذى)

হযরত হারিস ইবনে ওয়াহাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি নবী করীম (স)-এর সঙ্গে মিনায় দুই রাক'আত করিয়া নামায পড়িয়াছি। অথচ আমরা সংখ্যায় অনেক বেশী এবং ভয়-ভীতি হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদে ছিলাম। —বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী

ব্যাখ্যা মিনা মক্কা শরীফ হইতে এতটা দূর নয় যে, সেজন্য কসর পড়িতে হইবে। এবং সেখানে মুসলমানদের কোন ভয় ভীতি, বিপদ-আপদ কিংবা শত্রুর সঙ্গে মুখামুখী অবস্থা ছিল না, মুসলমানরা সংখ্যাও বেশী ছিল। তাহা সত্ত্বেও নবী করীম (স) মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই কসর পড়িয়াছেন—চার রাক'আত নামাযে দুই রাক'আত পড়িয়াছেন।

এই হাদীসটি হযরত ইবন মাসউদ হইতেও বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ -

আমি নবী করীম (স)–এর সঙ্গে মিনায় চার রাক্'আতের স্থলে দুই রাক্'আত (কসর) পড়িয়াছি।

কিন্তু অদূরবর্তী মক্কার স্থায়ী অধিবাসীদের জন্যও কসর করা কর্তব্য কিনা, এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেনঃ

لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَّقْصُرُوا الصَّلٰوةَ بِمِنًى اِلَّا مَنْ كَانَ بِمِنًى مُسَافِرًا -

মক্কার বাসিন্দারা মিনায় যাইয়া নামায কসর করিবে না। তবে মিনায় যে লোক মুসাফির হইবে, সে–ই কসর পড়িবে।

কেননা মিনায় কসর করা সফরের কারণে। ইহা হজ্জের অংশ নয়।

ইবনে জুরাইজ, সুফিয়ান সওরী, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল কাতান, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক এই মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলিয়াছেনঃ

لَا بَأْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ اَنْ يَّقْصُرُوا الصَّلٰوةَ بِمِنًى -

মক্কার স্থায়ী অধিবাসীদের জন্যও মিনায় কসর নামায পড়ায় কোন দোষ নাই।

এই মত দিয়াছেন ইমাম আওযায়ী, ইমাম মালিক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ও আবদুর রহমান ইবনে মাহদী প্রমুখ ফিকাহবিদ। তাঁহাদের মতে মিনায় কসর নামায পড়া হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে গণ্য। ইহা সফরের জন্য নয়।

ইমাম খাত্তাবী লিখিয়াছেনঃ 'রাসূলের সঙ্গে আমি মিনায় দুই রাক্'আত পড়িয়াছি।' সাহাবীর এই কথা মক্কার অধিবাসীদের জন্যও মিনায় কসর নামায পড়া জায়েয প্রমাণ করে না। নবী করীম (স) তথায় মুসাফির ছিলেন বিধায় কসর পড়িয়াছেন। মক্কাবাসীরা তথায় কি করিবে তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কসর পড়িবার নির্দেশ দিনে না। হযরত উরম ফারূক (রা) মিনায় কসর নামায শেষ করিয়া বলিতেনঃ

اَتِمُّوْا يَا اَهْلَ مَكَّةَ فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ -

হে মক্কাবাসীরা! তোমরা নামায পূর্ণ করিয়া পড়। আমরা মুসাফির হওয়ার কারণে দুই রাক্'আত, পড়িয়াছি। (معالم السنن - فتح البارى - تحفة الاحوذى -)

মিনা হইতে আরাফা যাত্রা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ غَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ صَبِيْحَةِ يَوْمِ

عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ۔ (ابو داؤد، مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (স) মিনা হইতে আরাফা যাওয়ার দিনের প্রাতঃকালে ফজরের নামায পড়া সম্পন্ন করার পর রওয়ানা হইলেন। পরে তিনি আরাফার নিকট পৌঁছিয়া 'নামেরাতা'য় অবতরণ করিলেন। উহা ইমামের সেই অবতরণ স্থান, আরাফার ময়দানের যেখানে সব সময়ই ইমাম অবতরণ করিয়া থাকে। ইহার পার জুহরের নামাযের সময় যখন হইল, নবী করীম (স) দ্বিপ্রহরকালীন প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে রওয়ানা হইয়া গেলেন। এইদিন তিনি জুহর ও আসরের নামায একসঙ্গে (অর্থাৎ একই সময় পর পর) পড়িয়াছেন। অতঃপর তিনি লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া ভাষণ দিলেন। পরে তিনি রওয়ানা হইলেন ও আরাফার ময়দানে অবস্থিতি গ্রহণ করিলেন। —আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা নবী করীম (স) মিনায় ফজরের নামায পড়ার পরও কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া ও সূর্যোদয়ের পর তথা হইতে আরাফার ময়দানের দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন। আরাফাতের ময়দানের নিকটবর্তী 'নামিরা' নামক স্থানে তিনি প্রথমে অবতরণ করিলেন। 'নামিরা' আরাফার পার্শ্ববর্তী স্থান হইলেও ইহা 'আরাফাতের ময়দানের' অন্তর্ভুক্ত নয়। এই স্থানটিতে মূল পাহাড়সহ পাথরগুলি পথিপার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় এবং আরাফাগামীর ডানদিকে পড়ে। এই স্থানটিই 'নামিয়া' নামে চিহ্নিত। নবী করীম (স) এবং তাঁহার পর খুলাফায়ে রাশেদুন আরাফা যাওয়ার পথে প্রথমে এই স্থানে অবতরণ করিয়াছেন।

এই স্থান হইতে নবী করীম (স) আরাফার মূল ময়দানের দিকে যাত্রা করিয়াছেন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়, যখন সূর্যতাপ খুব প্রখর হইয়াছিল ও জুহরের নামাযের সময় নিকটবর্তী হইয়াছিল। এই সময় তিনি জুহর ও আসরের নামায এক সঙ্গে আদায় করেন। ইহাকে جمع تقديم বলা হয়। অর্থাৎ পরবর্তী নামাযের সময় হওয়ার আগেই পূর্ববর্তী নামাযের সাথে সাথে উহা পড়িয়া লওয়া। নামায পড়ার পর তিনি সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণ দেওয়ার স্থানটিকে عرنة 'উরানী' বলা হয়। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য সকল ফিকাহবিদের মতে এই স্থানটিও মূল আরাফাতের ময়দানে গণ্য নয়। অবশ্য ইমাম মালিক ইহা হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে ইহা আরাফাতের মধ্যেরই একটি স্থান। এই স্থানে দাঁড়াইয়া নবী করীম (স) ভাষণ দিয়াছিলেন। সমবেত হজ্জ যাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া আরাফার দিনে এই স্থানে ভাষণ দেওয়া ইমামের জন্য কর্তব্য। জমহুর আলিমদের সম্মিলিত মতে এই ভাষণ দান সুন্নাত। ইমাম মালিক ও তাঁহার অনুসারীরা ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। শাফেয়ীর মতে হজ্জের চারিটি ভাষণ দিত হয়। একটি যিলহজ্জ মাসের সাত তারিখ জুহরের নামাযের পর কা'বা শরীফের পাদদেশে। দ্বিতীয় ভাষণ কুরবানীর দিবসে 'উনারা' উপত্যকায়। তৃতীয় ভাষণ কুরবানীর দিন, আর চতুর্থ ভাষণ আরাফার ময়দান হইতে বিদায়ের দিন। এই দিনটি আইয়্যামে তাশ্রীকের দ্বিতীয় দিন।

এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া নবী করীম (স) আরাফার ময়দানে অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি গ্রহণ করিলেন। ইহা 'জাবালে রহমত'-এর পাদদেশে পাথর বিছানো স্থান। আর 'জাবালে রহমত'— রহমতের পাহাড়টি আরাফাতের মূল যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে অবস্থান মুস্তাহাব। পাহাড়ের উপরে উঠিয়া অবস্থান করার একটা প্রবণতা সাধারণ হাজীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই স্থান ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান গ্রহণ সহীহ্ নয় বলিয়া ধারণা করা হয়। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা

মাত্র। সঠিক ও যথার্থ কথা হইল, আরাফাতের বিশাল ময়দানের যে কোন অংশে অবস্থান করার একটা ফযীলত রহিয়াছে। তাহা না পারিলে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী যে স্থানেই সম্ভব অবস্থান করিলে ফযীলত হইতে বঞ্চিত হইবে না।

·জুহর ও আসরের নামায এক সময়ে পড়ার জন্য আযান দেওয়ার ব্যাপারে দুইটি মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ সওর ও ইবনুল মুনযির-এর মত হইল, জুহরের নামাযের আযান দেওয়া হইবে, আসরের নামাযের জন্য নয়। কেননা নামাযের সময়টি হইল জুহরের। ইমাম তাহাভী দাবি করিয়াছেন, এই মতের উপর ইজমা হইয়াছে। কিন্তু ইমাম মালিক বলিয়াছেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য আযান ও ইকামত আলাদা আলাদা ভাবেই দিতে হইবে। ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই বলিয়াছেন, দুই ওয়াক্ত নামাযের প্রত্যেকটির জন্য ইকামত দিতে হইবে। কিন্তু আযান দিতে হইবে মাত্র এক ওয়াক্ত নামাযের। পূর্বোল্লেখিত মতের দলীল হইল হযরত জাবির বর্ণিত হাদীস। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ

ثُمَّ اَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ـ (مسلم)

অতঃপর আযান দিলেন, পরে ইকামত বলিলেন ও তাহার পর জুহরের নামায পড়িলেন। পরে আবার ইকামত বলা হইল ও আসরের নামায পড়িলেন। এই দুই নামাযে মধ্যে অন্য কোন নামায পড়েন নাই। —মুসলিম

এই বিষয়ে মুসলিম উম্মতের ইজমা অনুষ্ঠিত হইয়াছে যে, হাজী যদি ইমামের পিছনে নামায পড়ে তাহা হইলে এই দিনের জুহর ও আসরের নামায এক সময়ে পড়িয়া নিবে। যদি জামা'আতের সহিত নামায পড়িবার সুযোগ না পাইল, তবে একাকীও এই দুই নামায একসঙ্গে পড়িবে—ইহা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিয়াছেন, দুই নামায একসঙ্গে পড়া যাইবে ইমামের সঙ্গে পড়িলে একাকী পড়িলে নয়। (بلوغ الامانى ـ نبوى)

আরাফা যাওয়ার পথে তালবিয়া ও তাকবীর

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ الثَّقَفِىِّ رض اَنَّهُ سَاَلَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رض وَهُمَا غَادِيَانِ اِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ يَعْنِىْ يَوْمَ عَرَفَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ ـ (بخارى، نسائى، بيهقى، مسند احمد، ابن ماجه)

মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর সাকাফী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হযরত আনাস (রা)-এর সঙ্গে প্রাতঃকালে আরাফার দিকে যাওয়ার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ এই আরাফার দিনে আপনারা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে থাকিয়া পথ চলাকালে কি সব দোয়া-যিক্র করিতেন? উত্তরে হযরত আনাস বলিলেনঃ আমাদের মধ্যে কিছু লোক উচ্চস্বরে তালবিয়া করিতেন। কিন্তু কেহ উহার জন্য প্রতিবাদ বা সেইজন্য কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। তেমনি কিছু লোক তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছিলেন, সে বিষয়েও কেহ আপত্তি জানান নাই।

—বুখারী, নাসায়ী, বায়হাকী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা মিনা হইতে আরাফার ময়দানের দিকে যাওয়ার পথে তালবিয়া ও তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করা সম্পর্কে এই হাদীস। হযরত আনাস (রা) নবী করীমের সঙ্গী সাথী ও খাদিম হইয়া থাকার দরুন তাঁহার আমল সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিফহাল হওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে মুহাম্মাদ ইবেন আবূ

বকর সাকাফী তাবেয়ী তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে হযরত আনাস (রা) বলিলেনঃ আমাদের সঙ্গী-সাথীরা উচ্চস্বরে তালাবিয়া করিতেন, উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু কেহই সেইজন্য আপত্তি তুলেন নাই, কেহ উহার প্রতিবাদ করেন নাই--স্বয়ং নবী করীম (স)-ও।

বুখারী বর্ণিত অপর এক হাদীসের

كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ۔ (ابواب العيدين)

লোকেরা উচ্চস্বরে তালবিয়া করিত, কিন্তু কেহ উহার প্রতিবাদ করে নাই।

আর 'মুসলিম'-এর বর্ণনা হইলঃ

فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهِلُّ لَا يَعِيبُ اَحَدُنَا عَلٰى صَاحِبِهٖ۔ (بلوغ الاماني)

আমাদের মধ্যে কিছু লোক তাকবীরকারী ছিল। কিছু লোক তালবিয়াকারী; কিন্তু আমাদের কেহই তাহার সঙ্গীর এই কাজের দোষ ধরিত না।

এই হাদীসসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, মিনা হইতে আরাফার ময়দানের দিকে যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া ও 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া ধ্বনি উচ্চারণ করা মুস্তাবাহ। সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবী করীম (স)-এর সঙ্গে থাকিয়া এই কাজ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বা কোন সাহাবী এই কাজের প্রতিবাদ করেন নাই, ইহা করিতে নিষেধ করেন নাই। ফলে ইহা নবী করীম (স) কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। তবে তাকবীর ধ্বনির তুলনায় তালবিয়া বেশী পড়া হইত। জমহুর ফিকাহবিদগণ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। আরাফা দিবসের সকাল বেলায়ই তালবিয়া পড়া শেষ করিতে হইবে যাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন, আলোচ্য হাদীস উহার বিপরীত কথা প্রমাণ করিতেছে।

আরাফাতে অবস্থান

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيْلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَاَتَاهُ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَاَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَصَارَ يُنَادِىْ بِهِنَّ

(ابو داؤد، ترمذى، نسائى، ابن ماجه، مسند احمد)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'মার আদ-দায়লী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে আরাফায় অবস্থানরত দেখিতে পাইলাম। তখন নজদের অধিবাসী কিছুলোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা বলিলঃ হে রাসূল। হজ্জ কি রকমে—কি নিয়মে? উত্তরে নবী করীম (স) বলিলেনঃ আরাফাই তো হজ্জ। যে লোক মুযদালিফায় যাপন করা রাত্রির ফজরের নামাযের পূর্বে এখানে আসিয়া পৌছিবে, তাঁহার হজ্জ পূর্ণ হইয়া গেল। মিনায় অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট তিন দিন। যে লোক দুই দিনেই অবস্থান সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে তাহার কোন গুনাহ হইবে না। কেহ বিলম্বিত করিলে তাহাতেও কোন দোষ নাই। -পরে তিনি এক ব্যক্তিকে জন্তুযানে নিজের পিছনে বসাইয়া লইলেন। সেই লোক উক্তরূপ কথা ঘোষণা করিতে শুরু করিল।

ব্যাখ্যা নজদবাসীরা রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ كَيْفَ الْحَجُّ ইহার সোজা তরজমা হইল 'হজ্জ কিরূপ- কিরূপে হজ্জ করিতে হয়? কিন্তু নবী করীম (স) ইহার উত্তরে বলিলেনঃ اَلْحَجُّ عَرَفَةُ। ইহার তরজমাঃ আরাফা-ই হজ্জ। ইমাম শাওকানীর ভাষায় ইহার অর্থঃ

اَلْحَجُّ الصَّحِيْحُ حَجُّ مَنْ اَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ -

যে লোক আরাফা ময়াদনে অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট দিনে ময়দানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য পাইল, তাহার হজ্জই সহীহ্ হজ্জ।

ইজ্জুদ্দীন আবদুস সালাম বলিয়াছেনঃ জওয়াবটির পূর্ণরূপ হইলঃ

اِدْرَاكُ الْحَجِّ وَقُوْفُ عَرَفَةَ -

আরাফার ময়দানে অবস্থানই হজ্জ পাওয়ার কাজ।

ইমাম তিরমিযী লিখিয়াছেন, বিশেষজ্ঞগণ আরাফায় অবস্থান সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ

اِنَّ مَنْ لَّمْ يَقِفْ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ

যে লোক আরাফার ময়দানে ফজরের পূর্বে অবস্থান করে নাই, তাহার হজ্জ হারাইয়া গিয়াছে—হয় নাই।

অতএব কেহ যদি ফজর উদয় হওয়ার পর আরাফায় উপস্থিত হয়, তবে এই উপস্থিতি তাহার কোন কাজে লাগিবে না। তাহার হজ্জ হইবে না, হইবে উমরা। এই ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মত সম্পূর্ণ একমত। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে তাহাকে পরবর্তী বৎসর পুনরায় হজ্জ করিতে হইবে। (نيل الاوطار - تحفة الاحوذى - الفتح الربانى)

'আরাফাত' শব্দটি স্বতঃই বহুচন। অনেকে বলেন, ইহার আর কোন বহুবচন নাই। ইহার একবচন আরাফা' (عرفة)

আরাফা ময়দানের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, ইহার নামকরণ হইয়াছে ইহার চতুর্দিকের পরিবেশের অবস্থানুসারে। কেননা সমগ্র পরিবেশটি সুদূর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি সমন্বিত। কেহ বলিয়াছেন, এই বিশাল প্রান্তরের নাম 'আরাফা' রাখা হইয়াছে এইজন্য যে, এইখানে জনগণ একত্রিত হইয়া পরস্পরের সহিত পরিচিতি লাভ করে। কেননা 'আরাফা (عرف) শব্দের মূল অর্থ পরিচিতি। বলা হইয়াছে, হযরত আদম (আ) দুনিয়ায় আসিয়া ভারত অঞ্চলে অবতীর্ণ হইলেন এবং হাওয়া বিবি অবতীর্ণ হইলেন জিদ্দায়। পরে তাঁহারা দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ-বেদনা ও মিলন-কামনার পর এই আরাফার ময়দানে একত্রিত ও পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ফলে এই পরিচিতি লাভের দিনটিকে 'আরাফা দিবস' এবং এই স্থানটিকে 'আরাফাত' বলা হইতে লাগিল। এই মতও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, 'আরাফাত' শব্দটি 'আরাফ' হইতে নির্গত। ইহার অর্থ الطيب। সুগন্ধি। অর্থাৎ আরাফার ময়দান সুগন্ধিময় সুঘ্রানে মুখরিত। 'মিনা' ইহার ব্যতিক্রম। কেননা সেখানে ময়লা আবর্জনা ও রক্ত পূঞ্জীভূত হইয়া থাকে। এই কারণে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের নাম হইয়াছে আরাফাত। অন্যরা বলিয়াছেন, ময়দান ও দিনটির নাম 'আরাফা' রাখার মূল কারণ হইলঃ শব্দটি মূল অর্থ الصبر। 'সবর' বা ধৈর্য। কোন লোক যখন আল্লাহ্ ভীরু ও পরম ধৈর্যশীল হয়, তখন তাহাকে বলা হয় رَجُلٌ عَارِفٌ ধৈর্যশীল ও আল্লাহ্-ভীরু ব্যক্তি। আর আরাফার প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া হাজী অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী ও আল্লাহ্র প্রতাপে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। আল্লাহ্র নিকট দোয়া ও নানা ইবাদত করার ব্যাপারে এবং এখানে অবস্থানজনিত নানা অসুবিধা সৃষ্ট কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করার ব্যাপারে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও পরম সহিষ্ণু হইয়া থাকে। এ কারণে এই প্রান্তরের নাম 'আরাফাত—অনেক অনেক কষ্ট সহ্য করার স্থান এবং এই দিনটিকে 'আরাফার দিবস'—'অনেক দুঃখ কষ্ট

অকাতরে সহ্য করার দিন' বলিয়া অভিহিত করা হয়। 'আরাফাত' বহুবচনে ব্যবহৃত হয় এই কারণে যে, এই বিশাল ময়দানের প্রত্যেক অংশই আরাফা। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই ময়দানের কথা বলা হইয়াছিল। পরে তিনি বর্ণনানুযায়ী এই ময়দানটিকে চিনিয়া লইতে সক্ষম হন। এই কারণে এই নামকরণ হইয়াছে। দহহাক ও সুদ্দী প্রমুখ বলিয়াছেন, যেহেতু হযরত জিবরাঈল (আ) এই ময়দানে হযরত আদম (আ)-কে বলিয়াছেনঃ

اِعْتَرِفْ بِذَنْبِكَ وَاعْرِفْ مَنَاسِكَكَ -

আপনি আপনার গুনাহ স্বীকার করুন এবং আপনার হজ্জ ও যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীর নিয়ম কানুন জানিয়া চিনিয়া লউন।

এই কারণেই এই ময়দানটির এই নামকরণ করা হইয়াছে।

(تفسير روح المعانى للالوسى بغدادى - الجامع لاحكام القرآن للقرطبى -)

আরাফার ময়দান হইতে মুযদালিফা গমন

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ وَرِدْفُهُ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رض فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا يُجَاوِزَانِ رَاْسَهُ عَلٰى هَيْنَتِهِ حَتّٰى اَتٰى جَمْعًا ثُمَّ اَفَاضَ الْغَدَ وَرِدْفُهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رض فَمَا زَالَ يُلَبِّىْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - (مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) আরাফার ময়দান হইতে রওয়ানা হইলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) তাঁহার সঙ্গে আরোহী ছিলেন। উষ্ট্রটি তাঁহাকে লইয়া একটা পাক দিয়া আসিল-গেল এবং আসিল। এই সময় রাসূলে করীম (স)-এর দুইখানি হাত উর্ধ্বে এমনভাবে উত্তোলিত ছিল যে, হাত দুইখানি তাঁহার মস্তক অতিক্রম করিয়া যায় নাই। অতঃপর ধীর-মন্থর গতিতে তিনি চলিয়া গেলেন। শেষ পর্যন্ত মুযদালিফায় আসিয়া পৌছিলেন। ইহার পর পরের দিন রওয়ানা হইলেন। এই সময় তাঁহার সঙ্গে আরোহী ছিলেন হযরত ফযল ইবনে আব্বাস। তখন তিনি সব সময় তালবিয়া করিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জমরা আকাবায় প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন।

ব্যাখ্যা এই হাদীসটি কেবলমাত্র মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শব্দ ও ভাষায় হাদীসটি অন্য কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। তবে এই হাদীসটিই অর্থাৎ এই বক্তব্যটিই মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার ভাষা নিম্নরূপঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَاُسَامَةُ رض رِدْفُهُ قَالَ اُسَامَةُ فَمَا زَالَ يَسِيْرُ عَلٰى هَيْنَتِهِ حَتّٰى اَتٰى جَمْعًا -

রাসূলে করীম (স) আরাফার ময়দান হইতে রওয়ানা হইলেন। এই সময় হযরত উসামা হইবেন যায়দ (রা) তাঁহার সহ-আরোহী ছিলেন। অতঃপর তিনি খুব ধীর-মন্থর ও সম্ভ্রম সম্পন্ন গতিতে চলিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত মুযদালিফায় আসিয়া পৌছিলেন।

এই হাদীসের মূল বক্তব্য তিনটি। প্রথম, আরাফাত ময়দানের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর এই ময়দান হইতে রওয়ানা হইয়া যাইতে হয়। সূর্যাস্ত সম্পূর্ণরূপে হওয়ার পরই রওয়ানা হইতে হইবে।

যাইবার সময় পথে পথে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিতে হয়। নবী করীম (স) তাহাই করিয়াছেন' এই সময় দোয়া ও যিক্র করার নির্দেশ কুরআন মজীদে দেওয়া হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ - (البقرة)

তোমরা যখন আরাফাতের ময়দান হইতে রওয়ানা হইয়া যাইবে, তখন মুযদালিফার নিকটে আল্লাহ্র যিক্র করিবে।

ইমাম শাফেয়ী ও লাইস এই আয়াতের ভিত্তিতে মুযদালিফায় অবস্থান, যিকর ও তালবিয়া করাকে ফরয বলিয়াছেন। হানাফী মতে ফরয নয়। মূল হাদীসে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) এই সময় দুইখানি হাত উপরে তুলিয়া দোয়া করিয়াছেন। বস্তুত নবী করীম (স) ইস্তিস্‌কা নামাযের পর এবং এইখানের দোয়ার সময় হাত তুলিয়াছেন, ইহার উল্লেখ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সময় হাত তুলিয়া দোয়া করিয়াছেন, এমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে এই কথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মুনাজাতে হাত তুলিলে সেই হাত যেন মাথার উপরে উঠিয়া না যায়— নবী করীম (স)–এর হাত তাহা যায় নাই। ময়দান হইতে রওয়ানা হইয়া খুব ধীর স্থির ও গাম্ভীর্য সহকারে চলিতে হইবে। চলার পথে লোকদিগকে কোন কষ্ট দেওয়া চলিবে না। তবে যদি প্রশস্ততা পাওয়া যায়, তাহা হইলে দ্রুতগতিতে চলা সুন্নাত। কেননা মাগরিবের নামায এশার সময়ে মুযদালিফায় পৌঁছিয়া পড়িতে হইবে।

আরাফাতের ময়দান হইতে রওয়ানা হইয়া যে স্থানে অবস্থান করিতে হয়, উহার প্রচলিত নাম 'মুযদালিফা'। এই স্থানের নাম 'মুযদালিফা' হওয়ার কারণ বলা হইয়াছেঃ

لِأَنَّهُمْ يَزْدَلِفُوْنَ إِلَى اللَّهِ أَيْ يَتَقَرَّبُوْنَ بِالْوُقُوْفِ فِيْهَا -

কেননা এই স্থানে অবস্থান করিয়া লোকেরা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে।

কিন্তু উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়ে এই স্থানকে 'جَمْعًا' বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ 'একত্রিত করণ'.

যেহেতু এইখানে পৌঁছিয়া হাজীগণকে মাগরিব ও এশার নামায এক সময়ে 'জমা করিয়া পড়িতে হয়, এই কারণেই এই স্থানটিকে 'جَمْعًا' বলা হইয়াছে। হাদীসে এই জমা করিয়া নামায পড়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। এই স্থানের আর এক নাম 'মাশআরিল হারাম'।
(تفسير القرطبي - بلوغ الأماني)

عَنْ عَلِيٍّ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى جَمْعًا فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلَوتَيْنِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ أَتَى قُزَحَ فَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِي ثُمَّ حَبَسَهَا ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ وَسَارَ حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ - (مسند احمد)

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) মুযদালিফায় উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি লোকদের লইয়া মাগরিব ও এশার নামায পড়িলেন ও এখানেই রাত্রি যাপন করিলেন। সকাল হইলে পর তিনি 'কুযাহা' পাহাড়ে আসিলেন ও উহার উপরে অবস্থান গ্রহণ

করিলেন। পরে বলিলেন, ইহা অবস্থানের স্থান এবং মুযদালিফা সবটাই অবস্থান-স্থান। পরে তিনি রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং 'মুহাসৃসর'–এ উপস্থিত হইলেন ও উহার উপর অবস্থান করিলেন। তিনি তাঁহার উষ্ট্রীকে চাবুক মারিলেন। উষ্ট্রী দ্রুত চলিতে লাগিল। এইভাবে তিনি উপত্যকা অতিক্রম করিয়া গেলেন। পরে উহাকে থামাইলেন এবং আব্বাস পুত্র ফযল (রা)–কে উষ্ট্রযানের পিছনে বসাইলেন। চলিতে চলিতে পাথর নিক্ষেপ স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি পাথর নিক্ষেপ করিলেন। ইহার পর তিনি কুরবানী করিবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আসিলেন। বলিলেনঃ ইহা কুরবানী করার স্থান এবং মিনা'র যে কোন স্থানেই কুরবানী করা যায়। —মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা আরাফাতের ময়াদন হইতে রওয়ানা হইয়া যাওয়ার পর হইতে মিনা'তে কুরবানী করা পর্যন্ত নবী করীম (স) যত কাজ করিয়াছেন, এই হাদীসে উহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। নবী করীম (স) যাহা করিয়াছেন তাহা হজ্জের ধরাবাঁধা নিয়ম ও পদ্ধতি বলিয়াই করিয়াছেন এবং হাজীকে এই সবই করিতে হয়।

হাদীসটিতে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) মুযদালিফায় উপস্থিত হইয়া মাগরিব ও এশা'র নামায পড়িয়াছেন। অর্থাৎ এশার নামাযের সময় হইলে প্রথমে মাগরিবের নামায পড়িয়াছেন এবং পরে এশা পড়াইয়াছেন। এই নামায পড়া সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ وَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ۔

নবী করীম (স) মুযদালিফায় উপস্থিত হইয়া দুই ওয়াক্তের (মাগরিব ও এশার) নামায একত্র করিয়া (এক সময়ে) পড়িলেন। —আবূ দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ

হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) বলিয়াছেনঃ

جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ (زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ) وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا۔

রাসূলে করীম (স) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায 'জমা' করিয়া পড়িয়াছেন। (অপর এক বর্ণনায় এই কথাও আছেঃ) এবং এই দুই নামাযের মাঝখানে কোন নফল পড়েন নাই।

হযরত আবূ আইউব আনসারী ও অন্যান্য সাহাবীদের হইতেও এই রূপ অর্থের বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

এই দুই ওয়াক্ত নামায এক সঙ্গে পড়া সম্পূর্ণ শরীয়াতসম্মত, সহীহ্ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। মুসাফির মুযদালিফায় এই দুই নামায এশার নামাযের সময় পড়া সম্পূর্ণ জায়েয। যদি মাগরিবের নামাযের সময়ে কিংবা মুসদালিফা ছাড়া অন্য স্থানে এক সঙ্গে ইহা পড়া হয়, তাহা হইলে শাফেয়ী মাযহাবে জায়েয হইবে। আতা,ওরওয়া ইবনুল যুবায়র কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও সাঈদ ইবনে যুবায়র প্রমুখও এই মত দিয়াছেন। ইমাম মালিক, ইমাম আহ্‌মদ ইসহাক, ইমাম আবূ ইউসুফ, আবূ সওর, ইবনুল মুনযির, সুফিয়ান সওরী ও ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখের মতে মুযদালিফা পৌঁছার আগে এবং এশার সময় হওয়ার পূর্বেই পড়িলে তাহা জায়েয হইবে না। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ীর মতে কেবলমাত্র প্রথম নামাযের জন্য আযান দেওয়া হইবে। আর ইকামত বলা হইবে উভয় নামাযের জন্য। ইমাম মালিকের মতে উভয় নামাযের জন্য আলাদা ভাবে আযান–ইকামত বলা হইবে। হানাফী মাযহাব মতে কেবলমাত্র প্রথম নামাযের জন্য আযান–ইকামত বলা হইবে, দ্বিতীয় নামাযের জন্য নয়।

মুযদালিফায় থাকা অবস্থায় খুব বেশী দোয়া করা, লা–ইলাহা কালিমা পড়া আল্লাহু আকবর বলার ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এই দোয়া বেশী বেশী পড়া যায়ঃ

(سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ)

ইহা ছাড়া খুব বেশী 'তালবিয়া' পড়া এবং যাহা ইচ্ছা নেক দোয়া করা উচিত। হযরত ফজল ইবনে আনাস (রা) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসের শেষভাগে রাসূলে করীম (স) সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ـ

নবী করীম (স) জামরা আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করার সময় পর্যন্ত তালবিয়া পড়িতেছিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায়, পরের দিন—কুরবানীর দিন পাথর নিক্ষেপ শুরু করা পর্যন্ত 'তালবিয়া' করা মুস্তাহাব। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও সুফিয়ান সওরী প্রমুখ এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য হাসান বসরী বলিয়াছেন, আরাফা দিবস পর্যন্ত তালবিয়া পড়িয়া বন্ধ করিয়া দিবে।

(بلوغ الامانى - تحفة الاحوذى)

পাথর নিক্ষেপ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِيْ الْجَمْرَةَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُوْلُ لِتَأْخُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ فَاِنِّيْ لَا اَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا اَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِهٖ ـ

(مسلم، مسند احمد، نسائى)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি রাসূলে করীম (স)–কে দেখিয়াছি; তিনি কুরবানীর দিনে তাঁহার জন্তু যানে আরোহী থাকা অবস্থায়ই পাথর নিক্ষেপ করিতেছেন এবং বলিতেছেনঃ তোমরা আমার নিকট হইতে তোমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়া লও। কেননা আমি জানি না, হয়ত আমার এই হজ্জের পর আর কোন হজ্জ আমি করিব না। —মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর দিন। এই দিন মুযদালিফা হইতে মিনায় উপস্থিত হইয়া চারিটি কাজ করিতে হয়। তাহার মধ্যে সর্বপ্রথম হইল জামরা আকাবা'য় পাথর নিক্ষেপ করা। জামরা আকাবা'র পাথর নিক্ষেপ (رمى) ফিকাহর দৃষ্টিতে ওয়াজিব। ইহা করা না হইলে একটি জন্তু কুরবাণী করা কর্তব্য হইয়া যায়।

আলোচ্য হাদীসটিতে সাহাবী হযরত জাবির (রা) নবী করীম (স)–এর এই পাথর নিক্ষেপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নবী করীম (স)–এর কথা হইতেই এই কথা সুস্পষ্ট হয় যে,ইহা নবী করীম (স)–এর বিদায় হজ্জ–এর সময়কার পাথর নিক্ষেপ সংক্রান্ত বিবরণ।

এই পাথর নিক্ষেপের কাজ কুরবানীর দিনে করিতে হয়, তাহা উপরিউক্ত হাদীসেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন্ সময়?—হযরত জাবির (রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীস সময়ের উল্লেখ করা হইয়াছেঃ

يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَاَمَّا بَعْدُ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ـ

কুরবানীর দিন সকাল বেলা। আর ইহার পরে সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িবে তখন।

সকাল বেলা পাথর নিক্ষেপ করাই যে উত্তম, তাহাতে কোন মতভেদ নাই। তবে ফজরের পূর্বে করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলিয়াছেনঃ অর্ধ রাতেরও পূর্বে করা যাইতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ প্রমুখ বলিয়াছেন, জাম্‌রার আকাবা'র পাথর নিক্ষেপ সূর্যোদয়ের পর ছাড়া করা যাইতে পারে না।

পাথর নিক্ষেপ কিভাবে করিতে হইবে? এই পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

اِسْتَبْطَنَ الْوَادِىْ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ عَلٰى حَاجِبِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ رَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ۔ (بخارى، مسلم، ترمذى)

তিনি উপত্যকার উপর উহার মাঝখানে দাঁড়াইয়া কা'বামুখী হইয়া ডানদিকে পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি সাতটি পাথর টুকরা নিক্ষেপ করিলেন। প্রতিটি পাথর টুকরা নিক্ষেপকালে তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলিতেছিলেন।

পাথর নিক্ষেপকালে 'আল্লাহু আকবার' বলার পরই এই দোয়া করাও সুন্নাতঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّعَمَلًا مَّشْكُوْرًا ۔

হে আল্লাহ্! ইহাকে 'হজ্জে মাবরূর' (যাহার পর সব গুনাহ মাফ হইয়া যায়) গুনাহ মাফী ও কবুল করা আমল বানাইয়া দাও।

ইহা হইতে জানা গেল প্রত্যেকটি পাথর টুকরা ভিন্ন ভিন্নভাবে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অবশ্য আতা ও ইমাম আবূ হানীফা বলিয়াছেন, একবারেই সাতটি টুকরা নিক্ষেপ করা হইলে নাজায়েয হইবে না, উহাই যথেষ্ট হইবে। (نيل الاوطار ۔ تحفة الاحوذى ۔ فقه السنة)

পাথর নিক্ষেপের পরবর্তী কাজ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ رَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ ذَبَحَ ثُمَّ حَلَقَ ۔ (مسند احمد)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) জাম্‌রা আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করিয়াছেন। অতঃপর কুরবানী দিয়াছেন। ইহার পর মাথা মুণ্ডন করিয়াছেন। —মুসনাদে আহমদ

ব্যাখ্যা মুযদালিফায় উপস্থিত হওয়ার পর শেষকালে তিনটি কাজ করিতে হয়। একটি জামরা আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা, কুরবাণী দেওয়া ও মাথা মুণ্ডন করানো। এই কাজ তিনটি এই পরম্পরা অনুযায়ী করা বাঞ্ছনীয়, ইহাই উত্তম। তবে যদি আগে পিছে করে, তাহাতে কোন দোষ হইবে না।

জাম্‌রা আকাবা'র পাথর নিক্ষেপই মূলত হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানের সর্বশেষ কাজ। ইহা হইয়া গেলেই বুঝিতে হইবে, হজ্জ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলিয়াছেনঃ

إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ -

পাথর নিক্ষেপ কাজ সম্পূর্ণ হইয়া গেলে অতঃপর স্ত্রীসঙ্গম ছাড়া আর সব কাজই 'হালাল' হইয়া যাইবে।

অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে যেসব কাজ হারাম হইয়া গিয়াছিল, অতঃপর সেই সব কাজই হালাল করা যাইবে। কেননা ইহ্‌রামই শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে স্ত্রী সঙ্গম করা এখন বন্ধ রাখিতে হইবে।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيْبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ -

রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, যখন তোমরা পাথর নিক্ষেপের কাজ শেষ করিলে ও মাথা মুণ্ডন করাইলে, অতঃপর তোমাদের জন্য স্ত্রীসঙ্গম ব্যতীত সুগন্ধি ব্যবহার, সেলাই করা কাপড় পরা এবং অন্যান্য সব জিনিসই হালাল হইয়া গেল।

অর্থাৎ অতঃপর মুমিনের জন্য জায়েয এমন সব কাজ করাই জায়েয। অতঃপর আর কিছুই নিষিদ্ধ থাকিল না। তবে স্ত্রীসঙ্গম এই সময়ও হালাল হইবে না। উপরিউক্ত তিনটি কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার পর এই দিনই চতুর্থ একটি কাজ করিতে হয়, তাহা হইল কা'বা ঘরের তওয়াফ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى -

(بخاری، مسلم، مسند احمد، بیہقی)

রাসূলে করীম (স) কুরবানীর দিনই কা'বা ঘরের তওয়াফ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মিনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং এখানেই জুহরের নামায পড়িলেন।

রাসূলে করীম (স) এই যে কা'বা ঘরের তওয়াফ করিলেন, ইহাকে তওয়াফে ইফাযা কিংবা তওয়াফে যিয়ারত' বলা হয়।

এই তওয়াফ হজ্জের রুকন। ইহা না করিলে হজ্জ পূর্ণ হইতে পারে না। এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই। এই তওয়াফের জন্য দুইটি সময়। একটি কুরবানীর দিন পাথর নিক্ষেপ করা, কুরবানী করা, মাথা মুণ্ডন করানো এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তওয়াফ করা। সন্ধ্যা পর্যন্ত বিলম্ব হইলেও দোষ নাই। আর দ্বিতীয় হইল, জায়েয সময়। ইমাম আবূ হানীফার মতে কুরবানীর পরের দিন প্রথম সূর্যোদয় কাল পর্যন্ত।

উপরিউক্ত হাদীসে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) মক্কা হইতে মিনায় ফিরিয়া আসিয়া এখানেই জুহরের নামায পড়িয়াছেন। কিন্তু হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ -

রাসূলে করীম (স) উষ্ট্রে আরোহণ করেন। কা'বা ঘরের 'তওয়াফে ইফাযা' করেন এবং মক্কা শরীফেই জুহরের নামায পড়িলেন

এই দুইটি বর্ণনায় স্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্য দূর করিয়া উভয় কথার মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ইমাম নববী বলিয়াছেনঃ রাসূলে করীম (স) দ্বিপ্রহরের পূর্বেই তওয়াফ শেষ করেন। পরে মক্কাতেই আউয়াল ওয়াক্তে জুহর পড়েন। অতঃপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সেখানে উপস্থিত সাহাবীদের সহিত আবার জুহর পড়েন। এইবারের নামায নফল মাত্র এবং এইরূপ নফল পড়া নবী করীম (স) হইতে প্রমাণিত। ইহা শরীয়াতসম্মত। ইমাম শাওকানী লিখিয়াছেনঃ নবী করীম (স) জুহরের নামায মক্কাতে পড়িয়া মিনায় ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, সেখানে উপস্থিত সাহাবিগণ জুহরের নামায পড়িতেছেন। তখন তিনিও জামা'আতে শরীক হইয়া গেলেন। কেননা রাসূলে করীম (স) নিজেই এই বিধান দিয়েছেন যে, একবার নামায পড়ার পর যদি দেখিতে পায় যে, সেই নামাযের জামা'আত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে সে নফল স্বরূপ সেই জামা'আতে শামিল হইয়া নামায পড়িতে পারে। (تحفة الاحوذى - بلوغ الامانى)

কুরবানী

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رض قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِىْ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ قُلْتُ مَالَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالصُّوْفُ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ ـ

হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূল! এই কুরবানী কি? নবী করীম (স) বলিলেনঃ তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীমের সুন্নাত। বলিলাম, উহা করিলে আমরা কি পাইব? বলিলেন, প্রত্যেকটি চুলের বিনিময়ে একটি করিয়া নেকী। জিজ্ঞাসা করিলামঃ ইয়া রাসূল! পশমের ব্যাপারে কি হইবে? বলিলেন, পশমের প্রত্যেকটি চুলের বদলে একটি নেকী পাওয়া যাইবে।

—ইবনে মাজাহ, হাকেম, আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমদ, আল–মুনযিরী

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে কুরবানীর মৌল ইতিহাসের দিকে ইংগিত করার সঙ্গে সঙ্গে উহার সুবিপুল সওয়াবের কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত মুসলিম সমাজে প্রতিবছর ঈদুল আযহাকালে যে পশু যবাই করা হয়, ইহার পিছনে একটি দীর্ঘ মর্মান্তিক ইতিহাস রহিয়াছে। সে ইতিহাস নবীকুল মধ্যমণি হযরত ইবরাহীম এবং তাহার প্রাণাধিক পুত্র (হযরত ইসমাইল)–কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। হযরত ইসমাঈল (অথবা হযরত ইসহাক) পিতা ইবরাহীমের অত্যন্ত প্রিয় ও প্রাণাধিক সন্তান ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা পিতা পুত্রকে অধিকতর ও উন্নততর মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উভয়কে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ)–কে নির্দেশ দিলেন তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবাই করিতে। পিতা পুত্রকে এই কথা বলিলে পুত্র বলিলেনঃ

يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ـ (الصافات ١٠٢)

হে পিতঃ আপনি নির্দেশ পালনে ব্রতী হউন। আমাকে আল্লাহ্ চাহিলে ধৈর্যশীলই পাইবেন।

ইহার পর হযরত ইবরাহীম (আ) উদ্যোগী হইলেন। পুত্রকে যবাই করিতে প্রস্তুত হইলেন। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰؤُا الْمُبِيْنُ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ـ (الصافات، ١٠٢-١٠٣)

যখন উভয়েই আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবায়নে প্রস্তুত হইল এবং পিতা পুত্রকে কাত করাইয়া শোয়াইয়া দিল, তখন আমি তাহাকে ডাক দিলামঃ হে ইবরাহীম! তুমি নির্দেশ পালনে সততার প্রমাণ দিয়াছ। একান্তভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ লোকদিগকে এমনিভাবেই প্রতিফল দিয়া থাকি। নিঃসন্দেহে ইহা সুস্পষ্ট পরীক্ষা বিশেষ। আর পুত্র যবাইর বিনিময়ে তাহাকে এক যবাই করা মোটা তাজা জন্তু উপহার দিলাম।

বস্তুত হযরত ইবরাহীমের প্রাণাধিক পুত্র যবাইর বিনিময়ে একটা মোটা তাজা জন্তু যবাই হওয়ার সময় হইতেই এবং এই কাজে তাঁহার আদর্শের বাস্তব অনুসরণের প্রমাণ পেশ করার উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক বৎসর ঈদুল আযহা'র সময়ে পশু কুরবানী করার রেওয়াজ চালু হইয়াছে। বিশেষত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) মিল্লাতে ইবরাহীম পরিচিতিতেই দ্বীন-ইসলাম প্রচার করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার উম্মতের লোকদের পক্ষে হযরত ইবরাহীমের এই দৃষ্টান্তহীন আত্মত্যাগের অনুসরণে কুরবানী করা একান্তই জরুরী। নবী করীম (স) আলোচ্য হাদীসে কুরবানী সংক্রান্ত প্রশ্নের জওয়াবে এই কথাই বলিয়াছেন।

হাদীসে মূল বর্ণনাকারীর প্রথম প্রশ্ন উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِىْ 'এই উদাহী কি'? اَضَاحِىْ বহুবচনের শব্দ। একচনের اُضْحِيَّةٌ। আসমায়ী বলিয়াছেনঃ এই শব্দটির চারিটি রূপ হইতে পারেঃ (১) اُضْحِيَّةٌ ও اِضْحِيَّةٌ (২) اُضْحِيَةٌ ও اِضْحِيَةٌ ইহার বহুবচন اَضَاحِىْ (৩) ضَحِيَّةٌ ইহার বহুবচন ضَحَايَا আর (৪) اَضْحَاةٌ ইহার বহুবচন اَضْحٰى এই সব কয়টি রূপের মূল অর্থ 'সূর্যের উপরে উঠা'। যেহেতু এই জন্তু যবাই করার কাজ সকালে ঈদের নামায পড়ার পর এবং সূর্যের বেশ অনেকটা উপরে উঠার পর করা হয়, এইজন্য—এই সময়ের সম্পর্কের কারণে—ইহার নামকরণ হইয়াছে আযহা। ইমাম বুখারীর মতে এই হাদীসটি সনদের বিচারে সহীহ্ নয়; কিন্তু ইহার উদ্ধৃতকারিগণের মতে ইহার সনদ সহীহ।

কুরবানীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ اٰدَمِىٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ اِنَّهُ لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ مِنَ الْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا ـ (ترمذى، حاكم، ابن ماجه)

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ কুরবানীর দিন কোন ব্যক্তি রক্ত ঝরানোর তুলনায় আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় অন্য কোন কাজই করিতে পারে না। যবাই করা জন্তু কিয়ামতের দিন উহার শিং, পশম ও খুর লইয়া উপস্থিত হইবে। কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্‌র নিকট সন্তুষ্টির মর্যাদায় পৌছিয়া যায়। অতএব তোমরা উহাতে মনের সুখ ও সন্তোষ নিবদ্ধ কর। —তিরমিযী, হাকেম, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা হাদীসটি হইতে কুরবানীর ফযীলত ও মর্যাদার কথা বলা হইয়াছে। প্রথম কথা কুরবানীর দিন আল্লাহ্‌র সন্তোষ বিধানমূলক ও আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় পছন্দনীয় কাজ হইল কুরবানী করা। জয়নুল আরব ইহার অর্থ করিয়াছেন এই ভাষায়ঃ

اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ يَوْمَ الْعِيْدِ اِرَاقَةُ دَمِ الْقُرْبَاتِ ـ

ঈদুল আযহার দিন কুরবানীর জন্তুর রক্ত ঝরানোই অতীব উত্তম ইবাদত।

কুরবানী করা জন্তুও এই কারণে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইবে। এই মর্যাদা হইল, কিয়ামতের দিন জন্তুটি পূর্ণাঙ্গ হইয়া—যেমনটি দুনিয়ায় ছিল ঠিক তেমনি—এবং কোনরূপ অঙ্গহানি ব্যতিরেকেই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে। যেন উহার প্রত্যেকটি অংশ কুরবানীর সওয়াবের অংশ পাইতে পারে এবং কুরবানীদাতার জন্য উহা পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য বাহন হইতে পারে। কুরবানীর সময় জন্তুটির রক্ত মাটির উপর পড়ার আগেই আল্লাহ্‌র নিকট সন্তোষ পাইয়া যায় ও কবুল হয়। অর্থাৎ যবাই করার সংকল্প ও উদ্যোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এবং রক্ত ঝরানোর পূর্বেই আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হয়। কুরআন মজীদে এই কুরবানী সম্পর্কে বলা হইয়াছেঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ (الحج ، ٣٧)

কুরবানী করা জন্তুর গোশত ও উহার রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট কস্মিনকালেও পৌছায় না। বরং শুধু তোমাদের তাক্‌ওয়া—আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধানের ইচ্ছা ও উদ্যোগ গ্রহণই তাঁহার নিকট পৌছায় ও কবুল হয়। তিনি উহারই সওয়াব দেন।

বস্তুত কুরবানীর ব্যাপারে কুরবানীদাতার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই কুরবানী দেওয়ার জন্য এবং তাহাতে অন্য কোন উদ্দেশ্য যাহাতে শামিল হইতে না পারে সেই ব্যাপারে সাবধান করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাটি বলিয়াছেন। ইহারই প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (স)—এর এই নির্দেশ লক্ষণীয়ঃ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا

অর্থাৎ তোমরা যখন জানিতে পারিলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে দেওয়া কুরবানী কবুল করিবেন, উহার জন্য তোমাদিগকে বিপুলভাবে প্রতিফল দিবেন তখন তোমাদের মনে কুরবানী করার বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগ্রত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কুরবানী দেওয়ার পর উহা করিতে পারার জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করিবে এবং তোমাদের মনে এই কাজের প্রতি কোনরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব কিংবা অনীহা সৃষ্টি হওয়া কিছুতেই উচিত হইবে না।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে, নবী করীম (স) হযরত ফাতিমা (রা) কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ

قُوْمِىْ اِلٰى اُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيْهَا فَاِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا اَنْ يَّغْفِرَلَكِ مَاسَلَفَ مِنْ ذُنُوْبِكِ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَنَا خَاصَّةً اَهْلَ الْبَيْتِ اَوْلَنَا وَلِلْمُسْلِمِيْنَ قَالَ بَلٰى لَنَا وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ـ (بزار)

তুমি উঠ, তোমার কুরবানীর নিকট উপস্থিত হও এবং উহা দেখ। কেননা কুরবানীর যে রক্ত প্রবাহিত হয় উহার প্রতিবিন্দুর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অতীত গুনাহ মাফ করিয়া

দিবেন। হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেনঃ ইয়া রাসূল! আমাদের আপনার পরিবারবর্গের লোকদের জন্য ইহা কি বিশেষ ব্যবস্থা, না আমাদের জন্য ও সব মুসলমানের জন্য ইহা? নবী করীম (স) বলিলেন, না, বরং আমাদের ও সর্ব সাধারণ মুসলমানের জন্যই এই ব্যবস্থা —বায্যার

কুরবানীর উদ্দেশ্যে যবাই করা জন্তুর প্রবাহিত রক্তের প্রতিটি বিন্দুই যে ঈমানদার কুরবানীদাতার গুনাহ মাফীর কারণ হইবে এবং গুনাহ মাফী যে বিশেষ কোন ব্যক্তি কিংবা বিশেষ কোন পরিবারের লোকদের জন্য নয়, বরং সর্ব সাধারণ মুসলমানের জন্যই এই ব্যবস্থা, তাহা এই হাদীসটি এবং এই ধরনের বর্ণিত আরো বহু হাদীস হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায়। এই সমস্ত হাদীস সনদের বিচারে খুবই উন্নতমানের 'সহীহ' না হইলেও ইহা গ্রহণযোগ্যতার মানে উত্তীর্ণ—হাসান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই ইহা অবশ্য বিশ্বাস করিতে ও এই বিরাট সওয়াবের আশায় কুরবানী করিতে হইবে।

প্রত্যেকটি পরিবারের প্রতি বছর কুরবানী দেওয়া

حَدَّثَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ رض قَالَ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحَاةً وَعَتِيرَةً قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَلَا أَدْرِي مَا رَدُّوا - قَالَ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ -

(ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، نسائی)

হযরত মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) বলিয়াছেন, আমরা নবী করীম (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান অবস্থায় বলিলেনঃ হে জনগণ। নিশ্চয়ই প্রত্যেক ঘরের পরিবারের লোকদের প্রত্যেক বৎসর একটি কুরবানী করা কর্তব্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি জান, 'আতীরা' কাহাকে বলে? এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইবনে আউন বলিয়াছেন, সাহাবিগণ রাসূলে করীমের এই জিজ্ঞাসার কি জওয়াব দিয়াছেন তাহা আমি জানি না। রাসূলে করীম (স) নিজেই বলিয়াছেনঃ 'আতীরা' বলিতে তাহাই বুঝায়, যাহাকে লোকেরা 'রজবিয়াহ' বলিত।

ব্যাখ্যা হাদীসটিতে রাসূলে করীম (স)-এর মোটামুটি দুইটি কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। একটি হইল, প্রত্যেক পরিবার বা ঘরবাসীদের পক্ষ হইতে একটি কুরবানী দেওয়া যথেষ্ট, সে ঘর বা পরিবারের লোকসংখ্যা যাহাই হউক না কেন। আর এই কুরবানী প্রতি বছর—বছরে একবার দিতে হইবে। এমন নয় যে, জীবনে একবার দিলেই কুরবানী দেওয়ার কর্তব্য পালন হইয়া যাইবে, আর দিতে হইবে না। হজ্জ জীবনে একবার করা হইলে হজ্জের ফরযীলত আদায় হইয়া গেল; কিন্তু কুরবানী সেরূপ নয়। ইহা প্রত্যেক বৎসরই ঈদুল আযহার সময় দিত হয়।

রাসূলে করীম (স)-এর দ্বিতীয় কথাটি হইল, তিনি আতীরা বলিতে কি বুঝায় তাহা লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি নিজেই জওয়াব দিলেন যে, 'আতীরা' (عَتِيرَةٌ) বলিতে তাহাই বুঝায় লোকেরা যাহাকে 'রজবীয়া' বলে। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা রজব মাসে দেবতাদের উদ্দেশ্যে একটি ছাগী যবাই করিত। কাহারো কাহারো মতে ইহা মানতের কুরবানী হইত। একজন মানত মানিত যে, সে যদি একটা বিশেষ পরিমাণের ধন-সম্পদ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে প্রতি দশটি উষ্ট্র কিংবা ছাগলের বিনিময়ে একটি রজব মাসে যবাই করিবে।

প্রথম দিক দিয়া মুসলমানরাও তাহা করিত। কিন্তু পরে উহা বাতিল ও নাকচ করা হয়। কেননা এই যবাইটা হইত মূর্তির উদ্দেশ্যে এবং উহার রক্ত মূর্তির গায়ে মাথায় লেপিয়া দেওয়া হইত।

عَتِيرَةٌ শব্দটি عَتَر হইতে নির্গত। ইহার অর্থ যবাই করা। আর যেহেতু রজব মাসে এই যবাই হইত, এইজন্য উহাকে সাধারণত 'রজবীয়া' বলা হইত এবং এর নামটি সর্বজনবিদিত ছিল। নবী করীম (স) তাঁহার কথায় সেই দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে সনদের দিক দিয়া حسن বলিয়াছেন। কিন্তু ইমাম খাত্তাবী ইহাকে যয়ীফ বলিয়াছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরবানী দেওয়া আবশ্যকতা ও এই নিয়মের যথার্থতা অনস্বীকার্য।

কুরবানী দেওয়া কি? — ওয়াজিব না সুন্নাত? ফিকাহ্র দৃষ্টিতে এই বিষয়টি আলোচিতব্য।

সাধারণভাবে সাহাবিগণ ও ফিকাহ্র ইমামগণ মত দিয়াছেন, কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কিদা— অবশ্য সচ্ছল লোকের প্রতি। তবে ইহা তাহার প্রতিও ওয়াজিব নয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারূক, হযরত বিলাল ও হযরত আবূ মাসউদ আলবদরী (রা) প্রমুখ সাহাবী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আতা, আলকামা ও আসওয়াদ প্রমুখ তাবেয়ী এবং মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবূ ইউসুফ, ইসহাক, আবূ সওর, আল মুজানী দাউদ ও ইবনুল মুনযির পমুখ ফিকাহ্বিদ এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফা, রবীয়া, লাইস ইবনে সা'দ ও আওযায়ী বলিয়াছেন, কুরবানী করা সচ্ছল অবস্থার লোকের জন্য ওয়াজিব। মুহাম্মাদ ইবনে হাসান বলিয়াছেন, নিজ বাড়ীতে উপস্থিত ও মুসাফির নয়—এমন ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানিফা সম্পর্কে বলা হইয়াছে, বাড়ীতে উপস্থিত ব্যক্তি যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হইলে তাহার কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতের সমর্থকগণ তাহাদের মতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে উপরোক্ত হাদীস ও এই ধরনের আরো বহু হাদীস পেশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে কুরআনের আয়াতঃ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

অতএব তোমার আল্লাহ্র জন্য তুমি নামায পড় এবং কুরবানী দাও।

এই আয়াতটিও তাঁহাদের একটি বড় দলীল। তাঁহারা বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা নিজেই এই আয়াতটিতে কুরবানী করার হুকুম দিয়াছেন। আর হুকুম হইলে তো তাহা পালন করা ওয়াজিব— অবশ্য কর্তব্য হইয়া যায়।

এই পর্যায়ে আর একটি হাদীস হইলঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

(ابن ماجه، مسند احمد، ابن ابى شيبه، ابو يعلى، دارقطنى، حاكم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) ঘোষণা করিয়াছেনঃ যে লোক অর্থ সম্পদ ও অবস্থার দিক দিয়া সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী করেন না সে যেন আমার নামায পড়ার স্থানের নিকটেও আসে না।

ব্যাখ্যা যে লোক সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী করে না, সে যেন আমার নামায পড়ার স্থানেও অর্থাৎ আমার এই মসজিদে না আসে ও নামাযের জামা'আতে শরীক না হয়। সামর্থ্যবান ব্যক্তি কে? যাহারই যাকাত ফরয হওয়া পরিমাণ সম্পদ আছে, সে-ই সামর্থ্যবান ব্যক্তি। এইরূপ ব্যক্তি কুরবানী না দিলে নবী করীম (স) তাহাকে মসজিদের কাছেও যাইতে এবং মসজিদের জামা'আতে শরীক হইতে নিষেধ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি অত্যন্ত কড়া শব্দ ও ভঙ্গি ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতই ইহা অত্যন্ত কঠোর কথা। এই কথা হইতে কুরবানী করার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কুরবানী না করিলে তাহার নামাযও সহীহ্ হইবে না এমন কথা অবশ্য নয়। কিন্তু রাসূলে করীমের এই কথা হইতে বুঝা যায়, যে লোক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী দেয় না, রাসূলে করীম (স) তাহাকে সমাজের নেক লোকদের মধ্যে গণ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। দ্বিতীয় সে লোক তাহার নিজের

আমল দ্বারাই প্রমাণ করে যে, সে মুসলিম সমাজ ও জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং মুসলিম সমাজের রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি সভ্যতা মানিয়া চলিতে সে প্রস্তুত নয়। রাসূলে করীমের এই কঠোর বাণীর মূলীভূত কারণ ইহাই। আর যে কাজের জন্যই এইরূপ কঠোর বাণী স্বয়ং রাসূলে করীমের মুখে উচ্চারিত ও ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই ওয়াজিব হইবে।

যাঁহারা কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কিদা বলেন, তাঁহারা উপরোদ্ধৃত আয়াতটি প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই আয়াত হইতে কুরবানী করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। আয়াতটির বক্তব্যও তাহা নয়। বরং এই আযাতে নামায ও কুরবানী খালিসভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোনরূপ শিরকী আকীদা ব্যতিরেকেই করিবার নির্দেশ হইয়াছে। কিন্তু কুরবানী করিতেই হইবে এমন কথা নয়। তবে উহা করিলে কেবলমাত্র আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে, একমাত্র তাঁহারই সন্তোষ বিধানের জন্য করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এইরূপ যুক্তি বিশ্লেষণ খুব বলিষ্ঠ ও অকাট্য বলিয়া মনে হয় না। কেননা কুরবানী যে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্রই জন্য করিতে হইবে, ইহাতে তো কোন দ্বিমতের অবকাশ নাই। তবে وَانْحَرْ 'কুরবানী কর' আল্লাহ্র এই সুস্পষ্ট নির্দেশ হইতে যে ওয়াজিব প্রমাণিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং নবী করীম (স)-ও অনুরূপভাবে এই জন্য নির্দেশই দিয়াছেন। বলিয়াছেনঃ

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّىَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا اُخْرٰى - (بيهقى، مسند احمد)

যে লোক ঈদের নামাযের আগেই কুরবানী দিয়া বসিয়াছে, সে যেন নামাযের পর উহার স্থলে আর একটি কুরবানী করে।

ইহা রাসূলে করীম (স)-এর আদেশ এবং রাসূলের আদেশ হইতে ওয়াজিবই প্রমাণিত হয়। ইহা সর্বসম্মত।

ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ফিকাহ্বিদ তাঁহাদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে নিম্নোদ্ধৃত হাদীসটিতে পেশ করিয়াছেনঃ

اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَاَرَادَ اَنْ يُّضَحِّىَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهٖ وَلَا مِنْ بَشَرِهٖ - (مسلم، مسند احمد)

দশ যিলহজ্জ হইলে যে লোক কুরবানী করার ইচ্ছা করিবে সে যেন কুরবানী জন্তুর পশম ও চামড়া স্পর্শ না করে।

এখানে বলা হইয়াছে, 'যদি কেহ কুরবানী করার ইচ্ছা করে।' অর্থাৎ ইহা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ব্যাপার, বাধ্যতামূলক বা জরুরী কিছু নয়। যদি ইহা ওয়াজিবই হইত, তাহা হইলে নবী করীম (স) কাজটিকে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিতেন না।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারূক (রা) হইতে হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারূক (রা) কুরবানী করিতেন না এই ভয়ে যে, তাহা দেখিয়া লোকেরা ইহাকে ওয়াজিব মনে করিয়া বসিবে।

ইহা উভয় মতের সমর্থনের দলীলসমূহের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরবানীর রেওয়াজ মুসলিম সমাজের শুরু হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। ইহার গুরুত্ব কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। (بلوغ الامانى - تحفة الاحوذى)

হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় যে সব তাফসীর ও শরাহ্ গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, সে সবের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

১. আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন— কুরআনের তাফসীর— তাফসীরুল কুরতুবী নামে খ্যাতঃ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল আনসারী আল-কুরতুবী।

২. রূহুল মা'আনী ফী-তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস্ সাব্য়িল মা'আনী, আবুল ফযল শিহাবউদ্দীন আস্সায়্যিদ মুহ্ম্মাদ আ-লুসী আল-বাগদাদী। মৃত্যুঃ ১২৭ হিজরী।

৩. লুবাবুত্তা'বীল ফী মাআনীয়েত তানযীল— তাফসীরুল খাযেন ঃ আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-বাগদাদী আল খাযেন। মৃত্যুঃ ৭২৫ হিজরী।

৪. ফত্হুল বারী, শরহি সহীহুল বুখারী— ইমামুল হাফেয আহ্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩—৮৫২ হিঃ)।

৫. উমদাতুল কারী, শরহি সহীহুল বুখারী ঃ শায়খুল ইসলাম বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মাদ মাহমুদ ইবনে আহ্মদ ইবনে মূসা আল-আইনী (৭৬২—৮৫৫ হিঃ)।

৬. তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী শরহি জামে' তিরমিযী ঃ আবুল অলী মুহাম্মাদ আবদুর রহ্মান ইবনে আহমদ আল-মুবারকপুরী (১২৫৩—১২৮৩ হিঃ)।

৭. নববী শরহি মুসলিম ঃ মুহিউদ্দিন আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবনে শারফ আন-নববী (৬৩১—৬৭৬ হিজরী)

৮. বজ্লুল মজহুদ ফী হল্লে আবূ দাউদ। আবূ ইবরাহীম খলীল আহমদ।

৯. নাইলুল আওতার— শরহি মুনতাকাল আখবার মিন্ আহাদীসে সায়্যিদিল আখ্ইয়ার ঃ শায়খ কাযী মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ আশ্-শাওকানী। মৃত্যুঃ ১২৫৫ হিজরী।

১০. বুলুগুল আমানী মিন আস্রারিল ফত্হির রব্বানী ঃ আহ্মদ আবদুর রহমান আলবান্না আস্সায়াতী শরহি মুসনাদে ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল আশ্-শায়বানী।

১১. মিরকাতুল মাফাতীহ শরহি মিশ্কাতুল মাসাবীহ ঃ আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মাদ আলক্বারী। মৃত্যু ঃ ১০১৪ হিজরী।

১২. আশ্য়াতুল-লুমাআত, শরহি মিশ্কাত (ফার্সী) শাহ্ আবদুল হক্ মুহাদ্দিস দিহলভী।

১৩. আল-কাওকাবুদ দুররী শরহিত্ তিরমিযী।

১৪. যাদুল মা'আদ ফী হাদিয়ে খায়রিল ইবাবদ ঃ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইবনুল কায়্যিম আল জাওজীয়া। মৃত্যুঃ ৭৫১ হিজরী।

১৫. মায়ালিমুস্— সুনান শহরি সুনানে আবূ দাউদ ঃ ইমাম আবূ সুলায়মান হামদ্ ইবনে মুহাম্মাদ আল-খাত্তাবী। মৃত্যুঃ ২৭৫ হিজরী।

১৬. ফত্হুল মুব্দী শরহি মুখ্তাসারুজ্ যুবাইদীঃ শায়খ আবদুল্লাহ আশ্-শারকাভী।

১৭. আহ্কামুল কুরআন ঃ আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরাবী।

১৮. শরহিয্- যারকানী আ'লা মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

১৯. মা'আরিফুল হাদীস (উর্দূ) মাওলানা মনজুর নু'মানী।

২০. আল-ফিক্হু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া (ফিকাহ্)

২১. তুহ্ফাতুল ফুকাহা ঃ আস-সামারকন্দী (ফিকাহ্)

২২. আল-হিদায়া।

২৩. আল-মুগনীঃ ইবনে কুদামা।

২৪. বিদায়াতুল মুজতাহিদ-ওয়া-নিহায়াতিল মুকতাসিদঃ মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবী।

২৫. ফিকহুস্ সুন্নাত (উর্দূ)— আসিমুল হাদ্দাদ্।

গ্রন্থপঞ্জী

এই গ্রন্থে যেসব মৌলিক গ্রন্থাবলীর হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে সে সবের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. বুখারী শরীফ— আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম বুখারী। জন্ম ঃ ১৩ শওয়াল, ১৯৩ হিজরী।

২. মুসলিম শরীফ— আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ। জন্ম ঃ ২০৪ হিজরী।

৩. সুনানে নাসায়ী— আবূ আবদুর রাহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে বাহ্‌র ইবনে দীনার আন্-নাসায়ী। জন্মঃ ২১৫ হিজরী।

৪. সুনানে আবূ দাউদ— সুলায়মান ইবনুল আশ্‌য়াস ইবনে ইসহাক আল আসাদী আস্ সিজিস্তানী। জন্মঃ ২০২ হিজরী।

৫. জামে' তিরমিযী— আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাতা ইবনে মূসা ইবনে জাহাকুস্‌সল্লামী আত্-তিরমিযী। জন্মঃ ২০৯ হিজরী।

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ্— আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ্ আল-কাজভীনী।

৭. মুয়াত্তা ইমাম মালিক— ইমাম মালিক ইবনে আনাস। জন্ম ঃ ৯৩ হিজরী।

৮. মুস্তাদরাক হাকেম— হাকেম নিশাপুরী।

৯. দারেকুত্‌নী— আলী ইবনে উমর ইবনে আহ্‌মদ। জন্ম ঃ ৩০৬ হিজরী।

১০. মুসনাদে আহ্‌মদ— ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল। জন্ম ঃ ১৬৪ হিজরী।

১১. মুসান্নাফ ইবনে শায়বা— আবূ বকর ইবনে শায়বা।

১২. ইবনে খুযায়মা— মুহাম্মাদ ইবনে ইস্‌হাক আবূ বকর ইবনে খুযায়মা নিশাপুরী। ইন্তেকাল ঃ ৩১১ হিজরী।

১৩. সুনানে দারেমী— ইমাম দারেমী।

১৪. তাবারানী— আবুল কাশেম সুলায়মান ইবনে আহ্‌সান আত্ তাবারানী। তাঁহার হাদীস গ্রন্থ তিনটি ভাগে বিভক্ত (১) আল-কবীর, (২) আল-আওসাত (৩) আস্-সগীর।

১৫. তাহাভী— আবূ জাফর আহ্‌মদ ইবনে মুহাম্মাদ আত্-তাহাভী।

১৬. বায়হাকী— আস্-সুনানুল কুবরা, আহ্‌মদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী। মৃত্যুঃ ৪৫৮ হিজরী।

১৭. মুসনাদে শাফেয়ী— কিতাবুল উম্ম, ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আশ্ শাফেয়ী। জন্ম ঃ ১৫০ হিজরী। মৃত্যু ঃ ২০৪।

১৮. ইবনে হাব্বান— মুসনাদে ইবনে হাব্বান।

১৯. তায়ালীসী— আবূ দাইদ তায়ালীসী।

২০. আল-মুনযিরী— মুসনাদ আল-মুনযিরী।

২১. মুয়াত্তা মুহাম্মাদ— ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী।

২২. কিতাবুল আ-সার— মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান।

রাসূলে করীম (স.) বলিয়াছেন :
আল্লাহ্ তা'আলা সেই লোকের
মুখমণ্ডল উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত
করিবেন, চির সবুজ চির তাজা
করিয়া রাখিবেন, যে আমার
কথা শুনিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিবে
কিংবা স্মৃতিপটে সংরক্ষিত
রাখিবে এবং অপর লোকের
নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দিবে।
জ্ঞানের বহু ধারকই প্রকৃত জ্ঞানী
নহে, তবে জ্ঞানের বহু ধারক
উহা এমন ব্যক্তির নিকট
পৌঁছাইয়া দেয়, যে তাহার
অপেক্ষা অধিক সমঝদার।
—আবু দাউদ
খায়রুন প্রকাশনী